২

বিমল কর

কিকিরা সমগ্র

কিকিরা সমগ্র ২

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

সূচি

ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন

ময়ূরগঞ্জের নৃসিংহ সদন

তারাপদরা সবেই ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে, প্ল্যাটফর্মের আলোগুলো হঠাৎ কমে এল। একে তো ছোট স্টেশন, লোকজনও তেমন একটা নামল না গাড়ি থেকে বা উঠল না, তার ওপর আলোগুলো কমে আসতেই কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা নিঝুম মতন মনে হল জায়গাটা।

এদিকে আবার আকাশে মেঘ ডাকছে। একে পৌষের শীত, সময়টাও সন্ধে হয়-হয়, রীতিমত উত্তুরে বাতাস দিচ্ছে কনকনে, এর ওপর যদি বৃষ্টি শুরু হয়—তবে তো হয়ে গেল।

তারাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিল চন্দনকে, এমন সময় কানে এল, "হ্যা-ল্-লো !"

কিকিরা। হাত দশেক মাত্র তফাতে। এগিয়ে আসছিলেন তিনি।

তারাপদ আর চন্দন কিকিরাকে দেখতে লাগল। দেখার মতনই বেশভূষা। গরম প্যান্ট, ঢলঢল করছে ; গায়ে পুরো-হাতা বেঢপ এক পুলওভার ; রং ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, গাঢ় মেরুন রং বোধ হয়, মেরুনের সঙ্গে সাদার নকশা। রোগা-পাতলা, মাথায় লম্বা কিকিরার গায়ে জিনিসটা যা মানিয়েছে—আহা ! কিকিরার গলায় বড়সড় মাফলার, মাথায় এক কাশ্মীরি টুপি, হাতে ছড়ি আর টর্চ।

এগিয়ে এসে কিকিরা বললেন, "ট্রেন লেট। প্রায় এক ঘণ্টা।"

তারাপদ বলল, "চার ঘণ্টাও হতে পারত। ট্রেনের ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল। একটা ছোট জংশন স্টেশনে গাড়ি থামল, তারপর ছাড়ল যখন—ট্রেন আর এগোয় না, ইঞ্জিনের চাকা রেল লাইনে স্লিপ করতে লাগল। শুধু চাকা ঘুরে যায় বনবন করে।"

"বলো কী ?"

"রেলের লোকগুলো বালতি-বালতি বালি ঢালতে লাগল লাইনে, চাকার পাশে। সে এক কাণ্ড ! শেষ পর্যন্ত চাকাগুলো গ্রিপ পেল।"

কিকিরা বললেন, "আজকাল ট্রেন মানেই ট্রাবল ! হয় এটা, না হয় ওটা।

নাও নাও চলো ; আর দাঁড়িয়ে থাকা নয়।" বলেই কিকিরা মুটে ডাকতে লাগলেন।

মালপত্র কম। দুটো সুটকেস, দুটো হোল্ডঅল, একটা বেতের ঝুড়ি।

একটা মুটে হলেই চলত ; সুটকেসগুলো চন্দনরা হাতে-হাতে নিতে পারত। কিকিরা দু'জন মুটে ঠিক করলেন। বললেন, "নৃসিংহ-সদন খানিকটা দূর হে, মাইলটাক পথ। রাস্তাও তোমাদের কলকাতার মতন নয়, পাথর, গর্ত, এবড়োখেবড়ো, মাঠ-ময়দানের ভেতর দিয়েও যেতে হবে শর্টকাট করে, ওরাই নিক, তোমরা ফ্রি হ্যান্ডে চলো।" বলে একটু হাসলেন।

চন্দন তামাশা করে বলল, "ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে-করতে ?"

মুটেরা মাল উঠিয়ে নিল। নৃসিংহ-সদনের রেট পাঁচ টাকা করে।

কিকিরা বললেন, "আরে পাঁচ কাহে ছ' করকে মিলি তুহার। থোড়া জলদি জলদি চল্ ; আগ্‌র পানি আ যায়ি তো..."

ওভারব্রিজের আগেই টিকিটবাবুর সঙ্গে দেখা। চন্দন পকেট থেকে তাদের টিকিট বের করে এগিয়ে দিল।

টিকিটবাবু ছোকরা। বাঙালি। চন্দনদের দেখে নিয়ে হেসে কিকিরাকে বলল, "আপনার গেস্ট, দাদু ?"

কিকিরা বললেন, "রেস্‌পেক্টেব্‌ল্ গেস্টস্ ! ইনি হলেন ডাক্তার, ধন্বন্তরি ; আর উনি সেতার, কলকাতায় ওঁর খুব নাম সেতারে..." বলে হাত দিয়ে আঙুল নেড়ে সেতার-বাদ্যটা বুঝিয়ে দিলেন। হেসে বললেন আবার, "চলি, রাহাবাবু। অনেকটা যেতে হবে। বৃষ্টি এসে গেলেই মরব।" পা বাড়িয়ে কী মনে পড়ে যাওয়ায় আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন আর কোনো খবর আছে ?"

টিকিটবাবু মাথা নাড়লেন। "তেমন খবর কিছু নেই ?"

"তেমন নেই, তা এমন খবর কী আছে !"

"এমনও বলার মতন নয়। তবে লোকে বলছে, যে-লোকটা মারা গিয়েছে সেই লোক আর যাকে আগুনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত—তারা এক নয়।"

"আচ্ছা ! লোকে বলছে... ! চলি, রাহাবাবু।"

ওভারব্রিজে উঠেই শীতের দাপটটা আরও বোঝা গেল। পৌষ মাস, ডিসেম্বরের একেবারে শেষ। কনকনে বাতাস আসছে ঝাপটা মেরে। আকাশে মেঘ। চারপাশ জুড়ে যে ভীষণভাবে মেঘ ডাকছে তা অবশ্য নয়, কিন্তু গুড়গুড় শব্দটা রয়েছে। দূরের বিদ্যুৎ-চমক চোখে পড়ার মতন নয়। বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে। অথচ সবেই সন্ধে এখন। শীতের দিনে এই সময়টাকেই রাত বলে মনে হয়।

ওভারব্রিজের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে কিকিরা বললেন, "ট্রেনে এলে কেমন ?"

"এলাম। ভিড় মোটামুটি।...এক্সপ্রেস গাড়ি। শুনলাম—গাড়িটা সব সময় লেট রান করে বলে অনেকেই এই ট্রেনে আসতে চায় না, রাত্তিরের মেল নেয়।"

"তোমাদের বরাত ভাল হে! এ ট্রেন চার-পাঁচ ঘণ্টাও লেট করে। এর নাম লেট লতিফ ট্রেন। তোমাদের বেলায় মাত্র এক ঘণ্টা। কিস্যু নয়।"

"আপনিই তো এই ট্রেনটায় আসতে বলেছিলেন।"

"ঠিকই বলেছিলাম। রাত্তিরের গাড়িতে এলে তোমাদের কষ্ট হত, আমারও বুড়ো হাড়ে সহ্য হত না।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "আপনি বুড়ো!...এই বুড়ো হাড়েই কত ভেলকি দেখাচ্ছেন! এখন সাফসুফ বলুন তো কিকিরা-স্যার, আপনি হঠাৎ এই ময়ূরগঞ্জ নামক জায়গাটিতে এলেন কেন?"

কিকিরা বললেন, "বেড়াতে। বড়দিনের ছুটি কাটাতে।"

চন্দন বলল, "আপনি তা হলে বড়দিন করেন?"

"করি। আমার বাপ ঠাকুরদাও করেছেন। তোমরা করো না? কলকাতায় তোমাদের বড়দিন হয় না? সাহেব পাড়ায় বড়দিনের কথা বাদ দাও। দিশি পাড়ায় তোমাদের কেক খাবার বহর কম নাকি? কেক খাওয়া, পিকনিক করা, চিড়িয়াখানায় যাওয়া... ! দেখো হে স্যান্ডেল উড, খাঁটি সাহেবরা চলে গেছে বটে—কিন্তু তাদের লেজের টুকরো পড়ে পড়ে আছে। ওদের ফুর্তি-ফার্তা আমাদেরও করতে হচ্ছে অল্পস্বল্প।" কিকিরা টর্চের আলো দেখাতে লাগলেন। এখানের পথঘাট অন্ধকার।

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনি যদি বড়দিনের ছুটি কাটাতে এখানে এসে থাকেন—ভাল কথা। আমরা তা হলে শুধু ছুটি কাটাব, নাথিং মোর।...ওই যে শুনলাম আপনার রাহাবাবু কি সব বললেন, ওর মধ্যে আমরা নেই। কী বলিস, চাঁদু?"

চন্দন কিছু বলল না।

শীত এখানে সত্যিই বেশি। আজ বাদলা-বাদলা ভাব হয়েছে বলে আরও শীত পড়েছে, না, মেঘলার দরুন শীত খানিকটা চাপা রয়েছে, আপাতত তা বোঝা মুশকিল; মেঘ কাটলে বোঝা যাবে।

কিকিরা ঠিকই বলেছিলেন। এ তো রাস্তা নয়, যেন পাহাড়তলির হাঁটা পথ। উঁচু-নিচু গর্ত, ছোট-ছোট ঝোপ, পাথরের টুকরো ছড়ানো। গাছপালাও দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। বিশাল-বিশাল গাছ। অন্ধকারে বোঝা না গেলেও মনে হচ্ছিল, তেঁতুল, কাঁঠাল, অশ্বত্থ ছাড়া এত বড়-বড় গাছ বড় একটা হয় না।

সকাল না হলে বোঝা যাবে না জায়গাটা কেমন। কিকিরা অবশ্য লিখেছেন—খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা, অনেকেই জল-হাওয়া বদলাতে আসে, তবে ভিড়-ভাড়াক্কা বেশি হয় না। থাকার মতন ঘরবাড়ি এখানে কম।

তারাপদ আবার বলল, "কিকিরা-স্যার, আপনি যে কথা বলছেন না ?"

কিকিরা বললেন, "তোমরা কি বেড়াল ! আঁশের গন্ধ ছাড়া নাকে কিছু ঢোকে না !"

তারাপদ বলল, "এই অভ্যেস আপনিই করিয়েছেন।"

"বলো ! যা মন চায় বলো !"

"এক-এক করে বলি !"

"যেমনভাবে তোমাদের ইচ্ছে।"

তারাপদ বলল, "তা হলে বলি। এক নম্বর পয়েন্ট হল, আপনি আগেভাগে কিছু না জানিয়ে রাতারাতি এখানে আসা ঠিক করে ফেললেন। আসার আগে আমার কাছে একটা দু' লাইনের চিঠি পাঠালেন। ব্যাপার কী ? না, আমি বড়দিনের ছুটি কাটাতে অমুক জায়গায় যাচ্ছি। পৌঁছেই তোমাদের চিঠি দেব। ঠিক কি না ?"

"ঠিক। কারেক্ট।"

"এখান থেকে আপনি যে চিঠি দিলেন—তাতে লিখলেন, তুরন্ত চলে এসো। কী খাসা জায়গায় আছি না এলে বুঝবে না ! ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খিদে পায়, মুরগি ভেরি চিপ, দুধে মাত্র ওয়ান-টেনথ জল থাকে। শাকসবজি টাটকা। বড়দিন কাটাবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। লিখেছিলেন তো ?"

"কারেক্ট।"

"তারপর কী লিখেছিলেন ?"

"কী লিখেছিলাম ! মনে পড়ছে না।"

'স্যার, আপনি আমাদের লেজে খেলাচ্ছেন কেন ! এতদিন আপনার শাগরেদি করছি !...আপনি লিখেছিলেন—এখানে এলে তোমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না। 'অলস বিলাসে কাটিবে না বেলা'...। লিখেছিলেন না ?"

কিকিরা নিরীহ গলায় বললেন, "লিখেছিলাম বুঝি ! তা লিখতে পারি। মাঝে-মাঝে আমায় পদ্য ভর করে। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম।"

"এবার বলুন। প্লিজ !"

কিকিরা সামান্য চুপ করে থেকে বললেন "ধৈর্যং ধরতি রাঘব..." বলে নিজেই হেসে ফেললেন।

তারাপদরা হেসে ফেলল। বলল, "স্যার, আপনি তো ইংলিশদের নাক ভাঙার ব্রত নিয়েছেন, হঠাৎ স্যাংস্ক্রিট কেন ?"

"মাঝে-মাঝে জিভের স্বাদ পালটাতে হয়।...তবে কি জানো, এখানে রাঘব মানে রামচন্দ্র নন, রঘুপতি রাঠোর।"

"রঘুপতি রাঠোর ! দারুণ নাম ! ছত্রপতি বংশের নাকি ?" বলে হাসল তারাপদ।

"জানি না।...আমি যেখানে উঠেছি—নৃসিংহ-সদন, তার মালিক এই রঘুপতি।"

"আচ্ছা।"

"দেখলে বুঝতে পারবে। মানুষটিকে মালুম করতে পারবে খানিকটা। সেইসঙ্গে বাড়িটা দেখলেও চমৎকৃত হবে।"

"চমৎকৃত !'

"ওই হল বাবা !...তা এই রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অত কথা বলা যাবে না। আগে বাড়িতে চলো। একটু জিরিয়ে নিয়ে ডবল ডোজ চা, ডবল ডিমের ওমলেট, পটেটো ফ্রাই, টমাটো সস খাও—পেট জুড়োক—তারপর আস্তে-আস্তে সব শুনবে। এখন রাস্তা দেখে পথ হাঁটো, নয়ত হোঁচট খাবে।" বলে টর্চের আলোটা আরও কাছাকাছি ছড়িয়ে দিলেন।

চন্দন বলল, "জায়গার নাম ময়ূরগঞ্জ, অথচ রাস্তা আর মাঠ দেখে মনে হচ্ছে—এর নাম হওয়া উচিত ছিল পাথরগঞ্জ।"

কিকিরা মজা করে বললেন, "নামের মহিমা আছে হে ! পরে শুনো—এখন সাবধানে এগোও আর খানিকটা, তারপর মাঠ ধরব। শর্টকাট। মাঠ পরিষ্কার।"

মুটে দুটো সামনেই ছিল। যেতে-যেতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল নিচু গলায়। ওদের গায়ে ভুট কম্বলের মতন জামা, গামছায় কান-মাথা জড়ানো। চেনা রাস্তা বলে ওদের যেন কোনো অসুবিধেই হচ্ছিল না, অন্ধকারের মধ্যে দিয়েও চলে যাচ্ছিল দিব্যি।

খানিকটা তফাতে দু-চার ঘর কুঁড়ে। একটা ঝুপড়ি। টিমটিপে বাতি জ্বলছে। মাঠে যেন আরও জোর বাতাস। আকাশের কোনো প্রান্তেই তারা নেই। মেঘ ডাকছিল আগের মতনই।

কিকিরা বললেন, "রাত্তিরে ঠিক বুঝছ না, জায়গাটা কিন্তু সত্যিই ভাল।'

"স্বাস্থ্যকর বলছেন ?"

"খুবই স্বাস্থ্যকর। যেসব বাঙালিবাবু পুজোয় আর বড়দিনে জল-হাওয়া বদলাতে বেরিয়ে পড়ে, তারা এখনও এই জায়গায় খবর পায়নি। পেলে আর রক্ষে রাখবে না। মধুপুর-দেওঘর করে তুলবে। জায়গাটা কিন্তু পুরনো। বাঙালিবাবুদের বাড়িও আছে কিছু।"

"কই, চোখে তো পড়ছে না ?" চন্দন বলল।

"এ-পাশে চোখে পড়বে না। আমরা শর্টকাট করে যাচ্ছি। বড় রাস্তা ঘুরে গেলে দেখতে পেতে। বাহারি নামও আছে বাড়ির : 'সন্ধ্যানীড়', 'রুবিভিলা', 'মিতালি-লজ', 'ব্লু হাউস', 'মুন লাইট'। আবার 'দীননাথ', 'মাতৃস্মৃতি'—তাও আছে।"

"সব বাড়িই কি একদিকে, না... ?"

"উঁহু ! দু-চারটে স্টেশনের বাঁদিকে, বাকিগুলো এদিকে।"

"আপনার নৃসিংহ-সদন ?"

"একেবারে শেষদিকে। লাস্ট।"

"তা আপনার গৃহস্বামী রঘুপতি রাঠোর কোথাকার লোক ?"

"সাত পুরুষ আগে কোথা থেকে এসেছিলেন কে জানে ! এখন বাঙালি। রাঠোর পদবিটাকে বাড়িয়ে নিয়ে রায়-রাঠোর করে নিয়েছেন।"

"তা হলে তো স্যার আপনার জাত—কিঙ্করকিশোর রায় !" তারাপদ হেসে ফেলল।

"গৃহস্বামীর বয়েস ?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"বয়েস, পঞ্চাশের ওপর। বাহান্ন-তিপান্ন। মাতৃভাষা বাংলা। পত্নী বিগত। দুই পুত্রের মধ্যে একজন এখন জাহাজে-জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। অন্যজন কলকাতার বাড়িতে। সে বেচারির ছেলেবেলায় পোলিও হয়ে পা দুটো জখম হয়ে গেছে। দাঁড়াতে পারে না ভাল করে। কলকাতায় তাকে দেখাশোনা করার লোক আছে বলে তাকে কলকাতার বাড়িতেই রাখতে হয়। এখানে তাকে রাখার নানান অসুবিধে। খুব কমই এখানে এসেছে। তা ছাড়া রঘুপতিবাবু নিজেও কলকাতাতেই বেশি থাকেন।"

তারাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় জোরে মেঘ ডেকে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যুৎও চমকে গেল কাছেই।

কিকিরা বললেন, "তাড়াতাড়ি পা চালাও। বৃষ্টি এসে পড়লে ভিজে ন্যাতা হয়ে যেতে হবে।"

চন্দনরা জোরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "কিকিরা-স্যার—ঘটনাটা কি এই রঘুপতি রাঠোরকে নিয়ে ?"

"হ্যাঁ।...এখন আর কথা নয়, কাজ। মুখ বন্ধ করো, পা চালাও ; রানিং লাগাও।

বৃষ্টি আসেনি। বৃষ্টি আসার তোড়জোড় অবশ্য বেড়েছে। তারাপদরা নৃসিংহ-সদন-এ পৌঁছে গিয়েছিল।

বাড়ি দেখে তারাপদ বলল, "কিকিরা, এটা কি ভূতের বাড়ি ?"

কিকিরা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে একটি লোককে দেখিয়ে দিলেন। লোকটির হাতে লণ্ঠন। বছর চল্লিশ বয়েস হতে পারে, ঠিক ছোকরা নয়, আবার বয়স্কও নয় তেমন। হাতে লণ্ঠন, গায়ে গরম চাদর, পরনে ধুতি। স্বাস্থ্যবান চেহারা।

লোকটিকে দেখিয়ে কিকিরা বললেন, "চন্দন, এর নাম বিরজু। আদিতে বিরিজলাল। আমি বলি বিরজুবাবা। নামটা হিন্দুস্থানি হলে কী হবে বিরজুবাবা বারো-চোদ্দ বছর বয়েস থেকে এ-বাড়িতে।" বলে বিরজুর দিকে তাকালে

কিকিরা, "এ-বাড়িতে তোমার কত বছর চলছে বিরজুবাবা ?"

"পঁচিশ বছর।" পরিষ্কার বাংলায় বলল বিরজু। "বুড়োবাবু আমায় বিরজু বলে ডাকতেন।"

"বুড়োবাবু ? মানে রঘুপতিবাবু ?"

"না। বাবুর বাবা।"

তারাপদরা আর কিছু বলল না। বাগানের সরু পায়ে-চলা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। চারপাশে গাছপালা। আগাছার জঙ্গলে বাগান যেন ভরে আছে। গাছগাছালির গন্ধ। বাতাসের ঝাপটা আরও বাড়ছিল। অন্ধকারেই বাড়িটা আবছাভাবে অনুমান করা যাচ্ছিল। পুরনো বাড়ি। কত পুরনো তা এই অন্ধকারে বোঝা যায় না।

তারাপদ নিচু গলায় চন্দনকে বলল, "চাঁদু, থিয়েটারের সিনে যেমন ভাঙা দুর্গ আঁকা থাকে—সেইরকম দেখাচ্ছে না বাড়িটা ?"

চন্দন বলল, "আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না ; কালো-কালো দেওয়ালই দেখছি।"

"কিকিরা আমাদের কোথায় নিয়ে এলেন কে জানে !"

কথাটা কানে গিয়েছিল কিকিরার। বললেন, "'দানব দমন' পালার নাম শুনেছ ? কোত্থেকেই বা শুনবে তোমরা ! যোগেন পাণ্ডার রয়েল অপেরার পয়লা নম্বর পালা। তাতে ছিল : এ কী মল্লভূমি সেনাপতি, চতুর্দিকে শিবারব, অট্টহাসি হাসে ওই পিশাচের দল, কম্পিত আমার বক্ষ..."

বাধা দিয়ে তারাপদ বলল, "আমাদেরও বক্ষ কম্পিত হচ্ছে কিকিরা। এটা কি বাড়ি, না গোরস্থান ?"

"ধৈর্য বস্তুটা তোমাদের একেবারেই নেই, তারাপদ। তোমরা ভাবো যা হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যাক। আরে বাবা, এটা ওয়ান ডে ক্রিকেট নয়। পাঁচ দিনের খেলা। ধৈর্যং, ধরয়তি বৎস !"

তারাপদরা হেসে ফেলল।

কথা বলতে-বলতে বাড়ির ঢাকা বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। স্পষ্ট করে না হলেও বিরজুর লণ্ঠনের আলোয়, আর কিকিরার টর্চের দৌলতে বারান্দার খানিকটা চোখে পড়ল। বারান্দাটা যেন তিন ভাগে ভাগ করা। মাঝের ভাগটা এগিয়ে, পাশেরগুলো পিছিয়ে। গোল চাঁদোয়ার মতন ছাদ বারান্দাগুলোর।

বিরজু হাঁকডাক করার আগেই লণ্ঠন হাতে দুটি ছোকরা এসে গেল। মুটের কাছ থেকে মালপত্র নামিয়ে নেবে, নিয়ে যথাস্থানে রাখবে বোধ হয়।

কিকিরা বললেন, "বাবু কোথায় ?"

একজন বলল, "বাবুর শরীর ভাল নয়। শুয়ে আছেন। বলতে বললেন, কাল সকালে দেখা হবে।"

কিকিরা বললেন, "ঠিক আছে। নাও তোমরা মালপত্র তুলে নাও। নিয়ে

দোতলায়... ! তাই না বিরজুবাবা ?”

বিরজু বলল, “হ্যাঁ। সব ঠিক করা আছে।”

২

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। জোরে নায়, মাঝারিভাবে।

দোতলার একটা ঘরে কিকিরারা বসে ছিলেন। চা-খাওয়া শেষ হয়েছে খানিকটা আগে। গোল টেবিলের ওপর থেকে কাপ, প্লেট, সসের বোতল, চামচ সব পরিষ্কার করে তুলে নিয়ে গিয়েছে কাজের লোক। ঘরের মধ্যে একটা গোল ধরনের টেবিল-বাতি জ্বলছিল। কেরোসিনের বাতি। আলো মোটামুটিভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরে। তবে লালচে আলো।

ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। শার্সি, কাঠ দুইই। ঘরের এককোণে ফায়ার প্লেসের মতন জায়গাটায় একটা চৌকোনো উনুন মতন। তাতে কাঠকয়লার আঁচ। ঘরটা গরম রাখার চেষ্টা।

কিকিরা সিগারেট খেতে-খেতে বললেন, “এবার তা হলে শুরু করা যাক।”

তারাপদও সিগারেট খাচ্ছিল। বলল, “করুন, আর কত ধাঁধায় রাখবেন।”

কিকিরা বললেন, “বিগিনিংটা বলি তবে।...দিন দশ-পনেরো আগে আমার কাছে কলকাতার বাড়িতে এক ভদ্রলোক দেখা করতে যান। আমার চেনা লোক। গোপবাবু। এক সময় গোপবাবু আমার প্রতিবেশী ছিলেন। প্রায়ই গল্পগুজব করতে আসতেন। ওই গোপবাবু এখন রঘুপতিবাবুদের কলকাতার অফিসে কাজ করেন।”

“কিসের অফিস ?”

“ট্রাভেলিং এজেন্সির অফিস। রঘুপতিবাবুদের অনেকরকম ব্যবসা। বড় ব্যবসা বলতে, জাহাজের ঠাণ্ডি মেশিন সারানোর একটা কারবার, সেটা কলকাতায়। বজবজে এক কারখানা আছে ; সেখানে—ওই তোমার কী বলে—ড্যাম্প প্রুফ পাউডার তৈরি হয়, কেমিক্যাল প্রোডাক্ট। ঘরবাড়ি বানানোর সময় লাগে জিনিসটা। আর ওই ট্রাভেলিং এজেন্সি। মিশন রোয়ে অফিস।...তা গোপবাবু একদিন এসে বললেন, তাঁর মালিক একটা ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন, আমি যদি ব্যাপারটা একটু দেখি বড় ভাল হয়। বিনি পয়সার কাজ নয়, যা লাগে পাওয়া যাবে।”

“আপনি রাজি হয়ে গেলেন ?”

“নিমরাজি। ব্যাপারটা না বুঝে কি রাজি হওয়া যায় !...তবে মুশকিল হল কি জানো, আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলব সেই রঘুপতিবাবু তো এখানে—ময়ূরগঞ্জে। ঘটনাটাও এখানকার। গোপবাবু ভাল করে কিছু বলতে পারেন না। আমায় ধরেবেঁধে লোক দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। তোমাদের কোনোরকমে একটা

খবর দিয়ে চলে এলাম আমি। এসেই কিন্তু চিঠি দিয়েছি।"

চন্দন মাথা নাড়ল। "তা দিয়েছেন। আমি আবার ভেবেছিলাম দিন কয়েক দিঘা ঘুরে আসব। ছুটি নিয়েছিলাম।"

"দিঘা! ও তো ঘরের কাছে। পরে যাবে যখন খুশি।" সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে হাত নাড়লেন কিকিরা, যেন দিঘার ব্যাপারটা হাত নেড়ে দূরে হটিয়ে দিলেন। "এবার একটু মন দিয়ে শোনো।"

"বলুন।"

"গোড়ার কথা একটু বলি," কিকিরা বললেন, "রঘুপতিবাবু যদিও কলকাতাতেই থাকেন, তবু বছরে বার দুই করে এখানে—তাঁদের নৃসিংহ সদনে আসেন। এই বাড়িটার ওপর তাঁর খুবই মায়া-মমতা। পৈতৃক বাড়ি। যাট-সত্তর বছর হতে চলল। তা ছাড়া এখানে রঘুপতিবাবুদের কিছু জমি-জায়গা বিষয়-সম্পত্তি আছে। মাঝে-মাঝে খোঁজ-খবরও নিতে হয়।"

"শীতকালেই আসেন বুঝি?"

"বর্ষার গোড়ায় আসেন একবার। ধানী জমি আছে। চাষবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। আর আসেন শীতের মুখে। কালীপুজো নাগাদ। এই সময়টায় এসে এক-দেড় মাস থেকে যান টানা। আসেন বাড়ির টানে। ওঁর স্ত্রী এখানেই মারা গিয়েছিলেন—সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া বাইরে বাড়িঘর থাকলে লোকে একবার শরীর সারাতে আসে—এটা বনেদি রেওয়াজই বলতে পারো।"

তারাপদ বলল, "রঘুপতিবাবু এবারে কবে এসেছেন?"

"কালীপুজোর পর। নভেম্বর মাসের শেষদিকে।

"তারপর?"

"এসে ভালই ছিলেন। অন্য-অন্যবার আসার পর যেভাবে সময় কাটে সেইভাবেই দিন কাটছিল। সকাল-বিকেল ঘুরে বেড়ান অনেকটা, চেনা লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করেন, বইটই পড়েন—মানে দিনগুলো আরাম আয়াস করেই কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বরং বলতে পারো, ঘটতে লাগল।"

"কী ঘটনা?"

কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। চুপ করে থাকলেন সামান্য সময়। তারপর পাঁচ-দশ পা সরে ফায়ার প্লেসের মতন জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে চৌকোনা উনুনের মতন পাত্রে কাঠকয়লার আঁচ উঠেছিল। কিকিরা নুয়ে পড়ে সিগারেটের টুকরোটা আগুনে ফেলে দিলেন। দিয়ে হাত সেঁকতে লাগলেন।

তারাপদরা অপেক্ষা করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কিকিরা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রঘুপতিবাবু একদিন শেষ বিকেলে নিজের ঘরের ব্যালকনিতে বসে ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়ল দূরে

এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। ঠিক দাউ দাউ করে যে জ্বলছে তা নয়—খানিকটা জায়গা জুড়ে জ্বলছে ; শুকনো পাতাটাতায় আগুন ধরিয়ে দিলে যেভাবে জ্বলে, সেইভাবে জ্বলছে।"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন কিকিরার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

কিকিরা বললেন, "রঘুপতিবাবু প্রথমে ভেবেছিলেন, শীতের সময় বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে বড়-বড় গাছের তলায় ঝরে পড়া শুকনো পাতা জড়ো করে যেভাবে আগুন জ্বালানো হয়—সেইরকমই ব্যাপার। তবে শুধু পাহাড়ে-জঙ্গলে নয়—এমনিতেও সাফসুফ রাখার জন্য লোকে এখানে-ওখানে জঞ্জাল জ্বালিয়ে দেয়। সাধারণ দৃশ্য বলে তেমন নজর করতে চাননি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, একটা লোক সেই আগুনের ওপর হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝখানে, আগুনটাও ধীরে-ধীরে নিভে এল।"

চন্দন বলল, "আগুনের ওপর হাঁটছে ?"

"হ্যাঁ।"

"মানে—সেই—কী যেন বলে—ফায়ার ওয়াকিং না কী যেন !"

"বলে।"

তারাপদ বলল, "আগুনের ওপর হাঁটবে কেন ? ব্যাপারটা কী ?"

কিকিরা বললেন, "লোকটাকে কেমন দেখতে ছিল সেটা শোনো। তার গায়ে টকটকে লাল-গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। মাথার চুল বড়-বড়—কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো। লম্বা দাড়ি।"

"সাধু-সন্ন্যাসী ?"

"বেশভূষা সেইরকম।"

"তারপর ?"

"আগুন নিভে যাওয়ার পর লোকটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।...রঘুপতিবাবু এই ধরনের অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবু তিনি ভয় পাননি। ভেবেছিলেন, চোখের ভুল বা নিজে ঠিক মতন ধরতে পারেননি ব্যাপারটা।"

"তা হতে পারে।"

"আগে সবটা শোনো," কিকিরা বললেন। বলে তারাপদদের দিকে এগিয়ে এলেন। "এই একই দৃশ্য যদি তুমি বারবার দেখো—তখনো কি মনে হবে চোখের ভুল ?"

তারাপদ চন্দনের মুখের দিকে তাকাল। চন্দন বলল, "রঘুপতিবাবু এই একই ব্যাপার—আবার দেখেছেন।"

"পর-পর তিনবার। দু-তিনদিন অন্তর।"

"বলেন কী !"

"এর পর যা ঘটল সেটা বড় মারাত্মক ব্যাপার। ভয়ঙ্কর। যে জায়গায়

ঘটনাটা দেখা যেত ওরই কাছাকাছি এক জায়গায় একটা লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল।"

তারাপদ আঁতকে ওঠার শব্দ করল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল স্টেশনের টিকিটবাবুর কথা। কী যেন বলছিলেন ভদ্রলোক! একই লোক নয়—এইরকম কিছু একটা বলছিলেন কিকিরাকে।

চন্দন বলল, "মারা গেল কীভাবে?"

"ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে। মাথায় লেগেছিল। বড় পাথরের ওপর পড়ে গিয়েছিল লোকটা।"

"পুলিশ কী বলল?"

"এ-সব ছোটখাটো জায়গায় থানা বলে একটা আখড়া অবশ্য থাকে। কিন্তু তারা কোনো কর্মের নয়। নামকো বাস্তে থাকা। চুরি ছ্যাঁচড়ামি হলে লাঠি নিয়ে ঘোরে, ডাকাতি হলে টহল মেরে আসে। বিহারের এই ছোট জায়গায় অন্য ক্রাইম আর কী হতে পারে চুরিচামারি ছাড়া! মরে গেছে তো গেছে। পুলিশ কিছুই করল না, করতে পারল না। অ্যাকসিডেন্ট কেস। সাবডিভিশনের থানার ওপরঅলাকে জিজ্ঞেস করে লাশ পুড়িয়ে দিল।"

"লাশ পুড়িয়ে দিল?"

"কী করবে! এখানে কি মর্গ আছে?...লাশ পচতে শুরু করেছে, মাথার ওপর শকুনের ঝাঁক নেমেছে..."

"লোকটা কে?"

"কেউ জানে না। এখানকার লোক নয়।"

"আইডেন্টিফিকেশন হল না?"

"না।"

তারাপদ উঠে গেল হাত সেঁকতে। বৃষ্টি বোধ হয় পড়েই চলেছে। শীত যেন বেড়েই উঠছিল।

কিকিরা বললেন, "একটা ব্যাপার কী জানো? অজানা-অচেনা একটা লোক ওইভাবে মারা যাওয়ার পর আগুন জ্বলার ব্যাপারটাও বন্ধ হয়ে গেল। আর কেউ আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটল না।"

"তার মানে—যে-লোকটা আগুন জ্বালাত, জ্বালিয়ে আগুনের ওপর হাঁটত—সেই লোকটাই মারা গেল।"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "আপনি আসার আগেই এ-সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "আমি যেদিন এখানে এলাম—তার তিন-চারদিন আগে লোকটা মারা গিয়েছে। আমি এসেছি, একুশে ডিসেম্বর। আঠারোই ডিসেম্বর লোকটা মারা গিয়েছে।"

"আপনি এসে লোকটাকে দেখেননি?"

"না।"

"সে কি সাধু-সন্ন্যাসী ছিল ?"

"এরা বলছে, নয়। যে-লোকটা আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটত—তার বড়-বড় চুল ছিল ঘাড় পর্যন্ত, দাড়ি ছিল। যে-লোকটা মারা গেল— তার চুল-দাড়ি ওরকম ছিল না।"

"তা হলে তো আলাদা লোক !"

"তা তুমি কেমন করে বলতে পারো ? চুল-দাড়ি লাগিয়ে স্টেজে তো লোকে কত কী সাজে ! নারদমুনি, আলমগির... !"

চন্দন বুঝতে পারল, কথাটা বলার আগে সে খেয়াল করেনি তেমন করে। ঠিকই তো ! চুল-দাড়ি নকলও হতে পারে।

তারাপদ বলল, "একটু বুঝতে দিন স্যার। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তার আগে একটা কথা বলুন। আপনি বললেন, আপনার বন্ধু গোপবাবু আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। ঠিক কিনা !"

"বিলকুল ঠিক।"

"তিনি আছেন কলকাতায়—রঘুপতিবাবু আছেন এখানে, ময়ূরগঞ্জে। এখানে কি ফোন আছে যে দু'জনের মধ্যে কথা হয়ে যাবে রাতারাতি ?"

কিকিরা বললেন, "এখানে ফোন নেই। তবে রাতারাতি না হোক—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া হয়ে যায়।"

"কেমন করে ?"

"কলকাতা থেকে লোক আসে রঘুপতিবাবুদের। কমপক্ষে হপ্তায় দু'দিন। দরকার পড়লে তিনদিন। অফিসের লোক। মেসেঞ্জার। একবেলার ব্যাপার। চিঠিপত্র নিয়ে আসে, কাগজে সইসাবুদ করাতে আসে ; যখন যা দরকার হয় লোক এসে করিয়ে নিয়ে যায়।"

"আচ্ছা !"

কিকিরা আবার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, "অফিস আর বাড়ি—দুইয়ের সঙ্গেই এইভাবে যোগাযোগ রাখেন রঘুপতিবাবু। না রাখলে চলে না। কারবারি লোক। টাকা-পয়সা আছে।"

"সিস্টেমটা ভাল !" তারাপদ বলল "গোপবাবু কি লোকমুখে খবর পেয়েছিলেন ?"

"চিঠি। রঘুপতিবাবু চিঠি দিয়েছিলেন গোপবাবুকে। লোকের হাতে চিঠি পান গোপবাবু।

"উনি, মানে গোপবাবু তা হলে রঘুপতিবাবুর বিশ্বস্ত লোক ?"

"তা তো ঠিকই। গোপ খুবই কাজের লোক। রঘুপতির সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল—তবে তখন গোপ অন্য জায়গায় কাজ করতেন। রঘুপতিবাবুদের কাছে বছর দুই আছেন।"

চন্দন বার কয়েক পায়চারি করল ঘরের মধ্যে। "স্যার কিকিরা, সত্যি করে বলুন তো—এই ব্যাপারটার গন্ধ পেয়ে আপনি নিজেই ছুটে এলেন ? নাকি এই কাজটার জন্য আপনাকে ডাকা হয়েছে ? ডাকল কে ? রঘুপতি রাঠোর ? না, গোপবাবু ?"

কিকিরা হেসে বললেন, "স্যান্ডেল উড, সহজ কথাটা বুঝলে না ! গোপ আমার প্রতিবেশী আর বন্ধুর মতন ছিলেন। কিকিরার ক্যালিবার তিনিই জানেন—রঘুপতির জানার কথা নয়। গোপই আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ও !...ভাল কথা। তা আপনি এখানে এসে রঘুপতিজিকে কেমন দেখলেন ? মানে, তিনি আপনাকে দেখে কেমন ভাব করলেন ? আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন, এইরকম ভাব করলেন কী ?"

কিকিরা অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সেটাই বুঝতে পারছি না। উনি খুবই অবাক হয়েছিলেন আমাকে দেখে। বোধ হয় আমাকে আশাও করেননি। তবে মনে যাই থাক—মুখে আমাকে মেনে নিয়েছেন। হাবভাবে মনে হয়, খাতির করেন। আর থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধে রাখেননি কোথাও ! এই যে তোমাদের নেমন্তন্ন করে আনলুম এখানে—উনি জানেন। না করেননি। বরং বললেন—বেশ তো, ওরা আসুক না। ভালই হবে।"

তারাপদ কিছু ভাবছিল। বলল, "যা ঘটার আপনি আসার আগেই ঘটে গিয়েছে। তারপর আর কিছু হয়নি ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন, "আগুন আর দেখা যায়নি। গেরুয়াধারীকেও নয়। তবে অন্য দু-চারটে খুচরো ব্যাপার হয়েছে।"

"যেমন ?"

রঘুপতিবাবুর শরীর খারাপ হয়েছে। চুনিয়া নদী—যদিও সেটা নদী নয়—পাহাড়ি জল-বয়ে-যাওয়া একটা স্রোত বলতে পারো—সেই চুনিয়া নদীতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ পাওয়া গেছে !"

"ক্যাম্বিসের ব্যাগ ?"

"ক্যানভাস ব্যাগটার ভেতরে একটা হাতুড়ি। বরদস্ত হাতুড়ি। হাতলটা ধরো হাতখানেক মতন, আর লোহার মুগুটা বিঘতখানেক।"

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিছুই বুঝল না।

শেষে তারাপদ বলল, "কিকিরা, এ যে ডিটেকটিভ নভেল হয়ে যাচ্ছে। রহস্য আর রহস্য। আগুন, আগুনের ওপর হাঁটা, অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু, গৃহস্বামীর অসুস্থতা, তারপর হাতুড়ি...পর-পর—ওরে বাব্বা !" গলায় খানিকটা হালকা ভাব তারাপদর। মনে-মনে অবশ্য অন্যরকম ভাবছিল।

কিকিরা বলেন, "তোমাদের সেই গান আছে না—মেঘের পরে মেঘ জমেছে, এ অনেকটা সেইরকম। মিস্ট্রির পর মিস্ট্রি !"

"রঘুপতিবাবু সব জানেন ?"

"জানেন। শুধু একটা জানেন না। হাতুড়ি জানেন না।"

"কী বলছেন উনি ?"

"বলছেন, তিনি কিছুই ধরতে পারছেন না। তাঁর বাড়ির কাছে এ-সমস্ত ঘটনা ঘটল কেন ?"

"আপনি কিছু বুঝতে পারছেন ?"

"বোঝার চেষ্টা করছি।" বলে উঠে দাঁড়ালেন কিকিরা। হাই তুললেন। আগুনের কাছে গেলেন আবার, "ঠাণ্ডাটা বড় বেয়াড়াভাবে পড়েছে হে, তারাপদ ! বুড়ো হাড়ে আর সহ্য হয় না। এদিকে যদি এই বৃষ্টি চলতে থাকে তবে একেবারে কফিন !'

"কফিন ?"

"কবরের বাক্স।"

"আপনি কবরে যাবেন কেন ?"

"কবরটা আমার বেশ লাগে। বাক্সর মধ্যে আরামে থাকলুম। থাকতে-থাকতে বেরিয়ে এলুম।"

"বেরিয়ে এলেন ? বলেন কী !...আপনি কি ভূত-শক্তি ?"

"না, ভূত নয়। তবে পারি। বন্ধ বাক্স থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। ম্যাজিক। হুডিনির ম্যাজিক। কিকিরা দ্য গ্রেট ম্যাজিকটাকে আরও এক কাঠি ইমপ্রুভ করে নিয়েছে। প্রবেশ করব ধুতি-চাদর পরে। বেরিয়ে আসব গেরুয়া আলখাল্লা পরে খঞ্জনি বাজাতে-বাজাতে। হাউ বিউটিফুল।" বল কিকিরা হেসে খঞ্জনি বাজাবার ভঙ্গি করলেন।

৩

সকালে বৃষ্টির চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, দুপুর বা বিকেল নাগাদ বাদলা আবহাওয়াটা কাটলেও কাটতে পারে। ঝিরঝির বৃষ্টি থামছিল, হচ্ছিল আবার থামছিল। আকাশে মেঘ থাকলেও সেটা ঘন নয়, সাদাটে। দু-চারবার মেঘ সরে আলোও উঁকি দিয়ে গেল।

রঘুপতিকে ঘিরে কিকিরারা বসে ছিলেন। দোতলায়। রঘুপতির বসার ঘরে।

বসার ঘরটি বড় নয়, মাঝারি। সেকেলে বাড়ি। কাঠের কড়ি-বরগা। জানলা-দরজা বড়। জানলায় শার্সিও রয়েছে। ভেতরের দেওয়াল শক্তপোক্ত, সাধারণ প্লাস্টার। ঘরের দু'দিকে দুই দেওয়াল আলমারি, এমনি আলমারিও একজোড়া, ভারী গোছের সোফা সেটি। দেওয়ালে দু-চারটে ছবি, হরিণের মাথা একটা, দেওয়াল ঘড়ি। মোটামুটি সবই আছে—তবে খুব সাজিয়েগুছিয়ে রাখা নয়।

বসার ঘরের গা-লাগিয়ে ঝুল বারান্দা।

তারাপদরা রঘুপতিকে দেখছিল।

রঘুপতির বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে বোঝা যায়। তবে শরীরের কাঠামো মজবুত। উনি মাথায় তেমন লম্বা নন, মাঝারি হতে পারেন। প্রায়-গোল মুখ। থুতনির দিকটা ফোলা। গালে দু-চারটি দাগ আছে বসন্তের। ফরসা রং গায়ের। মাথার চুল পাতলা। মাঝখানে সিঁথি।

রঘুপতির চোখে চশমা ছিল। কাচের রং ঘোলাটে। স্পষ্ট করে তাঁর চোখ দেখা যাচ্ছিল না।

ভদ্রলোককে দেখলেই অভিজাত, রাশভারী, বৈষয়িক বলে মনে হয়।

কিকিরা আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তারাপদদের, সাধারণ কথাবার্তা হয়েছে রঘুপতিবাবুর সঙ্গে ওদের।

কিকিরা বললেন, "বৃষ্টিটা থেমে যাবে মনে হচ্ছে!"

রঘুপতি বললেন, "এ-সময় দু-চারদিন বৃষ্টি হয়। শীতের বৃষ্টি। 'যদি বরষে মাঘের শেষ—'।"

"মাঘ এখন দেরি রয়েছে," রঘুপতি বললেন, "ডিসেম্বরের এন্ডে এরকম হয়। কলকাতাতেও হয়। গত বছর তো জানুয়ারিতে গোড়া থেকেই এখানে বর্ষাকাল ফিরে এসেছিল আবার। সাত-আটদিন তুমুল বৃষ্টি।"

তারাপদ বলল, "আপনি প্রতি বছর এই ডিসেম্বরে এখানে থাকেন?"

"শীতটা থাকি। কখনো দেরি করে এসে একেবারে জানুয়ারি মাসটা কাটিয়ে ফিরে যাই। কখনো নতুন বছর পড়তেই। বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে বার-দুই শীতটা এখানে থাকতে পারিনি।"

"জায়গাটা আপনার ভাল লাগে?"

"লাগে।...ঠাকুরদার স্মৃতি। বাবা বেঁচে থাকতে এ-বাড়িতে পুজোয় আর এই শীতে হইহল্লা হত বেশ। তারপর যা হয়—, ধীরে-ধীরে আসা-যাওয়া কমতে লাগল। আত্মীয়স্বজন সরে গেল একে-একে। আমি আমার স্ত্রী শীতকালটা বরাবরই এখানে কাটাতাম। আমি এখন একলা। মায়া তো ছাড়তে পারি না।" বলে রঘুপতি একটু যেন ম্লান হাসলেন, "তোমরা কি এ-সব বুঝতে পারবে! বুড়োদের সেন্টিমেন্ট।"

তারাপদ হেসে বলল, "আপনি আবার বুড়ো কোথায়?"

"ফিফটি সিক্স।"

"ছাপ্পান্ন! বোঝা যায় না।"

"আমার বড় ছেলে মেরিনে আছে। তার বয়সেই ছাব্বিশ-সাতাশ।"

"শুনেছি। কিকিরা বলেছেন।"

"কিকিরা!" রঘুপতি হাসলেন, তারপর কিকিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি এরকম একটা নাম বেছে নিলেন কেন? কিঙ্কর নামটাই তো বেশ ছিল

মশাই !”

কিকিরা হেসে বললেন, “জাপানি-জাপানি মনে হয় বলে ! মিসিকিরা ওকাকুরা কিকিরা।”

রঘুপতি হেসে ফেললেন। তারাপদরাও হাসতে লাগল।

হাসি থামলে কিকিরা বললেন, “এ-বাড়িতে কি নতুন কোনও লোক এসেছে ?”

“নতুন ?” রঘুপতি তাকালেন।

“কল বিকেলে একটা লোককে দেখেছিলাম। আজ সকালেও দেখলাম।”

“কেমন দেখতে ?”

“গাঁট্টাগোট্টা। কালো।”

“ও ! আপনি পুজনের কথা বলছেন ! ওর নাম পুজন। এ-বাড়িতেই থাকে।”

“দেখিনি কিনা—তাই বলছিলাম।”

“দেখেননি !” রঘুপতি হাতের চুরুটটা আবার জ্বালাতে লাগলেন। “পুজন ছিল না। ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। কালই ফিরেছে।”

“আপনার পোষ্য তা হলে কম নয় রঘুপতিবাবু”, কিকিরা হাসতে-হাসতে সাদামাটা গলায় বললেন, “মানুষ আপনি একলা, এখানে থাকেনও বছরে দেড়-দু-মাস—লোকজন কিন্তু পুষতে হয় অনেক।”

চুরুট টেনে রঘুপতি বললেন “তা হয়। সকলেই কাজের লোক। ঘরবাড়ি রয়েছে, জমিজায়গার খোঁজ নেওয়া আছে, দেখাশোনারও দরকার করে। ওরাই তো সব করছে। আমি আর কী করি !”

কিকিরা মাথা নাড়লেন ! যেন বললেন, তা তো ঠিকই।

রঘুপতির যেন কী দরকার পড়েছিল, বললেন, “বসুন আপনারা ; আমি আসছি—দু-চার মিনিট।”

উনি উঠে গেলেন। ঘরে চুরুটের গন্ধ। বাইরে মিহি বৃষ্টি।

কিকিরা ইশারা করে ঝুল বারান্দাটা দেখালেন। বললেন, “ওই হচ্ছে সেই বারান্দা, যেখান থেকে রঘুপতিবাবু সেই সন্ন্যাসীকে দেখতেন। আগুন নিয়ে যে খেলা দেখাত।” জোরে-জোরেই কথাটা বললেন কিকিরা। রঘুপতি যদি কাছাকাছি কোথাও থেকে থাকেন—কথাটা শুনলেও শুনতে পারেন।

চন্দন প্রথমে তাকিয়ে থাকল বারান্দার দিকে, তারপর সামান্য ইতস্তত করে উঠে গেল বারান্দার কাছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল বাইরে। বৃষ্টির ঝাপসার দরুন দূরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

চন্দন বলল, “জায়গাটা এখান থেকে কতদূর ?”

“তা অনেকটা। সরাসরি ছ' সাতশো গজ হবে। হেঁটে যেতে হলে বেশ খানিকটা।”

"এখান থেকে কি অত দূরের জিনিস স্পষ্ট করে দেখা যায় ?"

"চোখের জ্যোতি থাকলে যায়। তবে খালি চোখে মোটামুটি বোঝা যাবে।...আর যদি দূরবীন চোখে আঁটো—না-দেখার কিছু নেই।"

"রঘুপতিবাবু কি বায়নাকুলার দিয়ে দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ। উনি বলছেন—প্রথম দিন নয়, পরে তাই দেখেছেন।"

"ওঁর কাছে আছে যন্ত্রটা ?"

"চলনসই একটা আছে।"

"উনি একটা বায়নাকুলার রাখতে গেলেন কেন ?"

"শখ !...শখ করে মানুষ কত জিনিস তো রাখে : ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার, বায়নাকুলার, বন্দুক..."

"রঘুপতিবাবুর বন্দুকও আছে ?"

"আছে। এতবড় বাড়ি যার, যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি, আর যে-জায়গায় থাকেন—জঙ্গলে, একেবারে একপ্রান্তে—তাতে একটা বন্দুক রাখতে দোষ কী ! বন্দুকের লাইসেন্স আছে।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা, ওই জায়গাটা তো আপনি দেখেছেন।"

"দেখেছি।...তোমাদেরও দেখাব। কিন্তু এই বৃষ্টিই সব ভেস্তে দিচ্ছে।"

আরও দু-একটা কথা বলাবলির মধ্যে রঘুপতি ফিরে এলেন। এসে বললেন, "একটা চিঠি পাঠিয়ে এলাম। এখানে আমার এক বন্ধু আছেন। পশুপতিবাবু। স্টেশনের দিকে থাকেন। 'রমা-কুটির'। ভদ্রলোককে আমি চিকিৎসা করি। উনি বাতের রোগী। শীতে-বাদলায় বাতটা বাড়ে। ওষুধটা পালটে দিলাম।"

"আপনি চিকিৎসা করেন ?" চন্দন অবাক হয়ে বলল।

"হোমিওপ্যাথি !" রঘুপতি সহজভাবে হাসিমুখে বললেন, "যে-জায়গায় আমরা থাকি, নিজের কখন কী দরকার পড়ে হুট করে, একটু-আধটু হোমিওপ্যাথি জেনে রাখা ভাল। আর আমি তো এই বিদ্যেটা অনেকদিন ধরেই চালাচ্ছি। আমার স্ত্রী অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেতে চাইতেন না। খেলেই নানারকম কমপ্লেন করতেন। তাঁর ওপর দিয়েই হাত পাকিয়েছিলাম প্রথমে।" বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর চন্দনকে বললেন, "ডাক্তার, আমার স্ত্রী যখন মারা গেলেন তখন অবশ্য অ্যালোপ্যাথিই চলছিল। গুপ্ত-ডাক্তার চিকিৎসা করছিল। ইট ওয়াজ সো সাডেন ! সব শেষ হয়ে গেল। ওঁকে নিয়ে আর কলকাতায় যেতে পারলাম না। গেলে অন্তত ভাল চিকিৎসা করাতে পারতাম। মরা-বাঁচা ভগবানের হাত। তবু মানুষ তো চেষ্টা করে। আমার কপাল খারাপ। দু'দিনের মধ্যে সব হয়ে গেল। সুস্থ মানুষ, কী যে হল—চোখের পলকে চলে গেল।" রঘুপতি চুপ করে গেলেন।

চন্দন কোনো কথা বলল না। রঘুপতির হতাশ বিষণ্ণ মুখে যেন কেমন

অনুশোচনা। নিজের অক্ষমতার জন্য, না দুভার্গ্যের কথা ভেবে, কে জানে!
কিকিরারা উঠে পড়লেন।

বৃষ্টি কিন্তু থামল না। সকালে যা মনে হয়েছিল—দুপুরে দেখা গেল ঠিক উলটো হয়ে গেল সব। আকাশ আবার কালো হল, জোর হল বৃষ্টি; আর হাড়-কাঁপানো বাতাস দিতে লাগল।

বাইরে যাওয়ার আশা-ভরসা ছেড়ে দিতে হল কিকিরাদের।

সারাটা দিন তা হলে করার কী থাকল? কিছুই নয়। তারাপদ আর চন্দন বাড়িটা দেখে নিল ঘুরে-ঘুরে। এ-বাড়ির ছাঁদছিরি খানিকটা বিহারি জমিদারবাড়ির মতন। বাহুল্য আছে, বাঁধুনিও আছে—কিন্তু ছিমছাম ভাব নেই। সামনের দিকটা একরকম, তবে পেছনের দিকটা খাপছাড়া। ঘরদোর বড় কম নয়। অব্যবহারের ফলে পোড়োবাড়ির মতন চেহারা হয়েছে। কোথাও দেওয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়েছে, কোথাও কড়িকাঠে দরজা-জানলায় ঘুণ ধরেছে। ময়লা জমেছে নানান জায়গায়, রং বিবর্ণ। বন্ধ ঘরের দমচাপা বাতাস।

রঘুপতি যে-ঘরগুলো ব্যবহার করেন—দোতলার মাত্র সেইগুলোই যে বসবাসযোগ্য। বাকিগুলো নয়।

তারাপদ বলল, "এত লোক এ-বাড়িতে! তারা করে কী?"

চন্দন বলল, "ঘুমোয়। এ-বাড়িতে কীই-বা করবে! লোকজন থাকে না।"

"রঘুপতিবাবু যতদিন আছেন—তারপর তো ধসে পড়বে বাড়ি।

"তাই মনে হয়।"

সন্ধের মুখে কিকিরা বললেন, "ওহে, দিনটা তো বৃথা গেল। এসো, একটু হোম ওয়ার্ক করে নিই।"

"বলুন, কী করতে হবে?"

"কেমন লাগল রঘুপতিবাবুকে?"

তারাপদ বলল, "খারাপ আর কোথায়?"

চন্দন বলল, "আমারও খারাপ লাগেনি।"

কিকিরা বললেন, "ভাল কথা। বয়স্ক মানুষ। অভিজাত। আচার-ব্যবহার ভাল—ওঁকে খারাপ লাগার কথা নয়। কিন্তু..." কিকিরা চুপ করে গেলেন।

"কিসের কিন্তু?"

"কথা হল— যে ঘটনাগুলো ঘটল—সেগুলো রঘুপতিবাবুর বাড়ির কাছেই ঘটল কেন?"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন কিছু বলল না।

কিকিরা বললেন, "এমন কী কারণ থাকতে পারে যে, একটা লোক

রঘুপতিকে দেখিয়ে-দেখিয়ে আগুনের ওপর হাঁটবে ? তার উদ্দেশ্য কী ছিল ?”

চন্দন বলল, “আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। লোকটা যে রঘুপতিবাবুকে দেখাবার জন্য আগুনের ওপর হেঁটে বেড়াত—এ-কথা কে বলল ! রঘুপতিবাবুর নজরে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। অন্যদের নজরেও পড়তেও পারে। আপনি খোঁজ নিয়েছেন ?”

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, “নিয়েছি। রঘুপতি ছাড়া এ-দৃশ্য আর মাত্র একজন দেখেছে—সে হল বিরজুবাবা। বিরজুকে দেখিয়েছেন রঘুপতি, ডেকে দেখিয়েছেন। এ-বাড়ির আর কেউ দৃশ্যটা দেখেনি।”

তারাপদ বলল, “বিরজুর সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন ?”

“বলেছি। সে দেখেছে বটে, তবে একদিনই দেখেছে। বাবু তাকে দেখিয়েছেন।”

“এটা কেমন করে হয় স্যার !” তারাপা বলল, “সাধারণ একটা দৃশ্য হলে লোকের চোখে না পড়তে পারে। একটা পাখি উড়ে গেল, কিংবা একটা লোক গাছতলায় দাঁড়িয়ে কাঠকুটো কুড়োচ্ছে, গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কোথায়—এ-সব দৃশ্য না হয় লোকে চোখ চেয়ে দেখে না। তা বলে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে—আর-এক গেরুয়াধারী আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে—এমন জিনিস চোখে পড়বে না—এমন হতেই পারে না। ইম্‌পসিব্‌ল্‌।”

কিকিরা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, “ঠিক তাই। একেবারে সহজ সত্য। অস্বাভাবিক কিছু একটা নজরে পড়লে মানুষ তার দিকে না তাকিয়ে পারে না, অবশ্য যদি সে অন্ধ না হয় ! এ-বাড়িতে অন্ধ কেউ নেই।”

“তা হলে ?” তারাপদ বলল।

“তবে একটা কথা আছে। তোমাদের পক্ষে আজ অনেক কিছু দেখা সম্ভব হয়নি। বৃষ্টি মাটি করে দিয়েছে।”

“কী কী দেখা হয়নি ?”

“রঘুপতিবাবুর বসার ঘরের দোতলায় ঝুল বারান্দায় গিয়ে তোমরা দাঁড়াওনি। চন্দন একবার উঁকি মেরে এল শুধু। ওখানে না দাঁড়ালে ওই জায়গাটা দেখা যাবে না।”

“মানে ?”

“মানে, আগুন যেখানে জ্বলত, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী এসে দাঁড়াত—সেই জায়গাটা দেখা যাবে না।”

“কেন ?”

“আড়ালে পড়ে যায়। গাছপালার আড়াল, পাহাড়ি খাঁজের আড়াল।” বলে কিকিরা রুমাল বের করে নাক মুছলেন। সর্দি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বললেন, “কাল নিশ্চয়ই রোদ উঠবে। রোদ উঠলে তোমাদের ওই জায়গাটায় নিয়ে

যাব। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।"

"রঘুপতিবাবুর বসার ঘরের বারান্দাটাও দেখব।"

"দেখবে।"

"ওঁর বসার ঘরের বারান্দা দিয়ে যা দেখা যায়—অন্য কোনো জায়গা থেকে তা দেখা যায় না?"

কিকিরা বললেন, "পারটিকুলার ওই স্পটটা দেখা যায় না। অবশ্য বসার ঘরের পশ্চিমের জানলা দিয়ে দেখা যায় খানিকটা। শোবার ঘর থেকে দেখা যায় না।"

তারাপদ ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "স্যার, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, রঘুপতিবাবুকে দেখাবার জন্যই ওই আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থাটা হয়েছিল!"

"কোনো সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু কেন?"

"সেটাই তো কথা।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "এই দৃশ্য রঘুপতি দেখতেন বলেই কি শেষ পর্যন্ত সেই লোকটাকে খুন করা হল?"

কিকিরা বললেন, "সেই লোক মানে—তুমি গেরুয়াপরা সাধুবাবার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"মুখে খুন বললেই তো খুন হবে না। প্রমাণ কী? পুলিশও খুন বলেনি। বলেছে, ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় চোখ লেগে মারা গেছে।"

"হতে পারে! ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় জখম হয়ে মারা যেতে পারে। কিন্তু সন্দেহটা থেকে যাচ্ছে।"

তারাপদ বলল, "জায়গাটা আপনি দেখেছেন নিজে?"

"দেখেছি। তোমরাও কাল দেখবে।...তবে এ-কথা ঠিক, কেউ যদি অতটা উঁচু থেকে পা হড়কে সরাসরি নিচে পড়ে, পাথরে মাথা থেঁতলে মরতেই পারে।" বলে কিকিরা ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করে নিলেন।

তারাপদ চাপা গলায় বলল, "আপনি কি রঘুপতিবাবুকে সন্দেহ করছেন?"

কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন, "সন্দেহ করার আগের প্রশ্ন, কেন করব?"

"কেন করবেন?"

"করার মতন কারণ দেখছি না বলে করতে পারছি না। রঘুপতিবাবু অকারণে একটা লোককে খুন করতে যাবেন কেন? যদি করে থাকেন—তা হলে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। কারণটা কী? কেন একটা লোক রঘুপতিকে বেছে নিয়েছিল তার আগুনে খেলা দেখাবার জন্য! আগুনের ওই খেলা দেখানোর মধ্যে কোন রহস্য আছে?" কিকিরা দু' হাত ডানার মতন ছড়িয়ে

যেন সাঁতার কাটার ভঙ্গি করতে-করতে বললেন, "আমি বাপু অগাধ জলে। ডিপ ওয়াটারে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছি। একবার ভাবছি রঘুপতি সাফসুফ মানুষ নন, নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে ওঁর মধ্যে। আবার ভাবছি, এই মানুষটি যদি দোষীই হবেন, তবে আমাকে এখানে তোয়াজ করে রাখবেন কেন? আবার মনে হচ্ছে, রঘুপতি তো ডেকে পাঠাতে চাননি, গোপবাবু আগ বাড়িয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। রঘুপতিবাবুর এখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। আমাকে গিলতেও পারছেন না, উগরোতেও পারছেন না। মুখে একেবারে 'ওয়েলকাম'-ভাব নিয়ে বসে আছেন।...সত্যি বলছি স্যান্ডেল উড, আমি কোনো দিশে পাচ্ছি না।"

"তা হলে?"

"পেতে হবে। চেষ্টা তো করি। পরে যা হয় হবে। ভাল কথা, চন্দন, ওই হাতুড়িটার কথা কিন্তু ভুলো না। ওটা আমি আমার হেফাজতে রেখেছি। কেউ জানে না। এমন তো হতে পাতে হাতুড়ি দিয়ে লোকটার মাথায় মারা হয়েছিল। তাতেই সে মারা গেছে। তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে নিচে। বলে কিকিরা নিজের মাথার পেছনদিকটা দেখালেন।

তারাপদরা কোনো কথা বলল না।

৪

পরের দিন আর বৃষ্টি নেই। শীতের কুয়াশা-মাখা রোদ উঠল সকালেই। সামান্য বেলা বাড়তে-না-বাড়তেই রোদ ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। পৌষের রোদ, তাত ওঠেনি তখনও। কিন্তু বড় আরামের। আর পরিষ্কার।

চায়ের পাট শেষ করেই কিকিরারা বেরিয়ে পড়লেন। শীত যেন আরও প্রখর হয়েছে।

তারাপদরা এসেছিল সন্ধের অন্ধকারে, মেঘ-বাদলার মধ্যে, চারদিক লক্ষ করার উপায় ছিল না তখন ; গতকাল বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে বসে-বসেই সারাদিন কেটেছে—বাইরের কিছুই প্রায় দেখতে পায়নি। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারা আশপাশের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিল।

একেবারে পাহাড়তলি। সমতল জায়গা কোথাও যেন নেই। কোথাও-কোথাও বেশ চড়াই। মাঠের মধ্যে এখানে-ওখানে তাঁবু খাটিয়ে রাখলে যেমন দেখায়, অনেকটা সেইভাবে কোথাও মাটি আর পাথরের স্তূপ, কোথাও ঝোপঝাড়। পাথর-নুড়িতে ভরতি হয়েছিল জায়গাটা। শ'গজ বড় জোর—তারপরই গাছপালা, জঙ্গলের মতন। গাছ সম্পর্কে তারাপদদের ধারণা কম, তবু বুঝতে পারছিল—বড়-বড় তেঁতুলগাছ আর ঘোড়ানিম যেন আড়াল করে রেখেছে ওপাশটা। শালও রয়েছে। কম। কুলগাছের ঝোপ অজস্র।

জামগাছও চোখে পড়ছিল। আর বট অশ্বত্থ। বুনো গাছপালাও কত কী!

তারাপদ বুঝতে পারছিল না, জঙ্গলের এত কাছাকাছি 'নৃহিংহসদন'-এর মতন বাড়ি তৈরির কী দরকার ছিল।

চন্দনই বলল, "কিকিরা, এত জায়গা থাকতে একেবারে জঙ্গল ঘেঁষে বাড়িটা তৈরি হল কেন?"

কিকিরা বললেন, "রঘুপতিবাবুর ঠাকুরদার পছন্দ হয়েছিল জায়গাটা।"

"অদ্ভুত পছন্দ!"

"খানিকটা অদ্ভুত ঠিকই। তবে এ-বাড়ি তৈরির পেছনে একটু ইতিহাস আছে। বাড়িটা যখন তৈরি হচ্ছিল তখন রঘুপতির কাকা অসুস্থ। তাঁর যক্ষ্মা রোগ হয়েছিল। তখনকার দিনে এই রোগ ছিল যম। চিকিৎসা কিছু ছিল না। ভগবানের নামে ফেলে রাখা। ডাক্তাররা বলতেন, স্বাস্থ্যকর জায়গায়, ফাঁকায়, আলোবাতাসে রোগীকে রাখতে। প্রকৃতি যতদিন টিকিয়ে রাখে।"

তারাপদ বলল, "সেইজন্যই এই বাড়ি।"

কিকিরা বললেন, খানিকটা নিশ্চয়ই। ওঁর বাবাই বাড়িটা শেষ করেছিলেন। রঘুপতির কাকা এই বাড়িতেই বছর পনেরো বেঁচেছিলেন। এখানেই তিনি থাকতেন। তাঁর শখ ছিল ছবি আঁকার। ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন, স্টিল লাইফ আঁকতেন। সেসব ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো একটা ঘরে কিছু ছবি রাখা আছে ভদ্রলোকের আঁকা।"

"আপনি দেখেছেন?"

"না। ইচ্ছে আছে—দেখব।...ঘরটা তালাবন্ধ থাকে।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "কিকিরা, আপনি কি ছবিও বোঝেন?"

কিকিরা মজার গলায় জবাব দিলেন, "না বাবু। আমি হলাম ছবি-কানা। তবে কলা, শশা, আম আঁকলে বুঝতে পারি। একবার ছেলেবেলায় চায়ের কেটলি এঁকেছিলুম, সবাই বলল—বাঃ, হুঁকোটা বেশ হয়েছে।"

তারাপদরা হোহো করে হেসে উঠল। কিকিরাও হাসছিলেন।

হাঁটতে-হাঁটতে মনে হল—সামনে পাহাড়ের মতন একটা বালিয়াড়ি, গাছপালা, ঝোপঝাড়, পাথরে ভরতি জায়গাটা, তারপর পাহাড়ি টিলা।

কিকিরা বললেন, "ওই উঁচুটার ওপাশে চুনিয়া নদী।"

"নৃসিংহ-সদন কিন্তু দেখা যাচ্ছে, স্যার।"

"এখন যাবে। এর পর যেখানে যাব—সেখান থেকে দেখা যাবে না।"

চন্দন পাখি দেখছিল। গাছপালার মাথা টপকে কয়েকটা টিয়া উড়ে গেল। চিকির-চিকির ডাক শোনা যাচ্ছে কোনো বুনো পাখির।

তারাপদ বলল, "জায়গাটা পাহাড়ি।"

কিকিরা বললেন, "কাছেই পাহাড়। পরেশনাথের ফ্যামিলি। এই যে দেখছ—এটা পাহাড়ের ঢাল। আধ মাইলটাক দূরে ঘন জঙ্গল।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "রঘুপতিবাবুদের বংশে আর কারা আছে কিকিরা ?"

"সঠিক জানি না।"

"তবু !"

"কাকা বিয়ে-থা করেননি। তাঁর কোনো বংশ নেই। আরও একজন কাকা ছিলেন। ছোটকাকা। সেই কাকা অনেককাল আগেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।"

"কেন ?"

"ওঁদের পরিবারের ব্যাপার। সোজাসুজি কিছু বলেন না। মনে হয়, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল।"

চন্দন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশের আকাশের দিকে মুখ তুলে কী দেখছিল। তারপর বলল, "প্লেন ! শব্দ হচ্ছে... !"

প্লেনের শব্দ ক্রমে জোর হল, দেখাও গেল, কিন্তু অনেক দূর দিয়ে মিলিয়েও গেল একসময়।

ওরা বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছিল। চড়াইয়ের প্রায় শেষ। এখানে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল। অনেকটাই ঘন। ঝাউগাছের মতন এক ধরনের গাছপালা যেন পাহাড়ের গা ঢেকে রেখেছে। বুনো লতাপাতা। বাবলা ঝোপের মতন ঝোপ।

নৃসিংহ-সদন আর দেখা যাচ্ছিল না।

তারাপদ বলল, "কিকিরা স্যার, আপনি বোধ হয় রঘুপতিবাবুর সঙ্গে আসর জমিয়ে বসে ওঁদের ফ্যামিলির কথা জেনে নিয়েছেন—তাই না ?"

কিকিরা বললেন, "সামথিং সামথিং, নট এভরিথিং। রঘুপতিবাবু, কী বলে তোমার ওই যে, মুখ-আঁটা মানুষ। ঠিক যেটুকু বলার বলেন, বাড়তি বলেন না। উনি একেবারে মেডিসিন বট্‌ল !"

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "সেটা আবার কী কিকিরা ? মেডিসিন বট্‌ল।"

"ওষুধের শিশি। ওষুধের শিশির মুখ এঁটে রাখতে বলে না, তেমন আর কী মাউথ টাইট..."।

চন্দন আর তারাপদ হোহো করে করে হেসে উঠল।

গাছের ছায়ায় রোদ আড়াল পড়ে যাচ্ছিল। কখনো-কখনো একেবারেই ঘন ছায়া। শীতও বেশি এখানে।

চড়াই উঠতে এবার কষ্ট হচ্ছিল। খাড়া বেশ। পায়ের তলায় পাথর আর নুড়ি। সামান্য লতাপাতা জড়ানো তৃণ, পাথরের কোথাও-কোথাও শ্যাওলা জমে রয়েছে ঘন হয়ে।

কিকিরা এবার একটু দাঁড়ালেন। দু' দণ্ড বিশ্রাম নেবেন বুঝি।

তারাপদরা দাঁড়াল। তাদেরও পা ধরে গিয়েছিল। কলকাতা শহরের মানুষ। এ-ধরনের রাস্তা হাঁটায় অভ্যস্ত নয়।

কিকিরা বললেন, "আমি গোপবাবুর কাছে কিছু-কিছু শুনে এসেছিলুম। তবে তিনিও যা জানেন ওপর-ওপর। বাকিটা রঘুপতি রায় রাঠোর মশাইয়ের মুখ থেকে জানার চেষ্টা করছি।

চন্দন বলল, "কিকিরা, রাঠোরটা কী ?"

"রাজপুত। তারাপদর ছত্রপতি নয়। অনেক রাজপুত ক্ষত্রিয়—এক সময় বিহারে, বাংলাদেশে চলে এসেছিল। রঘুপতিদের চার-পাঁচ পুরুষ বাংলাদেশে। ওঁরা নিজেদের দেশটেশ জানেনও না। বাঙালিই হয়ে গেছেন। খাঁটি বাঙালি।"

চন্দন বলল, "আমাদের এক মাস্টারমশাইও তাই। তাঁরা সিংহ; অরিজিন্যালি রাজপুতানার লোক। এখন সিন্‌হা হয়ে গেছেন।"

তারাপদ বলল, "রঘুপতিবাবুর মধ্যে সিংহ ব্যাপারটা নেই; তাই না কিকিরা ? থাকলে ব্যাঘ্র ব্যাপারটা থাকতে পারে।"

কিকিরা বললেন, "চলো। আঁর সামান্যই।"

তারাপদরা যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা একটা অদ্ভুত জায়গা। বড়-বড় কিছু পাথর পড়ে আছে চারপাশে। পাথরগুলো কোনোটাই মসৃণ নয়। ভাঙাচোরা হলে যেমন দেখায় সেইকম। কালচে পাথর। পাথরের গায়ে ফাঁক-ফোকরে অল্প ঘাস, তৃণজাতীয় গুল্ম, শ্যাওলা, দু-চারটি শ্যাওড়া ঝোপের মতন ঝোপ, একটি নিম চারা।

কিকিরা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দেখালেন "দেখো—"

তারাপদরা দেখল। অবাক কাণ্ড। এখান থেকে সত্যি-সত্যিই নৃসিংহসদনের সামান্য একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। রঘুপতির বসার ঘরের সেই ঝুলবারান্দা আর ঘরের অল্প একটু দেওয়াল, একটিমাত্র জানলা।

চন্দন বলল, "এখান থেকে বাড়িটা বেশি দূর মনে হচ্ছে না। সরাসরি বলে।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা, গাছপালার আড়াল থেকে যেমন একফালি চাঁদ ভেসে উঠতে দেখা যায়—এ যেন অনেকটা সেইরকম। তাই নয় ?"

কিকিরা বললেন, "তোমরা হাত পনেরো-বিশ ওপাশে সরে যাও, আর কিছু দেখতে পাবে না। আড়াল পড়ে যাবে গাছপালায়। পাহাড়ি গাছ ছাড়াও নৃসিংহ-সদনের গায়েই অজস্র গাছ।"

তারাপদরা সরে গিয়ে দেখে নিল। কিকিরা ঠিকই বলেছেন।

কিকিরা বললেন, "এইবার এ-দিকটায় দেখো।"

তারাপদরা কাছে এল।

কিকিরা আঙুল দিয়ে কতকগুলো জায়গা দেখালেন। পাথরের ওপর পোড়া পোড়া দাগ। বোঝা যায় ওই পাথরের ওপর কিছু পোড়ানো হয়েছিল। দাগ

ধরে রয়েছে।

চন্দন বলল, "এই পাথরের ওপর আগুন জ্বালানো হত, স্যার ?"

"হ্যাঁ।"

"কিসের আগুন ?"

"শুকনো লতাপাতার বা অন্য কিছুর" বলে তিনি পাথরের পাশে ফাঁকে পোড়া কিছু গুল্ম দেখালেন। বললেন, "ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবে, পাথর যেখানে খানিকটা প্লেন মতন—সেখানে আগুন জ্বালানো হত। তার আশেপাশে আরও যেসব পাথর ভাঙা-ভাঙা দেখতে, সেগুলা চারদিক দিয়ে যেন গোল হয়ে আছে। ওখানে দাগ পাবে।"

"মানে ?"

"মানে মাঝখানে একটা আগুন জ্বালিয়ে—তার চারপাশে ছোট-ছোট আগুনও জ্বালানো হত।"

"চারদিকে আগুন—মাঝখানে সন্ন্যাসী ?"

"হ্যাঁ।...আর এইখানটাও দেখো। পাথরে শ্যাওলা জমে ছিল—সেই শ্যাওলার ওপর ঘষটানো দাগ। ওদিকেও ঘাস রগড়ে গিয়েছে।"

তারাপদরা দেখল।

কিকিরা বললেন, "একটু বসা যাক।"

বসলেন কিকিরা। সিগারেট চাইলেন।

সিগারেট খেতে-খেতে শেষে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে বুঝলে ?"

তারাপদরা জবাব দেওয়ার আগেই নিজে থেকেই কিকিরা বললেন, "একটা লোক এখানে আসত। এসে আগুন জ্বালাত। কেন জ্বালাত ? জ্বালাত একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্যটা কী ? না, সে নৃসিংহ-সদনের কাউকে আগুন জ্বালানোর খেলাটা দেখাবে।"

"খেলা ?"

"খেলা না বলতে চাও, না বলো। দৃশ্য বলো। দৃশ্যটা সে দেখাত। আর কাকে দেখাত ? রঘুপতিবাবুকে। তার মানে সে রঘুপতি সম্পর্কে সব খবরই জানত।"

"যেমন ?"

"যেমন জানত—রঘুপতি এখন এখানে আছেন বা এ-সময় থাকেন সচরাচর। জানত—রঘুপতি কোন ঘরে থাকেন, কোনটা তাঁর বসার ঘর। তিনি কোন সময়টায় ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। মাঝে-মাঝে বা বসে-বসে এই পাহাড় দেখেন, সূর্যাস্ত দেখেন—এ-সবও তার জানা ছিল।"

চন্দন আর তারাপদ একইসঙ্গে বলল, "রঘুপতিকে কি ভয় দেখাত লোকটা ?"

কিকিরা বললেন, "ভয় ! হতে পারে ! ভয় দেখাত হয়ত। হয়ত কিছু বোঝাতেও চাইত।"

"কে লোকটা ?"

"কেমন করে বলব ?"

"যে মারা গেল..."

কিকিরা উঠে পড়লেন। বললেন, "চলো, লোকটা কোথায় মারা গিয়েছিল দেখাই তোমাদের !"

বিশ-পঁচিশ গজ ডাইনে সামান্য ঢাল। বড়-বড় পাথর। বুনো ঝোপঝাড়। তার পাশেই খাদ। নিচে চুনিয়া নদী। জল না থাকার মতন। পাথরে ভরা। পাথরের ফাঁক দিয়ে শীর্ণ জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে।

চন্দন আর তারাপদ দেখল। এখান থেকে চুনিয়া নদী—অন্তত সত্তর-আশি ফুট নিচে। মানে ছ-সাততলা বাড়ির সমান উঁচু। নীচের দিকে তাকালে ভয়ই হয়, পাথরভরা নদী দেখে।

চন্দন বলল,, "নদী কেথায় কিকিরা—শুধুই পাথর।"

"পাহাড়ি ঝরনা থেকে নেমে আসা স্রোত। পাহাড়ি ছোট নদী এইরকম হয়।"

"যে মারা গিয়েছিল সে কোথায় পড়ে ছিল ?"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে জায়গাটা দেখালেন। বললেন, "ওইরকম একটা জায়গায়। ঠিক স্পট বলতে পারব না।'

"জায়গাটা আপনাকে কে দেখিয়েছিল ?"

"বিরজুবাবু।"

"একটা লোক ওখানে মরে পড়ে আছে—এ-কথা লোকে জানল কেমন করে ? এদিকে তো লোকজন আসে না ?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, "এক্কেবারেই যে আসে না—তা নয়। আসে। ওপাশে গাঁ আছে। নদী পেরিয়ে লোক আসে। বিশেষ করে হাটবাজারের দিন। কিছু লোক কাঠকুটো কুড়োতে আসে। দু-চারজন বাচ্চাকাচ্চা জোটে নদীর মাছ ধরতে।"

"মাছ ? এ-নদীতে মাছ ?"

"পাওয়া যায়। ওই তোমার মৌরলা ধরনের মাছ। পুঁটিও থাকে। পাঁচমেশালি। খেতে খুব স্বাদ।"

চন্দন বলল, "কিকিরা, এত উঁচু কেউ যদি পা হড়কে নিচে পড়ে যায়—পাথরের ওপর, সে কিন্তু বাঁচবে না। বাঁচা মুশকিল। মাথা থেঁতলে যাবে। ঘাড় ভেঙে যেতে পারে। হাত-পা ভাঙবে।...কথা হচ্ছে বডিটা কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ?"

কিকিরা বললেন, "মাথা চৌচির, হাত-পা ভাঙা।" বলেই একটু থেমে

বললেন, "লোকে তাই বলছে।"

"পুলিশ ?"

"পুলিশের কাছে আমি যাইনি। যাওয়া অনর্থক।"

"রঘুপতি কিছু বলছেন না ?"

"তিনি ডেড বডি দেখেননি। ওঁর পক্ষে এ-ধরনের দৃশ্য দেখা অসম্ভব। সহ্য করতে পারবেন না। বডি না-দেখেই ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেখলে হার্ট ফেল করতেন।"

তারাপদ চুনিয়া নদীর দিকে তাকিয়ে ছিল। আচমকা বলল, "আর, আপনি ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ?"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখালেন। বললেন, "ডেড বডি পড়ে ছিল ওখানে—মানে ডান দিকে। আমাদের ডান দিকে। আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা আমি পেয়েছি বাঁ দিকে। পাথরের ফাঁকে আটকে গিয়েছিল। আমার মনে হয় ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কেউ জোরে ছুঁড়ে দিতে গিয়েছিল নদীর জলে। ব্যাগটা অতদূর যায়নি। খানিকটা আগে পড়ে যায়, পাথরের ফাঁকে আটকে থাকে।"

চন্দন বলল, "ব্যাগের মধ্যে ভারী হাতুড়ি !"

"বেশ ভারী।"

"বডি ডান দিকে, আর ব্যাগ বাঁ দিকে ! উলটো দিকে কেন ?"

কিকিরা হাসলেন, "তাই হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। একে বলে কনসিল্‌মেন্ট সাইকোলজি। তোমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা।"

তারাপদ বলল, "এটা তা হলে খুনের ঘটনা ! আশ্চর্য !"

৫

বিকেলের দিকে কিকিরা তারাপদদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।

নৃসিংহ-সদন থেকে বেরিয়ে শ'খানেক গজ পশ্চিমে এগোলে লালা রোড। দেখলেই বোঝা যায়, মূল রাস্তা থেকে নৃসিংহ-সদন খানিকটা তফাতে। তফাতে হলেও রাস্তা ভালই। মেঠো নুড়ি ছড়ানো পথ। গাড়ি আসা-যাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। এক সময় রঘুপতিরা গাড়ি নিয়েই আসতেন কলকাতা থেকে। তখন বাড়ি গমগম করত। এখন আর গাড়ি আসে না, আনার দরকার করে না।

লালা রোড মোটামুটি রাস্তা। পাথর, খোয়া আর নুড়ি ছড়ানো। রাস্তাটা সোজা জোড়া বটতলার পাশ দিয়ে ধানিয়া তলাও-এর গা দিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। রেল লাইনের ওপাশে বাজার, দোকান, ডিপো, চৌকি।

কিকিরা জায়গাটার বিবরণ শোনাচ্ছিলেন হাঁটতে-হাঁটতে। তারাপদরা কিছু শুনছিল, কিছু বা কানে যাচ্ছিল না। অন্যমনস্কভাবে মাঠঘাট গাছপালা দেখছিল। শীতের বিকেল প্রায় ফুরিয়ে আসছে। রোদ নিভে আসার মতন।

কিছু ঘরবাড়ি এখানে চোখে পড়ে। সাজানো-গোছানো বাড়ি দু-চারটে, বাকি মামুলি ধরনের। লোকজন মোটামুটি। সাইকেলের চলনটা বেশি বলে মনে হল। বিশ-পঁচিশ পা অন্তর কোনো-না-কোনো সাইকেলঅলাকে দেখা যাচ্ছিল।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর, মেঘ সরে যেতেই পৌষের হাওয়া যেন আরও ধারালো কনকনে হয়ে উঠেছে।

চন্দন বলল, "ওগুলো নিশ্চয় বাঙালিদের বাড়ি?"

কিকিরা বললেন, "হ্যাঁ। বেশিরভাগ। শীতের সময় জল-হাওয়া বদলাতে এসেছেন বাবুরা। স্টেশনের ওপারেও কিছু বাড়ি আছে। সেটাকে বলে—জজ মহল্লা।"

"জজ মহল্লা? কেন?"

"ওখানে এক বুড়ো জজবাবুর বাড়ি ছিল। তিনি কিছু জজ-উকিলদের এনে বসিয়েছিলেন।"

"ও!"

"আপনি এখানে আসতে-না-আসতেই ইতিহাস-ভূগোল জেনে নিয়েছেন?" তারাপদ মজার গলায় বলল, "ভ্রমণকাহিনী লিখবেন নাকি?"

কিকিরা বললেন, "একটু-একটু জানতে হয় হে! ময়ূরগঞ্জের পাস্ট হিস্ট্রি বলছে—এখানে এক মাউন্টেন অ্যান্ড জাঙ্গল কিং—মানে পার্বত্য রাজা মুসলমান এক সেনাপতির মুণ্ডু কেটে গেণ্ডুয়া খেলেছিল।"

"বলেন কী!"

"যুদ্ধ! জঙ্গুলে যুদ্ধ করার টেকনিক আলাদা। সেনাপতি সেটা জানত না।"

চন্দন বলল, "ঝোপে লাঠি মারতে হয়।"

"মানে?"

"মানে ঝোপেঝাড়ে লাঠি মেরে যাও, যদি সাপের মাথায় লাগে। এই যেমন আপনি?"

"আমি? আমি কি বাপু ঝোপেঝাড়ে লাঠি মেরে যাচ্ছি?"

"যাচ্ছেন বইকি! আপনার রঘুপতি, ওই আগুনের খেলা, একটা লোক খুন হওয়া—এর কোনোটারই কোনো সুতো আপনি ধরতে পারছেন না—জানেনও না, বৃথাই ঝোপেঝাড়ে লাঠি ঠুকে যাচ্ছেন?"

কিকিরা বললেন, "দেখো স্যান্ডেল উড, গল্পের গোয়েন্দারা বড়-বড় লাফ মারতে পারে, তাদের প্র্যাকটিস আছে! আমি গোয়েন্দা নই—ম্যাজিশিয়ান।

আমি হাত সাফাই করি। ভেলকি দেখাই।”

“তাই দেখান।”

বলতে-বলতে রেল ফটক। রেল ফটক পেরিয়ে এক পানঅলার দোকান।

কিকিরা বললেন, “চলো, একটু খোঁজখবর করি।”

পানঅলার সঙ্গে কিকিরা আগেই পরিচয় সেরে রেখেছিলেন। পানঅলা কিকিরাকে দেখে নমস্তে করল। কিকিরাও খুব আহ্লাদ-মেশানো গলা করে সিগারেট, দেশলাই, পান চাইলেন।

পানঅলা বুড়ো মতন। ছোট্ট দোকান তার। শুধু পানের দোকান দিয়ে চলে না বলে সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থাও রেখেছে। ময়লা কেটলি, ততোধিক ময়লা ক'টা ছোট-ছোট কাচের গ্লাস। অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে চিনি, হরলিকসের শিশিতে দুধ।

কিকিরা চোখ টিপে তারাপদদের বললেন, “চা খাবে নাকি ?”

আগেই মাথা নাড়ল চন্দন। “না।”

তারাপদও খাবে না।

কিকিরা কিন্তু এক গ্লাস চা বানাতে বললেন।

তারাপদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, ইশারায় বাধা দিয়ে কিকিরা বুড়ো চাঅলার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

দু-চার কথার পর কিকিরা বললেন, “বাবুলোক, কালকাত্তাসে আয়া। চায়ে নেহি পিয়ে গা। কফি পিনেঅলা বাবু হ্যায়।”

তারাপদরা কিকিরার হিন্দি-বুলির রসিকতা শুনতে-শুনতে হাসছিল।

পানঅলা কিকিরার চা তৈরি করতে লাগল।

কিকিরা অন্য দু-চারটে মজার কথা বলার পর বললেন, “এক খবর তো দেও বুড়া বাবা !”

“জি !”

“রঘুপতিবাবুকো কোঠিমে বহুত ডর লাগতা হ্যায়।” বলে কিকিরা কাঠের বেঞ্চিটায় বসলেন। বললেন, আগে জানলে তিনি ও-বাড়িতে এসে উঠতেন না।

“কাহে বাবু ?”

কিকিরা বললেন, “যে লোকটা মারা গিয়েছে, তার দাহ-কাজ ঠিকভাবে হয়েছে কিনা কে জানে ! একটা আত্মা যেন বাড়ির কাছে ঘুরে বেড়ায়।”

বুড়ো বলল, পুলিশের লোক লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে। ব্রাম্হন্ কেউ ছিল না। এ-রকম অধর্মের কাজ করলে আত্মার কি সদগতি হয় !

কিকিরা বললেন, “লোকটা কে ?” বাংলাতেই বললেন।

“নেহি মালুম।”

“তুমি তাকে দেখোনি কোনোদিন ?”

"নেহি।"

"লাশ দেখেছ ?"

মাথা নাড়ল পানঅলা। দেখেনি।

"কোনো নতুন লোককে তুমি দেখোনি ?"

পানঅলা কী ভাবল। তারপর বলল, একটা লোককে সে একদিন দেখেছিল। কিন্তু এখন এখানে চেঞ্জারদের ভিড়। কত লোক আসে, যায়। সবাই যে তার সামনে দিয়ে আসে, যায় তাও নয়। কাজেই যাকে দেখেছিল সে যে কে—কেমন করে বলবে !

কিকিরা বললেন, "কবে দেখেছিলে লোকটাকে ?"

পানঅলা ভাবল। আনুমানিক সময় বলল।

কিকিরা মোটামুটি হিসেব করে নিলেন। সময়টা মিলে যাচ্ছে।

"কখন দেখেছিলে ? ফজিরে, না সাঁঝে ?"

"ফজিরে।" বলে পানঅলা আবার বলল, সে যখন ভোরবেলায় চুলায় আগ লাগাচ্ছিল—তখন একটা লোক তার দোকানের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, তুরন্ত্ হলে এক গ্লাস চা খেতে পারে।

"চা খেয়েছিল ?"

"জি !"

"লোকটা বাঙালি ?"

"ওই সেই মালুম।"

"দাড়ি ছিল ?"

"না।"

"তোমায় কিছু বলল ? কোত্থেকে আসছে ?"

"জি না।...কুছ না বলল।"

"সকালে কোন ট্রেন আসে এখানে ?"

"বানারসকা গাড়ি আসে। ফজির চার বাজে।"

"আচ্ছা ! লোকটার সঙ্গে গাঁঠরি ছিল না ?"

"থোড়া বহুত ছিল।"

"কী ছিল ?"

"গাঁটরি, বাকাস্ !"

"বড় বাক্স !"

"জি না। ছোটা।" বলে একটা সুটকেসের চেহারা দেখাল।

"লোকটা কোথায় যাবে—কিছু বলল না ?"

"নেহি।"

কিকিরা সিগারেট দেশলাই পান নিয়ে পয়সা দিলেন পানঅলাকে।

পানঅলা নিজেই বলল, "আপনি মুসাফিরখানায় গিয়ে খোঁজ করুন বাবু,

ওখানে খোঁজ করলে কোনো খবর পেতেও পারেন।"

তারাপদদের ডেকে নিয়ে কিকিরা স্টেশনের দিকে পা বাড়ালেন।

হাঁটতে-হাঁটতে কিকিরা বললেন, "পান খাও।"

তারাপদ একটা পান নিল। বলল, "আপনি তো পান খান না। চাঁদুও খায় না। অকারণ এত পান নিলেন কেন? আর ওই গাঁজা সিগারেট! কে খাবে ওগুলো?

কিকিরা বললেন, "লোকটার সঙ্গে আমি ভাব পাতাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি জানো? স্টেশন থেকে কেউ যদি লালা রোড আসতে চায়—ওই পানঅলার দোকানের সামনে দিয়েই আসতে হবে। অবশ্য বে-টাইমে এলে কে দেখছে! টাইমে এলে—সেই আসুক, পানঅলার নজরে পড়তে পারে। যদি এই রাস্তায় না এসে মাঠ ভেঙে এগিয়ে গিয়ে লালা রোড ধরে—তবে আলাদা কথা। তোমাদের নিয়ে পরশু যেভাবে আমি নৃসিংহ-সদনের রাস্তা ধরেছিলুম।" বলে পানের মোড়কটা হাতে রেখেই সিগারেটের প্যাকেট দুটো তারাপদকে দিলেন, "রেখে দাও, যা শীত—এগুলো কাজে লেগে যাবে।...আরে, শুধু-শুধু তো ভাব পাতানো যায় না, দু-চার টাকা খরচ করতে হয়। নাও, রাখো।"

চন্দন বলল, "আপনি মুসাফিরখানায় খোঁজ করেননি?"

"না। মাথায় আসেনি।"

"টিকিট কালেক্টর? তাঁরা তো জানতে পারেন।"

"টিকিটবাবুরাও জানেন না।...আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করিনি, তবে ওই রাহাবাবু—টিকিটবাবু যাঁকে দেখলে—উনি বলছিলেন—অত লোকজনের মধ্যে নতুন-পুরনো খেয়াল করা যায় না তখন। তা ছাড়া টিকিটবাবুদের তো ডিউটির ঠিক থাকে না। কার কখন ডিউটি, কোন্ গাড়িতে কে নামল—, কার তখন ডিউটি ছিল..., নজর করেছেন কি করেননি—বলা মুশকিল।"

তারাপদ বলল, "সব প্যাসেঞ্জারই কি ওভারব্রিজ ধরে বেরিয়ে আসে? মনে হয় না।"

"হ্যাঁ—এদিক-ওদিক দিয়ে চলে যায়। দেহাতীরা বেশিরভাগ।"

তারাপদ আর কিছু বলল না। তিনজনে হাঁটতে লাগল। বিকেল ফুরিয়ে ঝাপসা অন্ধকার নেমে আসছিল।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "পুলিশগুলো কেমন বলো তো? তারা যদি ভাল করে খোঁজ করত—অন্তত কিছু জানতে পারত।"

"চেষ্টা করেছে নিশ্চয়। জানতে পারেনি।"

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—, পানঅলা যা বলল, তা হলেও হতে পারে। খুব ভোরের ট্রেনে যদি কেউ এসে থাকে, এই প্রচণ্ড শীতে, তাকে নজর করার মতন লোক পাওয়া মুশকিল!"

তারাপদ বলল, "এখন চলুন, মুসাফিরখানায় খোঁজ করে দেখুন—যদি কোনো হদিস পান !"

স্টেশনের বাইরে মুসাফিরখানা। একপাশে টিকিট অফিস, অন্যপাশে পার্সেল অফিস। দু-তিনটে ছোট-ছোট দোকান। দুটো মিঠাইঅলার, অন্যটা চায়ের দোকান। মাঝখানে চত্বর। গাঁটরি-গুটরি নিয়ে যাত্রীরা ওখানেই বসে থাকে, শুয়ে থাকে, অপেক্ষা করে গাড়ির।

কিকিরা খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন মিঠাইঅলাদের কাছে।

কেউ কিছু বলতে পারে না। বেনারসের গাড়ি আসে একেবারে ভোরবেলায়, এত ভোর যে, শেষরাতও বলা যায়। এই শীতে তখন দোকান খুলে রাখে না কেউ, চাঅলার দোকানই যা একচিলতে খোলা থাকে। তখন যদি কোনও যাত্রী এসে মুসাফিরখানায় অপেক্ষা করে সকাল না-হওয়া পর্যন্ত—তবে তাকে কে আর নজর করবে !

চাঅলা অবশ্য বলল, দু-একটা লোকে এসে দেখেছে, কিন্তু ভাল করে লক্ষ করেনি। কত তো যাত্রী আসছে-যাচ্ছে—কে আর খেয়াল করে বাবু ! থানা থেকে পুলিশ এসেও তাদের জিজ্ঞেস করেছিল। ওরা কিছু বলতে পারেনি।

মুসাফিরখানা থেকে রেল স্টেশন।

টিকিটবাবু রাহা বললেন, "আর্লি মর্নিংয়েবর ট্রেনটা এত ভোরে আসে মশাই যে, এই শীতে আমরা তখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে থাকি। একে ঘুম চোখ, তায় এই শীত আর কুয়াশা—ধরে নিন—কিছু দেখার অবস্থা থাকে না।...তা ঠিক আছে—শর্মার তখন ডিউটি ছিল—জিজ্ঞেস করব।"

কিকিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রাহা বললেন, "যে-লোকটা মারা গিয়েছে—তার সম্পর্কে এত খোঁজ করছেন ! আপনারা তাকে জানেন নাকি ?"

কিকিরা তাড়াতাড়ি বললেন, "না। আমরা কেমন করে জানব ! আপনিই তো বলছিলেন..."

"বলছিলুম। এ তো কলকাতা শহর নয় দাদু, রোজই দু-চারটে সেন্‌সেসান লেগে আছে। আমাদের কাছে এটাই মস্ত খবর। তার ওপর এই সিজনটাইমে।...তা আপনাদের ইন্টারেস্ট ?"

"ইন্টারেস্ট ঠিক নয়, কৌতূহল ! যাঁর বাড়িতে গেস্ট হয়ে রয়েছি, তিনি দেখছি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, তা ঘাবড়ে যেতে পারেন ! কিন্তু তাঁর বাড়ির মধ্যে যখন কিছু হয়নি ঘাবড়ে গিয়ে কী করবেন !...আগুনের ব্যাপারটা কিন্তু দাদু, ভুতুড়ে—তাই নয় ! সেই লোকটা কোথায় গেল ?"

কিকিরা বললেন, "পালিয়ে গিয়েছে বোধ হয় !" কথাটা হালকাভাবে বলা।

রাহা পান চিবোচ্ছিলেন, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লোক বাড়ছে। ট্রেন আসার

সময় হয়ে এল।

কিকিরারা চলে আসছিলেন, হঠাৎ রাহাবাবু বললেন "দাদু, আপনি একবার ঘোষদার সঙ্গে দেখা করে যান না! উনি অনেক খবর রাখেন। পুরনো লোক।"

"কে ঘোষদা ?"

"ঘোষদাকে চেনেন না ? নাম শোনেননি এখনো। লোকে বলে এইচ ঘোষ। হেম ঘোষ। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যান। অন্নদা-কুটির। ঘোষদা এখানকার পুরনো লোক।"

কিকিরা বললেন, "অন্নদা-কুটিরটা কোথায় ?"

"আপনার যাওয়ার পথেই পড়বে। বড় রাস্তায় নয়। ভেতরে ঢুকে। একটা খাটাল মতন দেখবেন। সামান্য এগিয়ে। বাঁ দিকে। বিরাট তেঁতুলগাছের পাশে ঢালু মাঠ। সেখানে অন্নদা-কুটির।"

কিকিরা ব্যস্ততা দেখালেন না। বললেন, "দেখি। যাব একবার।"

ফেরার পথে তারাপদ বলল, "কিকিরা, এই কেসটা ছেড়ে দিন।"

"কেন ?"

কোনো আশা দেখছি না। ধরার মতন পাচ্ছেন না কিছুই, অকারণ অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে কী লাভ!"

কিকিরা বললেন, "পাচ্ছি না ঠিকই ; তবে পেয়ে যেতেও পারি।" বলে চন্দনের দিকে তাকালেন। "স্যান্ডেল উড। কাল আমরা ওই জায়গাটা একবার ডিটেল সার্ভে করব। কোন জায়গা বুঝেছ ? আজ সকালে যেখানে গিয়েছিলুম। টিলার মাথা, তার আশপাশ। নদীর দিকটা। বুঝলে ?"

"আপনি তো সার্ভে করেছেন স্যার!"

"একা মানুষ—কতটুকু সার্ভে করব! ওপর-ওপর একটু দেখে এসেছি ?"

"পাবেন কিছু ?"

"পাওয়া উচিত।...একটা হোক দুটো হোক—কেউ-না-কেউ তো ওখানে যেত। হয়ত থাকত। মানুষের খিদে-তেষ্টা আছে, মাথা গোঁজার জায়গা দরকার—সে তো বাতাস নয়। মানুষ থাকলে তার ফেলে যাওয়া চিহ্ন থাকবে না—এমন হতে পারে না। নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে।"

চন্দন বলল, "আমার আপত্তি নেই। তবে একটা কথা আমি বলছি—যে-লোকটা মারা গিয়েছে—আমি তার মতন পা হড়কে ওই বিশ্রী জায়গা থেকে নিচে পড়ে মরতে রাজি নই। তারা যদি রাজি থাকে..."

তারাপদ বলল, "বাঃ! আমি কেন মরব!"

কিকিরা বললেন, "লোকটা যে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল—তা তোমাদের কে বলল! তাকে খুন করাও তো হতে পারে।"

"আপনি এই সন্দেহটা বারবার করছেন স্যার।"

"করছি দুটো কারণে। এক, ওই হাতুড়িরটার জন্য। কোথাও কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না, শুধু একটা হাতুড়ি—তাও ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যাবে কেন ? সেটা আবারও এমনভাবে পাওয়া গেল—যেন কেউ ওটা ব্যাগের মধ্যে পুরে নদীতে ফেলে দিতে গিয়েছিল। পারেনি। ঠিক মতন ছুঁড়তে পারেনি।"

"আপনি বলছেন, হাতুড়ি দিয়ে একটা লোককে জখম করা হয়েছিল আগে।"

"হ্যাঁ। মাথার পেছনে মারা হয়েছিল।"

তারাপদ বলল, "আপনার দ্বিতীয় সন্দেহের কারণ ?"

"সকালে তোমাদের দেখিয়েছি। হাতুড়ি দিয়ে মারার পর লোকটা যখন পড়ে যায়, অজ্ঞান। তখন তাকে টেনে-হিঁচড়ে টিলার ধারে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের সেই দাগও দেখিয়েছি। হেঁচড়ে ঘষটে কাউকে টেনে নিয়ে গেলে যেমন দাগ থাকে—সেইরকম দাগও কিছু ছিল। পাথর বলে দাগ কম। তবে শ্যাওলায় দাগ পড়েছে, ঘাসেও দাগ ধরেছে।...আমি মনে করছি, এটা খুন !"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দন কিছু বলল না।

৬

রোদ যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ছিল টিলার মাথায়। চারপাশের বন-জঙ্গল, বুনো আগাছার গায়ে তখনও রাতের হিমের ভিজে-ভিজে ভাব রয়েছে। ঘাসে শিশিরবিন্দু।

কিকিরা তারাপদদের নিয়ে সকাল-সকালই এসেছেন। বেলা বেড়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ভাল করে চারপাশ তিনি আজ দেখতে চান—কিছু পাওয়া যায় কিনা ! তাঁর ধারণা, নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

তারাপদকে একটা চড়াইয়ের দিক দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি ওদিকটা দেখো। ভাল করে দেখবে।"

তারাপদ ঠাট্টা করে বলল, "চোখে ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস গোছের কিছু যদি বেঁধে দিতেন, নয়ত এই বুনো ঝোপের আড়ালে কী পড়ে আছে—কেমন করে দেখব, স্যার।"

কিকিরা পালটা রসিকতা করে বললেন, "ম্যাগনিতে কি হবে—যা চোখ ! টেলিফায়িং গ্লাস হলে হত !...যাক, ছুতো না করে কাজে লেগে পড়ো। নজর রাখলে ঠিকই দেখতে পাবে।"

তারাপদ পা বাড়াল।

কিকিরা এবার চন্দনকে অন্যদিকটা দেখিয়ে দিলেন, "স্যান্ডেল উড, তুমি ও-পাশটা চষে ফেলবে। আমি সামনে দেখছি।"

চন্দন বলল, "সামনে খুব ঢালু সার ; পা হড়কে যাবেন না তো ?"

"না।"

"পড়লে কিন্তু খোঁড়া..."

"না বাবা, এ পায়ের অনেক প্লে আছে।...ভুজঙ্গ কাপালিকের বেলায় একটা খেলা দেখিয়েছিলুম মনে আছে ! ঘণ্টা নাড়ার খেলা।"

চন্দন হাসল। "আছে। দারুণ খেলা।"

"তবে !"

"আচ্ছা কিকিরা, আপনি কি আগুনের ওপর দিয়েও হাঁটতে পারেন ?"

কিকিরা একটু হাসলেন, "কেন ?"

"না, আপনি বারবার বলছিলেন—ওই সাধু আগুনের ওপর হাঁটার খেলা দেখাত, তাই জিজ্ঞেস করছি।"

কিকিরা বললেন "ওটা খেলাই। তোমরা কি কখনও চড়কপুজোর মেলা দেখোনি ? ঝাঁপান, নাক ফুটো কান ফুটো, আগুন নিয়ে খেলা... ! দেখোনি ?"

"ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম। দেখা যায় না।"

"আগুনের ওপর হাঁটাটা খেলাই। সস্তা খেলা।"

"আপনি পারেন ?"

"তুমিও পারবে।...তা এ-সব পরে হবে, আগে অন্য কাজ। যাও, এগিয়ে যাও। আমি এ-দিকটায় দেখছি।"

চন্দন চলে গেল।

কিকিরা বললেন, "কিছু দেখলে জায়গা ছেড়ো না ; চেঁচিয়ে ডাকবে। টারজানের মতন, বুঝলে ?" বলে মুখের সামনে হাত আড়াল করে টারজানের ডাক দেখানোর ভঙ্গিটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

চন্দন বলল, "ডাকব।"

কিকিরা সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পাহাড়ি জায়গা, পায়ে চলা পথও নেই। গাছপালার ডাল ধরে পাথর ধরে-ধরে ঝোপের পাশ দিয়ে এগুতে হয়। পা পিছলে যাওয়ার ভয় আছে। কিকিরা সাবধান হলেন।

ফুট তিরিশ নেমেছেন কিকিরা, চোখে পড়ল তারাপদ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কিকিরাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারাপদ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে—কিকিরাকে দেখছে না। কিকিরা তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন। তেমন একটা দূরেও নেই তারাপদ।

কিকিরা ডাকলেন তারাপদকে।

ডাক শুনে তারাপদ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ঠিক ধরতে পারছিল না,

কিকিরা কোথায় ?

কিকিরা রুমাল বের করলেন পকেট থেকে। নাড়তে লাগলেন।

তারাপদ দেখতে পেল। পেয়ে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল।

বাধ্য হয়েই কিকিরাকে আবার উঠে আসতে হল। ঘুরপথে তাঁকে তারাপদর কাছে যেতে হবে।

কিকিরা তারাপদর কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তারাপদ বলল, "ওই দেখুন!"

শিমগাছের মতন লতানো এক গাছ জড়িয়ে রয়েছে অন্য একটা গাছকে। গাছটির চেহারা করবী গাছের মতন, পাতাগুলো কিন্তু অন্যরকম। ছোট-ছোট হলুদ ফুলে ভরতি তার ডালপালা।

লতানো গাছটার আড়াল থেকে একটা ভাঙাচোরা খাপরা-ছাওয়া ছোট কুঁড়ে দেখা যাচ্ছিল। কুঁড়েটা দু' পাশ থেকে এমনভাবে ঢাকা যে, একেবারে কাছে এসে না দাঁড়ালে দেখা যায় না।

কিকিরা বললেন "চলো দেখি।"

ডালপালা, লতানো গাছের ঘন পাতা সরিয়ে কিকিরাকে কুঁড়েটার কাছে এলেন। সামনে আসতেই দেখা গেল, তফাত থেকে যতটা মনে হয়েছিল—কুঁড়েটা তত ভাঙাচোরা নয়। মাথায় খাপরা ঠিকই, তবে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। ছাউনির খাঁচাটা বেরিয়ে এসেছে বারান্দা পর্যন্ত। একটামাত্র কুঠরি, সামনে সরু বারান্দা মতন। দরজাও আছে। আলকাতরা মাখানো রয়েছে পাল্লায়। অবশ্য দরজার কাঠ বেঁকেচুরে গিয়েছে। আলকাতরার গায়ে রং দিয়ে হিন্দিতে কী যেন দু-একটা অক্ষর লেখা। নম্বরও রয়েছে।

কিকিরা দেখেশুনে বললেন, "মনে হচ্ছে জঙ্গলের বিট চৌকি।"

"মানে ?"

"জঙ্গলের পাহারাদারের চৌকি।"

"এই অবস্থা ?"

"আগে হয়ত এটা চৌকি ছিল—এখন নেই। হয় উঠিয়ে দিয়েছে—না হয় অন্য কোথাও করেছে।"

কিকিরা বারান্দায় উঠলেন। পাথর, ইট, কাদা, কোথাও বা সামান্য সুরকি দিয়ে গাঁথা একটা কুঁড়ে ধরনের ঘর। জঙ্গলের কাঠ কেটে তার মাথার ছাউনি হয়েছিল, তার ওপর খাপরা।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। শেকল তোলা।

তারাপদ বলল, "খুলব ?"

"খোলো!"

কিকিরা বারান্দাটা দেখছিলেন। তারাপদ দরজার পাল্লা হাট করে দিল।

খানিকটা অন্ধকার জমে আছে ঘরের মধ্যে। ছোট একটি জানলা দিয়ে রোদ না ঢুকলেও আলো ঢুকছিল।

ঘরের বাতাস ততটা ভারী নয়, বদ্ধও নয়। জানলা খোলা থাকার দরুনই বোধ হয়। দরজার ফাঁক-ফোকরও যথেষ্ট।

কিকিরা বললেন, "লোক ছিল। ওই দেখো— !"

এই কুঠরিতে লোক ছিল বোঝা যায়। একপাশে কিছু খড় বিছানো, টাটকা খড়, একটা শতরঞ্জি, কম্বল। গোটা দুয়েক মাটির হাঁড়ি, একটা ছোট লণ্ঠন।

কিকিরা আর তারাপদ নজর করে সব দেখতে লাগল। জলের পাত্র, লোটা। এমনকি সিগারেটের পুরনো প্যাকেট পর্যন্ত চোখে পড়ল।

কিকিরা বললেন, "গাঁঠরি কই, সুটকেস কই ?"

তারাপদ বলল, "আপনি কি সেই লোকটার কথা ভাবছেন—পানঅলা বুড়ো যার কথা বলেছিল ?"

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, "সেই লোক ছাড়া আর কে হবে ? বিট চৌকিদার এভাবে থাকবে না ! তারা টহল মেরে ফিরে যায় দিনে-দিনে।"

"তা হলে এই পোস্ট, মানে চৌকি ?"

"গরম আছে, বর্ষা আছে, আপদ-বিপদ আছে। হয়ত কখনো দরকার পড়লে একটা রাতও কাটিয়ে দিতে হয়..."

"আপনি জানেন ?"

"বাঃ ! জানি বইকি।"

"তা আপনার সেই লোকই যদি হবে—তার অন্য মালপত্র কোথায় গেল ?"

"তাই ভাবছি।"

কিকিরা মাটির হাঁড়ি দুটো তুলে নিতে বললেন তারাপদকে। নিয়ে বারান্দায় আসতে বললেন।

বারান্দায় এসে হাঁড়ির ভেতরটা দেখতে-দেখতে তারাপদ বলল, "স্যার, আটা ময়দা নাকি ? নুন ?"

কিকিরা হাত ডুবিয়ে গুঁড়ো পদার্থ খানকিটা তুলে নিলেন। তারপর কী হাসি তাঁর। হাসতে-হাসতে যেন নাচতে লাগলেন।

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "হল কি কিকিরা ? এত হাসছেন !"

"ছেলেমানুষ, একেবারে ছেলেমানুষ।"

"কে ?"

"তোমরা ! এই যে দুটো হাঁড়ি দেখছ—এই দুটো হল আগুনের ভেলকি দেখাবার জিনিস।"

"মানে ?"

"আগুনের খেলা দেখাতে হলে এ-দুটো দরকার। ...যাক্‌গে, হাঁড়ি দুটো তুলে নাও। নিয়ে যাব।"

কিকিরাকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। এতই খুশি যে, নিজের মনে রামপ্রসাদী ঢঙে গান গেয়ে উঠলেন : আর কত মা ঘুরাবি আমায়।

গান গাইতে-গাইতে কিকিরা বারান্দার আনাচ-কানাচ খুঁজলেন তন্নতন্ন করে। এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল। পকেটে পুরে নিলেন।

"ওটা কী দেখো তো ?"

তারাপদ নিচে নামল বারান্দার। আমলকী ঝোপের পাশে খানিকটা সাদা মতন কী পড়ে আছে। তুলে নিল তারাপদ। দেখল। বলল, "কিকিরা, পাকা চুল—সাদা শণের মতন দেখতে... !"

"সাধুবাবার দাড়ি থেকে খসে পড়েছে !"

"দাড়ি ?"

"ফল্স দাড়ি বা চুল। থিয়েটার যাত্রায় যা পরা হয়। বোধ হয়, সাধুবাবার গাল চুলকোচ্ছিল। খুব চুলকেছেন। খসে পড়ে গিয়েছে দু-চার গুচ্ছ। ফেলে দিয়েছেন।"

"তা হলে সাধুবাবা নকল ?"

"বলতে !"

"আগুনের ওপর হাঁটাও ভাঁওতা !'

"পুরোটাই ভাঁওতা।"

"কিন্তু সাধুবাবা কই ?"

"সেটাই বলা মুশকিল। হয় মরে গেছে, না হয় ঘাপটি মেরে বসে আছে কোথাও।"

কিকিরা আরও একবার দেখলেন চারপাশ। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "যেখানে যেমনটি আছে থাক। চলো, চন্দনের খোঁজ করি।"

চন্দনকে পাওয়া গেল নদীর দিকে। হাঁটতে-হাঁটতে নদী পর্যন্ত চলে এসেছে প্রায়। গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছিল।

তারাপদর হাতে একটা মাটির হাঁড়ি, অন্যটা কিকিরার হাতে।

চন্দন অবাক হয়ে বলল, "হাঁড়ি কিসের ?"

কিকিরা বললেন, "রসগোল্লার। এর ইংরিজি নাম সফ্‌ট্ মিল্ক পটাটোস উইথ সুগার জুস।"

চন্দন হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। বলল, "এ কি কিকিরা-ইংলিশ ?"

"না স্যার", কিকিরা বললেন, "এইট্‌টিন্ ফিফটি ফাইভে কোম্পানির খাস গিয়ারসন সাহেব তাঁর মেমসাহেবকে খাওয়ানোর জন্য মুনসিকে হুকুম করেছিলেন—এই মুনসি, গো অ্যান্ড ব্রিং দোস সফ্‌ট্ মিল্ক পটাটোস উইথ সুগার

জুস...।"

তারাপদ আর চন্দন হোহো করে হেসে উঠল।

কিকিরা এবার গাছতলায় বসলেন। বসে সিগারেট চাইলেন। তারপর মাটির হাঁড়ি দুটো দেখিয়ে বললেন, "স্যান্ডেল উড, এই দুটো হাঁড়ির মধ্যে যা আছে—তা দিয়ে আগুনে হাঁটার খেলা দেখানো যায়।"

চন্দন দেখল। বলল, "কিসের গুঁড়ো ?"

"একটায় আছে পেলেন অ্যান্ড সিম্‌পল নুন। সল্ট। নরমাল সল্ট। অন্যটায় রয়েছে অ্যালাম বা ফটকিরি আর নুন। গুঁড়ো করে মেশানো।...দাও সিগারেট দাও।" কিকিরা সিগারেট নিয়ে আরাম করে বসলেন।

চন্দন বলল, "এই গুঁড়ো নিয়ে আগুনের খেলা দেখানো যায় ?"

"যায়। ফট্‌কিরি আর নুনের এই গুঁড়ো পায়ে মাখো—হাতে মাখো মেখে আগুনের ওপর পা রাখো, বা হাত রাখো। তিন সেকেন্ডের বেশি রাখবে না। বড় জোর চার সেকেন্ড—তোমার কিস্যুটি হবে না। এ হল প্রিমিটিভ ব্যাপার। আজকাল শুনছি অ্যাক্রোলাইট পলিমার সলুশান আঙুলে লাগিয়ে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার ওপর আঙুল আরও বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায়। আমি পরখ করে দেখিনি। তা ছাড়া অ্যাসবেসটাস দিয়ে খড়ম করেও তুমি চাপা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে দেখতে পারো।"

চন্দন বলল, "দারুণ কিকিরা, খাসা ! গ্র্যান্ড !"

কিকিরা বললেন, "আরও একটু আছে স্যান্ডাল উড। আগুনের এই খেলা দেখানোর মধ্যে অন্য কলাকৌশলও আছে। ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজাতে হয়—যাতে যে দূর থেকে দেখে তার দৃষ্টিভ্রম হয়। ভিসানারি ইলিউশন। পাহাড়ের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলাটা দেখানো হত—সেটা খেলা দেখাবার পক্ষে খুবই ভাল জায়গা। পারফেক্ট প্লেস। ওই বড়-বড় পাথরগুলো সামনে থাকায় কাজটা অনেক সোজা ও নিখুঁত হয়ে উঠেছে। ...পরে তোমাদের দেখিয়ে দেব।"

তারাপদও সিগারেট খাচ্ছিল।

বেলা অনেকটা বেড়েছে। রোদের রং গাঢ়। তাত জমছে রোদে। পাহাড়তলি যেন নিঝুম। মাঝে-মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল।

চন্দন বলল, "আপনি তা হলে কাজের কাজ একটা কিছু করেছেন ?"

"একটা নয়, তিনটে।"

"তিনটে ?"

"হাঁড়ি, দাড়ি বা চুল, আর একটুকরো কাগজ।" বলে কিকিরা তারাপদকে নকল চুলদাড়ির অংশটুকু দেখাতে বললেন।

তারাপদ দেখাল। কিকিরা বললেন, "ফল্‌স দাড়ি বা চুল। সাধুবাবার।" বলে নিজের পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন। বারান্দার পাশে

কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টুকরোটা। বললেন আবার, "এটা একটা কাগজের টুকরো। খইনির প্যাকেটের টুকরো। মুখের দিকটা ছেঁড়া, নিচের দিকটা আছে। এখনো একটু-আধটু গন্ধ পাওয়া যাবে খইনির। প্যাকেটের তলায় লেখা আছে হাজিবাবা খইনি অ্যান্ড বিড়ি মার্চেন্ট, নাগোয়া। বানারস।"

তারাপদ প্রায় লাফিয়ে উঠল। "স্যার, আপনার সেই পানঅলা তা হলে ঠিক লোকই বলেছে। বেনারসের গাড়িতেই এসেছিল লোকটা। কাশীর লোক।

কিকিরা বললেন, "কাশীর লোক কিনা এখনই বলা যায় কেমন করে। তবে হতে পারে।...কিন্তু লোকটা কে ?"

চন্দন খুব নিরীহ গলায় বলল, "কমলাপতি..."

কিকিরা কান করলেন না। মস্ত করে ধোঁয়া গিললেন সিগারেটের। নিজের লম্বা-লম্বা মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে বললেন, নিজের মনেই, "লোকটা কে ? কেন এসেছিল ?"

চন্দন আবার বলল, "লোকটার নাম কমলাপতি রাঠোর।"

কিকিরা এবার তাকালেন চন্দনের দিকে।

চন্দন পকেট থেকে একটা লকেটের মতন জিনিস বের করল। গোল চাকতি। কিকিরার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, "এই দেখুন। চাবির রিংয়ের চাকতি। এই চাকতিটা খুলে গেছে। এটা মেটালের। এতে ঢালাই অক্ষরে ইংরিজিতে লেখা আছে—কমলাপতি রাঠোর অ্যান্ড কোং। গোধুলিয়া। বেনারস।"

কিকিরা কেমন স্তম্ভিত। হাত বাড়িয়ে চাকতিটা নিলেন।

তারাপদ বলল, "চাঁদু—তুই যে কেল্লা ফতে করে দিলি রে।"

৭

'অন্নদা-কুটির' খুঁজে পেতে কষ্ট হল না।

বাড়িটা প্রায় রেললাইন ঘেঁষে, বালিয়াড়ির তলায়, এক প্রান্তে। সেখানে আরও দু-তিনটে বাড়িও চোখে পড়ে। এদিককার ঘরবাড়িগুলো সাধারণ, বাহার বিশেষ নেই। তবু গাছপালা বাগান দিয়ে মোটামুটি সাজানো।

রোদ মরে আসছিল। শীতের অপরাহ্ন। আকাশ পরিষ্কার। কয়েকটা চিল পাখিটাখি তখনো ভেসে বেড়াচ্ছিল শূন্যে।

কিকিরা তারাপদদের নিয়ে এমনভাবে অন্নদা কুটিরের কাছে এলেন যেন তাঁরা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চেঞ্জার বাবুবিবিরা এই সময়টাতেই বেড়িয়ে বেড়ান। সন্ধের আগে-আগেই বাড়ি ফিরে যান তাঁরা, যা শীত—তখন আর ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়।

অন্নদা কুটিরের সামনে একজোড়া ইউক্যালিপটাস গাছ সিধে খাড়া হয়ে

রয়েছে, গাছতলায় কিছু শুকনো পাতা জমেছে।

কিকিরা যেন ইউক্যালিপটাস গাছ দেখছেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে তারাপদদের কিছু বলছিলেন, এমন সময় এক ভদ্রলোককে দেখা গেল।

বাড়ির ফটক খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক। কিকিরাদের দেখে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের ওপারে। পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। বয়েস হলেও শরীরস্বাস্থ্য ভাঙা নয়, বরং কর্মক্ষম বলেই মনে হয়। গায়ে জহর কোট, গরম চাদর, পরনে ধুতি। পায়ে জুতোমোজা। হাতে লাঠি। জহর কোটের পাশ পকেট থেকে চশমার খাপ উঁকি দিচ্ছিল।

কিকিরা বুঝতে পারলেন ইনিই ঘোষদাদা।

অচেনা হলেও চেনা-চেনা মুখ করে কিকিরা একটু হাসলেন। সৌজন্য দেখাতে নমস্কারও করলেন হাত জোড় করে।

ভদ্রলোক দেখলেন কিকিরাদের।

কিকিরা হাসি-হাসি মুখে বললেন, "একটু ঘুরতে বেরিয়েছি।...ইউক্যালিপটাস দেখছিলাম। বেশ বড় হয়ে গেছে। এখানে অনেক বাড়িতেই গাছটা দেখছি। আপনারটাই সবচেয়ে বেশি লম্বা মনে হল।"

"আরও পুরনো গাছ আছে ও-দিকে। গেলে দেখতে পাবেন।"

"এই গাছগুলো কত বছরের?"

"বছর বারো।"

"ষোলো হলেই সাবালক—" কিকিরা হাসলেন, "ইউক্যালিপটাস পঁচিশ-তিরিশ ফিট পেরোলেই নাকি সাবালক হয়ে যায়।"

"ও!...তা আপনারা?"

"বেড়াতে এসেছি। বড়দিনের ছুটিতে।"

"চেঞ্জার!...এ-বছর চেঞ্জার একটু কম। এখনো আসার সময় যায়নি।"

"আপনিই কি ঘোষসাহেব?"

"সাহেব!" ভদ্রলোক দু-চার পলক দেখলেন কিকিরাদের, তারপর বললেন, "না, বাপের জন্মেও নই। আমি হেমচন্দ্র ঘোষ, আদি বাড়ি মেমারি, বর্ধমান। বাপ-ঠাকুরদা জমিজায়গা চাষবাসের কাজকর্ম নিয়ে পড়ে থাকতেন। আমি রেলে চাকরি করতাম। রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টার। লোকে মাস্টারমশাই বলত। সাহেব তো মশাই কেউ বলত না।"

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, "তা ঠিক। সাহেবদের বেশ ভিড় এখানে। মশাইদের পাওয়াই যায় না।...আপনার নাম শুনছিলাম।"

"কোথায়?"

"স্টেশনে। রাহাবাবু বলছিলেন..."

"আচ্ছা ! আমাদের জীবন রাহা !...তা আপনারা উঠেছেন কোথায় ?"

"নৃসিংহ-সদন ।"

"নৃসিংহ-সদন !" ঘোষবাবু যেন দু-মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। তারপর তারাপদদের দিকে তাকালেন। "এঁরা ?"

"আমাদের ইয়াং ফ্রেন্ডস। ও হল চন্দন। ডাক্তার। এম বি বি এস। কলকাতার হাসপাতালে আছে। আর ও আমাদের তারাপদ, চাকরি করে অ্যাকাউন্টসে। চন্দন আর তারাপদ বন্ধু। ছেলেবেলার। আমিই বুড়ো।"

"আপনার নাম ?"

"কিঙ্করকিশোর রায়। লোকে বলে কিকিরা।"

"কিকিরা !" ঘোষবাবু মজা পেলেন, "কিকিরা কেন, মশাই ?"

"ওই শর্টকাট আর কি ! কিঙ্করের কি, কিশোরের কি আর রায়ের রা—কিকিরা।"

ঘোষবাবুর মন্দ লাগল না কথাটা। বললেন, "কলকাতা থেকে আসছেন সব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনার কী করা হয় ?"

"বিশেষ কিছু নয়। মানে—বড়সড় কাজকর্ম করি না কিছু। দু-একটা কোম্পানির হয়ে কাজ করি।"

"কী কোম্পানি ?"

"নাম করার মতন নয়। আজকাল আয়ুর্বেদের পুনর্জন্ম হচ্ছে—দেখেছেন ! রিভাইভেল। লোকে আর অ্যালোপাথি খেতে চাইছে না। চন্দনরা যতই বলুক। সিস্টেম খারাপ করে দেয় অ্যালোপাথিতে। আয়ুর্বেদের পুরনো ওষুধগুলো নেড়েচেড়ে নতুন-নতুন ওষুধ বেরুচ্ছে। হজমের, লিভারের, মাথাধরার, বাতের, সর্দি-শ্লেষ্মার, পা মচকানোর—কত কী ! তা আমাদের কোম্পানি ভাবছিল—হরতুকির এক্সট্রাক্ট দিয়ে একটা কিছু যদি বের করা যায়। কবিরাজী শাস্ত্রে বলেছে হরীতকীর শত গুণ। গুণ শত না হলেও অনেক। মালটিভিটামিন টাইপের একটা ওষুধ বের করতে পারলে বাজারে চলত ভাল। যেমন ধরুন রসুনের রস আজকাল বাজারে দমদম করে চলছে।"

"দমদম করে... !"

তারাপদরাও হেসে ফেলল।

ঘোষবাবু কৌতুক বোধ করছিলেন। বললেন, "তা এলেন যখন—একটু বসবেন নাকি ? এক কাপ করে চা ?"

কিকিরা সংকুচিত হবার ভান করে বললেন, "না, না, এখন থাক। আপনি দু-পা হাঁটতে বেরিয়েছেন—এখন আর বাড়ির মধ্যে ঢুকব না। বরং কাল-পরশু আসা যাবে। আমরা তো আছি দু-চার দিন।"

"আমার কোনো অসুবিধে হত না।...আসুনই না। আলাপ যখন হয়েই গেল।"

কিকিরাদের নিয়ে বাড়ির মধ্যেই এলেন ঘোষবাবু। বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল। বসতে বললেন তারাপদদের। তারপর কাকে যেন ডাকলেন।

ভেতর থেকে এক মহিলার গলা শোনা গেল।

"জটা নেই?"

"জল তুলছে। ডাকব?"

"তুমিই এসো একবার।"

এক মহিলা এলেন। বয়স্কা। মাথায় কাপড় ছিল না। বাইরে এসে কিকিরাদের দেখে মাথায় কাপড় দিলেন।

ঘোষবাবু বললেন, "এঁরা বেড়াতে এসেছেন। চেঞ্জার। উনি হত্তুকিবাবু—, হত্তুকির ব্যবসা ফাঁদবেন। উনি ডাক্তার। আর উনি চাকরি করেন।..." বলে ঘোষবাবু কিকিরার দিকে তাকালেন, মহিলাকে দেখিয়ে বললেন "আমার গিন্নি। নাতিনাতনিরা ছুটিতে এখানেই থাকে। তাদের আসার কথা। এখনো এসে পৌঁছয়নি। উনি দু' বেলা গাড়ির শব্দ পেলেই ঘরে-বাইরে করছেন।"

কিকিরারা উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাকে নমস্কার করলেন।

"আপনারা বসুন। একটু চা করে আনি।" মহিলা চলে গেলেন।

ঘোষবাবু দু-চারটে সাংসারিক কথা বললেন। এখানে ওঁরা দুই বৃদ্ধবৃদ্ধাই থাকেন। কাজের লোক আছে। ছেলেমেয়েরা বাইরে। কাজকর্ম করে। ছুটিছাটায় সব আসে। নাতিনাতনিরা তো আসেই।

তারাপদ বলল, "আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা অনেকদিন। এই বাড়ি অবশ্য বেশিদিন নয়। তাও ক'বছর হয়ে গেল। আগে আমি এখানকার স্টেশন মাস্টার ছিলাম। জায়গাটার সঙ্গে আমার কিসের নাড়ির যোগ কে জানে! চার-চারবার ট্রান্সফার হয়ে এখানেই এসেছি। ঘুরেফিরে। আগে এ এস এম ছিলাম—পরে স্টেশন মাস্টার। আমার খুব ভাল লাগে জায়গাটা। শেষ জীবনটা কাটাব বলে মাথা গোঁজার জায়গাও করেছি একটা।"

কথায়-কথায় আলাপ জমে গেল। চা এসেছিল।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব মাস্টারমশাই?"

"কেন করবেন না?"

"না—মানে, আমরা তো নতুন লোক, কলকাতা থেকে আসছি। কলকাতায় আমাদের এক বন্ধু নৃসিংহ-সদনে পাঠিয়ে দিয়েছেন ব্যবস্থা করে। বন্ধুটি রঘুপতিবাবুদের ফার্মে কাজ করেন। তাঁর ব্যবস্থা মতন আগে আমি এসেছি, আর এরা এসেছে মাত্র তিনদিন আগে।"

ঘোষবাবু মাথা দোলালেন। শুনছেন সবই।

কিকিরা বললেন "নৃসিংহ-সদনে আসার পর একটা খবর শুনলুম।"

"একটা লোক মারা যাওয়ার খবর ?"

"হ্যাঁ। আরও শুনলাম—কে একজন সাধু নাকি কিছুদিন ধরে আগুনের ওপর হাঁটাচলা করছিল..."

"আমিও তাই শুনেছি।"

"রঘুপতিবাবু আমাদের হোস্ট। এমনিতে আমাদের কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। কিন্তু ভদ্রলোককে খুবই ডিস্টার্বড় দেখছি, মুষড়ে পড়া চেহারা। শরীরও ওঁর খারাপ হচ্ছে।...আমরা কেমন অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছি।"

ঘোষবাবু মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "আপনারা আর কী করবেন !"

"করার কিছু নেই ঠিকই, কিন্তু খারাপ লাগছে।"

"আপনার সঙ্গে রঘুপতিবাবুর আলাপ নেই ?" তারাপদ বলল হঠাৎ।

"আলাপ ! আলাপ থাকবে না কেন ! অনেকদিন ধরেই আলাপ। ওঁরা এখানকার পুরনো লোক, আর আমিও কম পুরনো নই।"

"ওঁর বাবা... ?"

"বিলক্ষণ চিনতাম রে ভাই ! উমাপতিবাবু !...আমি তখন একেবারে ছোকরা, এখানে পোস্টেড, এ এস এম—তখন তাঁকে দেখেছি। বিশাল চেহারা ছিল। ছ' ফুটের ওপর লম্বা।"

"তবে তো আপনি রঘুপতিবাবুর কাকাকেও চেনেন ?"

"শচীপতিবাবু ! ছবিটবি আঁকতেন। চিনতাম।"

"তাঁর যক্ষ্মা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, উনিই এখানে থাকতেন বরাবর।"

"এখানেই মারা যান ?"

"তাই গেলেন। তখন ওঁর বয়েস বেশি হয়নি। চল্লিশের কাছাকাছি।" বলে ঘোষবাবু একটু চুপ করে থেকে নিজেই বললেন, "ভাল লোক ছিলেন। ছবিও বড় ভাল আঁকতেন। আমি দেখেছি। ছবি ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। অবশ্য এখানকার ক্লাইমেটও একটা ফ্যাক্টর।"

"আর কোনো ভাই ছিল না ?" তারাপদ বুদ্ধি করে জিজ্ঞেস করল।

"ছিল।...ব্যাপার কী জানো, ভাই আমি এখানে তিন-চার বছর করে থাকি—তারপর ট্রান্সফার হই। আবার দু-তিন জায়গার জল বদলে এখানেই ফিরে আসি। চারবার এই স্টেশনে পোস্টেড হয়েছি—যা তোমাদের বলছিলাম। পুরনো জায়গায় দু-একবার অনেকেই ফিরে আসে। আমি চার-চারবার।"

"উনিও কি পতি ছিলেন ?" চন্দন হালকাভাবে বলল, "এঁরা সবাই দেখছি পতি। উমাপতি, রঘুপতি, শচীপতি..."

"ওটা ওঁদের বংশের নিয়ম বা সংস্কার।"

"তা হলে নৃসিংহ... ?"

"নৃসিংহও হয়ত পতি ছিলেন। জানি না।"

কিকিরা বললেন, "উমাপতির ছোট ভাইয়ের নাম কী ছিল জানেন ?"

"বিশ্বপতি !"

"বিশ্বপতি ! ঠাকুরদেবতা দেবদেবী বাদ দিয়ে..."

"বিশ্বপতিও নারায়ণের নাম।"

"ও !"

ঘোষবাবু হঠাৎ কিকিরার দিকে তাকালেন। "আপনারা এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ! রঘুপতিবাবুর বাড়িতে তো কিছু ঘটেনি। তা হলে ?"

কিকিরা বললেন, "সেইটাই তো কথা মাস্টারমশাই ! আমরাও ওই কথাটাই ভাবছি। রঘুপতিবাবুকে আমরা বলেছিও সে-কথা। বলেছি, আপনি অস্থির হচ্ছেন কেন ! যা ঘটার বাইরে ঘটেছে। আপনার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ! উনি আমাদের কথায় কান করছেন না।"

"কেন ?"

কিকিরা চালাকি করে বললেন, "উনি বলছেন, যে-লোকটা টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে আগুনের ওপর হাঁটাচলা করত—সে নাকি ইচ্ছে করেই রঘুপতিবাবুকে সেটা দেখাতে চাইত।"

ঘোষবাবু পকেট থেকে সিগারেটের তামাক আর কাগজ বের করলেন। নিজের মনেই বললেন, "পুলিশকে সে-কথা উনি বলেছেন ?"

"জানি না। আমাদের বলেন।"

সিগারেট পাকাতে লাগলেন ঘোষবাবু। "আপনাদের বলেন !" বলেই চুপ করে গেলেন।

তারাপদ বলল, "বিশ্বপতিবাবু নাকি আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন ?"

মাথা তুললেন ঘোষবাবু। "তাই শুনেছি।"

"কেন ?"

"নিজেদের গণ্ডগোল। ফ্যামিলির ব্যাপার।"

"কিসের গণ্ডগোল ! সম্পত্তি নিয়ে।"

সিগারেটটা পাকানো হয়ে গিয়েছিল। ধরিয়ে নিলেন ঘোষবাবু। বললেন, "ভাই, ধনী লোকের সঙ্গে কি আমাদের মেলে ! আমরা দু-চার হাজার টাকার জন্য ঝগড়াঝাটি করি, দশ হাত জমি কোনো ভাই ভাগে বেশি পেল—তাই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করি। ওরা করে লাখ-লাখ টাকার জন্য। দু-চার লাখ টাকা ছেড়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াঝাটি তো হতেই পারে।"

কিকিরা বললেন, "এ ছাড়া কি কিছু নেই মাস্টারমশাই ?"

"কেন ?"

"জিজ্ঞেস করছি।"

"আপনারা কে ?"

কিকিরা থমত খেয়ে গেলেন। বললেন, "আমরা আমরাই। আপনি বিশ্বাস করছেন না ?"

ঘোষবাবু কথা বললেন না অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, "রঘুপতিবাবু তাঁর বংশের কথা কিছু বলেননি ?"

"তেমন কিছু বলেননি ?"

"রঘুবংশের কথা ?"

"রঘুবংশ... ?"

"আপনারা জানেন না। পুরাণে আছে, রঘুবংশের শেষ রাজা ছিলেন অগ্নিবর্ণ। মহারাজ সুদর্শন অনেককাল রাজত্ব করার পর ছেলে অগ্নিবর্ণকে রাজ্যপাটে বসিয়ে স্বর্গে চলে যান। অগ্নিবর্ণ ছিলেন অলস, বিলাসী, আহাম্মক। বিলাসব্যসনেই তাঁর দিন কাটত। তাঁর হল যক্ষ্মা। রাজরোগ। তখন অগ্নিবর্ণের মন্ত্রীরা নিজেরা পরামর্শ করে রাজাকে হত্যা করাই ঠিক করে। একদিন বনের মধ্যে নির্জনে এক অগ্নিকুণ্ডের ওপর ফেলে দেওয়া হল রাজাকে। রানীকে বসানো হল সিংহাসনে। রানী সন্তানসম্ভবা।" ঘোষবাবু থামলেন ; তাঁর হাতের পাকানো সিগারেটটা আবার ধরিয়ে নিলেন। বললেন "রঘুপতিবাবুরা মনে করেন—মানে তাঁদের আট পুরুষের ধারণা ছিল—রানীর যথাসময়ে যে পুত্রসন্তান হল—তারই গোত্রের তাঁরা। অগ্নিজিহ্ব তাঁদের উপাস্য দেবতা। অগ্নির সাতটি শিখা বা জিভ। সাতটি শিখার নাম—করালী, ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা নীললোহিতা, পদ্মরাগ, সুবর্ণা। সপ্তজিহ্ব অগ্নির এক নতুন মূর্তি করেছিলেন শচীপতি। পাথরের মূর্তি নয়, মাটিরও নয়। সেই আমি দেখেছি। এমন মূর্তি আর দেখিনি। দেখব না। ওই মূর্তিটি শেষ করার কিছুদিন পরে শচীপতিবাবু মারা যান।...শুনেছিলাম ওই মূর্তি নিয়ে পারিবারিক গণ্ডগোল হয়েছিল।...আমি তো ভাই বলতে পারব না, সেই অগ্নিজিহ্ব মূর্তির সঙ্গে এই আগুনের কী সম্পর্ক রয়েছে ! তবে থাকতেও পারে।"

তারাপদ চন্দন কিকিরা যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। অগ্নিজিহ্ব দেবতার সঙ্গে কি এই আগুনের কোনো সম্পর্ক আছে ?

ঘোষবাবু বললেন, "আর আমি কিছু জানি না।"

পরের দিন সকালটা কাছাকাছি ঘুরেফিরে কাটিয়ে দিলেন কিকিরা তারাপদদের নিয়ে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, আমি কিন্তু এখনো অগাধ জলে।"

চন্দন বলল, "স্যার, আমি একবার ভেবেছিলাম, কমলাপতি রাঠোরের নামটা ঘোষবাবুর কাছে বলি। বললাম না। বললে কি তিনি চিনতে পারতেন ?"

তারাপদ বলল, "আমার মনে ছিল। কিন্তু অগ্নিজিহ্ব-তেই আমার মাথা গোলমাল করে দিল। লাইফে এরকম এক দেবতার কথা শুনিনি। সাতটা জিভ !"

কিকিরা বললেন, "যটাই জিভ হোক, ব্যাপারটা আগুন। আগুনের সঙ্গে রঘুপতিদের একটা সম্পর্ক রয়েছে দেখছি।"

"উপাস্য দেবতা যে !" চন্দন বলল।

"তা ঠিকই। আমাদের দেশের নানা ধরনের মানুষের নানা উপাস্য দেবতা রয়েছে। সূর্য চন্দ্র থেকে সাপ পর্যন্ত। শুনেছি, অগ্নিও বৈদিক দেবতা।"

তারাপদ কতই না অবাক হয়েছে, বলল, "আপনি বেদও জানেন ?"

"বিন্দুমাত্র না," মাথা নাড়লেন কিকিরা। "তোমরা কমলাপতি রাঠোরের কথা বলছিলেন না ? আমার মনে হয় ঘোষ-মাস্টারমশাই তাঁকে চেনেন না। চিনলে বলতেন।"

"আমরা জিজ্ঞেসই করলাম না, তিনি বলবেন ?"

"বলতে পারতেন। এত কথা যখন বলেছেন—হয়ত নিজের থেকেই বলে ফেলতেন।"

খানিকটা চুপচাপ থাকার পর তারাপদ বলল, "কিকিরা, আমার মনে হচ্ছে, পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে হেঁটে বেড়ানোর ব্যাপারটার উদ্দেশ্যই ছিল রঘুপতি। রঘুপতিকে ওটা দেখানো হত।"

"কী উদ্দেশ্য ?" চন্দন বলল।

"রঘুপতিকে কিছু মনে করিয়ে দেওয়া।"

"সেটা কী ?"

কিকিরা কী ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন, "স্যান্ডেল উড, ওই যে রাজার ছেলে—কী নাম—অগ্নিজিহ্ব—যার যক্ষ্মা হয়েছিল, তাকে তার মন্ত্রীরা বনের মধ্যে নির্জনে নিয়ে গিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল, তাই না বললেন মাস্টারমশাই ?"

"হ্যাঁ।"

'শচীপতিরও যক্ষ্মা হয়েছিল। তাকে ষড়যন্ত্র করে কেউ পুড়িয়ে মারেনি তো ?"

"বলেন কী ! একজন টিবি পেশেন্টকে পুড়িয়ে মারা ! এত বড় নৃশংস কাজ কে করবে !"

কিকিরা কোনো জবাব দিতে পারলেন না। পরে নিচু গলায় বললেন, "সংসারে আগুন তো অনেক রকম আছে। শিখাও। শোক, তাপর, রুগ্নতা, ব্যর্থতা—কত কী ? তারও হয়ত সাতটি শিখটা।"

অনেকক্ষণ পরে চন্দন বলল, "কিকিরা, সেই মূর্তিটি কোথায় ? আমরা যদি দেখতে পেতাম।"

কিকিরা বললেন, "পারো !...দেখি আজ একবার চেষ্টা করব।"

দুপর বেলায় তারাপদ ধরল বিরজুকে। পাঁচটা এলোমেলো কথা, খোশ গল্পের পর তারাপদ বলল, "বিরজু, তোমাদের এখানে যে তসবির ঘরটা আছে—সেটা কোথায় ?" বলেই চালাকি করে আবার বলল, "রঘুপতিবাবু তসবির ঘরের গল্প করছিলেন।"

বিরজু বলল, "ওধারে আছে, ডাইনে। দক্ষিণ পাশে। বাবুর ঘরের গা দিয়ে বারান্দা আছে—বারান্দার শেষ ঘরে।"

"আমি তসবির দেখতে ভালবাসি। বাবুকে বলব !"

"ঘর বনধ্। তালা লাগানো আছে। বাবুকে বলবেন।"

"তুমি ও-ঘরে গিয়েছ ?"

"বাবুর সাথ গিয়েছি।"

"বাবু বুঝি প্রায়ই তসবির ঘরে যান ?"

"না। কলকাতা থেকে এলে একদিন-দু'দিন যান ?"

"ঘর সাফ হয় না ?"

"চাবি বাবুর কাছে থাকে। দোতলার ইধারকার সব ঘরের চাবি বাবুর কাছে। তিনি কলকাতা থেকে এলে আমরা ঘর সাফা করি।"

তারাপদ আর কিছু বলল না। বুঝতে পারল, রঘুপতি তাঁর দিককার ঘরদোরের চাবি এখানে ফেলে রেখে যান না। ছবি-রাখা ঘরের চাবিও থাকে তাঁর কাছে। এতে অবশ্য দোষের কিছু নেই। ভাইয়ের আঁকা ছবি তো তিনি বাগানে ফেলে রাখতে পারেন না। একটা ঘরে রেখে দিয়েছেন। যত্ন করেই হোক বা অযত্নে।

যদিও তারাপদ দেখেনি, তবু তার মনে হল ছবি-ঘরের তালাটা নিশ্চয় মামুলি নয়। রঘুপতি বৈষয়িক লোক, তিনি নিশ্চয় সস্তা বাজে তালা তাঁর নিজের মহলের দরজায় ঝুলিয়ে কলকাতায় গিয়ে বসে থাকেন না।

কিকিরা যদি কোনো ভেলকি দেখিয়ে তালাটা খুলতে পারতেন !

তবে তা সম্ভব নয়। গৃহস্বামীর ঘরের সামনে দিয়ে না গেলে ছবিঘরে যাওয়া যায় না। আর রঘুপতি তো এখন সারাদিন বাড়িতে। হয় তাঁর ঘরে না

হয় বসার ঘরে। নিচেও বড় একটা নামেন না।

কিকিরার কাছে ফিরে এসে তারাপদ বলল, "কিকিরা, শচীপতিবাবুর ছবিঘরে একবার যাওয়া দরকার।"

"হুঁ।"

"আপনি কিছু ভেবেছেন ?"

"তুমি ভাবলে কিছু ?"

তারাপদ বিরজুর কথা বলল। বিরজুর কাছ থেকে সে যা শুনেছে।

কিকিরা সব শুনলেন। তারপর বললেন, "আজ সন্ধেবেলায় রঘুপতিবাবুকে দিয়েই ছবিঘর খুলিয়ে নেব।"

৯

বছরের শেষ দিনে শীতও পড়েছিল প্রচণ্ড। বইরের উত্তুরে বাতাস এই সন্ধেতে মাঝে-মাঝে এমন করে বয়ে ঝড় উঠেছে। রঘুপতির বসার ঘরে কাঠ-চুল্লি জ্বলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। ঘরটা মোটামুটি আরামদায়ক হয়ে উঠেছে।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

চুরুট ধরাতে-ধরাতে রঘুপতি বললেন, "ছবি দেখতে চান, দেখতে পারেন। তবে এই সন্ধেবেলায় কি ছবি দেখতে ভাল লাগবে ! আলো নেই।"

কিকিরা বললেন, "এমনি আলোতেই দেখি। আপনার যদি কোনো অসুবিধে না থাকে..."

"না না, আমার আর কিসের অসুবিধে," বলে সোফা থেকে উঠলেন, "দাঁড়ান—বিরজুকে আলো আনতে বলি। চাবিটাও নিয়ে আসি।"

রঘুপতি চলে গেলেন।

সামান্য অপেক্ষা করে কিকিরা নিচু গলায় বললেন, "তারাপদ, বোধ হয় ওঁর সুবিধেই হল।"

"কেন ?"

"দিনের বেলার চেয়ে এই সন্ধেবেলায় টিমটিমে আলোয় ছবিঘর দেখালে সব তো আর চোখে পড়বে না। হয়ত এটাই ওঁর পক্ষে ভাল হল।"

চন্দন বলল, "আমরা দিনে দেখলেও পারতাম। রঘুপতিবাবুর কথা শুনে মনে হল, উনি ছবি দেখাতে অরাজি ছিলেন না।"

কিকিরা বললেন, "চলো, দেখা তো যাক—কী আছে। একটু চোখ চেয়ে দেখো তোমরা। আমার একার নজরে..."

কথাটা শেষ হল না কিকিরার, রঘুপতির গলা শোনা গেল। কী যেন বলছিলেন তিনি বিরজুকে।

সামান্য পরে ঘরে এলেন রঘুপতি। “আসুন।”

কিকিরারা উঠলেন।

বসার ঘর, বারান্দা, বারান্দার পাশ দিয়ে ডাইনের গলি। শীতের হাওয়া এসে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

রঘুপতির হাতে চৌকো টর্চ। বেশ জোরালো আলো হয় টর্চটার। বিরজুর হাতে বড় বাতি, টেবিলে রাখার বাতি। তারাপদকেও একটা বাতি নিতে হয়েছে।

ছবিঘরের সামনে এসে রঘুপতি বললেন, “ক'দিন আগেই ঘর পরিষ্কার করিয়েছি, ভেতরের দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও নোংরা লাগবে না।”

কিকিরা নজর করে দেখলেন, তালাটা মামুলি নয়। ভাল তালা। সাধারণ তালা ছাড়াও ডোর-লক রয়েছে।

দরজা খুলে রঘুপতি ডাকলেন, “আসুন।”

যে-কোনো বন্ধ ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেই কেমন লাগে। চাপা একটা গন্ধ যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস ভারী করে তোলে।

কিকিরারা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিরজু একপাশ দিয়ে এগিয়ে গেল আলো হাতে। রঘুপতি তাকে বলে দিলেন—আলোটা কোথায় রাখতে হবে। “তুমি যাও।”

বিরজু চলে গেল।

তারাপদও এক জায়গায় আলো রাখল।

রঘুপতি বললেন, “এই ঘর দুটো আমার কাকার ছিল। শচীপতির। কাকাকে আমরা শচীভাই বলতাম। ছেলেবেলা থেকেই। বাবা শচীভাই বলে ডাকতেন। আমরাও বলতাম। কাকার ছবি-টবি শেষ পর্যন্ত যা ছিল—এখানে রেখে দিয়েছি। দু-একটা এ বাড়িতে টাঙানো আছে। আমার বসার ঘরেও আছে। কলকাতার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি কয়েকটা।”

কিকিরা ঘরের চারদিক দেখছিলেন। ঘর বেশ বড়। দক্ষিণের দিকটা বোধ হয় আধখানা চাঁদের মতন গোল বাঁকানো। বড়-বড় দরজা-জানলা। জানলার খড়খড়ি আর শার্সি বন্ধ। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজাও বন্ধ ছিল।

এতবড় ঘরে যত ছবি থাকার কথা ছিল, তা নেই। সাজানো-গোছানোও নয় ছবিগুলো। পড়ে আছে এখানে ওখানে। দু' চারটে দেওয়ালে ঝোলানো। কোনো কোনো ছবি একটা লম্বা টেবিলের ওপর দাঁড় করানো, দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

কিকিরা বললেন, “ওঁর ছবি তো খুব বেশি নেই!”

“নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ও নিজেই কত বিলিয়ে দিয়েছে...। আর এ-সব কে দেখাশোনা করবে, যত্ন করবে। আমি তো বছরে দু-একবার আসি মাত্র।”

তারাপদ আর চন্দন ছবি দেখছিল। দাঁড়াচ্ছিল কোথাও, আবার দু-পা

এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘরে এখন যা আলো তাতে বাস্তবিকই কোনো ছবি ভাল করে দেখা যায় না। সাজানো-গোছানোও নেই। তবে একটা মস্ত সুবিধে এই যে, শচীপতি বেশিরভাগই নিসর্গচিত্র এঁকেছেন, আর স্টিল লাইফ। নিসর্গচিত্রগুলো বড়-বড়। বিরাট অশ্বত্থগাছের ওপাধের ধুধু মাঠ, একটা হয়ত গোরুর গাড়ি। বেশ লাগে। জঙ্গলের ছবিই বেশি। পাহাড়, গাছপালা, নদী, পুকুর, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত।

তারাপদ ছবি দেখতে-দেখতে বলল, "স্টিল লাইফ বলে ওকে—ওই যে ফুল... !"

"হ্যাঁ।"

"ভালই। ভদ্রলোকের হাত ছিল।"

কিকিরাও ছবি দেখতে-দেখতে কথা বলছিলেন রঘুপতির সঙ্গে।

হঠাৎ চন্দন কেমন শব্দ করে উঠল।

কিকিরা ঘুরে দাঁড়ালেন।

কিছু বলতে গিয়ে চন্দন নিজেকে সামলে নিল।

তারাপদও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কিকিরাও ঘুরে এলেন। তাকালেন। তাকিয়ে কেমন অপলক চোখে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কাচের একটা চৌখুপি বা বাক্স। হাত দেড়েক লম্বায়, চওড়ায় হয়ত হাতখানেকের মতন। তার মধ্যে এক অদ্ভুত মূর্তি।

"ওই মূর্তিটা... !"

রঘুপতি তাঁর হাতের টর্চের উজ্জ্বল আলো কাচের ওপর ফেললেন। ভেতরের মূর্তিটা যেন কেঁপে গেল।

কিকিরা অবাক হয়ে মূর্তিটা দেখছিলেন।

রঘুপতি বললেন, "অগ্নিমূর্তি !"

"অগ্নিমূর্তি ?"

"হ্যাঁ। ওই তো দেখছেন। পরনে কৃষ্ণ বস্ত্র। হাতে ধূম্রপতাকা, জ্বলন্ত বর্শা।"

"চারটে হাত ?"

"হ্যাঁ। হরিবংশের বর্ণনা মতে অগ্নির ওই রূপ। কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, ধূম্রপতাকা, জ্বলন্ত বর্শা হাতে দেবতা অগ্নি। ওঁর চারপাশে আগুনের সাতটি শিখা।"

"একটা ছাগলের মুণ্ডু রয়েছে নিচে।"

"অগ্নির বাহন ছাগ।"

কিকিরা বুঝতে পারছিলেন না এই মূর্তিটিকে তিনি কী বলবেন! অসামান্য, সুন্দর, না ভীতিপদ। আগুনের সাতটি শিখার রং এক নয়, কোনোটা ঘন লাল, কোনোটা আগুনে-লাল, কোনোটা তামাটে, কোনোটা সাদা-মেশানো।

অগ্নিমূর্তির বেশ একেবারে কালো। চার হাতের এক হাতে পতাকা। ধোঁয়া উঠছে যেন পতাকার মাথায়, বর্শা লাল, অন্য দুই হাতের একটিতে শাঁখ, অন্যটিতে কমণ্ডলু।

তারাপদ আর চন্দন কোনো কথা বলছি না।

শেষ পর্যন্ত কিকিরাই কথা বললেন, "এই মূর্তি কিসের তৈরি?"

"তা আমি ঠিক বলতে পারব না। শচীভাই নানারকম জিনিস মিশিয়ে করেছিল। তবে গালাই বেশি।"

"গালা?"

"কালো লাল গালা। সবুজ নীল গালাও আছে। কেমন করে এ-সমস্ত গালা সে জুটিয়েছিল, বা নিজেই রং বানিয়েছিল আমি জানি না।"

"এই মূর্তি কি এখানেই আছে বরাবর?"

"না।"

"কোথায় ছিল?"

রঘুপতি ইতস্তত করে বললেন, "পাশের ঘরের এক চোরা সিন্দুকে।"

"আপনি এখানে নিয়ে এসে রেখেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

রঘুপতি হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলেন। স্তব্ধ, গম্ভীর, বিষণ্ণ। নির্বাক মানুষটি যেন ভীষণ অন্যমনস্ক।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "চলুন—বাইরে যাই।"

কিকিরা কিছু বলার আগেই রঘুপতি ঘুরে দাঁড়ালেন।

উনি চলে যাচ্ছেন দেখে কিকিরা তারাপদদের ইশারা করলেন—বাতি দুটো তুলে নিতে।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন কিকিরারা।

রঘুপতি দরজা বন্ধ করতে লাগলেন সাবধানে।

১০

বসার ঘরে এসে আবার বসলেন চারজনে।

চুপচাপ। রঘুপতিকে বিমর্ষ, ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল।

কিকিরাই শেষ পর্যন্ত কথা বললেন, "রঘুপতিবাবু, ওই মূর্তি কি আপনাদের..."

রঘুপতি বললেন, "আমরা অগ্নি-উপাসক। আমাদের কুলদেবতা অগ্নি। যে-মূর্তি আমরা পুজো করি সেই মূর্তি আমার কলকাতার বাড়িতে আছে। সেই মূর্তি এক ঋষিপুরুষের। তাঁর দুটি হাত। এক হাতে বজ্র, অন্য হাতে

ঘৃতপাত্র। পরনে তাঁর সন্ন্যাসীর বেশভূষা। তাঁর পায়ের তলায় আগুনের শিখা।" বলে রঘুপতি চুপ করে থাকলেন সময়। আবার বললেন, "এখানে যে মূর্তিটি দেখলেন—এটা শচীভাই নিজের খেয়ালে গড়েছিল। তার মনের মতন করে। এই মূর্তি ভয়ঙ্কর, অভিশপ্ত। এতে আমাদের অমঙ্গল হয়েছে। শচীভাই মারা গেল, আমার ছোটছেলে হল পঙ্গু। বাবা শেষ বয়সে উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করলেন।"

কিকিরা বললেন, "মূর্তির জন্য কি এমন হয়!"

"জানি না। হয় না হয়ত। আমার মনে হয়, হয়েছে।"

"তারপর?"

"আমার আর-এক কাকা বিশ্বপতি আমাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।"

"কেন?"

"ওই মূর্তির জন্য।...সে মূর্তিটি নিজের জন্য চেয়েছিল।"

"আপনারা দেননি?"

"না।"

"মূর্তিটি অমঙ্গলের বলছেন—তা হলে দিলেন না কেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রঘুপতি বললেন, "ওই মূর্তির মধ্যে আগুনের যে সাতটি শিখা আছে—সেই শিখার তলায় সাতটি রত্ন লুকানো রয়েছে—গালার মধ্যে। এই সাতটি রত্ন আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চয়। প্রতিটি শিখার যেমন রং, রত্নগুলিরও রং সেইরকম। এক-একটি রত্নের দাম আজকের দিনে অনেক। ...বিশ্বপতি মূর্তিটা গলিয়ে নষ্ট করে রত্নগুলি নিয়ে নিত।'

কিকিরা বললেন, "শচীপতিকে এইসব রত্ন কে দিয়েছিল?"

"বাবা।"

"কেন?"

"আমি জানি না। বোধ হয় লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিংবা শচীভাই নিজেই চেয়ে নিয়েছিল। অসুস্থ ভাইকে বাবা কষ্ট দিতে চাননি। শচীভাইয়ের বড় জেদ ছিল। তা ছাড়া সে হয়ত নতুন করে আমাদের উপাস্য কুল-দেবতার মূর্তি তৈরি করতে চেয়েছিল বলেই।"

"আপনি এ-সব জানতেন না?"

"আগে জানতাম না। বাবা যখন পাগল হয়ে যান—তখন বলেছিলেন।"

কিকিরা কী ভেবে বললেন, "ওগুলো কি এখনো আছে?"

রঘুপতি যেন বিষণ্ণ মুখে হাসলেন। "আছে।"

তারাপদ আর চন্দন একসঙ্গে হঠাৎ বলে বসল, "বিশ্বপতি কোথায় আছেন?"

"মারা গিয়েছেন। কাশীর গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিলেন।"

"কতদিন আগে ?"

"বছর দশেক।"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "কমলাপতি রাঠোর কে ?"

"আমার ভাই। বিশ্বপতির ছেলে।"

"যে-সাধু আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটার খেলা দেখাত, সে কি কমলাপতি ?"

"হ্যাঁ। আমার তাই মনে হয়। ...আমি শুনেছিলাম—কমলাপতি অনেক অসাধ্য কাজ করতে শিখেছে। তন্ত্রমন্ত্র জানে। আগুনের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে থাকত—হাঁটত। আমার মনে হয়েছিল, কমলাপতিই আমাকে ভয় দেখিয়ে মূর্তিটি নিতে এসেছে।"

"এরকম মনে হত কেন ?"

"হত। দূর থেকে যখন ওকে আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম—তখন ওই মূর্তির কথাই মনে হত।"

কিকিরা এবার হাসলেন। বললেন, "রঘুপতিবাবু, আপনি ভুল করেছেন। আগুনের মাঝখানে দাঁড়ানো, তার ওপর দিয়ে হাঁটা—সাধারণ একটা চালাকির খেলা। তন্ত্রমন্ত্র ওতে নেই।"

"খেলা ! কী বলছেন ?"

"খেলা—ছেলেমানুষি খেলা। আপনাকে আমি কালই দেখাব কেমন করে এই খেলা খেলতে হয়। ...আচ্ছা আজই একটু দেখাই," বলে কিকিরা উঠে পড়লেন। "আমি আসছি, দু-পাঁচ মিনিট।"

কিকিরা চলে গেলেন।

তারাপদ বলল, "কমলাপতি আপনাকে কিছু জানায়নি ? এখানে আসবে ?"

"না।"

"আপনি তার খোঁজখবর করতেন।"

"না। সম্পর্ক ওরা রাখেনি। আমিও নয়। তবে মাস কয়েক আগে কে একজন খবর দিল, কমলাপতিদের ব্যবসা ডুবে গিয়েছে। অজস্র দেনা। পুলিশ নাকি তাকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল বার কয়েক, জাল-জালিয়াতির জন্য।"

চন্দন বলল, "কমলাপতির টাকার খুব দরকার পড়েছিল মনে হচ্ছে।"

"বোধ হয়।"

কিকিরা ফিরে এলেন। দু'হাতে দুটি হাঁড়ি। পায়ে চটি।

হাঁড়ি দুটো চন্দনকে রাখতে দিলেন। দিয়ে একটা হাঁড়ি থেকে কিছু সাদা গুঁড়ো নিয়ে ডান পায়ের পাতার চেটোয় ছড়িয়ে নিলেন ভাল করে। বললেন, "আমি আগেই প্রিপেয়ার হয়ে এসেছি। তবু পায়ে চটিটা ছিল। আবার একবার লাগিয়ে-নিলাম।" বলে কাঠকয়লার চুল্লির কাছে এগিয়ে গেলেন। চুল্লির আগুন নিভে আসার মতন। তাত আছে সামান্য।

কিকিরা চুল্লির ওপর পা রাখলেন, তুললেন। আবার রাখলেন, তুললেন। তারপর আরও একটু রাখলেন।

রঘুপতি অবাক হয়ে বললেন, "আগুন নেই?"

"দেখুন।"

উঠে গিয়ে দেখলেন রঘুপতি। হাত বাড়িয়ে তাত অনুভব করলেন।

কিকিরা বললেন, "আগুনের আঁচ মরে গিয়েছে। তবু যতটুকু আছে—আপনি হাত চেপে রাখতে পারবেন না। আমি পারব।"

"কেমন করে?"

কিকিরা হাঁড়ি দুটো দেখালেন। বললেন, "এই দুটো হাঁড়িতে কী আছে জানেন? এটাতে রয়েছে ফটকিরি আর নুনের গুঁড়ো। পাউডার করে মিশিয়ে রাখা আছে। আর এই হাঁড়িটায় আছে নুন। আগুনের খেলা দেখাবার সহজ সস্তা দুটো জিনিস। তবে এ দুটো ছাড়া অন্য একটা জিনিস এখানে ছিল রঘুপতিবাবু—যেটা আপনি ধরতে পারেননি।" বলে কিকিরা ঘরের অন্যপাশে সরে গেলেন।

সামান্য দাঁড়িয়ে থেকে কিকিরা হাত দিয়ে সোফা সেটি দেখালেন তাঁর সামনের। বললেন, 'ধরে নিন—এই যে সোফাগুলো—এগুলো এক-একটা বড় পাথরের চাঁই। পাহাড়ে নদীর পাড়ে যেমন দেখেন। এই বড়-বড় পাথরগুলো যদি আমার সামনে থাকে, আশেপাশেও থাকে আর আমি তার আড়ালে বা মাঝখানে থাকি—আপনি আমার পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখতে পাবেন না। এখন এই ধরনের পাথরগুলোর ওপর আগুন জ্বালানো হল। পাশাপশি, সামান্য ছাড়াছাড়া ভাবে আগুন জ্বালানে পাথরের মাথায়। আগুন জ্বলতে লাগল। আমি থাকলাম পাথরের আড়ালে। সামনে থেকে—সামান্য দূর থেকে অবশ্য কেউ যদি—আমাকে দেখে—তার মনে হবে আমি আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।"

রঘুপতি তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মাথায় যেন কিছুই ঢুকছিল না।

কিকিরা হেসে বললেন, "কলকাতার স্টেজে সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখেননি? এটাও হল অগ্নিলীলা।"

"কিন্তু আমি হাঁটতে দেখেছি।"

"আপনি দেখেননি। ওটা আপনার চোখের ভুল। যদিবা দেখেও থাকেন—তা হলেও ক্ষতি নেই। ধরুন আপনি রয়েছেন পাথরগুলোর আড়ালে। সামনের পাথরগুলোর মাথায় আগুন জ্বলছে জ্বলুক। আপনি যেখানে আছেন সেখানে কিছু কাঠকুটো পাতা সাজিয়ে নিন। সামনের দিকে উঁচু করে পেছনের দিকে নিচু করে। মাঝখানে কাঠকুটো কম রাখবেন। এবার আগুন জ্বালিয়ে দিন। সামনের দিকের কাঠকুটোয় আগুন জোর জ্বলতে থাকবে—পেছনের দিকের কাঠকুঠো ঘাসপাতা টিমটিম করে জ্বলবে। তফাত

থেকে কিছু বোঝা যাবে না। পায়ে ফটকিরি আর নুনের গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে ওই টিমটিমে আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটুন, একটু তাড়াতাড়ি—-কিস্যু হবে না আপনার। প্র্যাকটিসের ব্যাপার। আর সেইসঙ্গে নুনের গুঁড়ো ছড়াতে থাকুন আগুনে। দেখবেন আগুন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এই খেলাটা খুব সাধারণ।...আপনি যা দেখেছেন সেটা খেলা।"

রঘুপতি বললেন, "কে বলল ? আপনারা কি দেখেছেন ওই জায়গাটা ?"

কিকিরা বললেন, "আমরা ওখানে গিয়ে সব দেখেছি। তারাপদ-চন্দনকে জিজ্ঞেস করুন। আমরা যতটা পেরেছি দেখেছি সামনে গিয়ে, খুঁজেছি সমস্ত।" বলে কিকিরা তাঁদের ঘোরাফেরা, খোঁজখবর করার কথা বললেন সবিস্তারে। কী-কী পেয়েছেন সেখানে—হাঁড়ি, দাড়ি, খইনির ছেঁড়া প্যাকেট, চাবির রিংয়ের চাকতি।

রঘুপতি যেন কোনো গল্পকথা শুনছেন, এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার কিকিরা বললেন, "শুধু দুটো ব্যাপার ধরতে পারছি না।"

"কী ?"

"যে-লোকটা মারা গেল সে কে ?" বলে কিকিরা রঘুপতির চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকলেন সামান্য সময়, যেন জবাবটা অন্য পক্ষই দেবেন, "কমলাপতি ?"

রঘুপতি চুপ করে আছেন দেখে তারাপদ বলল, "কমলাপতি বলেই মনে হয়।"

কিকিরা বললেন, "লোকটা যেখানে মারা যায়—চুনিয়া নদীতে, পাথরের ওপর—তার বিশ-পঁচিশ গজ দূরে আমি একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। ব্যাগের মধ্যে ভারী এই হাতুড়ি ছিল। এটা কোথা থেকে এল ?"

রঘুপতি এবারও কোনো কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে কিকিরা রঘুপতিকে বললেন, "আপনি সব জানেন। আমাদের বলছেন না। রঘুপতিবাবু, আমরা পুলিশের লোক নই। গোপবাবু আমাকে ধরে বেঁধে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনাকে সাহায্য করতেই আমি এসেছিলুম।"

রঘুপতি যেন খানিকটা চঞ্চল হলেন। তাকালেন। মুখ নিচু করলেন আবার। চুপচাপ। নিজের মনে মাথা নাড়লেন। মুখ তুললেন। বললেন, "যে মারা গিয়েছে সে কমলাপতি।" বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভারী গলায় আবার বললেন, "আমি তাকে দেখিনি। তবু বলছি সে কমলাপতি। আর সে কমলাপতিকে মেরেছে সে তার লোক।"

কিকিরা রঘুপতিকে দেখছিলেন। "আপনি কমলাপতিকে দেখেননি। তবু এ-কথা বলছেন কেমন করে ?"

"পুজনকে আপনারা দেখেছেন। আমি তাকে খবর করতে পাঠিয়েছিলাম। সে খোঁজখবর করে এসে আমায় বলেছে।"

"কমলাপতির বন্ধুটি কে ?"

"জানি না। বেনারস থেকে নিয়ে এসেছিল। ভাড়াটে গুণ্ডা হয়ত।"

"সে কেন কমলাপতিকে খুন করবে ?"

"কেন করতে তার জবাব আমি দিতে পারব না। তবে ওই মূর্তির জন্যই মনে হয়। কমলাপতি বোধ হয় তাকে বলেছিল—মূর্তিটা খুব দামি। লাখ-লাখ টাকা হাতে আসবে মূর্তিটা পেলে। এলে ভাগাভাগি করা যাবে।"

"কিন্তু মূর্তি তো আপনার কাছে। চুরি না করা পর্যন্ত মূর্তি পাবে কোথায় ?"

"চুরি করতে আসবে জেনেই আমি মূর্তিটা ছবির ঘরে এনে রেখেছিলাম। ...ওটা তো পাশের ঘরে চোরা সিন্দুকের মধ্যে থাকার কথা।"

"আপনি কি চোর ধরতে চাইছিলেন ?"

"না। আমি চাইছিলাম চোর ওটা নিয়ে যাক।"

কিকিরা অবাক। তারাপদ আর চন্দনও কিছু বুঝতে না পেরে রঘুপতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রঘুপতি নিজেই বললেন, "কমলাপতিকে যেদিন মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার আগের দিন রাত্তিরে চোর এসেছিল এ-বাড়িতে। আমার কুকুরটাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল রুটির টুকরোর সঙ্গে। কুকুরটা মারা যায় পরের পরের দিন। বুনো কুকুর বলে লড়েছিল দু'দিন, নয়ত আগেই মারা যেত।"

চন্দন বলল, "আপনি কি বলতে চাইছেন—কমলাপতিকে খুন করে সেদিন রাত্তিরেই তার বন্ধু এ-বাড়িতে মূর্তি চুরি করতে এসেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"এর কোনো প্রমাণ আছে ?"

"কুকুর ছাড়াও প্রমাণ আছে। বাড়ির কাজের লোকরা জেগে উঠেছিল...। তারা একটা লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছে।"

কিকিরা বললেন, "একটা কথা, রঘুপতিবাবু। যে-মূর্তি চোরাই সিন্দুকের মধ্যে ছিল সেই মূর্তি আপনি ছবিঘরে এনে রাখলেন কেন ? তা ছাড়া আপনার ছবিঘরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে মূর্তি চুরি করবে—এ প্রায় দুঃসাধ্য কর্ম।"

রঘুপতি বললেন, "আপনাদের কাছে দুঃসাধ্য কর্ম। এ-বাড়ির খোঁজখবর যারা ভাল রাখে তাদের কাছে নয়। ছবিঘরে যাওয়ার একটা অন্য পথও আছে। পেছনদিক থেকে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায়। উঠে একটা মামুলি দরজা পাবে। পাকা চোরের পক্ষে সে-দরজা ভাঙা সহজ। ...কমলাপতি এ-সব জানত। তার বাবার কাছে শুনেছে। সে এ-বাড়ির নাড়িনক্ষত্র জেনে নিয়েছিল।"

"কিন্তু আপনি কি তাকে মূর্তিটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ?"

রঘুপতি কিছু বললেন না প্রথমে। তারপর দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "আমি একটা কথা আপনাদের ঠিক বলিনি। আমি বলেছিলাম—কমলাপতি আমাকে জানায়নি সে এখানে আসছে। না না।...। সে জানিয়েছিল। আমিও তাকে মূর্তিটা দিতে চেয়েছিলাম।"

"কিন্তু কেন ?"

রঘুপতি আর কথা বলেন না। তাঁর গলার কাছটা ফুলে উঠল, মুখের মাংসগুলো কাঁপছিল। নিজেকে যেন প্রাণপণে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন। শেষে বললেন, "আমি আপনাদের সব কথা বলিনি, বলতে চাইনি। এখন আর না বলে উপায় নেই।...ওই কমলাপতি আমাকে কলকাতায় চিঠি লিখে-লিখে বিরক্ত করছিল। ভয় দেখাচ্ছিল। শেষে ও আমার ছোট ছেলেকে চিঠি লিখল। সে বেচারি পঙ্গু। পোলিও ভিক্‌টিম। কমলাপতি তাকে জীবনের ভয় দেখাল। নিজের রুগ্ন ছেলেটাকে প্রাচে বাঁচাতে আমি শেষ পর্যন্ত তার কথায় রাজি হলাম। আমার লোক তাকে জানিয়ে দিল—শীতকালে যখন আমি ময়ূরগঞ্জে আসব—তখন সে যোগাযোগ করতে পারে। তবে লুকিয়ে। সরাসরি আমি তার মুখ দেখতে চাই না, তার হাতে ওই মূর্তিও তুলে দিতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার নেই। শচীভাইয়ের তৈরি মূর্তি—বাড়ির জিনিস—যতই তা অমঙ্গলের হোক—আমি চোরবদমাশ নচ্ছারের হাতে তুলে দিতে পারব না বাড়ির জিনিস। সে নিজে এসে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক। আমি অন্তত বাধা দেব না।"

রঘুপতি নীরব হলেন। তাঁর দুটি চোখ যেন জলে ভরে এসেছে।

কিকিরা প্রথমে কিছু বললেন না, পরে বললেন, "রঘুপতিবাবু, আমরা একটা লোকের খবর পেয়েছিলুম। দু'নম্বরটা এল কোথা থেকে ? মানে কমলাপতির বন্ধু—বা ভাড়া-করা লোক।"

"একসঙ্গেই এসেছিল বোধ হয়। তবে ঘোরাফেরা করেনি একসঙ্গে। পাছে লোকে সন্দেহ করে, দেখতে পায়। বা মুখ চিনে রাখে।" রঘুপতি মাথা নাড়লেন—নিজের মনেই, "এখানে কোনো হোটেল নেই। পিনুর গেস্ট হাউস বলে একটা বাড়ি আছে। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে থাকতে পারে দু-দশ দিন। খাওয়া-দাওয়া বাইরে। আপনি সেখানে খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন 'খইনি-খাওয়া' একটা লোক ওই সময় ওখানে এসে কিছুদিন ছিল। লোকটাকে দেখতে ষণ্ডার মতন। বলত, সে জি আর পি-তে কাজ করে মোগলসরাইয়ে। নাম বলত, কেদার।...এ-সব খবর আমাকে জোগাড় করতে হয়েছে। পুজনই জোগাড় করেছে।"

"সেই লোক আর নেই ?"

"না। কমলাপতি মারা যাওয়ার পরের দিনই সে চলে গেছে। মানে খবরটা

জানাজানি হওয়ার পরের দিন।"

কিকিরা কিছুক্ষণ বসে থাকার পর উঠে পড়লেন ধীরে-ধীরে। বললেন, "মূর্তিটা তা হলে আপনার কাছেই থেকে গেল।"

"থাকল। ওটা আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেব।" বলে রঘুপতিও উঠে দাঁড়ালেন। "আমি জানতাম আপনারা কেন এসেছেন। গোপ আমায় জানিয়েছিল। কী করছেন তাও জানতাম। ছবিঘর যে আপনারা দেখতে চাইবেন—তাও বুঝতে পেরেছিলাম। মূর্তিটা তাই তুলে রাখিনি। এবার রেখে দেব।"

"ওটা বিদায় করা যায় না?"

"কোথায় আর গেল!...আপনারা বিশ্বাস করুন, কমলাপতি আমার ভাই। সম্পর্ক থাক না থাক—সে যতবড় বদমাইশ হোক—এমন করে সে মারা যাবে আমি কল্পনাও করিনি। বংশের আরও একজন গেল। এর পর হয়ত আমার পালা।"

তারাপদরাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

রঘুপতি বললেন, "অনেক রাত হয়ে গেল।"

কিকিরা বললেন, "রঘুপতিবাবু আপনি সব বলেও একটা কথা বললেন না। মূর্তিটা আপনি বোধ হয় কমলাপতিকে দিতে চাননি। আপনি চেয়েছিলেন সে ওই মূর্তি নিতে আসুক কিন্তু নিয়ে যেতে যেন না পারে।"

রঘুপতি অপলকে চেয়ে থাকলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনার রুগ্ন পঙ্গু ছেলেকে যে ভয় দেখায় সে নিশ্চয় অমানুষ পশু। কাকা হয়েও সে এমন কাজ করতে পারে! আমার মনে হয় আপনি ঠিক করেছিলেন কমলাপতি মূর্তিটা নিতে এলে আপনি তাকে গুলি করে মারবেন। আপনার সৌভাগ্য এই কাজটা আপনাকে আর করতে হল না। কমলাপতির সঙ্গী সেই গুণ্ডাটাই করে গেল।"

রঘুপতি নির্বাক। তাঁর সমস্ত মুখ যেন আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠছিল। তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না।
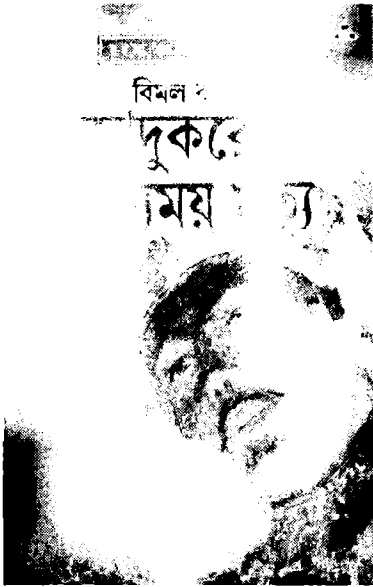
জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু

জাদুকরের রহস্যময় মৃত্যু

ট্রাম থেকে নেমেই তারাপদ বলল, "নে, হয়ে গেল!" হয়ে গেল মানে চোখের পলকে সব অন্ধকার ; আলো চলে গেল। লোডশেডিং।

ভর সন্ধেবেলায় এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেলে কারই বা ভাল লাগে! চন্দন বলল, "কলকাতায় আর থাকা যায় না, বুঝলি! এর চেয়ে গ্রামে গিয়ে থাকা ভাল।"

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তারাপদ পাশের লোকটিকে খেয়াল করতে পারেনি। হুমড়ি খেয়ে তার গায়ে পড়ছিল। সামলে নিল কোনোরকমে। লোকটি কিছু বলল। তারাপদ ভাল করে শুনতে পায়নি।

চন্দন বলল, "তোকে কী বলল শুনলি?"

"কী?"

"অন্ধ বলল। চীনে ভাষায়।"

"তুই চীনে ভাষা বুঝিস?"

"একটু একটু বুঝতে পারি। আমাদের হাসপাতালে চীনে রোগী দু'দশটা রোজই আসে। আন্দাজ করে নিতে পারি," বলে চন্দন হেসে উঠল।

তারাপদ বুঝতে পারল, চন্দন ঠাট্টা করছে। ঠাট্টাই করুক আর যাই করুক, এই পাড়াটায় চীনেদের অভাব নেই। তবে পাড়াটা চীনেদের নয়। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই বেশি। কিছু চীনে। দু'দশ ঘর পার্সি বোম্বাইঅলা। বেশ কিছু মুসলমান। পাঁচমেশালি পাড়া। এদের কার কী পেশা বোঝা যায় না। তবে চেহারা দেখলে মনে হয়, গতরে-খাটা মানুষ। ব্যবসাপত্রও করে।

চন্দন বলল, "হ্যাঁ রে তারা, কিকিরা ফিরেছেন তো? না, গিয়ে দেখব, দরজায় তালা ঝুলছে?"

তারাপদ বলল, "ফেরারই কথা। চিঠিতে লিখেছেন, দশ তারিখে ফিরছেন। আজ তেরো তারিখ।"

"চল্‌, দেখি।...আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে কিকিরার কাশীতে বেড়াতে যাবার কী দরকার ছিল বলতে পারিস?"

"বেড়াবার আবার দরকার থাকে নাকি ! এমনি গিয়েছিলেন।"

ট্রাম রাস্তা থেকে কিকিরার বাড়ি দূর নয়। তবে গলিতে ঢুকতে হয়। বার তিনেক ডাইনে-বাঁয়ে পাক খেয়ে পৌঁছতে হয় কিকিরার বাড়িতে। চন্দনরা গলিতে ঢোকার আগেই আলো দেখতে পাচ্ছিল ; নানা ধরনের বাতি জ্বলে উঠছে। কেউ জ্বালিয়েছে লণ্ঠন, কেউ মোমবাতি। কোথাও বা কার্বাইডের লম্ফ জ্বলতে শুরু করেছে। ইন্‌ভার্টারের আলোও চোখে পড়ছিল দু'এক জায়গায়।

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চন্দন বলল, "কিকিরা এই পাড়াটা পালটে নিতে পারেন। এখানে এলেই আমার ভাই গুমঘর লেনের কথা মনে পড়ে।"

"গুমঘর লেন ! কোথায় সেটা ?"

"চাঁদনির দিকে। অদ্ভুত নাম। তাই না ?"

"এরকম নাম হবার কারণ ?"

"কে জানে ! আমার মনে হয়, পুরনো কলকাতায় ওখানে একটা মর্গ ছিল। লাশকাটা ঘর। বোধহয় সেই থেকে ওরকম নাম হয়েছে। কে জানে !"

তারাপদ মজার গলায় বলল, "কলকাতায় অদ্ভুত অদ্ভুত নামের গলি আছে। কিকিরার নামেও একটা গলি করে দেওয়া যেতে পারে, কী বলিস, চাঁদু ?" বলে হেসে উঠল।

সামান্য এগিয়েই কিকিরার বাড়ি। নিচের তলায় মুসলমান কারিগররা দরজিগিরি করছে। লণ্ঠন ঝুলছে এখানে-ওখানে। সেলাই-মেশিনের শব্দ। কেউ-কেউ গোছগাছ সেরে নিচ্ছে ; বোধহয় দোকান বন্ধ করবে। ডান দিকে চাতাল। চাতালের শেষ প্রান্তে দোতলার সিঁড়ি।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তারাপদ বলল, "আলো দেখছি রে, কিকিরা আছেন।"

দরজায় টোকা মারতেই বগলা দরজা খুলে দিল। প্যাসেজে লণ্ঠন জ্বলছে।

চন্দন বলল, "কী বগলাদা ? কাশী বেড়ানো হল ?"

"হল দাদা ! এই নিয়ে দু'বার হল। একবার গিয়েছি ছেলেবেলায়, আর এবার গেলাম বুড়োবেলায়।"

"ভাল ছিলে ?"

"তা ছিলাম। কোনো কষ্ট হয়নি।"

কিকিরার গলা পাওয়া গেল। ঘর থেকে সাড়া দিচ্ছেন।

তারাপদ ঘরের দিকে পা বাড়াল।

চন্দন বগলাকে বলল, "চা লাগাও, বগলাদা। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।"

কিকিরার ঘরে এসে তারাপদ বলল, "আপনি অন্ধকারে বসে আছেন ?"

কিকিরা ঠিক অন্ধকারে বসে ছিলেন না। ঘরের এক কোণে এক খেলনা-বাতি জ্বলছিল। দেখতে অনেকটা ফানুসের মতন। বাহারি। ছোট।

তার মধ্যে বোধহয় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন কিকিরা। বাটি-মোমবাতি।

কিকিরা বললেন, "এসো। তোমাদের কথাই ভাবছিলাম।...এসো গো, স্যান্ডেল উড্। তোমার হাসপাতাল কেমন চলছে?"

চন্দন হাসল, "যেমন চলে। আপনি ফিরলেন কবে?"

"বুধবার। দশ তারিখেই। ভদ্দরলোকের এক কথা।"

"শুনলাম, খুব আরামে ছিলেন? বগলাদা বলছিল।"

"তা ছিলাম। এককালের রাজ-রাজড়ার বাড়ি। এখন ভূতের বাড়ি। একপাশে পড়ে ছিলাম।"

"ভূতের বাড়ি মানে?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"আগে বোসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবে নাকি?"

চন্দন আর তারাপদ কাছাকাছি বসল কিকিরার।

ঘরের আলো এতই কম যে, কিকিরাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। পরনে পাজামা, গায়ে কামিজ ধরনের এক জামা। জামার রঙ সাদা না ফিকে বাদামি বোঝা যাচ্ছে না। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। কিকিরার রোগা হাড়-হাড় চেহারায় কেমন যেন রুক্ষ ভাব। শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি ওঁর।

চন্দন বলল, "কিকিরা-স্যার, আপনাকে কাহিল দেখাচ্ছে কেন? বগলাদা বলছিল, আরামে ছিলেন কাশীতে; তা হলে শুকিয়ে গেলেন কেমন করে?"

কিকিরা কিছু বলার আগে হাত বাড়ালেন। বললেন, "একটা মিঠে সিগারেট দাও! চুরুট খেতে পারছি না। গলায় লাগছে।"

চুরুট সিগারেট কোনোটারই পাকা নেশা নেই কিকিরার। শখ করে খান। চিন্তা-ভাবনার সময় মগজে ধোঁয়া দেন।

চন্দন সিগারেট-দেশলাই এগিয়ে দিল কিকিরাকে।

সিগারেট ধরিয়ে দু'চারটে টান দিলেন কিকিরা। তারপর হালকা গলায় বললেন, "চন্দন, আমাকে বোধহয় এবার একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলতে হবে।"

চন্দন কিছু বুঝল না। তারাপদর দিকে তাকাল। তামাশা করছেন কিকিরা, না, অন্য কিছু ঘটেছে? কিকিরাকেই আবার নজর করে দেখতে লাগল চন্দন। লম্বা নাক, উঁচু চোয়াল। চোখ দুটি গর্তে ঢোকানো। দেখলে মনে হয়, টর্চলাইটের বাল্ব যেমন কাচের তলায় গর্তে ঢোকানো থাকে, সেই ভাবে ডোবানো আছে কিকিরার চোখ দুটি। অজীর্ণ রোগীর মতন রোগা রুক্ষ চেহারা। এই মানুষকে কি গোয়েন্দা মানায়? গোয়েন্দাদের কাঠামোই আলাদা।

চন্দন হেসে বলল, "আপনি তো হাফ-গোয়েন্দা।"

"না বাপু," কিকিরা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি ম্যাজিশিয়ান। কিকিরা দি গ্রেট্," বলে ছেলেমানুষের মতন হাসলেন। পরে বললেন, "সত্যি কথা বলতে

কী, ম্যাজিকটাই বা হল কোথায় ! শুরু করেছিলাম, মাঝপথে সেটা গেল। কপাল খারাপ হলে যা হয়। তারপর দেখো, কবে থেকে বসে আছি ম্যাজিকের ওপর বড়-বড় দুটো বই লিখব বলে, জোগাড়যন্তর করি, আর কাজ নিয়ে বসলেই আটকে যায়। হবে না হে, আমার দ্বারা হবে না।"

এক সময় তারাপদদের ধারণা ছিল, ম্যাজিক নিয়ে আবার বই লেখা হয় নাকি ? হলে সেটা বটতলার বইয়ের মতন হয়। কিকিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর বুঝেছে, তাদের ধারণা ভুল। বিরাট-বিরাট বই আছে ম্যাজিকের। আর সে-সব কি আজকের বই ? কত পুরনো-পুরনো বই ! কিকিরার মুখে নাম শোনা যায় : রোলো, বাট্‌লার, কিং ফ্রান্সিস, সেলিগ্‌ম্যান, হুডিনি, আরও কত কে ! নামগুলো মনে থাকে না তাদের। তবে কিকিরার ঘর হাতড়ালে দশ-বিশটা বই পাওয়াও যাবে।

তারাপদ বলল, "ব্যাপারটা কী বলুন তো ? আপনি যেন কাশী ঘুরে এসে মনমরা হয়ে গিয়েছেন। আপনার হাসিঠাট্টা নেই, মজা নেই, আপনার ইংলিশ নেই।"

কিকিরা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "গিয়ে ভুল হয়েছে। আমার এক পুরনো বন্ধু এসেছিল কলকাতায়। তার ভাগ্নের বিয়েতে। সে একদিন খোঁজ করে দেখা করতে এল। পুরনো বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপার তো বোঝো। এমন করে মন গলিয়ে দেয় যে, তাদের আর না বলা যায় না। ওর পাল্লায় পড়ে কাশী চলে গেলাম। ভাবলাম, যাই, দু'দিন বেড়িয়ে আসি। এক সময় দশাশ্বমেধ ঘাট আমায় খুব টানত। গরমের দিন নৌকো করে গঙ্গায় ঘুরে বেড়াতে বড় আরাম হে। আমার একটা নেশাই ছিল, নৌকো করে ঘোরা। দশাশ্বমেধ, কেদার, ঘোড়াঘাট, এন্তার ঘুরে বেড়াতাম।"

"কাশীতে গরম পড়ে গিয়েছে ?" চন্দন বলল।

"পড়ছে। কলকাতায় যা দেখছি তার চেয়ে বেশি।"

"এখানেও তো গরম পড়ে এল।...দেখুন না, আলো নেই, পাখা নেই, গরম-গরম লাগছে আমার।"

কিকিরা সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে ফেলে দিলেন।

তারাপদ বলল, "কাশী বেড়াতে গিয়েছিলেন, ভাল করেছিলেন। কিন্তু ভুলটা কী করলেন যে আফসোস করছেন ?"

কিকিরা সামান্য চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, "তোমরা কাগজ-টাগজ পড়ো না ?"

প্রশ্নটা যেন বুঝতে পারল না তারাপদ। চন্দনের দিকে তাকাল। বলল, "পড়ি বইকি ! অনেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কাগজ পড়ে। আমি অত পড়ি না," বলে চন্দনের দিকে তাকাল, "তুই পড়িস ?"

"আসলগুলো পড়ে নিই ; ভেজাল পড়ি না," হাসতে হাসতে বলল চন্দন।

কিকিরা বললেন, "তা হলে তোমরা খবরটা পড়োনি ?"

"কোন্ খবর ?"

"ডেথ্ অব এ ম্যাজিশিয়ান, জাদুকর ফুলকুমারের রহস্যময় মৃত্যু ?"

চন্দন তারাপদ দু'জনেই অবাক। ফুলকুমার আবার কে ? জীবনে এমন নাম তারা শোনেনি। তা ছাড়া ম্যাজিক সম্পর্কে তাদের আগ্রহ তেমন কিছু নেই। নিতান্ত কিকিরার সঙ্গে ওদের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তাই মাঝে-মাঝে দু'দশটা গল্প শোনে ম্যাজিশিয়ানদের। ফুলকুমারের নাম চন্দনরা শোনেনি।

চন্দন বলল, "কিকিরা-স্যার, ফুলকুমারের নাম আমরা শুনিনি। খবরের কাগজেও কিছু পড়িনি। হেঁয়ালি না করে ব্যাপারটা যদি আমাদের বলেন, খুশি হব।"

কিকিরা মাথার ওপর হাত তুলে আলস্য ভাঙার ভঙ্গিতে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। যেন ফুলকুমারের কথা ভাবছিলেন।

বগলা চা নিয়ে এল। তার কাজকর্ম বেশ গোছানো। ট্রে করে চা এনেছে। বড় প্লেট গোটা দুই। প্লেটে কাশীর প্যাঁড়া, বরফি ধরনের এক মিষ্টি আর মচমচে সেউ গাঁঠিয়া।

চা রেখে বগলা চলে গেল।

চন্দন বরাবরই পেটুক গোছের। হাত বাড়িয়ে গোটা-দুই প্যাঁড়া তুলে নিল, নাকের কাছে এনে শুঁকল শব্দ করে ; মজার গলায় বলল, "দারুণ, গন্ধতেই জিবে জল আসে।"

"দেওঘরের প্যাঁড়ার চেয়ে খারাপ নয় স্যান্ডেল উড়, বরং 'বেটার' বলেই আমার মনে হয়। নাও, খাও। তারাপদ হাত বাড়াও, নয়ত ঠকবে," বলে কিকিরা নিজের চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

তারাপদ বলল, "প্যাঁড়ার চেয়েও জাদুকর ফুলকুমার আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে কিকিরা।"

কিকিরা বললেন, "বলছি ফুলকুমারের কথা। তুমি শুরু করে দাও," বলে বার কয়েক চুমুক দিলেন চায়ে। পরে বললেন, "ফুলকুমারকে আমি বাপু চিনি না। তার দাদা রাজকুমারকে চিনি। রাজকুমারের মুখেই আমি গতকাল সব শুনলাম।"

"আপনি যে বললেন কাগজে বেরিয়েছে ?"

"বেরিয়েছে। ছোট করে। রাজকুমারই আমাকে বলেছে। আমি তো তখন কলকাতায় ছিলাম না। আজ সকালে পুরনো কাগজ জোগাড় করে দেখলাম।"

চন্দন বলল, "কবে ঘটেছে ঘটনাটা ?"

"সাত তারিখে।" বলে কিকিরা বিষম খাওয়ার মতন করে কাশলেন।

সামলে নিলেন। বললেন, "ফুলকুমারের মৃত্যুটা বড় অদ্ভুত। শিয়ালদার কাছে একটা হল-এ ম্যাজিক দেখাবার প্রোগ্রাম ছিল ফুলকুমারের। প্রায় অর্ধেকটা সময় সে তার ম্যাজিক দেখিয়েছে। মাঝে মিনিট পনেরো-বিশের জন্যে খানিকটা হাসি-তামাশার ব্যবস্থা ছিল। ওই প্রোগ্রামের পর ছিল ফুলকুমারের আসল খেলা, ভৌতিক হারমোনিয়াম।"

তারাপদর যেন গলা আটকে গেল, "ভৌতিক হারমোনিয়াম ? সেটা আবার কী ?"

"এক ধরনের খেলা। ম্যাজিক শো। স্টেজের ওপর একটা হারমোনিয়াম রাখা হবে। কাছাকাছি থাকবে ম্যাজিশিয়ান। চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা। অথচ হারমোনিয়ামটা নিজেই বাজবে।"

চন্দন অবাক গলায় বলল, "বলেন কী ? নিজে-নিজেই হারমোনিয়াম বাজবে ! ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি ?"

"বললাম তো ভৌতিক হারমোনিয়াম," কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারের এইটেই ছিল সেরা খেলা আর নতুন খেলা।"

চন্দন বলল, "দেখুন স্যার কিকিরা, আমরা এত রকম ম্যাজিকের খেলার কথা শুনেছি, নিজেরাও দু' চারটে দেখেছি যে, হারমোনিয়াম বাজনায় কোনো থ্রিল পাচ্ছি না। ম্যাজিকে গলা-কাটা, পেট-কাটা, ভূত-নাচানো, মোটরগাড়ি ওড়ানো, কত কী হয়। এ-সব যদি হতে পারে, তবে সামান্য হারমোনিয়াম বাজানো হবে না কেন ?"

"না-হবার কারণ সত্যি নেই। কিন্তু, তুমি কি এমন কথা শুনেছ চন্দন, খেলা দেখাবার সময় কোনো ম্যাজিশিয়ান স্টেজের মধ্যে খুন হয় ?"

"খুন !" চন্দন আর তারাপদ একসঙ্গে যেন আঁতকে উঠল।

কিকিরা বললেন, "হ্যাঁ, খুন। রাজকুমার তাই বলল। বলল, তার ভাইকে স্টেজের মধ্যে কেউ খুন করেছে।"

"খুন করার প্রমাণ ?"

"হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই ফুলকুমার মারা যায়। ওরা সন্দেহ করেছে মাথার পিছন দিকে মারাত্মক চোট।"

"আপনি কী বলছেন, কিকিরা ?"

"যা শুনেছি তাই বলছি। ফুলকুমারকে এমন একটা জিনিস দিয়ে মারা হয়েছিল যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যে-কোনো সবল সুস্থ মানুষ মারা যেতে পারে।"

"কী দিয়ে মারা হয়েছিল ?"

"তা আমি জানি না। রাজকুমারের মুখে যা শুনেছি তাই বলেছি।"

"ফুলকুমারকে খুন করার কারণ ?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"আমি কেমন করে বলব ! আপাতদৃষ্টিতে কোনো কারণ থাকতে পারে না।

ওর দাদা রাজকুমারও বলছিল, ফুলকুমারকে খুন করার মতন কেউ আছে বলে সেও জানে না। তবে তার জানার বাইরে অনেক কিছুই তো ঘটতে পারে।"

চন্দন বলল, "তবু একটা সন্দেহ? কিংবা ধরুন অনুমান..."

"না," মাথা নাড়লেন কিকিরা, "রাজকুমার কাউকে সন্দেহ করতে পারছে না। তবে একটা ব্যাপার যা ঘটেছে সেটা অদ্ভুত।...স্টেজের মধ্যে ফুলকুমার মারা যাবার পর সেই হারমোনিয়ামটাও বেপাত্তা হয়ে গেছে।"

"বেপাত্তা? মানে হাপিস?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

"তা তো বলতে পারব না এখন। হারমোনিয়াম নেই; কিন্তু তার বাক্সটা আছে।"

তারাপদ চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। জানলা দিয়ে হাওয়া এল এক ঝলক। কিকিরার এই ঘরে এত রকম জিনিসপত্র যে ভাল করে বাতাস বইতে পারে না। চন্দনের কাছে একটা সিগারেট চাইল তারাপদ। তারপর কিকিরাকে বলল, "আপনি কি মনে করছেন ওই ভুতুড়ে হারমোনিয়ামটার জন্যে ফুলকুমারকে খুন করা হয়েছে?"

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটলেন সামান্য। বললেন, "কোনো ম্যাজিশিয়ানের খেলা দেখাবার জিনিসের জন্যে তাকে খুন করা হয়েছে বলে আমি শুনিনি। কেনই বা করবে? ফুলকুমারের ম্যাজিক-দেখানো হারমোনিয়ামের জন্যে তাকে খুন করা হবে কেন? আবার এটাও ঠিক, হারমোনিয়ামটা চুরিই বা যাবে কেন?...আমার মাথায় কিছু আসছে না।"

চন্দন আর তারাপদ সিগারেট ধরাল। চন্দন বলল, "আপনি কি ফুলকুমারের মৃত্যু-রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করবেন ঠিক করেছেন?"

"ঠিক করিনি। কিন্তু রাজকুমার আমায় বড় ধরেছে। বলছে, পুলিশ তার কাজ যা করছে করুক। আমি যেন অন্তত চোর এবং চুরি, এই দুটো নিয়ে কিছু করি।"

তারাপদ একমুখ ধোঁয়া গিলে বলল, "কিকিরা-স্যার, ব্যাপারটা যখন খুন-জখমের, তখন কি আপনার নাক গলানো উচিত হবে?"

"কেন?"

"ওটা তো পুলিশের হাতে চলে গেছে। আপনি নাক গলাতে গেলে উলটো না হয়ে যায়!"

কিকিরা মাথা দোলালেন। বললেন, "উলটো না হোক, পুলিশ ভাল চোখে দেখবে না। তবে কী জানো তারাপদ, আমি এমন একটা মানুষ, নিরীহ গোবেচারি যে, পুলিশ অন্তত আমায় খুনি ভাববে না। তা ছাড়া আমি বাপু, সাত তারিখে কলকাতায় ছিলাম না, ছিলাম কাশীতে। ঠিক কিনা?" বলে কিকিরা

একটু মজা করে হাসলেন। বললেন, "মামলা লড়ার জন্যে তুমি যেমন যে-কোনো উকিল-ব্যারিস্টার নিতে পারো, রাজকুমার তার ভাইয়ের রহস্যময় মৃত্যুর কারণ জানার জন্যে যে-কোনো লোকের সাহায্য নিতে পারে। আইন তাকে আটকাতে পারে না।"

চন্দন বলল, "তার মানে, আপনি রাজকুমারের কথায় রাজি হয়ে গেছেন ?"

"হ্যাঁ।...আরও হয়েছি এই জন্যে যে, ফুলকুমার একজন ম্যাজিশিয়ান ছিল। আমি নিজে ম্যাজিশিয়ান। ফুলকুমারের ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো আমার কর্তব্য। ঠিক কিনা, বলো ?"

তারাপদ আর চন্দন চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারাপদ বলল, "আপনার কাজ কি শুরু হয়ে গেছে ?"

"সবে শুরু করছি। এখন ভাবনা-চিন্তা যা খেলছে সব মাথার মধ্যে। সকালের দিকে একবার ওদিকের থানায় গিয়েছিলাম। রাজকুমার সঙ্গে ছিল। থানার বড়বাবু ছোটবাবুর সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। বড়বাবু আমার দেশের লোক হে ! গলাধাক্কা দেননি।" বলে কিকিরা হাসলেন। "পনেরো তারিখ থেকে কাজ শুরু করব। যাকে বলে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। তোমরাও আমার সঙ্গে লেগে পড়ো। পরশু থেকে। বুঝলে ?"

তারাপদ বলল, "আমরা তো আপনার সঙ্গে লেগেই আছি। বলুন কী করতে হবে ?"

"কাল বিকেলে আমার এখানে চলে আসবে। কাল রবিবার। কাল তোমাদের ওই জায়গাটায় নিয়ে যাব—যাকে বলে ঘটনাস্থল। বুঝলে ? পরশু থেকে কাজ।"

ঘটনাস্থল

কিকিরা যাকে ঘটনাস্থল বলেছিলেন, সেই জায়গাটাকে দেখলে মনে হয় এ যেন ঠিক কলকাতা শহর নয় ; পুরনো কোনো রেল কলোনি। কলকাতার ঘরবাড়ি, পাড়ার সঙ্গে এখানকার মিল কম, অমিলই বেশি। দু'চারটে সেকেলে বাড়ি, লোহার নকশা-করা রেলিং, খড়খড়ি-দেওয়া দরজা-জানলা, ইট বার-করা ঝুল-বারান্দা, এ-সব চোখে না পড়বে তা নয়, তবে বেশি করে যেটা চোখে পড়বে সেটা হল এক ছাঁদের, একই ধাঁচের সার-সার বাড়ি। মেটে লাল রং। একতলা। দোতলার সংখ্যা কম। বাড়িগুলো থেকে খানিকটা তফাতে বড় একটা মাঠ, মাঠের ওপারে বুঝি রেললাইন। উঁচু পাঁচিলের জন্যে লাইন চোখে পড়ছিল না।

তারাপদ আর চন্দন এলাকাটা ভাল করে দেখছিল। এদিকে তাদের আসা হয়ে ওঠেনি। রাস্তাঘাট সাধারণ, মাঝে-মাঝে ইট-বাঁধানো সেকেলে গলিঘুঁজিও

চোখে পড়ে। এক-আধটা ছোট কারখানা। দূরে বোধহয় রেলব্রিজ। খাল।

কিকিরা বললেন, "ওই বটগাছের পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা, ওদিকে...।"

চন্দন বলল, "জায়গাটা চুপচাপ বলে মনে হচ্ছে ?"

"কলকাতার তুলনায়। নয়ত চুপচাপ আর কোথায় ?"

তারাপদরও সেইরকম মনে হল। লোকজনের আসা-যাওয়া, ছেলেছোকরার হইচই, রেডিওর গান, কোনো কিছুই বাদ যায় না, তবে কলকাতা শহরের পাড়াগুলো যেমন গমগম করছে, সে-রকম গমগমে নয়। তার একটা কারণ বোধহয়, ঠিক এই জায়গাটা দিয়ে বাস-মিনিবাস যায় না, দোকান-পসার কম। ট্যাক্সি-রিকশার অবশ্য চলাচল রয়েছে।

তারাপদ বলল, "জায়গাটার নাম কী ? কী বলে ?"

কিকিরা জায়গাটার নাম বললেন। বলে চন্দনকে ইশারায় ঘড়ি দেখতে বললেন।

চন্দন তার হাতঘড়ি দেখল, "সাড়ে পাঁচ বেজে গিয়েছে।"

"এখনও ঘণ্টাখানেক আলো থাকবে, কী বলো ? আজকাল বেলা বেড়ে গেছে।"

চন্দন অত খেয়াল করে কথাটা শুনল না, মাথা নাড়ল।

বটতলার পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। পিচ-বাঁধানো। ট্যাক্সি টেম্পো অনায়াসেই চলে যেতে পারে। ডান দিকে এক শহিদ-স্তম্ভ। হাত-কয়েক তফাতে খানিকটা জায়গার মাটি কোপানো। কুস্তির আখড়া নাকি ? সাইকেল চড়ে দু'তিনটে ছেলে পাশ দিয়ে চলে গেল।

কিকিরা হাত তুলে সামনের দিকটা দেখালেন, "ওই বাড়িটা। সামনে গেট।"

তারাপদ আর চন্দন বাড়িটার দিকে তাকাল। ভাঙা পাঁচিলের ওপারে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ি না বলে শেড্ বলাই ভাল। ঢেউ-খেলানো ছাদ। সিনেমা-থিয়েটারের হল সাধারণত যেমন দেখতে হয় সেই রকম দেখাচ্ছিল। লোহার শিক্-দেওয়া ফটক। ফটকের গা ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়ার গাছ একটা।

কিকিরা বললেন, "আজ যেন ফাঁকা-ফাঁকা !"

চন্দন তাকাল। "ফাঁকা মানে ?"

"হল্ ফাঁকা। নো ফাংশান," কিকিরা হাসলেন, "নাচ-গান-থিয়েটার কিছু নেই।"

তারাপদ বলল, "এই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে কে ফাংশান করতে আসবে ?"

"যার দরকার সে আসবে," কিকিরা বললেন, "কলকাতা শহরে রোজ কত ফাংশান হয় জানো ? পাড়ার ক্লাব, অফিস-ক্লাব, স্কুলের প্রাইজ, কলেজের থিয়েটার এ তো বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন লেগে আছে। অত হল্ লোকে পাবে কোথায় ? দরকারে পড়লে এখানেও আসে।"

"আপনি জানেন ?"

"অল্পস্বল্প জানি বইকি ! তা ছাড়া খবর নিয়েছি। রাজকুমার বলেছে।" বলে কিকিরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আলোর অবস্থাটা দেখে নিলেন বোধহয়। তারাপদকে বললেন, "একটা কথা আগে থাকতে শিখিয়ে দিই। তোমরা এমন ভাব করবে যেন এই হল্‌টা ভাড়া নেবার কথা বলতে এসেছ। পাড়ার ক্লাব থেকে আসছ। আমি তোমাদের সেক্রেটারি।"

চন্দন হেসে ফেলে বলল, "কোন্ ক্লাব ? নাম কী ?"

"কোন্ ক্লাব ? ও একটা বলে দিও যা মুখে আসে। তবে পাড়ার কথা বললে কাছাকাছি একটা জায়গার নাম করবে। কাছাকাছি পাড়া থেকেই এখানে ভাড়া নিতে আসে বেশি। তাদের সুবিধে হয়। পাড়ার লোকেরও সুবিধে।"

তারাপদ চন্দনের দিকে তাকিয়ে রগড়ের গলায় বলল, "চাঁদু, কিকিরা একেবারে ছকে এসেছেন সব।"

কিকিরা বললেন, "তা ছকতে হবে না ! এসেছি গোয়েন্দাগিরি করতে, পা বাড়াবার আগে না ভাবলে চলে ?"

চন্দন বলল, "কিকিরা-স্যার, কাছাকাছি কোন্ পাড়া আছে আমি জানি না। তবে এদিক দিয়ে বোধহয় বেলেঘাটা যাওয়া যায়। তাই না ?"

"বেলেঘাটাই বোলো। মস্ত এলাকা। বুঝতে পারবে না।"

শিকঅলা লোহার ফটক খোলাই ছিল। অবশ্য ফটকটা পুরো বন্ধ হবার কোনো উপায় নেই। একদিকের পাল্লার তলার দিকটা হেলে পড়ে মাটির মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

ফটক পেরিয়ে ভেতরে পা দিতেই তারাপদ আর চন্দন খানিকটা অবাক হয়ে গেল। তাদের ডান দিকে ছোট-মতন একটা শেড্। ঢাকা-বারান্দার মতন দেখতে লাগে। সেখানে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। একটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে বাইরে। ছেলেগুলো গাঁট্টাগোট্টা। চেহারা আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, ওরা এতক্ষণ ব্যায়াম করছিল। এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। প্যারালাল বার, রিং, ওজন—আরও কত কী চোখে পড়ছে শেডের তলায়। দুটো বাতি জ্বলছিল।

তারাপদ বলল নিচু গলায়, "চাঁদু, ফিজিকাল্ কালচার নাকি রে ?"

চন্দন বলল, "তাই মনে হচ্ছে। ব্যায়াম সমিতি।"

কিকিরা বললেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। দাঁড়াও, আমি জেনে আসছি।"

কিকিরা যে কী জানতে গেলেন, চন্দনরা বুঝল না। তারা দেখল, উনি ছেলেগুলোর কাছে এগিয়ে গেলেন।

তারাপদ চারদিক দেখছিল। বাইরে থেকে একেবারেই বোঝা যায় না, ভেতরে এসে দাঁড়ালে অন্য রকম লাগে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা কম নয়। বাঁ দিকে কয়েকটা খুপরি ঘর, লোকজন থাকে। ঘরের সামনে দড়ির

খাটিয়া, গামছা শুকোচ্ছে। দেখে মনে হল, দরোয়ান জমাদার, এদের থাকার জায়গা ওগুলো। ফটকের পাশে দু'চারটে টিনের ছাউনি। চা-পান-বিড়ির দোকান বসে শো থাকলে। মাঝ-মধ্যিখানে হল্। সামনের দিকে কোনো দরজা নেই। হলে ঢোকার দরজা বোধহয় দু'পাশে, ডাইনে বাঁয়ে। সামনে শুধু কাঠের এক চৌখুপি। টিকিট বিক্রির ঘর।

চন্দন বলল, "তারা, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াচ্ছে বল্ তো ?"

"কোন্ ব্যাপার ?"

"এই গোয়েন্দাগিরির। আমার ভাই মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিকিরা যে কেন এই ঝামেলা ঘাড় পেতে নিলেন কে জানে ! পুলিশের কাজ পুলিশকেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।"

তারাপদ কিছু বলল না। কিকিরা আসছিলেন।

কাছে এসে কিকিরা বললেন, "সরখেলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"সরখেল ? সে কে ?"

"এই হলের চার্জে আছেন। কেয়ারটেকার। সরখেলবাবুর অফিস পিছন দিকে। স্টেজের দিকটায়। চলো, যাই।"

কিকিরা পা বাড়ালেন।

তারাপদ আর চন্দন এগোতে লাগল। চন্দন বলল, "আপনি ওদের কী বললেন ?"

"বললাম, আমরা এই হল্‌টা বুক্ করতে চাই। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, ভাই ! ওরা সরখেলবাবুর কথা বলল। আর কী বলল, জানো !"

"কী ?"

"বলল, হল্ ভাড়া দেওয়া এখন বন্ধ। এই হলে ক'দিন আগে একজন খুন হয়েছে। ওদের কথা শুনে আমি এমন ভাব করলাম যেন ফল্ ফ্রম স্কাই। তারপর বললাম, সে কী, আমরা যে তা হলে মারা পড়ে যাব। তখন ওরা সরখেলবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলল।" কিকিরা হাসলেন একটু, মুখ-টেপা হাসি।

চন্দন বলল, "এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কিকিরা। আজ রবিবার ; তবু হল্ ফাঁকা। তার মানে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না।...আপনি আর তা হলে কষ্ট করে যাচ্ছেন কেন সরখেলবাবুর কাছে ?"

"আমি কি ভাড়া নিতে যাচ্ছি ?"

"বাঃ ! ভাড়ার কথাই বলতে যাচ্ছেন। আপনি তো সেই রকম 'শো' দেবেন ?" চন্দন মজা করে বলল।

"তা দেব ; দিতে হবে। আসলে, সরখেল কী বলে শুনব, তাকে বাগিয়ে একবার স্টেজ আর হল্‌টা দেখব।"

"সরখেল যদি আপনাকে হল্ দেখাতে না চায় ?"

"চাইবে না, কেন চাইবে--" কিকিরা মুচকি হাসলেন, তারপর চোখ ছোট করে বললেন, "সরখেল চাইবে না, কিন্তু ওকে দিয়ে কাজটা হাসিল করিয়ে নিতে হবে। সেটাই তো কেরামতি।"

হলের পাশ দিয়ে রাস্তা। দরজাগুলো বন্ধ রয়েছে হলের। একটা মাত্র বাতি জ্বলছে এপাশে। দু'চারটে সাধারণ গাছপালা কম্পাউন্ডওয়ালের দিকে। সাইকেল রাখা কাঠের ভাঙা খাঁচা।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, হল্‌টার পিছন দিকে বোধহয় ঝোপঝাড় আছে।"

"গাছ দেখে বলছ ?"

মস্ত একটা নিমগাছের মাথা দেখা যাচ্ছিল পিছন দিকে। অন্ধকার মতন দেখাচ্ছে ওপাশটায়। আলো মরে এসেছে। ছায়া নেমে গিয়েছে গাঢ় হয়ে। তারাপদ বলল, "গন্ধ পাচ্ছেন না ? ঝোপজঙ্গলের গন্ধ ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন।

দশ-পনেরো হাতের একটা ঘর। বাতি জ্বলছিল। সমস্ত ঘরটা অগোছালো, নোংরা। কয়েকটা পুরনো র‍্যাক, গোটা-দুই ভাঙা আলমারি আর গোটা কয়েক লোহার চেয়ার ছাড়া অন্য কিছু নেই।

সরখেল টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। বিড়ির গন্ধে ঘর ভরা।

কিকিরা দরজার বাইরে থেকে কাশলেন।

"কে ?" সরখেল দরজার দিকে তাকালেন।

"আমরা একবার আসব, স্যার ?"

"কী দরকার ?"

"জরুরি দরকারেই এসেছি, স্যার। আপনি তো সরখেলবাবু ?"

"আসুন।"

ভেতরে এলেন কিকিরা। চন্দন আর তারাপদ পিছনে।

"নমস্কার স্যার," কিকিরা বিনয় করে নমস্কার সারলেন। "আপনার নাম শুনেই এলাম।"

সরখেল বোধহয় কোনো হিসেবপত্র দেখছিলেন। খাতাটা সেই রকম। মানুষটিকে দেখলে মায়া হয়। গায়ে যেন মাংস নেই, শুধু হাড় ; মাথার চুল কাঁচা-পাকা, তোবড়ানো গাল, চোখের চশমাটা ডাঁটি-ভাঙা। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি।

কিকিরা বললেন, "আমরা একটু বসি ?" বলে চেয়ার সরিয়ে বসে পড়লেন। ইশারায় বসতে বললেন তারাপদদের।

"কী দরকার আপনাদের ?" সরখেল জিজ্ঞেস করলেন।

"আমাদের একটা বুকিং দিতে হবে, স্যার," কিকিরা বললেন।

"বুকিং ? কিসের বুকিং ?"

"এই হল্‌টা আমাদের একদিন চাই।"

"হল্ ভাড়া !" সরখেল চশমাটা কপালের ওপর তুলে নিলেন। "হল্ এখন ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না।"

"ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না ! কেন ? এই তো সেদিন হরিপদ চাটুজ্যেরা ভাড়া নিয়ে ওদের থিয়েটার করল। আমি কার্ড দেখেছি ওদের।"

"আগে কী হয়েছে সেকথা বাদ দিন," সরখেল বললেন, "হল্ আমরা ভাড়া দিই। ভাড়া দেবার জন্যেই হল্। ভাড়ার টাকায় খরচ-খরচা চলে। কিন্তু মশাই, হল্ এখন বন্ধ। ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না।"

"সে কী ! কেন ?" কিকিরা ইশারায় চন্দনের কাছে সিগারেটের প্যাকেটটা চাইলেন। চন্দন প্যাকেট দিল।

সরখেল বললেন, "থানা থেকে বারণ করে দিয়েছে।"

"থানা ?" কিকিরা যেন কতই না অবাক হয়েছেন, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ততক্ষণে সিগারেটের প্যাকেট তাঁর হাতে। প্যাকেটের মধ্যে কী যেন গুঁজলেন। সরখেলের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। রেখেই দিলেন সামনে। "থানা কেন বারণ করবে ? মারদাঙ্গা হয়েছিল, স্যার ?"

"না। খুন।"

"খুন ?" চোখের পাতা পড়ছিল না কিকিরার, হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন, "এই হলে খুন ! বলেন কী ?"

সরখেল সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন, "কী বলব, মশাই ! এমন ঘটনা এই হলে কোনোদিন ঘটেনি। আজ বিশ বছর আমি এখানকার কেয়ারটেকার। খুনখারাপি হয়নি কখনও। লোকে হল্ ভাড়া নেয় ; নাচে, গায়, থিয়েটার করে ; টাকা মিটিয়ে যে-যার বাড়ি চলে যায়।"

সিগারেটের প্যাকেট খুলতেই সরখেল কী যেন দেখলেন। দেখে অবাক হলেন। একবার কিকিরার দিকে তাকালেন। তারপর প্যাকেট থেকে আলগোছে সিগারেট বার করলেন। "কোত্থেকে আসছেন আপনারা ?"

"বেলেঘাটা। আমাদের এই ছেলেদের ক্লাবের সিলভার জুবিলির একটা ফাংশান আছে," বলে তারাপদ আর চন্দনকে দেখালেন। "হল্ না হলে বিপদে পড়ে যাব, দাদা !"

সরখেল বললেন, "কোন্ ক্লাব ?"

চন্দন বলল, "নব যুবক সংঘ," নামটা তার চট্ করে মুখে এসে গিয়েছিল।

কিকিরা বললেন, "বুঝতেই তো পারছেন। পাড়ার লোকের সুবিধে দেখে আমাদের ব্যবস্থা করতে হয়। এই হল্‌টা কাছে। আসা-যাওয়ার সুবিধে।"

সরখেল সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "হল্ এখন আমার হাতে নেই। খুন হবার পরের দিন থেকেই থানার হুকুমে সব বন্ধ রাখতে হয়েছে। এমনকী, যাদের বুকিং করা ছিল, তাদের ডেট্ ক্যানসেল করে দিতে হল। কী যে ঝামেলা, মশাই। লোকে এসে গালাগাল দিচ্ছে। আমি থানা দেখিয়ে

দিচ্ছি। কী করব!"
"সত্যি সত্যি খুন হয়েছে ?" কিকিরা বললেন।
"মানে ! আপনি বলছেন কী ! আমি কি ফক্কুড়ি করছি ?"
"না না, তা করবেন কেন ! কবে হয়েছে খুন ?"
"ওই তো, সাত তারিখে।"
"হলের মধ্যে ?"
"স্টেজে। একেবারে স্টেজের ওপর। তখন কে একজন ম্যাজিক দেখাচ্ছিল।"
"ম্যাজিক ! আপনি দেখেছেন খুন হতে ?"
"না," মাথা নাড়লেন সরখেল, "আমি কি মশাই সারা রাত এখানে বসে পাহারা দেব ? সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ আমি বাড়ি চলে যাই।" বলে সরখেল যেন বিরক্ত হয়েই সামনের খাতাটা বন্ধ করে ফেললেন।
"তা তো ঠিকই। আপনি এই ঘরে কতক্ষণ আর বসে থাকবেন !"
"থাকি না। পার্টির কাছ থেকে বকেয়া টাকা নিয়ে রসিদ দিয়ে এক-আধ ঘণ্টা থাকি, তারপর বাড়ি। দরকার পড়লে আমায় বাড়ি থেকে ডেকে নেয়। বাড়ি কাছেই।"
কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন, "তোমরা খুব মুশকিলে পড়ে গেলে। সরখেলবাবু যা বলছেন, তাতে আর আশা দেখছি না," কিকিরা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। রুমালটা তুললেন না। টেবিলের ওপর ফেলে রাখলেন। সরখেলকে দেখলেন কিকিরা, হাসলেন, "বড় নিরাশ হলাম স্যার। বিপদেও পড়ে গেলাম।"
সরখেল কী মনে করে বললেন, "আপনাদের ফাংশান কবে ?"
"তা...তা দেরি আছে ক'দিন। এ-মাসের শেষাশেষি...। হল্ যবে পাব।"
"এ-মাসের শেষাশেষি ! তাই বলুন। তা হলে হয়ে যেতে পারে।"
"পারে ?"
"পারে। থানা বোধহয় দু'চার দিনের মধ্যেই হুকুম উঠিয়ে নেবে। সে-রকম শুনেছি। আমাদের বড় লোকসান হচ্ছে, বুঝলেন না !"
কিকিরা এমন করে নিশ্বাস ফেললেন, যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন এতক্ষণে। বললেন, "তা হলে স্যার, আমাদের একটা দিন দিয়ে দেন যদি...।"
"এখনই ! না না, এখন কিছুই হবে না। পরে আসুন। থানা থেকে ছাড় আসুক।"
"বেশ। তবে তাই," রুমালটা আরও একটু সরিয়ে দিলেন কিকিরা সরখেলের দিকে, "আমরা দিন চার-পাঁচ পরেই আসব।"
"আসুন।"
"একটা অনুরোধ," কিকিরা রুমালের ওপর চোখ রেখে হাসলেন, "হল্টা যদি

একবার দেখতে দেন। মানে আমাদের ছেলেরা একটা ঐতিহাসিক নাটক করবে। স্টেজটা দেখে গেলে ভাল হত। নিজেরাই সেট্‌টেট্‌ তৈরি করছে। বেশ্র করেছে। কোথায় কেমন মানাবে দেখে নিলে ভাল হত। তা ছাড়া হলটাও দেখে নেওয়া দরকার। পাঁচ-ছ'শো লোক হবে আমাদের। পাড়ার লোকই বেশি।...আপনাদের হলে কত লোক ধরে?"

"শ'পাঁচেক। চারশো বাহাত্তর।"

"একটু কম হয়ে গেল," কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন, "টেনেটুনে ম্যানেজ করতে হবে, কী বলো!...যাকগে, তোমার স্টেজের ব্যাপার—একবার দেখে নাও," কিকিরা এমনভাবে বললেন, যেন সরখেল স্টেজ দেখাতে রাজি হয়ে গেছেন।

সরখেল চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না।

কিকিরা ইশারা করলেন তারাপদদের। ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

চন্দন আর তারাপদ একে-একে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সরখেল প্রথমটায় কোনো কথাই বললেন না। পরে বললেন, "আপনাদের আমি স্টেজ দেখাতে পারি না।"

"কেন! একটিবার শুধু দেখব।"

"আপনাকে আমি বলছি কী? পুলিশ থেকে বারণ!"

"ভাড়া দেওয়া বারণ বলেছেন। ভাড়ার কথা পরে এসে ঠিক করে যাব। এখন শুধু একটি বার স্টেজ আর হল্‌টা..."

"না। হবে না। আপনি মশাই বেআইনি কাজ করিয়ে নিতে চাইছেন। থানা থেকে লিখিয়ে আনুন, আপনাদের হল্‌ দেখিয়ে দেব।"

কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "আমি স্যার থানা-পুলিশ জানি না। আপনাকে জানি। আপনি যদি দেখাতে না চান দেখাবেন না। কিন্তু, আমি বলছিলাম, আপনি যদি দেখাতেন ক্ষতিটা কী হত! আমরা একবার চোখের দেখা দেখে চলে যেতাম। কোনো জিনিসে হাত ছোঁয়াতাম না।...তা আপনার যখন অসুবিধে, তখন না হয় না-দেখালেন। পরে এসে দেখে যাব।"

কিকিরা নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লেন।

সরখেলের বোধহয় খেয়াল হল। "আপনার রুমাল?"

"ও!"

কিকিরা রুমালটা তুলে নিলেন হাত বাড়িয়ে। রুমালের তলায় এমন কিছু ছিল, যা দেখার পর সরখেল খানিকটা ইতস্তত করলেন। হঠাৎ তাঁর মত পালটে গেল। বললেন, "আপনি আমাকে দিয়ে বেআইনি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন মশাই। কী আছে, চলুন। তাড়াতাড়ি সেরে নিন।"

সরখেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে চাবির গোছা বার করে উঠে দাঁড়ালেন।

রাজকুমার

তারাপদ এসে দেখল, কিকিরা চোখ বুজে গান শুনছেন। এমনভাবে শুয়ে আছেন তাঁর গদিঅলা আর্ম চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে, মাথার তলায় কুশন গুঁজে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দু'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল তারাপদ। পুরনো আমলের গ্রামোফোন, রেকর্ডও পুরনো ; গান দূরের কথা, গলাই শোনা যায় না ; ঘ্যাসঘেসে একটা শব্দ, না-কথা, না-সুর। এই গান শুনে মানুষ আবার ঘুমিয়ে পড়ে নাকি ? কিকিরার সবই অদ্ভুত। যেমন মানুষ, তেমন তাঁর পছন্দ। এই ঘরটা দেখলেই বোঝা যায়, ছোটখাটো একটি মিউজিয়াম আগলে কিকিরা দিব্যি তাঁর দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছেন।

তারাপদ ডাকতে যাচ্ছিল কিকিরাকে, তার আগেই কিকিরা বললেন, "সোজা আসছ ?"

"আপনি জেগে আছেন ? আমি ভেবেছিলুম, গান শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন !"

কিকিরা চোখ খুললেন, নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, "এ গান তোমার খগেন দস্তিদারের। রেকর্ডটা হবে ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সালের। আমার পুরনো রেকর্ডের স্টকের মধ্যে পেয়ে গেলাম।"

"ওটা গান, না, গদাযুদ্ধ ?"

হেসে ফেললেন কিকিরা। "সেকালের গানটান তোমাদের পছন্দ নয়। বন্ধ করে দাও। শেষ হয়ে এসেছে।"

গান শেষ হল। তারাপদ রেকর্ডটা তুলে রেখে দিল একপাশে। গ্রামোফোনের ঢাকনা বন্ধ করল।

"তুমি মেসে যাওনি ?"

"না। চন্দনের আসতে আসতে সাতটা বেজে যাবে। ওর হাসপাতাল থেকে ছুটিই হবে ছ'টার সময়।"

"তাই বলছিল, নতুন ডিউটি শুরু হয়েছে ?"

"কিকিরা-স্যার," তারাপদ বলল, "কাল রাত্তিরে আমার একটা কথা মাথায় এল।" কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল সে। ঘরে পাখা চলছে। জানলা খোলা। বিকেল মরে গিয়েছে অনেকক্ষণ, আলো ঝাপসা। ঘরের মধ্যে এখনো তেমনভাবে ছায়া নামেনি। সব কিছুই চোখে দেখা যায়।

কিকিরা বললেন, "কী কথা ?"

"ফুলকুমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তার দাদা রাজকুমার আপনাকে যা বলছে, আপনি সেটাই মেনে নিচ্ছেন।"

"মেনে নিচ্ছি মানে শুনছি। না শুনে উপায় কী ! রাজকুমার যদি আমার কাছে এসে তার ভাইয়ের কথা না বলত, কিছুই জানতে পারতাম না।"

"রাজকুমারকে আপনি বিশ্বাস করেন ?"

"এ-কথা কেন বলছ ?"

"না, ধরুন, এর মধ্যে যদি রাজকুমারের কোনো হাত থাকে ?"

"আমার মনে হয় না," কিকিরা বললেন, "রাজকুমারের হাত থাকলে সে আমার কাছে আসত না। আর সে না এলে আমি ফুলকুমারের কথা কিছুই জানতে পারতাম না।"

তারাপদ সামান্য চুপ করে থাকল। "রাজকুমারকে আপনি অনেকদিন চেনেন ?"

"তা চিনি। দশ-বারো বছর আগে ওর সঙ্গে আমার দেখাশোনা খুবই হত। আমি তখন বিডন্ স্কোয়ারের দিকে থাকতাম। রাজকুমার আমাদের পাড়ায় একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে কারখানা খুলেছিল।"

"কিসের কারখানা ?"

"বাজনা তৈরির। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট-এর। মানে বাদ্যযন্ত্র তৈরির। সেখানে হারমোনিয়াম, বাঁশি, ফ্লুট, তবলা, তারপর কী বলে তোমার তারের যন্ত্র—সেতার, এস্রাজ তৈরি হত।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "ভদ্রলোকের কি বাজনা-তৈরির কারবার ?"

"আগে তাই ছিল। একরকম পৈতৃক ব্যবসাই ছিল। চিতপুরে দোকান ছিল ওদের। এখন আর নেই।"

"এখন কিসের ব্যবসা ?"

"কাপড়ের। বড়বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করে।"

"বাদ্যযন্ত্র থেকে বস্ত্র-ব্যবসায়ী ?" তারাপদ হাসল।

কিকিরাও মুচকি হাসলেন। বললেন, "রাজকুমার আজ আসবে। সময়ও হয়ে এসেছে। তাকে দেখলে তুমি খানিকটা আঁচ করতে পারবে।"

তারাপদ আর কিছু বলল না। আসুক রাজকুমার, দেখা যাবে ভদ্রলোককে।

কিকিরাও সামান্য সময় চুপচাপ। মাথার চুল ঘাঁটছিলেন অলসভাবে। শেষে উঠে দাঁড়ালেন। "আমি একটা পিক্চার এঁকেছি ! দেখবে ?"

কিকিরার গলার স্বরে মজা। চোখ দুটিও হাসি-হাসি।

তারাপদ বলল, "ছবি ? আপনার ওটাও জানা আছে ?" বলে জোরে হেসে উঠল।

কিকিরা এগিয়ে গিয়ে র‍্যাকের মাথা থেকে একটা চওড়া মাপের বই তুলে নিলেন। তার মধ্যে থেকে মোটা ড্রয়িং-পেপারের মতন এক কাগজ বার করলেন। নিজে দেখলেন একবার। কাগজটা এনে তারাপদকে দিলেন।

কাগজটা হাতে নিয়ে তারাপদ অবাক। এ আবার কেমন ছবি ? দেখতে দেখতে তারাপদ বলল, "কিকিরা-স্যার, এটা কিসের ছবি ?"

"কী মনে হচ্ছে তোমার ?"

"স্টেজের মতন লাগছে।"

"ওটা স্টেজ। ঠিকই ধরেছ। যে-স্টেজ আমরা গত পরশু দেখে এলাম।"

"আচ্ছা! এ ছবির মধ্যে এখানে-ওখানে নানা চিহ্ন কেন?"

"ওগুলো সংকেত-চিহ্ন বলতে পারো। খানিকটা আবার নকশা।"

"ছবিটা থেকে আপনি কিছু ধরবার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে।"

"না, একটা আন্দাজ করছিলাম," কিকিরা বললেন, "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় স্টেজটা ঠিকঠাক আছে? কিছু বাদ যায়নি তো?"

তারাপদ খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করল। সরখেল যেভাবে স্টেজ দেখিয়েছেন ওভাবে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। দুটো টিমটিমে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বড়জোর মিনিট দশেক দেখিয়েছিলেন স্টেজের ভেতর আর বাইরেটা। তারাপদ মন দিয়ে লক্ষ করতেও পারেনি সব।

তারাপদ বলল, "স্টেজের সামনের দিক আর পিছনের দিক ঠিকই আছে মনে হচ্ছে। একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি না। কাঠের একটা সিঁড়ি দেখেছিলাম স্টেজের বাঁ...না, বাঁ নয়, ডান ধারে। সেই সিঁড়িটা কই?"

কিকিরা কী ভেবে হাসলেন। "নেই? তা হলে বোধহয় ভুলে গিয়েছি আঁকতে। বাকি সব ঠিক আছে?"

"মনে হচ্ছে আছে," তারাপদ নকশা দেখতে দেখতে বলল।

সাজঘরের জায়গায় দুটো ক্রস দেওয়া আছে, দেখছ। একটা ঘর ছেলেদের, অন্যটা মেয়েদের। তার পাশ দিয়ে একটা প্যাসেজ গেছে। লক্ষ করেছ?"

"ডট্-ডট্ দিয়ে রেখেছেন যেটা?"

"হ্যাঁ। ওই প্যাসেজটা সোজা ব্যাক স্টেজের বাইরে গিয়ে পড়েছে। যেখানে পড়েছে সেখানে একটা গুদোম মতন। কাঠকুটো, ছেঁড়াখোঁড়া সিন্‌সিনারি, লোহালক্কড় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে ওখানটায়। তার পাশেই একটা কল। খানিকটা ঝোপ মতন।"

তারাপদ নকশা দেখছিল। নকশায় কয়েকটা গোল চৌকো দাগ দেওয়া রয়েছে। কিকিরার নজরকে তারিফ করতে হয়। কত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ-সব নজর করেছেন! তারাপদ বলল, "এই নকশা থেকে আপনি কী প্রমাণ করতে চাইছেন?"

"প্রমাণ করতে চাইছি না কিছু। এখন অন্তত নয়। তবে ভাবছি।"

"কী ভাবছেন?"

"ভাবছি, এই রাস্তাটা দিয়ে একটা লোকের আসা, চলে যাওয়া, চুরি করে কিছু নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ। সহজ, কেননা একবার ওই বাতিল জিনিসপত্রের জঞ্জাল আর ঝোপঝাড়ের কাছে পৌঁছতে পারলে তার বাইরে বেরোতে কষ্ট হবে না। ওখানটার পাঁচিল ভাঙা। কম্পাউন্ড-ওয়ালের ওপারেই সরু রাস্তা। রাস্তাটা ঘুরে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে।"

তারাপদ কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, এই রাস্তা ধরে কেউ এসেছিল, ফুলকুমারকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছে ?"

"হতে পারে। আসতেও পারে, আবার শুধু পালাতেও পারে। ভুতুড়ে হারমোনিয়ামটাও এই রাস্তা দিয়ে পাচার হয়ে যেতে পারে। তুমি কী বলো ?"

তারাপদ কিছু বলার আগেই বগলা তাকে ডাকল।

নকশা রেখে দিয়ে তারাপদ বলল, "আমি আসছি। চোখে-মুখে জল দিয়ে আসি। বগলাদা খাবার তৈরি করেছে। বড় খিদে পেয়ে গিয়েছে আমার," বলে উঠে পড়ল। কিকিরার ঘরবাড়িকে ওরা আর অন্যের বলে মনে করে না।

কিকিরা নকশাটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন।

ঘরে আলো জ্বালাবার মুখেই রাজকুমার এসে হাজির।

কিকিরা আর তারাপদ কথা বলছে, রাজকুমার এলেন। তারাপদকে দেখে রাজকুমার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হল, খুশি হলেন না।

কিকিরা হেসে বললেন, "ঘাবড়াবেন না ; এরা আমার চেলা। আমি এদের 'সোলজার' বলি। এর নাম তারাপদ। আর একজন এখনো এসে পৌঁছয়নি। তার নাম চন্দন। সে ডাক্তার।"

তারাপদ নমস্কার করল।

রাজকুমারও নমস্কার করে ঘরের অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোককে দেখছিল তারাপদ। লম্বা-চওড়া চেহারা। শক্ত গড়ন। গায়ের রঙ ফরসাই ছিল, বয়েসে খানিকটা যেন তামাটে হয়ে গিয়েছেন। মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় ঠিক বাঙালি নন। তবে সাজে-পোশাকে একেবারে বাঙালি। পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি। মাথার চুল সিঁথি করে আঁচড়ানো। চোখে চশমা। কপালের একপাশে কাটা দাগ। চোখ দুটিতে দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের ছাপ রয়েছে। জামা-কাপড়গুলোও ধোপদুরস্ত নয়। সবই কেমন বিষণ্ণ লাগে।

রাজকুমারের হাতে একটা বড় মতন খাম ছিল। উনি বসলেন একপাশে।

কিকিরা বললেন, "আমরা পরশুদিন জায়গাটা দেখে এসেছি, কুমারবাবু।"

রাজকুমার খুশি হলেন। "আপনি যাবেন বলেছিলেন।"

তারাপদ লক্ষ করল, রাজকুমারের বাংলা উচ্চারণে দোষ প্রায় নেই। বোঝাই যায় না উনি বাঙালি নন। কলকাতায় থাকতে থাকতে জিভ রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কিকিরা বললেন, "হল্‌টার যিনি কেয়ারটেকার, সরখেলবাবু, তাঁকে বাগ মানাতে তেমন অসুবিধে হয়নি। তবে হল্‌ এখন বন্ধ।"

"জায়গাটা কেমন দেখলেন ?" রাজকুমার বললেন।

"খুনখারাপি করে গা-ঢাকা দেবার মতন জায়গা। ফাঁকা, চুপচাপ ; একদিকে রেললাইনের সাইডিং, অন্যদিকে খাঁখাঁ," কিকিরা হাসলেন।

রাজকুমার বললেন, "আপনার কথামতন আমি জিনিসগুলো এনেছি।" বলে খামটা দেখালেন।

কিকিরা হাত বাড়ালেন। "ফুলকুমার কবে থেকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে রাজকুমারবাবু ?"

"পাঁচ-ছ' সাল। আপনাকে সেদিন বলেছি, রায়বাবু।"

তারাপদ বুঝতে পারল কিকিরাকে রাজকুমার রায়বাবু বলেন। দু'একটা চলতি হিন্দি শব্দ বেরিয়ে আসে।

"বলেছেন। সব কথা খেয়াল রাখতে পারি না," হাসির মুখ করলেন কিকিরা, "তা ছাড়া বারবার শুনলে ফাঁকগুলো ধরা পড়ে।" কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। "কাগজ কলম নেবে নাকি ? দু'চারটে নোট্ থাকা ভাল। পাঁচরকম ভাবতে ভাবতে এটা ওটা মিস্ করে যায়।"

তারাপদ উঠল। সামনের টেবিলেই সাত-সতেরো জিনিস পড়ে আছে ; কাগজ, কলম, ডায়েরি, পাঁজি, সেলোটেপ, কাঁচি, হজমি-বড়ির শিশি, কিছুই বাদ যায়নি।

কাগজ আর ডট্‌পেন নিয়ে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল তারাপদ।

কিকিরা রাজকুমারকে বললেন, "আমি কী জিজ্ঞেস করছি তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। যা জানেন, যতটা জানেন বলবেন। না জানলে বলবেন না।...আপনি বলছেন, ফুলকুমার ম্যাজিক দেখাচ্ছে মাত্র পাঁচ-ছ' বছর ?"

রাজকুমার ঘাড় নাড়লেন।

"তারাপদ, তুমি শর্টে নোট্ করে নিয়ো। জাস্ট পয়েন্টগুলো।...কুমারবাবু, আপনার ভাই, ফুলকুমার অন্য কী কাজ করত ? শুধুই ম্যাজিক দেখাত, তা তো হতে পারে না।"

রাজকুমার বললেন, "আমার ভাইয়ের মাথা খারাপ ছিল রায়বাবু! ওকে আমরা কমার্স পড়াতে পারলাম না, ওকাইলতি পড়াব ভেবেছিলাম, ও কিছু পড়ল না। কালেজে যেত, ঘুরত-ফিরত, ইয়ার-দোস্ত নিয়ে মজা করত, সিনেমা দেখত। কালেজ ছেড়ে দিল। ভাইকে বললাম, কারবারে এসে বসতে। দু'চার মাস মরজি মতন এল। আর এল না। কলকাত্তা ছেড়ে চলে গেল বেনারস। আমার বোন থাকে। বোনের কাছে, ফ্যামিলিতে দেড় সাল ছিল, কলকাত্তা ফিরে এল। সেই থেকে ওর নেশা চাপল—ম্যাজিশিয়ান হবে।"

"বয়স কত ছিল ফুলকুমারের ?"

"আঠাইশ।"

"দেখতে কেমন ছিল ? ফোটো এনেছেন ?"

"খামের মধ্যে আছে।"

কিকিরা খাম থেকে ছবি বার করলেন। ফোটো। দেখলেন, "আপনার ভাই দেখতে সুন্দর ছিল কুমারবাবু!" বলে গোটাচারেক ফোটো তারাপদর দিকে এগিয়ে দিলেন।

তারাপদ ফোটো নিল। দেখল। ফুলকুমারের সাধারণ একটা ফোটো ছাড়া, অন্যগুলো জাদুকরের পোশাক-আশাক পরা ছবি। ফুলকুমার দেখতে সুন্দর ছিল যে, বোঝাই যায়।

"আপনি বলছেন ফুলকুমার শুধু ম্যাজিকই দেখাত?" কিকিরা বললেন।

"না, রায়বাবু। দো সাল হল ও একটা দোকান খুলেছিল, 'টয় শপ্'। নিউ মার্কেটে ওর স্টল ছিল। বালবাচ্চার খেলাওনা বিক্রি করত। ম্যাজিক ওর নেশা ছিল।"

"খেলনার দোকানটির মালিক কে? ফুলকুমার একলা?"

"ওর একলারই দোকান ছিল। আমরাও নামে মালিক ছিলাম।"

"মানে, আপনি আর আপনার মেজো ভাই, মোহনভাই?"

"জি।...আপনি মোহনকে দেখেছেন রায়বাবু, ও বেচারির..."

"জানি।" কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন, "কুমারবাবুর মেজো ভাইকে আমি চিনি। ট্রাম অ্যাকসিডেন্টে একটা হাত নষ্ট হয়ে গেছে। খুব ভাল লোক। মোহন চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাত। তবলা। না, কুমারবাবু?"

রাজকুমার ঘাড় নাড়লেন। "আপনি জানেন রায়বাবু, আগে আমাদের যখন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টসের দোকান ছিল, তখন কারখানাটা মোহন দেখত। ওর হাত চলে যাবার পর কারখানা তুলে দিলাম।"

কিকিরা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, বগলা এল। রাজকুমারের জন্যে চা এনেছে।

বগলা চলে গেলে কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারের খেলনার দোকান এখন বন্ধ?"

"জি।"

"আচ্ছা কুমারবাবু, বেনারস থেকে ফিরে আসার পরই কি আপনার ভাইয়ের মাথায় ম্যাজিকের নেশা বা শখ যাই বলুন, সেটা চেপে ধরে?"

"আমার তাই মালুম।"

"বেনারসে ও কার কাছে খেলা শিখত, আপনি জানেন?"

"না।"

কিকিরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। শেষে বললেন, "আপনারা ফুলকুমারের খেলা দেখেছেন?"

রাজকুমার কেমন বিষণ্ণ মুখে হাসলেন। "দো-একবার দেখেছি। বাতচিত ভাল বলত। খেলা খারাপ ছিল না, রায়বাবু। থোড়া থোড়া কাঁচা ছিল। ইমপ্রুভ করছিল। চার-পাঁচ সালে কে আর পাকা ম্যাজিশিয়ান হয়?"

কিকিরা মশলার কৌটোটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। "সেদিন আপনি বা আপনার বাড়ির কেউ খেলা দেখতে যাননি বলছিলেন ?"

"না।"

"ফুলকুমারের হারমোনিয়ামের খেলা আপনারা দেখেননি ?"

"না। খেলাটা নতুন ছিল। ওই দিন ও সেকেন্ড টাইম খেলাটা দেখাচ্ছিল।"

"খেলাটা কে দেখেছে ?"

"বাড়ির কেউ দেখেনি।...আমাদের দোকানের লালাজি দেখেছে। পয়লা বার যখন খেলা দেখায় ফুলকুমার, তখন দেখেছে।"

"আপনি জানেন খেলাটা কেমন ভাবে দেখানো হত ?"

রাজকুমার মাথা নাড়লেন। "আমি ঠিক জানি না, রায়বাবু। লালাজি দেখেছে, ও জানে।...আমি শুনেছি, স্টেজের ওপর, মাঝখানে টেবিলে হারমোনিয়াম থাকে। হারমোনিয়াম থেকে দো-তিন হাত দূরে ফুলকুমার। ফুলকুমারের হাতে হ্যান্ড্ কাফ্ থাকে, চোখ বাঁধা থাকে পট্টিতে।"

তারাপদ অবাক হয়ে রাজকুমারের কথা শুনছিল।

কিকিরা এর আগেও রাজকুমারের কাছ থেকে কথাটা শুনে নিয়েছেন। আবার শুনলেন। রাজকুমার ঠিক-ঠিক বলছেন, না, ভুলচুক করছেন, বা কিকিরাই কোনো কথা ভুলে গিয়েছেন কি না, পরখ করে নিচ্ছিলেন।

"স্টেজ অন্ধকার থাকে তখন ?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"জি, তাই থাকে। স্টেজ বিলকুল ডার্ক। অডিটোরিয়াম ডার্ক।"

"কুমারবাবু, আমি যদি আপনার দোকানে যাই লালাজিকে পাব ?"

"কেন পাবেন না ?"

"আমি লালাজির সঙ্গে একটু কথা বলব !" বলে কিকিরা খাম থেকে বাকি ছবিগুলো বার করে দেখতে লাগলেন। বেশির ভাগ ছবিই হল ম্যাজিক শো-এর। ফুলকুমারের নানান সাজ, কোনোটায় রাজপুত্র গোছের পোশাক, কোনোটায় আরব দেশের সাজপোশাক। জাপানি পোশাকও দেখা গেল। কোনো-কোনো ফোটো গ্রুপ ফোটো ; ফুলকুমারের সঙ্গে তার দলের ছেলেমেয়েরা রয়েছে।

কিকিরা ছবিগুলো দেখতে দেখতে বললেন, "দুটো ছবি দেখছি, ফুলকুমারের দলের ছবি নয়, তার সঙ্গীর ছবি। আপনি এদের চেনেন ?"

"একজনকে চিনি। অন্য ছোকরাকে চিনি না।"

"যাকে চেনেন তার নাম কী ? কোথায় থাকে ?"

"লম্বা মুখের ছেলেটা, নাক থোড়া বেঁকা, ওর নাম হল কমল। কমল ফুলকুমারের পুরানা দোস্ত। স্কুল ফ্রেন্ড্। ও এন্টালি বাজারের কাছে থাকে। ভাল ছেলে, রায়বাবু। কমল হোটেলে কাজ করে। ক্লার্ক।"

"আর অন্যটা ?"

"আমি চিনি না। নাম জানি না। কমল জানতে পারে।"

"এটাকে তো বডি বিল্ডারের মতন দেখতে।...যাক গে, আপনি একটা কথা খোলাখুলি বলুন তো কুমারবাবু ?" কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারকে খুন করার কী কারণ থাকতে পারে ?"

রাজকুমার কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হল, তাঁর বলার কিছু নেই। মুখে ঘাম জমছিল তাঁর। বললেন, "আমি জানি না, রায়বাবু। ফুলকুমারের কোনো বদ দোষ ছিল না। তার কোনো দুশমন ছিল বলেও জানি না।...ও আমাদের ছোট ভাই। আমরা সেই শয়তানকে চাই, ভাইকে যে মেরেছে।" রাজকুমারের গলা বুজে এল।

কিকিরা কিছু বললেন না।

খোঁজ-খবর : কমল আর মোতিয়া

দু' তিন দিন চন্দনের কোনো খবর নেই। তারাপদ বুঝতে পারছিল না, কী হয়েছে চন্দনের ? বাড়ি গিয়েছে নাকি ? কোনোরকম খবর না দিয়ে চন্দন অবশ্য কলকাতা ছেড়ে পালায় না। আগে মাঝে-মাঝে ডুব দিত। এখন হাসপাতালের চাকরি, ডুব দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে কখনো-কখনো চন্দনের মাথা গরম হয়ে গেলে ও গা ঢাকা দেয়। সে-অভ্যেস তার আছে।

বন্ধুর খোঁজ নিতে তারাপদ গেল চন্দনের মেডিক্যাল মেসে। গিয়ে দেখল, চোখে রঙিন গগলস্ এঁটে চন্দন বসে-বসে তাস খেলছে, পেসেন্স। আর রেডিও খুলে গান শুনছে।

সময়টা বিকেল। খানিকটা আগে ঝোড়ো হাওয়া উঠেছিল। এখনও যেন রাস্তাঘাটের ধুলোটে ভাব কাটেনি।

তারাপদ এসে বলল, "কী রে, তুই চোখে ঠুলি পরে বসে আছিস ? কী হয়েছে ?"

রেডিও বন্ধ করে দিল চন্দন। বলল, "বলিস না, কী করে একটা ইনফেকশান হয়ে গিয়েছিল। চোখ ফুলে, লাল হয়ে দু'দিন যা কষ্ট দিয়েছে। আজ বেটার।"

"আমি ভাবলাম বাড়িটাড়ি চলে গিয়েছিস !"

"না। আসছে মাসে যাব," বলে চন্দন তাসগুলো গুটিয়ে ফেলল, "আমি ভাবছিলাম আজ তুই আসবি।"

"তোর পাত্তা নেই, ভাবছিলাম কী হল !"

"কিকিরার খবর কী ?"

"বলছি।"

চন্দনদের মেডিক্যাল মেসটাকে কোয়ার্টারও বলা যায়। প্রত্যেকের একটা করে ঘর, লাগোয়া ছোট বাথরুম। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মেসের মতনই। তবে চা-জলখাবার এটা-ওটা ঘরেই দিয়ে যায়।

তারাপদ গায়ের জামা খুলে ফেলল। ঝড়ের ধুলোয় চোখ-মুখ-মাথা কিরকির করছে। আগে বাথরুমে যাবে।

"আমি একটু ভদ্দরলোক হয়ে নিই। পাঁচ মিনিট। কিকিরা আসতে পারেন।" তারাপদ বাথরুমে চলে গেল।

চন্দন তাস রেখে বিছানাটা একটু ঝেড়ে নিল। জানলার একটা পাট কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, খুলে দিল। বাইরে করিডোর। শাঁটুল যাচ্ছিল নাচতে নাচতে। ছেলেটার হাঁটার ধরনই ওই রকম। ডাকল শাঁটুলকে। চা-টোস্ট আনতে বলল তারাপদর জন্যে। বলেই আবার কী মনে হল, "এই, আমাকে মুড়ি-বাদাম খাওয়াতে পারবি ? আচ্ছাসে তেল দিয়ে মাখবি। ভেজাল তেল। পিঁয়াজ দিবি, পচা পিঁয়াজ। আর লঙ্কা। পারবি না ?"

শাঁটুল মাথা হেলিয়ে হাসল, "ওর সঙ্গে দুটো ফুলুরি ?"

চন্দন বুঝল, ফাজলামি করছে শাঁটুল। তাড়া মারল শাঁটুলকে।

চোখের জন্যে গত দু'দিন মাথা ধরে ছিল বেশ। আজ অবশ্য মাথা-ধরা নেই। কিন্তু জিভের স্বাদ আসছে না কেন ? আসলে মাঝে-মাঝে বাড়ি গিয়ে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে জিভের স্বাদ না পালটে এলে আর ভাল লাগে না।

বাড়ির জন্যে চন্দনের মন-কেমন করে উঠল হঠাৎ।

তারাপদ বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। বলল, "চাঁদু, আমার বোধহয় বাত হয়েছে। মাঝে-মাঝে বাঁ পায়ের হাঁটুটা কনকন করে ওঠে।"

"করুক। বেশি করে হাঁটবি, সেরে যাবে।"

চুল আঁচড়াতে লাগল তারাপদ। বলল, "আর কত হাঁটব রে ! হেঁটেই অফিস যাই ; ফিরি। কাল কম-সে-কম পাঁচ-সাত মাইল হেঁটেছি।"

"কেন ? কোথায় গিয়েছিলি ?"

"কিকিরার চেলাগিরি করছিলাম। গিয়েছিলাম এন্টালির দিকে। সেখানে গিয়ে শুনলাম, লাইন পেরিয়ে শিবতলায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে আবার খোঁজ পেলাম...।"

তারাপদকে কথা শেষ করতে দিল না চন্দন, "এন্টালির দিকে কেন !"

"কমলের খোঁজ করতে।"

"কে কমল ?"

"কমল ব্যানার্জি।"

"কে সে ?"

"ফুলকুমারের বন্ধু। ফুলকুমারের ম্যাজিকের দলেও ছিল।"

চন্দন টেবিল হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল, "আমি তো একেবারে

ইগনোরান্ট্ হয়ে আছি রে তারা, মানে কিকিরার ভাষায়...” বলে হো-হো করে হেসে উঠল।

তারাপদ বলল, “তুই সেদিন গেলি না, গেলে জানতে পারতিস। রাজকুমারের সঙ্গে তোর আলাপটাও হয়ে যেত।”

“কপাল খারাপ,” চন্দন নিজের কপাল দেখাল, “আমি যে কী রকম হাঁ করে তোদের জন্যে বসে ছিলাম। কোনো খবর পাচ্ছি না। কিকিরাকে একটা টেলিফোন নিতে বল।”

“বল না তুই!”

“যাক গে, আমায় বল তো, ডেভালাপমেন্ট কতদূর?”

তারাপদ গত দু'তিন দিনের ঘটনা শোনাতে লাগল চন্দনকে। রাজকুমারের কথা, কিকিরার নকশা-করা স্টেজের কথা, সেদিনের সমস্ত কথাবার্তা একে-একে বলে যেতে লাগল।

শাঁটুল খাবার এনেছিল। চা টোস্ট পুডিং দিল তারাপদকে। চন্দন বসল এক বাটি মুড়ি-বাদাম নিয়ে।

চন্দন বলল, “কিকিরা কাল তোর সঙ্গে ছিলেন?”

“না। আমি একলাই কমলের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম।”

“দেখা পেলি?”

“পেলাম। তিন জায়গায় ঘুরে দেখা পেলাম। আমায় পাত্তা দিতে চায়নি প্রথমটা। সন্দেহ করছিল। পরে রাজকুমারবাবুর কথা বলতে খানিকটা কান দিল।”

“কী বলল কমল?”

“বলল, ফুলকুমারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব থাকলেও, সে অনেক দিন হল দল ছেড়ে দিয়েছে। এখন সময় হয় না। হোটেলের চাকরি।”

“হোটেলের চাকরি? কী চাকরি?”

“বিল্ ক্লার্ক।”

“কোন্ হোটেল?”

“স্টার হোটেল। মাঝারি হোটেল,” তারাপদ পুডিং খেতে খেতে বলল, “চন্দনদের মেডিক্যাল মেসে পুডিংটা চমৎকার করে।”

“কীরকম দেখলি কমলকে?” চন্দন জিজ্ঞেস করল।

“খারাপ লাগল না। ফুলকুমারের দাদা রাজকুমারবাবু সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন কমলকে। আমারও মনে হল, কমল সিম্পল্ টাইপের।”

তারাপদর কথা ফুরোবার মুখেই কিকিরা এসে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন চন্দনকে, তারপর বললেন, “আগে আমায় জল খাওয়াও।” উনি হাঁপাচ্ছিলেন।

ঘরের একপাশে ছোট কুঁজোয় জল ছিল। চন্দন উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে

আনল। "দৌড়চ্ছিলেন নাকি ? এমন হাঁপাচ্ছেন ?"

কিকিরা কোনো জবাব দিলেন না। আগে জল খেলেন। হাঁফ ছাড়লেন স্বস্তির। বললেন, "কী ফ্যাসাদ ! ওই যে বড় রাস্তায় ছানার দোকান আছে, ওখানে একপাল কুকুর খ্যাপার মতন কামড়াকামড়ি করছে। তাড়ানো যাচ্ছে না। রাস্তার লোককেও তেড়ে আসছে। আমি বাপু, কুকুরকে বড় ভয় পাই।"

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, "করবেন গোয়েন্দাগিরি, আবার কুকুর দেখলে ভয় পাবেন, আপনি কেমন গোয়েন্দা ?"

"কে চায় গোয়েন্দাগিরি করতে ! 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা আমার। যাক গে, তোমার খবর শুনি আগে। হয়েছে কী তোমার ?"

চন্দন চশমা-আঁটা চোখ দেখাল। "দেখছেন না, গগলস্ এঁটে বসে আছি। ইনফেকশান হয়েছিল।"

কিকিরা হাত উঠিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন। "তোমাদের একটু কিছু হলেই গালভরা কথা ! ইনফেকশান। সোজা কথাটা কী ! চোখ উঠেছিল, না আঞ্জনি বড় হয়ে ফেটে গিয়েছিল !"

চন্দন হাসল, "আইরাইটিস্।" এমন ভাবে গালভরা একটা কথা বলল, যেন কিকিরা একটু ঘাবড়ে যান।

"বোগাফাইটিস্—যত্ত সব ! রোজ ওয়াটার দাও ; না হয় লোটাস হনি," কিকিরা মজা করে বললেন। তাকালেন তারাপদর দিকে, "তোমার খবর কী ? গিয়েছিলে ?"

"গিয়েছিলাম," তারাপদ বলল, "চাঁদুকে সেই কথাই বলছিলাম। কমল এখন এন্টালিতে থাকে না। থাকে তার জ্যাঠতুতো দিদির কাছে, গুলাম আলি লেনে।"

"কেমন দেখলে ?"

"আমার তো মনে হল, এই গোলমালের মধ্যে ও নেই। কমল বলল, ফুলকুমার তার স্কুলের বন্ধু। কলেজে পড়ার সময় দু'জনে আলাদা কলেজে পড়লেও আগের মতনই ভাবসাব ছিল। ফুলকুমার কাশী চলে যাবার পর দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়। আবার যখন ফুলকুমার ফিরে এল কাশী থেকে, এসে ম্যাজিক নিয়ে পড়ল, তখন কমলের সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব আগের মতনই গড়ে উঠল। তবে কমল তখন চাকরিবাকরি শুরু করেছে, বন্ধুর সঙ্গে রোজ তার দেখা-সাক্ষাৎ হত না।"

"ফুলকুমারের ম্যাজিকের দলে কমল ছিল," কিকিরা বললেন।

"আমি জিজ্ঞেস করেছি।" কমল বলল, "গোড়ার দিকে দু-এক বছর সে ফুলকুমারের দলের সঙ্গে ছিল। ছিল মানে, কমল একরকম ম্যানেজারি করত ফুলকুমারের ম্যাজিক-পার্টির। যারা ওর ম্যাজিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, খেলা দেখানোয় সাহায্য করত, কমল তাদের মধ্যে ছিল না।"

কিকিরা ইশারায় আসতে বললেন তারাপদকে। চোখ বুজে কিছু ভাবলেন। বললেন, "ফুলকুমারদের যে গ্রুপ-ফোটো দেখেছি, তাতে কমল ছিল ?"

"আমার মনে পড়ছে না।"

"আচ্ছা ! তারপর— ?"

তারাপদ বলল, "আজ প্রায় দেড় বছর কমল আর ফুলকুমারের ম্যাজিক-পার্টির দেখাশোনা করে না। সে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়েছে। সময় হয় না। তবে ফুলকুমারের সঙ্গে দেখাশোনা, আসা-যাওয়া তার ছিল। মাঝে-মাঝে গল্পগুজব করতে যেত নিউ মার্কেটের দোকানে।"

"ফুলকুমারের খুন সম্পর্কে কিছু বলল ?"

"বলল, খবর শুনে সে রাজকুমারবাবুর কাছে ছুটে গিয়েছিল। তার ভীষণ লেগেছে। ছেলেবেলার বন্ধু।"

কিকিরা কিছুক্ষণ তারাপদর মুখের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকলেন। চন্দন মুড়ি শেষ করে চা খাচ্ছিল। উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল ঘরের। বাইরে গেল একবার। হাঁক মারল শাঁটুলকে। চা আনতে বলল আবার। ঘরে ফিরে এল।

তারাপদ বলল, "আমার মনে হল, ফুলকুমারের সঙ্গে হালে বোধহয় কমলের বন্ধুত্ব আগের মতন ছিল না। কোনো কারণে বন্ধুর ওপর বিরক্ত হয়েছিল।"

"কারণটা কী ?"

"তা বলল না।...শুধু বলল, ফুলকুমার কতকগুলো বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল। ববি বলে একটা লোকের কথা বলল কমল।"

"কে ববি ?"

"ববি নাকি একজন বক্সার। লাইট্ ওয়েট, ফেদার ওয়েট—কিসের চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল এককালে। এখন তার বাস-লরির ব্যবসা।"

তারাপদ চা-খাওয়া শেষ করে কাপটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

সন্ধের মুখে চন্দনদের মেডিক্যাল মেস গমগমে হয়ে উঠেছে। করিডোর দিয়ে লোকজন আসছে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে কথা বলছে। হাসাহাসি করছে। নিচে রাস্তায় একটা ব্যান্ড-পার্টি যাচ্ছিল। বাজনার আওয়াজ আসছিল।

কিকিরা চুপচাপ। তারাপদর দিকে তাকাচ্ছেন মাঝে-মাঝে, আবার চোখ ফিরিয়ে ঘরের ছাদ দেখছেন, দেওয়াল দেখছেন। উঠে পড়লেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন বারকয়েক। তারপর বললেন, "আমি কাল থেকে চেষ্টা করেও ওই ছোকরার কোনো হদিস করতে পারলাম না।"

"কোন্ ছোকরা ?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"দ্যাট্ বডি বিল্ডার।...তুমি তার ছবি দেখোনি। আমরা দেখেছি।...ছোকরার চেহারা দেখে বডি বিল্ডার বলে মনে হয়। তাগড়া, বেঁটে, গোল মুখ, মাথার চুল কোঁকড়ানো। ওকে মাস্‌ল্-ম্যানও বলা যেতে পারে।

আমি অনেক চেষ্টাচরিত্র করে নামটা উদ্ধার করেছি। মোতিয়া।”

“মোতিয়া ?” তারাপদ অবাক চোখ করে বলল, “কেমন নাম ? বাঙালি নাম বলে মনে হচ্ছে না !”

কিকিরা মাথা নাড়লেন, “সেভাবে বাঙালি নয়। ওরা ভাগলপুরের লোক। মোতিয়ার বাবা কলকাতায় এসেছিল চাকরিবাকরির খোঁজে। কাজ করত গ্যাস কোম্পানিতে। বাবা অনেক কাল আগে মারা গেছে। মোতিয়ার মা ছেলেকে মানুষ করেছে। মা কাজ নিয়েছিল মেয়ো হাসপাতালে। আয়ার কাজ। মা'ও মারা গিয়েছে বছরখানেক আগে। মোতিয়া এখন গণেশ টকির দিকে একটা গলিতে থাকে। যে-বাড়িতে থাকে, সে-বাড়িতে নানান রকমের লোক, পঞ্চাশ রকম ব্যবসা। দাঁতের মাজন, কলপের শিশি থেকে ফলের দোকানের খেজুরের প্যাকেট—কী না হচ্ছে, চন্দন। খুপরি-খুপরি ঘর, যে-যার মতন ব্যবসাও করছে, আবার তোলা উনুন-হাঁড়ি-কড়া নিয়ে সংসারও ফেঁদে বসেছে। মোতিয়া ওই বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে থাকত।”

চন্দন বলল, “একলা ?”

মাথা হেলালেন কিকিরা, “একলাই থাকত। খাওয়াদাওয়া করত হোটেলে, দোকানে।”

তারাপদ কিকিরাকে লক্ষ করছিল। বলল, “আপনি মোতিয়ার খবর পেলেন কেমন করে ?”

“খবর পাওয়া কঠিন কিসের ? আমি তো তোমায় বলেছিলাম, রাজকুমার না চিনুক আমি চিনে নেব। রাজকুমার কমলের কথা বলেছিল। তোমাকে পাঠালাম কমলের খোঁজ করতে। অন্য ফোটোটা কার সে বলতে পারেনি। আমি ফুলকুমারের দলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদের দু'একজনের নাম-ঠিকানা রাজকুমারই বলে দিয়েছিল জোগাড় করে। বাকিগুলো আমি দেখা করে জোগাড় করে নিলাম। ওরাই বলে দিল মোতিয়ার কথা।”

“ফোটো দেখে ?”

“ফোটো দেখাবার দরকার করল না। চেহারা বলতেই বলে দিল।”

চা নিয়ে এসেছিল শাঁটুল। কিকিরাকে সে চেনে। কখনো-সখনো চন্দনের মেসে কিকিরা আসেন। দেখে-দেখে চিনে ফেলেছে। চন্দনের মুখে শুনেছে, কিকিরা ম্যাজিশিয়ান। শাঁটুলের ভক্তি বেড়ে গিয়েছে কিকিরার ওপর।

চা এগিয়ে দিয়ে দু'একটা কথা বলল শাঁটুল কিকিরার সঙ্গে। এঁটো কাপ-ডিশ উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

চা খেতে খেতে কিকিরা বললেন, “মোতিয়াকে আজ তিন-চার দিন আর তার আস্তানায় পাওয়া যাচ্ছে না।”

“মানে ?” তারাপদ বলল, “বেপাত্তা হয়ে গেছে ?”

"কী হয়েছে, কেমন করে বলব! সাত তারিখে ফুলকুমার খুন হয়েছে। আট-ন' তারিখ পর্যন্ত সে ছিল। থানা থেকে ফুলকুমারের দলের লোকজনের, সেদিন যারা ছিল, সকলকেই জেরা করা হয়েছিল। মোতিয়াকেও।"

"মোতিয়া সেদিন তা হলে ছিল?" চন্দন বলল, "ফুলকুমারের খুনের দিন?"

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "ছিল। মোতিয়াও একটা খেলা দেখায়।"

তারাপদ আর চন্দন অবাক হয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল, "কী খেলা?"

"চেঞ্জ অব কফিন।"

মুখে যেন কথা আসছিল না তারাপদদের। চন্দন ঢোক গিলে বলল, "স্যার, আপনি আমাদের মাথা গোলমাল করে দিচ্ছেন। চেঞ্জ অব কফিনটা কী?"

কিকিরা বললেন, "কফিনের বাক্স তো দেখেছ? ওই রকম একই মাপের, একই রঙের, একই রকম দুটো বাক্সর একটাতে মোতিয়াকে শুইয়ে দেওয়া হত। সেই বাক্সটা থাকত স্টেজের মাঝখানে। আর-একটা কফিন বাক্স এনে রাখা হত পাশে, সেটা থাকত ফাঁকা। দুটো বাক্স, এরপর একটার ওপর অন্যটা চাপিয়ে দেওয়া হত। কিছুক্ষণ একটা কাপড় ঢেকে দেওয়া থাকত বাক্স দুটোর ওপর। তারপর কাপড় সরিয়ে কফিন খুললে দেখা যেত, মোতিয়া ছিল এক কফিনে, বেরিয়ে এল অন্য কফিন থেকে।"

চন্দন একবার তারাপদর দিকে তাকাল। তারপর গাল চুলকে বলল, "এ-রকম খেলা হয় নাকি কিকিরা-স্যার?"

"কেন হবে না? অনেক হয়। এক-একজন এক-একভাবে দেখায়। নিজের সুবিধেমতন করে নিয়েছে। কেউ বড় ডাইস বক্সের নকশা করে দেখায়, কেউ আবার বাস্কেট করে দেখায়।"

তারাপদ বলল, "এই খেলা সেদিন মোতিয়া দেখিয়েছে?"

"হ্যাঁ।" কিকিরা বললেন, "ইন্টারভ্যালের আগে এই খেলাটা হয়ে যায়।"

"তা হলে তো মোতিয়া..."

তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কিকিরা বললেন, "তা হলে মোতিয়া গেল কোথায়? বা মোতিয়া হঠাৎ গা-ঢাকাই বা দেবে কেন?"

"থানা থেকে কি ওদের ওপর চোখ রাখছিল না?"

"হয়ত রাখছিল, জানি না। এমনও হতে পারে, আমি যেমন মোতিয়াকে খুঁজছি পুলিশও হয়ত নজর রেখে তাকে খুঁজছে।"

চন্দন ঘরের মধ্যে বার-দুই পায়চারি করে নিল। সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি মোতিয়াকে সন্দেহ করছেন?"

কিকিরা ঘাড় নেড়ে বললেন, "মোতিয়াকে সন্দেহ করার কতকগুলো কারণ থেকে যাচ্ছে। প্রথম কারণ, তার চেহারার মধ্যে একটা রাফ্ ভাব আছে। দেখলেই মনে হয়, খুন-জখম করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, কাউকে কিছু না

বলে তার বেপাত্তা হওয়া। আর তৃতীয় কারণ...” কিকিরা কথা শেষ না করে থেমে গেলেন। তাঁর চোখের তলায় যেন কেমন রহস্য।

“তৃতীয় কারণটা কী ?”

“মোতিয়ার কাজ ছিল, ভুতুড়ে হারমোনিয়াম বাজার খেলা শুরু হওয়ার সময় ফুলকুমারের চোখ বাঁধা, হ্যান্ড্‌ কাফ্‌ পরানো। হ্যান্ড কাফের চাবিটা সে দর্শকদের মধ্যে একজনকে দিয়ে দিত। দিয়ে নিজে আবার স্টেজে উঠে আসত। স্টেজে ফুলকুমার আর মোতিয়া ছাড়া তৃতীয় কারও থাকার কথা নয়।” কিকিরা সিগারেটের জন্যে হাত বাড়ালেন। সিগারেট নিয়ে ধরালেন অন্যমনস্কভাবে। ধোঁয়া গিললেন। তারপর বললেন, “চোখ বাঁধা, হ্যান্ড কাফ্‌ লাগানো, চাবি দেওয়া হয়ে যাবার পর মোতিয়ার উইংসের পাশে চলে আসার কথা। স্টেজ তারপর অন্ধকার হয়ে যাবে।...আমি শুনলাম, মোতিয়া উইংসের পাশে এসে দাঁড়াবার পর, আচমকা নিজের জায়গা ছেড়ে কোথাও চলে যায়।”

“কোথায় যায় ?”

“সেটা জানতে হবে।...মোতিয়াকে আবার দেখা যায় যখন ফুলকুমারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।”

“হাসপাতালে গিয়েছিল মোতিয়া ?”

“হ্যাঁ।”

“তবে তো সে বলতে পারে, স্টেজের কাছাকাছি ছিল সে।”

“বলতে পারে। বলেছে নিশ্চয়ই পুলিশের কাছে। ফুলকুমারের হ্যান্ড কাফের চাবি তার পকেটে থাকার কথা নয়। মোতিয়াই হ্যান্ড কাফ খুলে দিয়েছিল হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে।”

তারাপদ বলল, “তবু আপনি মোতিয়াকে সন্দেহ করছেন ?”

“দেখো হে, একটা জটিল অসুখ হলে চন্দনরা চট্‌ করে কি কোনো একটা বিশেষ রোগ হয়েছে বলে ঠিক করে নেয় ? না, তারা পাঁচটা লক্ষণ মেলায়, দশ রকম পরীক্ষা করে, অপেক্ষা করে দেখে, শেষে রোগটা ধরতে পারে। এখানেও সেই কথা। সন্দেহ অনেককেই হয়। দশরকম দেখে, প্রমাণ পেয়ে তবে না আসল লোককে ধরতে হবে!” কিকিরা সামান্য সময় চুপ করে থাকলেন। সিগারেট খেলেন নিজের মনে, শেষে বললেন, “মোতিয়া হাসপাতালে বেশিক্ষণ ছিল না।”

“কতক্ষণ ছিল ?”

“আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।”

“অন্যরা ছিল ?”

“দলের চার-পাঁচজন ছিল। রাজকুমার যখন খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যায়, তখনো মোতিয়া ছিল না।”

“আপনাকে এ-সব কথা কে বলেছে ?”

"হরিমাধব।...হরিমাধব ফুলকুমারের দলের ম্যানেজার হয়ে কাজ করছিল ইদানীং। সেদিনের শো-এর বায়নাও ধরেছিল হরিমাধব। সাড়ে তিন হাজার টাকা শো-বাবদ, আর অন্যান্য খরচ বাবদ পাঁচশো টাকা পাবার কথা ছিল তাদের। শোয়ের ব্যবস্থা করেছিল একটা জুট মিলের রিক্রিয়েশান ক্লাব।"

মাথা চুলকে চন্দন বলল, "আপনি অনেক খবরই নিয়েছেন তা হলে ?"

"নিতে হয়েছে। সবেই শুরু। এখনো কত খবর নিতে হবে," বলে আঙুল দেখালেন তারাপদর দিকে, "তারাপদ আবার এক ববি'র কথা বলল। কে সে ? খোঁজ নিতে হবে। তারপর রয়েছে লালাজি !"

চন্দন বলল, "কিকিরা-স্যার, আর-একটা দিন। পরশু থেকে আমি আপনার সার্ভিসে।"

কিকিরা হেসে ফেললেন।

ফুলের দোকানের খোঁড়া মানুষটি

দেখতে দেখতে গরম পড়ে গেল। সপ্তাহখানেক আগেও এমন গরম ছিল না। তখন বিকেলের দিকে এলোমেলো বসন্তের হাওয়া দিয়ে যেত। এখন আর তেমন বাতাস বইছে না, বরং গরমের ঝলকানি দিচ্ছে থেকে-থেকে।

দুপুরের দিকে ঘোরাফেরা করতে কষ্ট হয় কিকিরার। বাধ্য না হলে বাড়ির বাইরে বড় বেরোন না।

ঘুম নয়, আবার পুরোপুরি যে জেগে ছিলেন তাও নয়, তন্দ্রার মধ্যে শুয়ে ছিলেন, এমন সময় তারাপদ আর চন্দনের গলা পেলেন। এই সময়টা ওদের আসার সময় নয়। চোখ খুলে কান পেতে থাকলেন। স্বপ্ন নয়, সত্যি-সত্যি ওরা এসেছে। এসে বাইরের ঘরে বসে হাঁকডাক ছাড়ছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন কিকিরা।

বাইরের ঘরে পা দিতেই চোখে পড়ল, তারাপদ-চন্দনদের সঙ্গে রয়েছেন লালাজি।

"কী ব্যাপার ? তোমরা এই অসময়ে ?"

চন্দন বলল, "তারার আজ শনিবার। আর আমার ডিপার্টমেন্ট বন্ধ।"

"বন্ধ ! কেন ?"

"আপনি স্যার কলকাতায় থাকেন। কলকাতার হাসপাতাল মাঝে-মাঝে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, জানেন না ? অবশ্য আমার হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। দিন-দুয়েকের জন্যে ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা গোলমাল হচ্ছিল।"

কিকিরা লালাজির দিকে তাকালেন।

লালাজি মানুষটিকে দেখলেই মনে হয়, সাদামাটা নিরীহ বয়স্ক মানুষ। তাঁর

কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলার কাছে একটি মালা, তুলসীর মালার মতন। চোখের তলায় দাগ ধরেছে। মাথার চুল সবই প্রায় সাদা।

কিকিরা বললেন, "লালাজি, আপনি ?"

লালাজি বললেন, "আমি আপনার কাছেই আসছি, রায়বাবু। কুছ খবর আছে।" বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে কিকিরার দিকে এগিয়ে দিলেন। "রাজাজি দিয়েছেন।"

চিঠিটা নিলেন কিকিরা। খামের মুখ বন্ধ। তারাপদদের আসার সঙ্গে লালাজির আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে একপক্ষে ভালই হয়েছে। লালাজিকে তারাপদরা দেখেনি। দেখার সুযোগ হয়ে গেল।

চন্দন বোধহয় আগেই জল চেয়েছিল। বগলা জলের জগ্ আর গ্লাস নিয়ে ঘরে এল।

কিকিরার যেন মনে পড়ে গেল কিছু। তারাপদদের সঙ্গে লালাজির পরিচয় করিয়ে দিলেন। রগড় করে বললেন, "লালাজি, এরা দু'জনে পাক্কা জাসুস !" বলে হেসে উঠলেন।

বগলা লালাজিকে জল দিতে যাচ্ছিল। লালাজি হাত নেড়ে বারণ করলেন।

কিকিরা চিঠির মুখ খুলে পড়লেন চিঠিটা। বার-দুই। তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল না কিছুই।

লালাজি খানিক অপেক্ষা করে বললেন, "বাবুজি, আমি যাই ?"

"যাবেন ?...দোকানে যাবেন ?"

"দুসরা একটা কাম আছে। এক-আধ ঘণ্টা বাদ যাব।"

"আসুন তবে।"

লালাজি উঠতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কী মনে করে কিকিরা বললেন, "একটু বসুন লালাজি ! পাঁচ-দশ মিনিট," বলে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন একবার। চোখ ফিরিয়ে লালাজির দিকেই তাকালেন আবার, "আচ্ছা লালাজি, আপনি ফুলকুমারের হারমোনিয়ামের খেল্ একবারই দেখেছেন ?"

"জি," লালাজি মাথা হেলালেন, "আমি আপনাকে বলেছি বাবুজি।"

কিকিরা অস্বীকার করলেন না। রাজকুমারের দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। লালাজির সঙ্গে কথাও বলেছেন। ফুলকুমার কেমনভাবে খেলাটা দেখাত, ভাল করে জেনে নিয়েছেন।

"লালাজি, আপনি কি জানেন, হারমোনিয়ামটা কে তৈরি করেছিল ?"

"জি, না।"

"আপনি বলেছেন, হারমোনিয়ামটা সরু আর লম্বা ছিল। মামুলি হারমোনিয়ামের মতন দেখতে ছিল না।"

"আমি ঠিক বলেছি বাবুজি !"

"আচ্ছা লালাজি, ফুলকুমার যখন হারমোনিয়ামের খেলা দেখাত, ও কী ধরনের পোশাক পরত ? মানে, ওর সাজ কী হত ?"

"আমি বলেছি আপকো।"

"বলেছেন," কিকিরা একটু হাসলেন, "আর-একবার বলুন।"

লালাজি বললেন, "রায়বাবু, আমি বুড্ডা আদমি। খেলা-উলা আমি দেখি না। ছোটবাবু আমায় জবরদস্তি করলেন। আমি যিস্ দিন খেলা দেখি, উস্ দিন, ফুলকুমার ওস্তাদজির কাপড়া পরেছিল।"

"পাজামা আর পাঞ্জাবি ?"

"জি।"

"কালো রঙের ?"

"তফাতসে ওইসে মালুম হয়।"

"মোতিয়া ছিল ?"

"নাম আমার মালুম ছিল না, বাবুজি। মগর, আপ যার কথা বলেছিলেন, উও ছোকরা ছিল।"

কিকিরা সামান্য চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, "লালাজি, আপনি ফুলকুমারকে ছেলের মতন ভালবাসতেন শুনেছি। একটা কথা আমায় বলুন। ফুলকুমারের দুশমন কে ছিল ? কাকে আপনার সন্দেহ হয় ?"

লালাজি কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর মুখে কষ্ট ও বেদনার ছাপ ফুটে উঠছিল। চোখ নামিয়ে নিয়ে ভাঙা-ভাঙা ভাবে বললেন, "রায়বাবু, আমি রাজাজির সঙ্গে দোকানে থাকি। ফুলবেটা কাদের সাথ্ দোস্তি করত, আমি জানি না। তব্ সাচ্ বাত কী জানেন ? আচ্ছা দোস্ত ওর জাদা ছিল না।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "আপনি কমলকে জানেন লালাজি ?"

"জি, জানি।"

"কমল কেমন লোক ?"

"কমল আচ্ছা ছোকরা।"

"মোতিয়া ?"

"আমার মালুম নেহি।"

লালাজি আর বসতে চাইছিলেন না। কাজ আছে হাতে। উঠে দাঁড়ালেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি আসুন। কুমারবাবুকে বলবেন, কাল আমি থাকব। উনি আমাকে বাড়িতে পাবেন।"

লালাজি চলে গেলেন।

কিকিরা সামান্য চুপচাপ থাকলেন। হাই উঠল। বললেন, "বোসো তোমরা, চোখে-মুখে জল দিয়ে আসি। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু।"

বাইরে গেলেন কিকিরা।

চন্দন বলল, "তারা, আমি কাল এই ব্যাপারটা নিয়ে রাত্তিরে অনেক

ভাবছিলুম। প্রবলেমটা টু-ফোল্ড। মানে, ডবল্ ব্যাপার। একটা হল, ফুলকুমারকে খুন ; আর দু' নম্বর হল, হারমোনিয়াম চুরি। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। তবু বলব, মতলব যদি চুরির হত, অনর্থক একটা মানুষকে খুন করতে যাবে কেন ? চোর হিসেবে ধরা পড়লে যে শাস্তি, সেটা হল চুরির শাস্তি। বড়জোর ছ' মাস এক বছরের জেল। খুনি হিসেবে ধরা পড়লে যে ফাঁসির দড়ি, এটা সকলেই জানে। হঠকারিতা করে খুন করে না ফেললে মানুষ সহজে খুন করে না। এমনকী ক্রিমিন্যালরাও ঝট করে খুন পর্যন্ত এগোতে চায় না। তবে যারা পাকা খুনি তাদের কথা আলাদা। ...আমার এইটেই অবাক লাগছে।"

তারাপদ বলল, "এমন তো হতে পারে, হারমোনিয়াম চুরি করতে হলে ফুলকুমারকে খুন না করে উপায় ছিল না।"

"মনে হয় তাই। কিন্তু একটা ম্যাজিক-দেখানো হারমোনিয়াম কি এতই দামি যে তার জন্যে মানুষ খুন করতে হবে ?"

"দেখো চাঁদু, আমারও সেটা মনে হয়।...তা ছাড়া আমি বুঝতেই পারি না—হারমোনিয়ামটা বাজত কেমন করে। কিকিরা কিছু বলেন না।"

ঘরে এলেন কিকিরা। চোখ-মুখ ধুয়ে এসেছেন। বললেন, "কী বলছিলে কিকিরাকে নিয়ে ?"

"বলছিলাম, আপনি হারমোনিয়াম-রহস্যটা আমাদের কাছে ভাঙছেন না..." তারাপদ বলল।

কিকিরা কোনো জবাব দিলেন না। নিজের জায়গাটিতে বসলেন। ঘড়ি দেখলেন দেওয়ালের। বললেন, "চা খাবে তো ?"

চন্দন বলল, "সে-চিন্তা বগলাদার। আপনি আমাদের কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করলেন। মাথার চুল ঘাঁটলেন অভ্যাসবশে। বললেন, "হারমোনিয়ামটা কেমন করে বাজত, এটা জানা তেমন জরুরি নয়, স্যান্ডাল উড্। ম্যাজিক মানে ভেলকি। বুদ্ধির খেলা, হাতের খেলা, কথার খেলা, আর তোমার প্রেজেন্টেশান, এই সব মিলিয়ে ম্যাজিক। হারমোনিয়ামটা কেমন করে বাজত, সেটা তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিতে পারলে ভাল হত, বেশ তো, একদিন দেখিয়ে দেব। একটা হারমোনিয়াম জোগাড় করে এনো।"

"আপনি জানেন ?" তারাপদ বলল।

"না, আমি জানি না।" মাথা নাড়লেন কিকিরা, "ও-রকম খেলা আমি কখনো দেখাইনি।"

"তা হলে ?"

"তা হলে কিছু নয়," কিকিরা মজার চোখে হাসলেন। "প্রসেসটা জানি। ছেলেবেলায় তোমরা তো কত অঙ্ক করেছ, জ্যামিতি করেছ। নিয়মটা জানলে

যেমন সেই নিয়মের অন্য অঙ্কগুলো করা যায়, এ হল তাই। জিনিস এক। তবে দেখাবার সময় এক-একজন এক-এক কায়দা করে দেখায়। যে যত চমক দিতে পারবে তার কপালে তত হাততালি জুটবে।" বলে কয়েক মুহূর্ত থামলেন কিকিরা। আবার বললেন, "হারমোনিয়ামটা কেমন করে বাজছিল, সেটা আমার কাছে তত বড় কথা নয়। আমার কাছে বড় কথা, ওই হারমোনিয়ামের মধ্যে কী ছিল ? কে ফুলকুমারকে খুন করল ?"

চন্দন কিকিরার চোখে-চোখে তাকিয়ে থাকল। বলল, "আমরাও তাই বলাবলি করছিলাম। ম্যাজিক-দেখানো হারমোনিয়াম কি এতই মূল্যবান যে, তার জন্যে মানুষ খুন করতে হবে ?"

"ঠিকই," কিকিরা ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন। "আমার মনে হয় চন্দন, হারমোনিয়ামটা উপলক্ষ। ওর মধ্যে কিছু ছিল। যাই থাক, সেটা মূল্যবান।"

তারাপদ বলল, "কী থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "বলতে পারছি না। চোরাই হীরে, জহরত, দামি পাথর। সোনার বিস্কুট বার থেকে শুরু করে নেশার জিনিস, কোকেন, হ্যাসিস্ সবই থাকতে পারে। আবার অন্য কোনো বহুমূল্য জিনিস থাকতে পারে।"

তারাপদ বলল, "ফুলকুমার কি সেটা জানত ?"

"বলতে পারি না।"

"ফুলকুমার কি নিজেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল ?"

"বাইরে থেকে দেখতে গেলে তার বাজাবার কথা নয়। কেন নয় ? কারণ তার হাতে ছিল হ্যান্ড-কাফ্ ; হ্যান্ড-কাফের চাবি অন্যের কাছে—মানে কোনো দর্শকের কাছে। তার ওপর ফুলকুমারের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।"

চন্দন বলল, "আপনি বলতে চাইছেন, অন্য কেউ তার হয়ে বাজাচ্ছিল ?"

কিকিরা এবার ছোট-ছোট চোখ করে হাসিমুখে বারকয়েক নাক চুলকোলেন। পরে বললেন, "চন্দন, তোমরা এতদিন ম্যাজিশিয়ান কিকিরার চেলাগিরি করেও নাথিং নোয়িং হয়ে রইলে। দু'চারটে ম্যাজিকের বই পড়তে বলি, তাও পড়বে না। পড়লে অনেক কিছু জানতে পারতে। কথায় কথায় এত অবাক হতে হত না। যাক গে, সবুর করো। সবুরে মেওয়া ফলে।"

বগলা চা নিয়ে এল।

হাতে-হাতে চা এগিয়ে দিয়ে বগলা কিছু টাকা চাইল কেনাকাটার জন্য।

কিকিরা নিজে উঠলেন না। শোবার ঘরের টেবিলের ওপর খুচরো টাকা কিছু পড়ে আছে। নিয়ে যেতে বললেন বগলাকে।

টাকা এনে চলে যাচ্ছিল বগলা, কিকিরা বললেন, "আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে ; আমরা ঠিক পাঁচটায় বেরোব।"

চলে গেল বগলা।

চায়ে চুমুক দিয়েছিল তারাপদ। বলল, "কোথায় বেরোবেন ?"

"নিউ মার্কেট," কিকিরা বললেন।

"নিউ মার্কেটে ? সেখানে কী ?"

"সেখানে একটি খোঁড়া লোকের সন্ধানে। সেই-যে ফার্স্ট বুকে পড়েছ, ওয়ান মর্ন আই মেট্ এ লেম্ ম্যান, এও হল অনেকটা তাই। একজন লেম্ ম্যানকে খুঁজে বার করতে হবে।"

চন্দন একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। চারটে কুড়ি। বলল, "আপনার সঙ্গে কি তার দেখা করার কথা ?"

"না। আমি তাকে চিনি না। সেও আমাকে চেনে না।"

"তা হলে আর নাই বা গেলেন ! আপনি কিকিরা-স্যার, কলকাতার অনেক খবর রাখেন না। শনিবার নিউ মার্কেট আধবেলা। আপনি গিয়ে দেখবেন সব বন্ধ।"

কিকিরা বললেন, "লোকটাকে আমি পাব," বলে জামার পকেট থেকে চিঠি বার করলেন। "রাজকুমার যে চিঠিটা পাঠিয়েছে, তাতে কী লিখেছে জানো ? লিখেছে ফুলকুমারের খেলনার দোকান বা 'টয় শপ'-এর আশেপাশে এই লোকটা আজ ক'দিন ঘুরঘুর করছে। লোকটার চালচলন সন্দেহজনক। সে কেন ফুলকুমারের বন্ধ খেলনার দোকানের সামনে ঘুরঘুর করছে এটা জানা দরকার।"

"খবরটা রাজকুমারবাবুকে কেউ দিয়েছে, না তিনি নিজে দেখেছেন ?"

"পাওয়া খবর। ফুলকুমারের স্টলের পাশে যাদের দোকান আছে, তাদের কেউ দিয়েছে খবরটা।"

চন্দন বলল, "কিন্তু সেই খোঁড়া লোকটাকে এখন আপনি কেমন করে পাবেন ? দোকান বন্ধ। মার্কেট বন্ধ।"

"দেখতে ক্ষতি কিসের," কিকিরা বললেন, "হিন্ট্ একটা আছে। যদি পাই ! আর না যদি পাই—বিকেলের দিকে একটু বেড়ানো তো হবে। তোমরা এমন অলস কেন ? ইয়ং ম্যান !"

চন্দন বলল, "অলস নই, স্যার। আমরা দারুণ অ্যাকটিভ্। কিন্তু আপনার এই ফুলকুমার-রহস্যতে মারদাঙ্গা দেখছি না। একবার চান্স্ দিন, তারপর দেখুন কী হয় ?" চন্দন হাসতে লাগল।

কিকিরাও হেসে ফেললেন। বললেন, "মুখে তো বলছ, কাজের সময় পারবে মারদাঙ্গা করতে ?"

"তারা পারবে না, স্যার। আমি পারব।"

নিউ মার্কেটের সামনে ঠিক নয়, নিউ এম্পায়ার সিনেমার কাছে আচমকা একটা গণ্ডগোল বেঁধে গিয়েছিল। ছোটখাটো ভিড়। ছোকরামতন একজনের

চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মনে হল, ছোকরা বেদম মারধোর খেয়েছে। চোখের তলায় কালশিটে, ঠোঁটের পাশে রক্ত, ধুলো লেগে রয়েছে চুলে, শার্টের একটা হাতা ছেঁড়াখোঁড়া।

চন্দন ভিড়ের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে খবরটা জেনে এল। এসে বলল, "মোটর-বাইক কাকে ধাক্কা মেরেছিল। পাবলিক বেদম মেরেছে লোকটাকে।"

কিকিরা বললেন, "তবু রক্ষে ! ওর গায়ে সইতে হল ; গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলে বেচারির অনেকগুলো টাকা যেত।"

ভিড়ের কাছ থেকে সরে এল তারাপদরা।

শনিবারের বিকেল, সিনেমার ভিড় গিজগিজ করছে। উলটো দিকের দোকানগুলো খোলা। শরবতের দোকানের সামনে বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের ভিড়।

কিকিরা বললেন, "এ-পাশে নয়, লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকে চলো।"

নিউ মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে কোন্ দুপুরে। ওদিকের রাস্তাটা সামান্য ফাঁকা। কিকিরা হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "গ্লোব সিনেমার উলটো দিকে, মার্কেটের গায়ে একটা ফুলের দোকান আছে। একেবারে শেষের দিকে, মনে হচ্ছে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে। দোকানটা খুঁজে বার করতে হবে।"

চন্দন বলল, "দোকান না হয় খুঁজে বার করা গেল। কিন্তু লাভ কী ? দোকান বন্ধ দেখবেন।"

"চলো দেখি।"

কিকিরা ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগলেন। যেন বেড়াতে এসেছেন। আশেপাশে তাঁর নজর ছিল। সন্ধে হয়ে আসছে প্রায়। জায়গাটা গমগম করছে। গাড়ি রাখার জায়গাগুলো ভরতি। দুটো ছেলে প্ল্যাস্টিকের জল-ভরতি ব্যাগে রঙিন মাছ পুরে নিয়ে খদ্দের ধরার চেষ্টা করছে।

চন্দন আর তারাপদ সিগারেট ধরাল।

চন্দন বলল, "আপনি যে বললেন, খোঁড়া লোকটিকে আপনি চেনেন না। তা হলে ফুলের দোকানে খোঁজ করছেন কেন ?"

"রাজকুমার তার চিঠিতে একটা হদিস দিয়েছে। তাই," কিকিরা বললেন।

"তাই বলুন।"

নিউ মার্কেটের গা ধরে আরও খানিকটা হেঁটে গেলেন কিকিরা। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় যখন দক্ষিণের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন, চোখে পড়ল, একটা নার্শারি। নিছক ফুলের দোকান নয়, তবে নার্শারি। দোকান অবশ্য বন্ধ। বন্ধ হলেও দোকানের সামনে কয়েকটা টব পড়ে আছে। পাতাবাহারের টব। একটা বেতের বড় ঝুড়ির মধ্যে বাসী ফুল আর পাতার জঞ্জাল। দোকানটার নাম, 'কৃষ্ণা নার্শারি'।

তারাপদ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, "এই দোকান ?"

মাথা হেলালেন কিকিরা। দেখলেন দোকানটা, তারপর এদিক-ওদিক তাকালেন।

চন্দন বলল, "আপনার খোঁড়া লোক কোথায় ?"

আশেপাশে কাউকে বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। খানিকটা তফাতে জনা দু-তিন বাজারের মুটে বসে-বসে সুখদুঃখের গল্প করছে।

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। বললেন, "তারাপদ, ওই যে উলটো দিকে একটা দোকান আছে, ওটা কিসের দোকান ?"

মার্কেটের উলটো দিকে একটা ছোট দোকান দেখা যাচ্ছিল। বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে বলে মনে হল। বেতের টুকরি, চেয়ার, টেবিল, টুকিটাকি দেখা যাচ্ছিল। তারাপদ বলল, "বেতের জিনিস বিক্রি হয় মনে হচ্ছে। ওটা রাস্তার ওপারে। খোলা আছে।"

"চলো, একবার খোঁজ করি।"

রাস্তা পেরিয়ে এ-পারে দোকানের কাছে আসতেই লুঙ্গি আর হাফ্ শার্ট পরা একজনকে দেখা গেল। দোকানে খদ্দের নেই। লোকটা বোধহয় নতুন-আসা কিছু মালপত্র মিলিয়ে নিয়ে দোকান বন্ধ করার অপেক্ষায় ছিল।

কিকিরা কিছু বলার আগেই লোকটা বলল, "এখন আর বিক্রি হবে না।"

কথার ঢঙ থেকে বোঝা গেল, লোকটা দক্ষিণ ভারতীয়।

কিকিরা বললেন, তিনি একজনের খোঁজে এসেছেন। ওই নার্শারিতে খোঁড়ামতন একটি লোক থাকে, তার খোঁজে!

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি আর বেখাপ্পা হিন্দি মিশিয়ে লোকটা বলল, "মুফতি ? ইউ ওয়ান্ট হিম ? উধার যাও," বলে আঙুল দিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিটের দিকে একটা গলি দেখাল। বলল, "টেলারিং শপ ! মিল্ জায়গা।"

কিকিরা আর দাঁড়ালেন না। চোখের ইশারায় তারাপদদের পা বাড়াতে বললেন।

দশ-পনেরো পা হেঁটে এসে চন্দন বলল, "লোকটার নাম কি মুফতি ?"

"বোধহয়।"

"বাঙালি বলে মনে হচ্ছে না ?"

"চলো, দেখা যাক্।"

"আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে কিকিরা, ফুলকুমার ম্যাজিকই দেখাক, আর খেলনার দোকান দিক, সে কোনো একটা বাজে দলে ভিড়ে গিয়েছিল। মোতিয়া, ববি, মুফতি...এ যেন এক শয়তানের চক্র !"

কিকিরা ঠোঁট টিপে হাসলেন, বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কোনো কিছু ঠিক করে নিও না। তুমি যা বলছ তা হতে পারে। আবার এমনও তো হতে পারে চন্দন, ফুলকুমার স্বভাবে বোকা ছিল। হয়ত সে নিজে কিছু জানত না। চালাকি করে তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।"

কিকিরার কথা শেষ হয়নি, হঠাৎ তারাপদ চেঁচিয়ে উঠল, "কমল, কিকিরা, ওই যে কমল। স্কুটারে করে চলে যাচ্ছে।"

তাকালেন কিকিরা। চন্দনও তাকাল।

তারাপদ হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের কাকে যেন দেখাতে লাগল। স্কুটারে-চড়া লোক অন্তত জনা-তিনেক। "ওই গলি দিয়েই বেরিয়ে এল কমল। ধরব ?"

"ধরো।"

তারাপদ পা চালিয়ে ধরতে যাচ্ছিল কমলকে। কিন্তু ধরতে পারল না। লিন্ডসে স্ট্রিট ধরে কমল সোজা চৌরঙ্গির দিকে চলে গেল।

বিজয় মুস্তাফি

দরজির দোকান নয়, দরজির দোকানের পাশে খোঁড়া মানুষটিকে পাওয়া গেল। নাম তার 'মুফতি' নয়—মুস্তাফি। বলল, "ওই নার্শারির মালিকের বন্ধু আমি। মুস্তাফি। আমার নাম বিজয় মুস্তাফি। ভুল করে আমায় মুফতি বলেছে। মাথায় আসেনি ওর। বুঝতে ভুল হয়েছে।"

কিকিরা খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। রাজকুমারের চিঠি পড়ে যে-মানুষটিকে খুঁজতে এসেছিলেন, বিজয় মুস্তাফির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বিজয়ের বয়েস বছর চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। শক্ত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে। চোখ দেখলে বোঝা যায়, চতুর। বুদ্ধিমান। সাদা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বসেছিল বিজয়। খাটের উপর। লুঙ্গি পরে থাকার দরুন কিকিরা পা দেখতে পাচ্ছিলেন বিজয়ের। খোঁড়া বলতে যেমনটি মনে হয়েছিল তেমন নয়। বাঁ পায়ের নিচের অংশ, হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, সোজা করতে পারে না বিজয়। ভর দিতে পারে না মাটিতে। ক্রাচ নিয়ে হাঁটে।

তারাপদ আর চন্দন বিজয় মুস্তাফির ঘরবাড়ি দেখছিল। দেখার মতন যদিও নয়, তবু এই ঘরের এক অন্যরকম চেহারা রয়েছে। মাঝারি ঘর, গোটাতিনেক জানলা। জানলাগুলোর তলার অর্ধেক খোলা যায় না, ওপরের অংশ খোলা যায়, খোলাই ছিল। খড়খড়ি-করা জানলা। দরজা দুটোও বড়। উঁচু। ঘরের দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে ধরনের, খাপচা-খাপচা হলদেটে দাগ ধরেছে অনেক জায়গায়। মাথার ওপর থেকে বাতি আর পুরনো পাখা ঝুলছিল। আসবাবপত্র বলতে একটা শোবার খাট, টেবিল, দু'তিনটে নানা ছাঁদের চেয়ার। ঘরের একপাশে এক বড় মিটশেফ। মিটশেফের মাথার ওপর কৌটোবাটা, চায়ের কেটলি, প্ল্যাস্টিকের বাটি। মিটশেফের পাশে কেরোসিন স্টোভ আর প্রেশার কুকার। বোঝাই যায়, বিজয় মুস্তাফির এই ঘরই তার সংসার।

কিকিরা যেন ভেবে নিচ্ছিলেন কেমন করে কথা শুরু করবেন। শেষে

বললেন, "আমরা রাজকুমারবাবুর কাছ থেকে আসছি। চেনেন আপনি রাজকুমারকে ?"
বিজয় মুস্তাফি ঘাড় নাড়ল। "নাম জানি। ফুলকুমারবাবুর দাদা।"
"ওঁকে দেখেননি ?"
"না। ফুলকুমারের দোকানে ওঁকে আমি দেখিনি। উনি আসতেন না।"
"কখনোই আসতেন না ?"
"দু' চারবার নিশ্চয়ই এসেছেন। ভাইয়ের দোকান। তবে আমি দেখিনি।"
কিকিরা একবার তারাপদর দিকে তাকালেন। চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বিজয়কে দেখতে দেখতে বললেন, "ফুলকুমারকে খুন করা হয়েছে, আপনি জানেন ?"
ঘাড় হেলাল বিজয়, "জানি।"
"আপনি ফুলকুমারকে কত দিন ধরে চিনতেন ?"
"চার-ছ' মাস।"
"আপনার এই নার্শারি কত দিনের ?"
বিজয় কয়েক পলক কিকিরাকে দেখল। চোখের তলায় যেন হাসি এল। বলল, "দোকান আমার নয় আপনাকে আমি বলেছি। দোকানের মালিক আতাবাবু। আতাবাবু মালিকের ডাকনাম। সবাই তাকে আতাবাবু বলে। মালিক বেহালায় থাকে। তার ভারী এক অসুখ করার পর থেকে রোজ দোকানে আসতে পারে না। ওর লোক আছে দোকান দেখার। আমিও কিছু-কিছু দেখি।"
"আপনি দোকানের কর্মচারী নন ?"
বিজয় যেন অসন্তুষ্ট হল। বলল, "না। আমি কারও চাকরি করি না। কী নাম আপনার ?"
"কিকিরা বলেই ডাকতে পারেন। ওর নাম তারাপদ, আর ওর নাম চন্দন।"
"অদ্ভুত নাম," বিজয় একটু হাসল। "আপনি কে ? কী করেন ?"
"আমি রাজকুমারবাবুর বন্ধু। পুরনো বন্ধু।...মাঝে মাঝে চোর গুণ্ডা বদমাশের খোঁজখবর করি," বলে কিকিরাও মুচকি হাসলেন, "তা বলে পুলিশে কাজ করি না।"
বিজয় কয়েক পলক কিকিরাকে দেখল। তারপর বলল, "ডিটেকটিভ ?"
"আধা-ডিটেকটিভ," কিকিরা হাসলেন, "আমি আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি। যদি আপত্তি না থাকে আমায় বলতে পারেন। না বলতে চাইলে বলবেন না। আমি পুলিশের লোক নই, জোর করে কথা আদায় করতে পারি না।"
চন্দন সিগারেটের প্যাকেট বার করল। বিজয় মুস্তাফি লোকটাকে তার

নির্বোধ মনে হচ্ছিল না।

বিজয় বলল, "কী কথা জানতে চান ?"

কিকিরা বললেন, "আপনি নার্শারির মালিক নন বললেন। আপনি কর্মচারীও নন। তা হলে আপনি কী ? মানে... ?"

"আমার সঙ্গে আতাবাবুর আসল সম্পর্ক ব্যবসার। আমি দেওঘরের লোক। যশিডিতে আমার ফল-ফুলের বাগান আছে। আতাবাবুকে আমি ফুলের টুকরি পাঠাতাম রেল-পার্শেলে। মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসতাম। ওর অসুখ হবার পর আমাকে কলকাতার দোকানটা দেখতে হয়। ও আমায় দেখতে বলেছে। আমি পনেরো-বিশ দিন কলকাতায় থাকি। আবার যশিড়ি ফিরে যাই। পাঁচ-সাতদিন পর আবার আসি। এটাই আমার ডেরা।"

চন্দন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "নিচে গুদোম মতন দেখলাম। ওটা কী ?"

"ইউ. পি. গভর্নমেন্টের হ্যান্ডলুমের গোডাউন। তার পাশে বিহার গভর্নমেন্টের কটেজ ইন্‌ডাসট্রির গোডাউন। এই বাড়িটার নিচে গোডাউন দু' তিনটে। একটা ছোট বেকারি আছে।"

চন্দন সিগারেট দিল কিকিরাকে। বিজয়কেও। তারাপদ সিগারেট নিল না।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল ?"

মাথা হেলিয়ে বিজয় বলল, "চেনা-জানা ছিল। ফুলবাবুর দোকানে বসে কথাবার্তা বলতাম, গল্প করতাম।"

"দোকানটা কেমন চলত ?"

"সবসময় ভাল চলত না। পরবের আগে ভাল চলত।"

"ফুলকুমারের দোকানে আপনি কাদের আসা-যাওয়া করতে বেশি দেখতেন ? কারা এসে আড্ডা মারত ? মানে, ওর বন্ধুবান্ধবের কথা বলছি।"

বিজয় মুঠো পাকিয়ে সিগারেট খায়। শব্দ করে টান মারল সিগারেটে, বলল, "আসত অনেকে। হরিমাধব, মোতিয়া, কমল, ববি। আর-একজন আসত। তার নাম 'টাইগার'। আসল নাম পিণ্টু দুবে।"

চন্দন-তারাপদ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিকিরা সিগারেটের ধোঁয়া গিলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, "মুস্তাফিবাবু, আপনি একটা কথা আমাদের বলতে পারেন ? কিন্তু তার আগে বলুন, ফুলকুমার কেমন ভাবে খুন হয়েছে, কোথায় খুন হয়েছে, আপনি জানেন ?"

বিজয় মুস্তাফি ঘাড় হেলিয়ে বলল, "জানি। শুনেছি। স্টল হোল্ডাররা অনেকেই জানে।"

"তা হলে নতুন করে বলার কিছু নেই।...আচ্ছা, বলতে পারেন, পুলিশ এদিকে কোনো খোঁজখবর করেছে কি না ?"

"আমি জানি না। শুনেছি, একদিন এক ইনস্‌পেক্টারসাহেব এসেছিল।"

"আপনার কী মনে হয় মুস্তাফিবাবু ? ফুলকুমারের কেউ শত্রু ছিল ?"

বিজয় ছাদের দিকে চেয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। পরে মুখ নামিয়ে বলল, "কে কখন শত্রু হয় কেমন করে বলব ? আমিও তার শত্রু হতে পারি," বিজয় যেন চাপা হাসি হাসল।

কিকিরা বুঝতে পারছিলেন বিজয় যেন রেখে-ঢেকে কথা বলছে। তেমন করে কান দিলেন না কথায়। বললেন, "আপনি কেন শত্রু হবেন ! আমি ওর বন্ধুদের কথা বলছি।"

"বাবু, ফুলকুমারের সঙ্গে আমার ফালতু গল্প হত। আমি কিছু জানি না।"

কিকিরা হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে নিলেন, "ববিকে আপনি ফুলকুমারের দোকানে দেখেছেন। কেমন লোক ?"

বিজয় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিকিরার চোখে-চোখে। পরে বলল, "আমার ভাল লাগত না।"

"টাইগার ?"

"পাক্কা গুণ্ডা। ববি কাজ-কারবার করে। টাইগার শুধু গুণ্ডা বদমাইশি করে। শয়তান। পুলিশের খাতায় নাম আছে টাইগারের।"

কিকিরা চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। "ববিকে কোথায় পাওয়া যাবে মুস্তাফিবাবু ?"

"ওর বাড়িতে খোঁজ করুন। চাঁদনি বাজারের পিছনে ওর বাড়ি। টেম্পল স্ট্রিট।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "আরে, ওই দিকে কোথায় যেন আমি গুমঘর লেন দেখেছি," বলে তারাপদর দিকে তাকাল। "মনে আছে, তোকে সেদিন গুমঘর লেনের কথা বলছিলাম !"

তারাপদ মাথা নাড়ল। তার মনে আছে।

বিজয় জানালার দিকে তাকাল অন্যমনস্ক চোখে।

ববির বাড়ির নম্বরটা জানতে চাইলেন কিকিরা। মুস্তাফি সঠিকভাবে বলতে পারল না।

হঠাৎ বিজয় মুস্তাফির যেন মনে পড়ে গেল কিকিরাদের অন্তত এক কাপ করে চা খাওয়ানো উচিত। বলল, "চা খাবেন ?"

সামনের ছোট টেবিলে বাসী চায়ের কাপ পড়ে আছে লক্ষ করেছেন তিনি। মাথা নাড়লেন কিকিরা, "না, থাক্। ...আচ্ছা, ওই টাইগারটিকে কোথায় পাব ?"

বিজয় ভাল করে নজর করল কিকিরাকে। বলল, "এদিকেই পাবেন। ওর বাড়ি কোথায় আমি জানি না। সন্ধেবেলায় ওকে এই এলাকায় দেখা যায়। এলিট সিনেমা, মিনার্ভা সিনেমা, মার্কেটের এ-পাশে ও-পাশে ঘুরে বেড়ায়। ওর দু'চারজন চেলা থাকে সঙ্গে।"

"কেমন দেখতে ?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"লম্বা, কালো। মুখে দাগ। দাঁত উঁচু। দুলে-দুলে হাঁটে।"

"ফুলকুমারের সঙ্গে ওর ভাব কত দিনের ?"

"বলতে পারব না।"

"কেন আসত ফুলকুমারের কাছে, জানেন কিছু ?"

"না।"

কিকিরার যেন আর কিছু জানার নেই। উঠে পড়ার ভাব করে বললেন, "আজ আমরা চলি। পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব, মুস্তাফিবাবু। চলো, চন্দন।" বলে উঠে পড়লেন কিকিরা। "ভাল কথা, একটু জল খাওয়াতে পারেন ?"

"জল ? দিচ্ছি।" বিজয় মুস্তাফি উঠে দাঁড়াল। ক্রাচ নিল। জল গড়িয়ে দেবার জন্যে জানলার দিকে যাচ্ছিল।

কিকিরা চোখের ইশারায় চন্দনকে কিছু বললেন। চন্দন বুঝতে পারল। বিজয় মুস্তাফির হাঁটা নজর করতে লাগল তীক্ষ্ণ ভাবে।

জল গড়িয়ে নিল বিজয়। কাচের গ্লাস।

এগিয়ে গেলেন কিকিরা। গ্লাস নিলেন। "আপনার এখানে ফুলকুমার আসত না ?"

"না।"

"কোনো দিনই আসেনি ?"

"না। দোকানে দেখা হত। আসবার দরকার করেনি।"

জল খেতে গিয়েও কিকিরা মুখের সামনে থেকে গ্লাস সরিয়ে নিলেন। "ববি, টাইগার, এরা এখানে এসেছে ?"

"ববি এক-আধবার এসেছে। টাইগার আসেনি।"

"কমল ?"

"কমল আসত।"

"শেষ কবে এসেছে ?"

"শেষ ?" বিজয় কিকিরার চোখের দিকে তাকাল। মনে করবার চেষ্টা করছে যেন। বলল, "দিন-তিনেক আগে।"

তারাপদ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

কিকিরা জল খেলেন। পুরো গ্লাস খেলেন না। আধগ্লাস মতন জল খেয়ে নিজেই জানলার পাশে রাখতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গেল মাটিতে। শব্দ হল ভাঙার। ভেঙে চুরমার হল, কাচ ছড়িয়ে গেল মাটিতে পায়ের কাছে।

"ইশ্ !" কিকিরা আফসোসের শব্দ করে বিজয়কে ধরে ফেললেন, "হাত ফসকে পড়ে গেল। সাবধান মুস্তাফিবাবু। পায়ে কাচ ফুটবে। এ-দিক দিয়ে

আসুন। কাচের টুকরো বাঁচিয়ে।”

বিজয় মুস্তাফিকে সাবধানে কাচের টুকরো থেকে সরিয়ে আনছিলেন কিকিরা। মুস্তাফির বগলে ক্রাচ।

এক টুকরো বিশ্রী কাচের ধারালো ফলার দিকে তাকিয়ে কিকিরা বললেন, “দেখবেন, সামলে।” বলতে বলতে কী যে করলেন কিকিরা, বিজয়ের ক্রাচ্ পিছলে গেল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে-যেতে নিজেকে সামলে নিল বিজয়। কিকিরা পায়ে করে সেই বিশ্রী কাচের টুকরোটা সরিয়ে দিলেন।

“তারাপদ, কাচের টুকরোগুলোকে সরিয়ে একপাশে রেখে দাও তো,” কিকিরা ব্যস্তভাবে বললেন। তারপর বিজয়ের দিকে তাকালেন, “আপনার একটা ক্ষতি করলাম। স্যরি।”

বিজয় কিছু বলল না।

বাইরে এসে কিকিরা কিছু বলার আগেই তারাপদ বলল, “মুস্তাফি মিথ্যে কথা বলেছে, কিকিরা। ও বলল, কমল দিন-তিনেক আগে এসেছিল। ডাহা মিথ্যে কথা। কমল আজই এসেছিল। ওই গলির মুখেই আমি কমলকে দেখেছি।”

কিকিরা কিছু ভাবছিলেন। বললেন, “গলির মুখে দেখেছ বলেই কিছু প্রমাণ হয় না। তবে, তুমি যা বলছ, সেটাই ঠিক মনে হয়। মুস্তাফির ঘরে দুটো চায়ের কাপ পড়ে ছিল। আমাদেরই চোখের সামনে। টেবিলের ওপর। কাপ দুটোর তলায় তলানি চা যতটুকু পড়ে ছিল, তা বাসী নয়। টাটকা চেহারা। মনে হয়, কমল আর মুস্তাফি বসে-বসে চা খেয়েছে।”

চন্দন বাহবা দেবার মতন করে বলল, “দারুণ, কিকিরা। ওয়ান্ডারফুল।”

কিকিরা বললেন, “দাঁড়াও, দাঁড়াও, আরও আছে। মুস্তাফি লোকটা খোঁড়াও নয়।”

“খোঁড়া নয় ?” তারাপদ অবাক হয়ে বলল।

“না,” মাথা নাড়লেন কিকিরা, “ও লুঙ্গি পরে বসে ছিল দেখেছ তো ? খোঁড়া পায়ের দিকে নজর পড়তে আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। শরীরের যে-অঙ্গ কাজ করে না, তার বাইরের চেহারা বড় একটা স্বাভাবিক হবার কথা নয়। মুস্তাফির খোঁড়া পায়ের চেহারা দেখে আমার মনে হল, পায়ের চেহারায় গোলমাল তেমন নজরে আসছে না। ব্যাপারটা জানার জন্যে আমি একটা চাল চাললাম। উঠে আসার সময় জল খেতে চাইলাম মুস্তাফির কাছে। মুস্তাফি জল দিতে গেল। চন্দনকে বললাম ওর পায়ের দিকে নজর রাখতে। তারপর তো দেখলে কী করলাম ? ইচ্ছে করে ওর পায়ের কাছে কাচের গ্লাস ভাঙলাম। খোঁড়া মানুষকে আগলাবার নাম করে ঠেলে দিলাম কাচের ওপর। ভাঙা কাচ থেকে পা সামলাতে গিয়ে মুস্তাফি খোঁড়া পা সোজা করে নিজেকে সামলে নিল। অবশ্য মুহূর্তের জন্যে। আমার চোখ কিন্তু এড়ায়নি। কী চন্দন ? আমি

রাইট ?”

চন্দন বলল, “রাইট। আমিও দেখেছি। আপনি কিকিরা, ফ্যান্টাস্টিক্।”

কিকিরা বললেন, “আমায় খোঁজ নিতে হবে, লোকটা কে ? কেন ও খোঁড়া সেজে রয়েছে ?”

“কেমন করে খোঁজ নেবেন ?”

“আমার ব্যবস্থা আছে ; মুস্তাফি বললে, যশিডিতে ওর বাগান।...তোমরা বোধহয় সেই কাপালিক ভুজঙ্গের কথা ভুলে যাওনি। তখন তোমাদের বলেছিলাম, যশিডিতে আমার জানাশোনা পুলিশের লোক আছে। তেওয়ারি। আমি খোঁজ করে নেব।”

ববির সঙ্গে

কলিংবেলটা বাজে কী বাজে না কিকিরা বুঝতে পারছিলেন না। এই নিয়ে বার-তিনেক বোতাম টিপলেন কলিংবেলের। কেউ দরজা খুলল না। অথচ ভেতরে লোক আছে। গান বাজছিল। রেকর্ড। জোরেই বাজছিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই বাজনা শুনতে পাচ্ছিলেন কিকিরা। কোনো ইংরেজি গান-বাজনা চলছে।

তারাপদ বারবার সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। অদ্ভুত বাড়ি, অদ্ভুত সিঁড়ি। কলকাতা শহরে এমন জেলখানার মতন বাড়ি আছে, স্বর্গে চড়ার মতন সিঁড়ি আছে সে জানত না। পাড়াটা যে অনেক পুরনো বোঝা যায় ; ঘরবাড়ির বেশির ভাগই বোধহয় শ'খানেক বছরের পুরনো। ছাঁদছিরি থেকে মনে হয়, অনেককাল আগে যেন এখানে সাহেবসুবোদের ব্যবসার মালপত্র রাখার গুদোমখানা ছিল। কে জানে কী ছিল !

কিকিরা মুখ ফিরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তারাপদকে, দরজা খুলে গেল।

ববি। কিকিরা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলেন, ও ববি।

ববি বলল, “ইয়েস ? কিয়া বাত ?”

কিকিরা বুঝতে পারলেন ববি জানতে চাইছে, 'কে তোমরা ? কী দরকার ?'

কিকিরা বললেন, “ববি ?”

ববি মাথা হেলাল, “ইয়েস।”

কিকিরা পকেট হাতড়ে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন।

কার্ড নিয়ে ঘরের আলোয় লেখাগুলো পড়ল ববি। তারপর খানিকটা অবাক হয়ে দেখল কিকিরাকে, “ম্যাজিশিয়ান ?”

“কিকিরা,” মাথা ঘাড় ঝুঁকিয়ে কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করলেন। “ইন্ডিয়ান ; নট্ জাপানিজ্।”

ববি হেসে ফেলল, “আসুন।” স্পষ্ট বাংলায় বলল ববি।

কিকিরা আর তারাপদ ভেতরে এলেন। দরজা বন্ধ করে দিল ববি।

ঘরের অবস্থা দেখে তারাপদ হকচকিয়ে যাচ্ছিল। দশ-বিশ হাতের ঘর, কিন্তু জিনিসপত্রে ঠাসা। সোফাসেট, টেবিল, আলমারি, স্টিরিও। একপাশে মাঝারি এক কাচের বাক্সে রঙিন মাছ, অ্যাকোয়ারিয়াম। টিমটিমে আলো জ্বলছে বাক্সের মধ্যে। তারই পাশে নিচে গোটা দুই বড়-বড় পেস্টবোর্ডের প্যাকিং-বাক্স।

ববি এগিয়ে গিয়ে স্টিরিও বন্ধ করে দিল। ঘরের ডান পাশে দরজা। ভেতর দিকের জানলা দিয়ে করিডোর দেখা যাচ্ছিল। রান্নাবান্নার গন্ধ আসছিল ভেতর থেকে। ববি বোধহয় একা থাকে না।

কিকিরা ববিকে দেখছিলেন। মাথায় বেঁটে। নাক আর চোয়াল খানিকটা বসা ; বিশেষ করে নাক, নয়ত ববিকে দেখতে খারাপ নয়। চোখ সামান্য কটা। মাথার চুল কোঁকড়ানো, ব্যাকব্রাশ করা। গায়ের রঙ ফরসা। ববির পরনে সাদা শার্ট-প্যান্ট। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি।

কিকিরা বললেন, "আমি দু'দিন এসে ঘুরে গিয়েছি।"

"আপনি এসেছিলেন ? দিদি বলছিল, কে একজন এসে..."

"দিদি ? আমার সঙ্গে আপনার দিদির দেখা হয়নি। একটা ছোকরা...।"

"আমাদের বাড়িতে কাজ করে। দিদিকে আপনার কথা বলেছে। ...বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?"

কিকিরা আর তারাপদ বসলেন। তারাপদ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। ববি সম্পর্কে যা শুনেছে, কিছুই যে মিলছে না!

"আপনি কলকাতায় ছিলেন না ?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"না। আমার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। মাঝে-মাঝে লরির সঙ্গে বাইরে যাই। বাইরে কাজ থাকে। নিজে না দেখলে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা চলে না।"

"আপনার শুনেছিলাম বাস-মিনিবাসও...।"

"না। আমাদের দুটো লরি আছে। আমি আর আমার একজন বন্ধু মিলে ব্যবসা করি।"

তারাপদ কী ভেবে আচমকা বলল, "আপনি কলকাতার লোক ?"

ববি হেসে উঠল, "তিন জেনারেশান। আমার বাবা ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের অফিসার ছিলেন। ঠাকুরদা পোর্টে কাজ করতেন।"

কিকিরা হেসে বললেন, "ববি নাম শুনে অন্যরকম মনে হয়েছিল।"

"নামটা বাবা দিয়েছিলেন। বাবা হকি-প্লেয়ার ছিলেন। বাবা ভেবেছিলেন, আমি ববি বিশ্বাসের মতন ভাল হকি-প্লেয়ার হব। ববি বিশ্বাসের খেলা আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। ভাল খেলত। এখন মনে নেই।"

"আপনি বক্সার ?"

ববি হাসল। ঝকঝকে হাসি, "ছিলাম।"

কিকিরা ববির ভাবভঙ্গি লক্ষ করছিলেন। ছেলেমানুষি রয়েছে।

ববি নিজেই হঠাৎ বলল, "আমার বাড়িতে ম্যাজিশিয়ান কেন ?" বলে হাসল।

কিকিরা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ম্যাজিশিয়ানদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভাল নয়, স্যার ?"

ববি টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে নিল সিগারেটের, "না না, ভালই লাগে। ফুলকুমার আমার বন্ধু ছিল। নাম শুনেছেন ?" বলে বাঁকা চোখেই যেন তাকাল।

কিকিরা বুঝতে পারলেন, ববিকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। বললেন, "শুনেছি। আগে শুনিনি। এখন শুনছি।"

"আপনারা বোধহয় সেজন্যে এসেছেন ?" ববি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল কিকিরার দিকে।

কিকিরা ববিকে লক্ষ করলেন। লুকোচুরি করে লাভ হবে না।

সিগারেট নিতে-নিতে কিকিরা বললেন, "আপনি বুঝলেন কেমন করে ?"

ববি লাইটার এগিয়ে দিল। চোখে হাসি। বলল, "বোঝা যায়।"

কিকিরা সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "আমি রাজকুমারবাবু, মানে ফুলকুমারের দাদার পরিচিত। ছোট ভাই খুন হয়ে যাবার পর তাঁর মনের অবস্থা ভাল নয়। রাজকুমারবাবু এই খুনের রহস্যটা জানতে চান। কেন ফুলকুমার খুন হল ? কে তাকে খুন করল ?"

ববি নিজের সিগারেট ধরাল। ভেতর দিকের জানলার কাছে গিয়ে হাঁক মেরে কিছু বলল। ফিরে এল। "আপনি ম্যাজিশিয়ান, না ডিটেকটিভ ?" ঠাট্টা করেই বলল ববি।

কিকিরা জোরে হেসে উঠলেন। "আমি ম্যাজিশিয়ান ! এখন আর ম্যাজিক দেখাই না। পারি না। আর মাঝে-মাঝে শখের গোয়েন্দাগিরি করি স্যার ; করতে হয়," বলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। দু-চার পা এগিয়ে অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে গেলেন। রঙিন মাছ দেখতে দেখতে বললেন, "বিউটিফুল ! ওই মাছটা সোনার গয়নার মতন দেখতে। কী সুন্দর রঙ ! ওই জাতের আর ক'টা আছে ? দুই, তিন...।"

ববি বলল, "দু' জোড়া। ওকে বলে গোল্ডেন নাইফ।"

"নাইফ ? ছুরি ?"

"পাতলা ছুরির মতন দেখতে। এ-সমস্ত নাম বাজারের লোকেরা দেয়। আসল নাম কেউ জানে না।"

"তা ঠিক," কিকিরা মুখ ফেরালেন, "যা বলছিলাম, ফুলকুমারকে আমি দেখিনি। চিনি না। রাজকুমারকে চিনি। পুরনো চেনাজানা লোক। তিনি আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করছেন। শুধু সেই জন্যে... !"

কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ববি বলল, "আপনি আমার কাছে কেন

এসেছেন ? আপনি কি ভাবছেন, এই খুনের মধ্যে আমার হাত আছে ?"

মস্ত জিভ বার করে কিকিরা ছি ছি করে উঠলেন। বললেন, "না, না, এ আপনি কী বলছেন, স্যার ! আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি, সাহায্য নিতে এসেছি।"

"আপনি এসেছেন সাহায্য নিতে !...কই, ফুলকুমারের দাদা তো আসেননি ?"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, "আসা উচিত ছিল, স্যার। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে রাজকুমারবাবুর ?"

• "না।"

"হয়ত সেজন্যে আসেনি। আপনার কথাও রাজকুমার আমাকে বলেনি।"

"আমার কথা কে বলেছে আপনাদের ? কমল ? মুস্তাফি ?"

তারাপদ একদৃষ্টে ববির দিকে তাকিয়ে ছিল। ববি যেন সবই জানে।

কিকিরা বললেন, "ঠিকই ধরেছেন।"

ববির মুখ রুক্ষ রূঢ় হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে কিছু বলল অস্ফুটভাবে। শোনা গেল না। শেষে ববি বলল, "চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই !...যাক গে, আপনি আমার কাছে কী ধরনের সাহায্য চান ?"

একটা ছেলে কফি নিয়ে এল ট্রে করে। কিকিরা চিনতে পারলেন। এর আগে এই ছেলেটির কাছ থেকেই ববির খবর নিয়ে গেছেন।

ছেলেটি চলে গেল।

ববি ডাকল কিকিরাকে, "নিন, কফি খান।"

ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন কিকিরা। বললেন, "আপনার কী মনে হয় ? হঠাৎ ফুলকুমারকে খুন করার দরকার হল কেন ? খুন করার কারণ ?"

ববি সরাসরি জবাব দিল না। বলল, "আমার কথা পরে। আপনার ধারণা কী ?"

"আমি...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারকে খুন করার পেছনে কার স্বার্থ ? কী জন্যে তাকে খুন করা হল ? এখনো কোনো হদিস করতে পারিনি। তবে বুঝতে পারছি, ভেবেচিন্তে ছক করে সাজিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। যাকে বলে প্ল্যান করে।"

ববি বেঁকা করে হেসে বলল, "এই প্ল্যানের মধ্যে আমাকে আপনি জড়াতে চান ? দেখুন মশাই, আমি যদি খুন করতে চাইতাম, ফুলকুমারকে তুলে নিয়ে যেতাম লরি করে, খুন করে জি. টি. রোডে, জঙ্গল ঝোপঝাড়ে ফেলে দিতাম। প্ল্যান আমার মাথায় আসত না। তার ধার ধারতাম না। আমি লেখাপড়া কম শিখেছি। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কম। আপনাদের প্ল্যান আমার আসে না। তবে আমি খুনখারাপির মধ্যে থাকি না। কখনো ছিলাম না। আমি খুনি হলে আমার দিদিকে দেখতেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। দিদি ছাড়া আমার কেউ নেই।

আর দাদু বেঁচে থাকতে কোনো নোংরা কাজ আমি করব না, এটা ফুলকুমারও জানত।”

কিকিরা কফিতে চুমুক দিলেন। দেখছিলেন ববিকে। ছোকরা সাফসুফ কথা বলে। মেজাজি।

“আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ফুলকুমার আপনার বন্ধু হলেও তার ওপর আপনার রাগ ছিল!”

“যদি সত্যি কথা শুনতে চান, রাগ ছিল।...কেউ যদি বন্ধু হয় তার ওপর রাগ করা যাবে না, এমন কথা আছে?”

“তা ঠিক। তবে রাগের কারণ তো থাকবে! আপনার রাগ ছিল কেন?”

“তাও বলতে হবে?”

“বললে উপকার হয়।”

“ফুলকুমার ম্যাজিক-ট্যাজিক কী করত আমি জানি না। আমি ওর ম্যাজিক দেখিনি। দোকানে বসে কখনো কখনো তাসের খেলা দেখাত। দেখেছি। কিন্তু আমি জানতাম, ফুলকুমার তার খেলনার দোকানে বসে চোরাই স্মাগলড্ মালপত্র বিক্রি করে।”

তারাপদ এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, হঠাৎ বলল, “চোরাই সোনা?”

ববি তারাপদর দিকে তাকাল। “শুধু সোনা নয়, আরও অনেক কিছু।”

“তার খরিদ্দার কারা ছিল?”

“খরিদ্দাররা সোজাসুজি বোধহয় আসত না। স্মাগলাররাই তাদের পাঠাত। ফুলকুমার ছিল, কী বলব, সাপ্লায়ার। এজেন্ট। মানে, যারা বেচাকেনা চালাত, তারা ফুলকুমারের হাত দিয়ে কারবার করত। ভাল কমিশন পেত ফুলকুমার।”

কিকিরা কফি খাচ্ছিলেন। খেতে-খেতে বললেন, “আপনি নিজের চোখে এরকম কাউকে দেখেছেন?”

“আমার চোখের সামনে আট-দশ হাজার টাকা রতির চুনি, হীরে বিক্রি হবে এটা কি আপনি আশা করেন? আপনি কি মনে করেন, যারা চোরাই মাল বিক্রি করে, তারা ইঞ্চি-ছয়েক লম্বা ইটালিয়ান রিভলবার আমার নাকের ডগায় বিক্রি করবে?”

তারাপদ যেন চমকে ওঠার মতন শব্দ করল। কিকিরাও চুপ।

ববি বলল, “আপনি ভাববেন না, ফুলকুমার আমার কাছে তার লুকনো কারবারের কথা বলত। আমি জানতাম। একবার ফুলকুমার আমাকে বলেছিল, ছোট এক পেটি চকোলেট ধানবাদে পৌঁছে দিতে। বলেছিল, পার্টি হাজার চারেক টাকাও দেবে। আমি রাজি হইনি। বুঝতেই পারছেন, পেটিটা চকোলেটের নয়।...মাল-মশলার। মানে...” ববি আঙুলের ইশারায় গুলি-বন্দুক বোঝাল।

কিকিরা একদৃষ্টে ববির দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক পলক, তারপর

বললেন, "আপনি জানলেন কেমন করে ?"

ববি এবার মুচকি হাসল। বলল, "আপনি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন, অথচ সহজ নিয়মগুলো জানেন না। কোনো চোরাই-কারবার একা-একা করা যায় না। তার জন্যে দল থাকা দরকার। চোরাই-কারবারটা হল রিলে রেসের মতন। হাতে-হাতে এগোয়।"

কিকিরা বললেন, "আপনি বলতে চাইছেন, ফুলকুমার আপনাকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল।"

"হ্যাঁ। আমার ট্রান্সপোর্টের কারবার। আমার পক্ষে সোনা-দানা, রিভলবার, গুলি-বারুদ কোনোটাই জায়গামতন পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব নয়। ধরুন, আমাকে বলা হল, ট্রাক নিয়ে যাবার সময় অমুক জিনিসটা পানাগড়ে অমুক লোকের হাতে ফেলে দিয়ে যেতে। কাজটা কি কঠিন ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কফি খেতে লাগলেন চুপচাপ।

তারাপদ বলল, "ফুলকুমার যে একটা বাজে দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, আমরাও তা সন্দেহ করি। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দলের কাউকে ধরতে পারছি না।"

ববি ঘাড় কাঁপাল। যেন বলল, সে আপনারা বুঝে নিন।

কিকিরা কফি শেষ করলেন। বললেন, "টাইগারকে চেনেন, স্যার ?"

"ভাল করেই চিনি।"

"কেমন লোক ?"

"পয়সা পেলে সবই করতে পারে।"

"খুন ?"

"ওটা বোধহয় পারে না। চুরি, গুণ্ডামি, সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক, পকেটমার, ছিনতাইয়ে তার হাত আছে। খুনের ব্যাপারে এগোবে বলে মনে হয় না। আর যদি-বা এগোয়, বে-পাড়ায় খুন করতে যাবে না। টাইগার সেই ধরনের ক্রিমিন্যাল নয়।"

কিকিরা যেন হতাশ হয়ে বললেন, "না, কিছুই ধরা যাচ্ছে না।...আচ্ছা ববিসাহেব, একটা কথা বলুন, ফুলকুমার নোংরা ব্যাপারে হাত গলিয়েছে দেখেও আপনি ওর বন্ধু থাকলেন কেমন করে ?"

ববি মুচকি হাসল, "কেন বলুন তো ? আপনি সঙ্গদোষের ভয় পাচ্ছেন !...যাক্‌, এবার আমায় ছাড়ুন। আমি দিদিকে নিয়ে সিনেমায় যাব। তৈরি হতে হবে। দরকার পড়লে পরে আসবেন। আড্ডা মারতে আমার আপত্তি নেই।" বলে ববি হাত তুলে বিদায় জানাল।

কিকিরা যেন বাধ্য হয়ে উঠে পড়লেন।

কমলের হোটেল

দু'তিনটে দিন কিকিরাকে বাড়িতে পাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ল। তারাপদরা আসে যায়, অপেক্ষা করে, কিকিরাকে ধরাই যায় না। বগলা কিছু বলতে পারে না। শুধু বলে, 'আপনাদের বসতে বলে গেছেন।'

তিন দিনের দিন কিকিরাকে ধরা গেল। চন্দন বলল, "আপনার ব্যাপার কী স্যার ? আমরা তো ভাবলাম, আপনি নিজেই গায়েব হয়ে গেছেন।"

কিকিরা বললেন, "আমার দোষ নেই। রোজই বলে যাই তোমাদের বসিয়ে রাখতে, ফিরে এসে দেখি, তোমরা নেই। না, না, দোষ তোমাদেরও নয়। আমি সময় মতন ফিরতে পারি না। আটকে যাই।"

"যাক গে, আসল কথা বলুন ! প্রগ্রেস্ কতদূর ?" তারাপদ বলল।

"মোটামুটি।...আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, তারাপদ ; শেষ রক্ষা করা যাবে না।"

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, "তা হলে আর বেগার কেন খেটে মরছেন। ছেড়ে দিন। ফর নাথিং..."

চন্দনকে কথা শেষ করতে দিলেন না কিকিরা। বললেন, "আর একটু দেখি। কাল একটা লাস্ট চান্স নেব !"

"লাস্ট চান্স ?"

"কাল আমরা কমলের সঙ্গে দেখা করব। তার হোটেলে। বাড়িতে নয়।"

তারাপদ দু' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। "হোটেলে ?"

"বাড়িতে যাব না। হোটেলেই যাব।...তুমি একটু খোঁজ করে জেনে নাও তার ডিউটি কখন ?"

"দুপুরেই হবে।"

"বিকেলেও হতে পারে। খোঁজ করে নাও," বলে কিকিরা পিঠ এলিয়ে বসলেন, "ভাল কথা, যশিডি থেকে চিঠির জবাব পেয়েছি। তেওয়ারি লিখেছে, মুস্তাফি বলে কোনো লোকের বাগান যশিডিতে নেই। বিজয় মুস্তাফি বলে কোনো লোকও থাকে না। তবে মধুপুরের এক মুস্তাফি নাশারির ব্যবসা করে।"

চন্দন কিকিরাকে দেখছিল। বলল, "আপনি তা হলে ঠিকই ধরেছেন, কিকিরা। বিজয় মুস্তাফি একটা ব্লাফ !"

কিকিরা একটু হেসে বললেন, "লোকটা ভাল অভিনেতা। তা ছাড়া কী জানো, ও যে-ধরনের খোঁড়া তেমন খোঁড়া হওয়া সহজ। আমার মনে হয়, ও যদি প্যান্ট পরে, ওইরকম এক পেয়ে ল্যাংচা হয়ে থাকে, চট্ করে ধরাও যাবে না।"

চন্দন বলল, "ওর মতলবটা কী বলুন তো ?"

"সেটাই বুঝতে পারছি না। তবে লোকটা নিজেকে ধরিয়ে দিয়েছে। ফুলকুমারের ব্যাপারটার সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে। কীভাবে আছে সেটা ধরতে হবে।"

চন্দন ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। তার কাজ আছে। বলল, "আমরা আজ উঠি, কিকিরা। রাত আটটা। কাল দেখা হবে। আপনি কখন যাবেন জানলে সুবিধে হত।"

"তারাপদ খোঁজ না করা পর্যন্ত বলতে পারছি না। তা ও তোমায় জানিয়ে দেবে। একটা কথা বলে নিই। কমলের হোটেলে আমি আর তুমি দু'জনে যাব। তারাপদকে বাইরে বসিয়ে রাখব।"

"কেন, আপনি কি মনে করছেন..."

"আমি কিছুই মনে করিনি। কমল যে মুস্তাফির কাছ থেকে আমাদের খবর শুনবে, সেটাও আমি ধরে নিচ্ছি। তবু তারাপদকে হোটেলের বাইরে রাখব।"

"যা ভাল বোঝেন। উঠি..."

তারাপদ আর চন্দন উঠে পড়ল।

একপশলা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল শেষ বিকেলে। বাতাসে তখনও বাদলা ভাব, আকাশে মেঘও রয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে বোঝা গেল, আজ গুমোট বা গরম থাকবে না, বরং আরামই লাগবে।

কিকিরা ভাড়া মিটিয়ে দিলেন ট্যাক্সির। সন্ধে হয়ে আসার মতন দেখাচ্ছে। ঘড়িতে মাত্র সোয়া ছয়। কিকিরা বললেন, "তারাপদ, তুমি হোটেলের বাইরে কোথায় থাকবে ?"

"আপনি বলুন।"

"রেস্টুরেন্ট ?" চার দিকে তাকালেন কিকিরা। রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলেন না। সোডা ফাউনটেন গোছের একটা কী আছে দেখা গেল। কিকিরা বললেন, "আপাতত ওখানে থাকবে। একটু নজর রাখবে। অবশ্য নজর রাখবে কার ওপর ? তুমি আমি ক'জনকে বা চিনি ? তবু নজর রেখো।"

কিকিরা চন্দনকে নিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন।

হোটেলটা বাইরে থেকে দেখতে বাহারি নয়। ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায়। বাহারি না হোক, এই হোটেলের প্রাচীনত্ব রয়েছে, হয়ত সেই জন্যেই খানিকটা আভিজাত্য। রঙচঙে ঝকঝকে ভাবের চেয়ে পরিচ্ছন্নতাই নজরে আসে। ছোট রিসেপশান। দু'জনে বসে কাজকর্ম করছিল। পাশে ফোন।

চন্দন এগিয়ে গিয়ে কমলের খোঁজ করল।

কমল বসে দোতলায়। সিঁড়ির মুখে বাঁ দিকের ঘরে।

কিকিরা আর চন্দন সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় এলেন। একটা ঘর দেখতে পেল চন্দন বাঁ দিকে। 'অফিস' লেখা রয়েছে। এপাশে দোতলার অন্য

ঘরগুলো থাকা-খাওয়ার জন্যে নয় বলে মনে হল। বোধহয় হোটেলের স্টোর, কিচেন, ম্যানেজারের ঘরটর হবে। তিরিশ-পঞ্চাশ পা তফাতে ঢাকা বারান্দা চোখে পড়ছিল। টেবিল-চেয়ার পাতা। হোটেলের রেস্টুরেন্ট হতে পারে।

অফিস-ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল।

কিকিরা কমলকে আন্দাজ করে নিতে পারলেন। ছবি দেখা আছে কমলের।

এগিয়ে গেলেন কিকিরা। কমল বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল। হাতে কাজ নেই। তার টেবিলের পাশে খাতাপত্র, বিল-বুক, কলম-পেনসিল পড়ে আছে। এক কাপ চা। একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ।

কিকিরা হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "কমল ব্যানার্জি?"

কমল দেখছিল কিকিরাকে। "আমি। আপনি?"

"কিকিরা। রাজকুমারবাবুর বন্ধু," বলে দু' পা পেছনে দাঁড়ানো চন্দনকে দেখাল, "চন্দন।"

কমলের মুখ দেখে মনে হল, ও যেন কিকিরার কথা আগে শোনেনি। বলল, "কী ব্যাপার বলুন?"

"আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। একটু সময় লাগবে।"

"সময়! কিন্তু এখন...এখন আমার সময় কোথায়?"

"ঘণ্টাখানেক," কিকিরা বিনয়ের মুখ করে বললেন।

কমলের হাত-কয়েক তফাতে অবাঙালি মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক কাজ করছিলেন। বেয়ারা আসা-যাওয়া করছিল।

কমল বলল, "স্যরি। দু'পাঁচ মিনিট কথা বলা যায়, এক ঘণ্টা গল্প করা অসম্ভব?" বলে হাত দিয়ে কাগজপত্র দেখাল, "এত কাজ।"

কিকিরা বললেন, "তা হলে ছুটির পর?"

"ছুটির পর?" কমল অবাক হয়ে বলল, "আমার ছুটি হতে-হতে আট সোয়া-আট বাজবে। ততক্ষণ..."

"আমরা অপেক্ষা করব।"

"অপেক্ষা করবেন?"

"তাতে আর কী! বাইরে রিসেপশানের ওখানে বসে থাকব! এখন ক'টা বাজে? সাড়ে ছয়। ঘণ্টা দেড়েক বসে থাকা যাবে! তুমি কী বলো, চন্দন?"

চন্দন মাথা নাড়ল, "নো প্রবলেম।"

কমল প্রথমটায় যেন বুঝতে পারেনি, বা, খেয়াল করেনি। পরে তার খেয়াল হল। বলল, "রিসেপশানে বসে থাকবেন? এতক্ষণ!"

কিকিরা রগুড়ে হাসি হেসে বললেন, "নট্ মাচ্ স্যার। ওনলি ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স। রেশনে লাইন দিলে দু' ঘণ্টাও দাঁড়াতে হয়, ঝাঁঝাঁ রোদে। আর এখানে তো আরামেই বসে থাকব, কী বলো চন্দন?"

চন্দন মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

কমলকে খুশি মনে হল না, বাধ্য হয়েই বলল, "বেশ, বসুন।"

কিকিরা চলে যাচ্ছিলেন, কমলই আবার বলল, "আমার সঙ্গে আপনাদের এমন কী কথা মশাই, দেড় ঘণ্টা বসে থাকবেন?"

"জরুরি কথা। শুনলেই বুঝতে পারবেন।"

"রাজাদা আপনাদের পাঠিয়েছেন?"

"আপনি কাজ সেরে নিন; আমরা আছি। পরে কথা হবে।"

কিকিরা আর দাঁড়ালেন না। চলে এলেন চন্দনকে নিয়ে।

নিচে রিসেপশানের জায়গায় ভিড় প্রায় নেই। সোফাসেট পাতা ছিল। দেওয়ালে দু' একটা ছবি ঝুলছে।

কিকিরা একপাশে বসলেন। সামান্য আড়াল থাকে যেন। চন্দনকে বললেন, "একটা ম্যাগাজিন টেনে নাও তো।"

চন্দন গোটা দুয়েক ম্যাগাজিন তুলে আনল।

"ছোকরাকে কি নার্ভাস দেখলে?" কিকিরা বললেন।

"নার্ভাস? না, নার্ভাস নয়, তবে..."

"তবে আমাদের দেড় ঘণ্টা বসে থাকায় ও খুশি হল না।"

"কেন বলুন তো?"

"দেখা যাক্, কেন? একটা সিগারেট দাও। আর শোনো, তুমি একবার বাইরে গিয়ে তারাপদকে বলে এসো, আমরা না বেরোনো পর্যন্ত ও যেন হোটেলের কাছাকাছি থাকে। দরকার হলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। পালিয়ে না যায়।"

চন্দন সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই কিকিরার হাতে তুলে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

কিকিরা সিগারেট ধরালেন। ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। হোটেলে যারা আসছে-যাচ্ছে তাদের লক্ষ করতে লাগলেন।

চন্দন ফিরছিল না। দেওয়াল-ঘড়িতে পৌনে সাত হল। বোধহয় তারাপদর সঙ্গে কথা বলছে চন্দন। কিকিরা ব্যস্ত হলেন না, অধৈর্য হলেন না।

লোকজন দেখতে দেখতে কিকিরার মনে হল, এখানে যারা আসে, তারা বেশির ভাগই অবাঙালি। হোটেলের খদ্দেররা মাঝারিআনার। ব্যবসাপত্রের কাজে যারা কলকাতায় আসে, সেই ধরনের লোকই বেশি। বেড়াতে এসে হোটেলে উঠেছে বউ-বাচ্চা নিয়ে, এমন লোক চোখে পড়ে না বললেই হয়।

চন্দন ফিরে এল। এসে ঠাট্টার গলায় বলল, "তারা একটা পজিশন পেয়ে গেছে। ইলেকট্রনিকস্ মালপত্র বিক্রির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, দেড়-দু' ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলে পা ধরে যাবে।"

"যাক্। পায়চারি করুক। লয়টারিং।"

আরও খানিকটা সময় কাটল। সোয়া সাত।

কিকিরা আর চন্দন কথা বলছেন, নেপালি চেহারার এক বেয়ারা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। কিকিরাকে দেখল। বলল, "কমলবাবুসে মোলাকাত করনে কৌন্ আয়া ? আপ ?"

"হ্যাঁ।"

"দেরি হোগা সাব ! ন' বাজ্ যায়গা।"

"ঠিক হ্যায়। আগার দশ্ ভি হো তো বাত নেহি..."

বেয়ারাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে থাকল ক' মুহূর্ত ; তারপর চলে গেল।

চন্দন বলল, "কী ব্যাপার কিকিরা ? কমল আমাদের তাড়াতে চাইছে যেন !"

"ঠিক ধরেছ। হঠাতে চাইছে।"

"কেন ?"

"কেন ? হয় ও আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি নয়, না-হয় এই হোটেল থেকে বেরিয়ে ও কোথাও যাবে।"

"কিংবা কেউ আসবে। আসার কথা আছে।"

"রাইট্ স্যার।" কিকিরা সিঁড়ির দিকে তাকালেন, "আমরা বাপু উঠছি না। সে যত রাতই হোক।"

চন্দন বলল, "আমি একটা চেষ্টা করব ?"

"কী চেষ্টা করবে ?"

"বাইরে গিয়ে ফলস্ ফোন করব। এই হোটেলের দু'একটা বাড়ির পর একটা ড্রাগ স্টোর আছে। ওখান থেকে হোটেলে কমলকে ফোন করতে পারি।"

কিকিরা ভাবলেন। কথাটা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল, "কী ফোন করবে ?"

"কী ফোন ! ধরুন, ধরুন মুস্তাফি হয়ে ফোন করলাম। বললাম, কথা আছে। কিংবা বললাম, কমলের কখন ছুটি হচ্ছে ? বা আপনি যদি অন্য কিছু সাজেস্ট করেন !"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, "না থাক। আর খানিকক্ষণ দেখা যাক। আমার মনে হচ্ছে, কমল নিজেই আসবে। ওর ইচ্ছে নয়, আমরা হোটেলে থাকি। আমাদের হোটেলে থাকায় ও ভয় পাচ্ছে। বসে থাকো, দ্যাখো, কী হয়।"

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, সত্যি-সত্যি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কমল। বিরক্ত। কিকিরার সামনে এসে বলল, "আপনাকে আমি যে বলে পাঠালাম, আমার দেরি হবে আজ।"

কিকিরা হাসিমুখেই বললেন, "হোক্ না দেরি। আমরা থাকব।"

"থাকবেন ? বাঃ ! আমি বলছি দেরি হবে, তবু বলছেন থাকব।"

"কথা আছে।"

"আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। ফুলকুমারের ব্যাপার আমি কিছু জানি না।"

"ফুলকুমার! কই, আমরা তো ফুলকুমারের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আসিনি!"

কমল থতমত খেয়ে গেল। মনে হল, নিজের বোকামির জন্যে আফসোস করছে। অবাক চোখে কিকিরাদের দেখছিল। কী বলবে যেন বুঝতে পারছিল না। শেষে বলল, "তা হলে কেন এসেছেন? কোন্ কথা বলতে?"

কিকিরা হাসিমুখেই বললেন, "আপনার কাজকর্ম শেষ হোক। তখন বলা যাবে।"

কমল চটে গেল, "আমার কাজকর্ম শেষ হবে না। আপনারা যান। আমি কোনো কথা আপনাদের সঙ্গে বলব না।"

কিকিরা মুখ টিপে হাসলেন। ইশারায় চন্দনকে দেখালেন। বললেন, "আমাকে না বললেন। ওঁকে তো বলতে হবে। উনি কিন্তু বাইরে চন্দন, ভেতরে জ্বালাতন; আসলে লালবাজার... !"

লালবাজার শুনে কমল কেমন চমকে গেল। দেখল চন্দনকে। চন্দনের শরীর স্বাস্থ্য চেহারা দেখে লালবাজারের লোক মনে হওয়া অসম্ভব নয়। সাদা পোশাকের গোয়েন্দা-অফিসার নাকি? কমলের মুখের চেহারা পালটে যাচ্ছিল।

কমলের যেন গলা শুকিয়ে গেল। বার-দুয়েক ঢোক গিলল। "লালবাজার! লালবাজারের সঙ্গে আমার... !" কথাটা আর শেষ করতে পারল না।

কিকিরা সাহস দেবার মতন করে বললেন, "না, না, আপনার সঙ্গে কিছু নেই। শুধু কয়েকটা কথা। ওঁর সামনে হলেই ভাল।"

কমল একবার বাইরের দরজার দিকে তাকাল। ভাবছিল। শেষে বলল, "আসুন।"

কিকিরা আর চন্দন উঠে দাঁড়াল।

কমলের সঙ্গে দোতলায় এলেন কিকিরা। চন্দনের সঙ্গে ইশারায় যেন তাঁর কথা হয়ে গিয়েছে। চন্দন গম্ভীর মুখ করে লালবাজার হবার চেষ্টা করছিল।

নিজের ঘরের কাছে এসে কমল বলল, "একটু দাঁড়ান। বলে আসি। অফিসে বসে কথা বলা অসুবিধে। অন্য জায়গায় বসব।"

কিকিরা মাথা হেলালেন।

কমল তার অফিসে ঢুকল। বেরিয়ে এল। তারপর কিকিরাদের নিয়ে দোতলার অন্য পাশে চলে গেল। শেষের দিকের একটা ঘরে এনে বলল, "এটা আমাদের রেস্ট-রুম। বসুন।"

ছোট ঘর। একটা সোফা-কাম-বেড, গোটা-দুয়েক চেয়ার, নিচু এক টেবিল

রয়েছে ঘরে। লম্বাটে জানলা। আলো-পাখা আছে। কমল নিজেই পাখা চালিয়ে দিল।

কিকিরা বসলেন। চন্দন দু'পা এগিয়ে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল। জানলা খোলা। ঝুঁকে পড়ে বাইরেটা দেখল। রাস্তা ঘেঁষে এই ঘর। নিচের সবই দেখা যাচ্ছে।

কমল বলল, "বলুন, কী কথা ?"

কিকিরা বললেন, "আপনি বসুন। আমরা কোনো বদ মতলব নিয়ে আসিনি। কয়েকটা কথা আপনার কাছে জানতে এসেছি। আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই।"

কমল বসল। সে যে রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছে, বোঝাই যাচ্ছিল। চোখ-মুখ শুকনো, কপালে গলায় ঘাম জমেছে।

চন্দন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কিকিরাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "আমার কথাগুলো জেনে নিই।"

ঘাড় হেলিয়ে চন্দন বলল, "নিন।"

কিকিরা কমলের দিকে সহজভাবেই তাকিয়ে বললেন, "আপনি স্যার, রাজকুমারবাবুদের ফ্যামিলি-ফ্রেন্ড ?"

"না," কমল মাথা নাড়ল। "রাজাদা'র ছোট ভাই ফুলকুমার আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সেই হিসেবে ও-বাড়ির সকলকে আমি চিনি। আমাকে সবাই চেনেন।"

"আপনি ফুলকুমারের ম্যাজিকের দলে আগে ছিলেন না ?"

"দলে আমি কোনো দিনই ছিলাম না। ফুল যখন ম্যাজিক দেখাবার জন্যে মেতে উঠল, আমাকে তার দলের দেখাশোনা করতে বলেছিল। সেটা অর্ডিনারি ব্যাপার। শৌখিন ম্যাজিক শো। পরে আর আমি ওর সঙ্গে ছিলাম না।"

"ফুলকুমার কীভাবে মারা গিয়েছে, সবই আপনি শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ। আমি ভাবতেও পারিনি এ-ভাবে ও মারা যাবে !"

"একটা কথা স্যার ! ফুলকুমারকে নিয়ে কথা বলতে আসিনি আমরা। আগেই আপনাকে বলেছি। কথাটা উঠল বলে বলছি। আচ্ছা, আপনার কী মনে হয় ? কে আপনার বন্ধুকে খুন করতে পারে ?"

কমল পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। "আমি জানি না।"

"ফুলকুমার আপনার বন্ধু ছিল। ও কি কোনো দিন কারও সম্পর্কে কিছু বলেছে ?"

কমল কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। মাথা নাড়ল, "না।"

"আপনার কাউকে সন্দেহ হয় ?"

"সন্দেহ ! না, মানে সন্দেহ করার মতন কেউ নেই। তবে আজকাল ওর বন্ধুবান্ধবদের ভাল মনে হত না।"

"দু'একটা নাম বলতে পারেন ?"

"নাম বলে লাভ কী ! ববি বলে ওর এক বন্ধুকে আমার ভাল লাগত না।"

"ববি ! আচ্ছা, রাজকুমারবাবু সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?"

কমল কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। "রাজাদা ! রাজাদা অত্যন্ত ভালমানুষ। ছোট ভাইকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। রাজাদার সঙ্গে আমি দেখাও করেছি।"

"মোহনবাবু ? মানে, মোহনকুমার ?"

কমলকে যেন কেউ আচমকা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল কমল। "মোহনদাদা ?"

"হ্যাঁ ; মোহনভাই। ফুলকুমারের মেজদা।"

"আপনি কী বলছেন, আমি ভাল বুঝতে পারছি না। মোহনদাদা মাটির মানুষ। নিরীহ। তাঁর একটা হাত..."

"জানি। একটা হাত কাটা," কিকিরা বললেন, "ভাল লোকও কখনো-কখনো মন্দ হয়ে যায়। দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়, জানেন তো ?"

কমল কোনো কথা বলল না। ঠোঁট কামড়ে বসে থাকল।

কিকিরা বললেন, "ফুলকুমারের খেলনার দোকান সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?"

কমল কিকিরার চোখের দিকে তাকাল। "খেলনার দোকানে খেলনা বিক্রি হত !"

"তা তো হবেই," কিকিরা ঠাট্টার গলায় বললেন, "পানের দোকানে কি মশাই পোনামাছ বিক্রি হয় ? আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, ওখানে আর কী হত ?"

মাথা নাড়ল কমল, "আমি জানি না।" বলে চোখ নামিয়ে নিল।

কিকিরা হঠাৎ রুক্ষ গলায় বললেন, "আপনি জানেন। মিথ্যে কথা বলবেন না, বোকা সাজার চেষ্টা করবেন না, স্যার। আপনি ভাল করেই জানেন দোকানে কী হত ? আর যদি না জানেন, আমি আপনাকে বলছি, ফুলকুমারের খেলনার দোকানে চোরাই-সোনা, চোরাই-পাথর, আরও পাঁচরকম জিনিস বিক্রি হত। খেলনার দোকানটা ছিল বাইরের ভেক্। আসলে ওই দোকান থেকে চোরাই-মালের কারবার হত।"

কমল তার শুকনো ঠোঁট জিভের আগা দিয়ে ভেজাতে লাগল। কথা বলছিল না।

কিকিরা বললেন, "আপনি এখন ধোয়া তুলসীপাতা সাজতে চাইছেন ? ওতে লাভ হবে না। ফুলকুমারের দালালি করে, তার বিশ্বস্ত লোক হয়ে আপনি মোটামুটি ভাল পয়সা কামাতেন।"

"বাজে কথা, সমস্ত বাজে কথা," কমল চিৎকার করে উঠল, "কে আপনাকে

এ-সব কথা বলেছে ? আপনি নিয়ে আসুন তাকে। টেনে জিভ ছিঁড়ে দেব রাস্কেলের।"

কিকিরা যেন কমলের রাগ দেখছিলেন। ক'মুহূর্ত পরে বললেন, "যে বলেছে তার কাছ থেকে আপনি দু'দফায় পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন। শুধু টাকাই নেননি, তাকে বলেছিলেন, মোতিয়ার সঙ্গে আপনি কথা বলে ব্যবস্থা করবেন। হাজার চার-পাঁচ টাকা মোতিয়াকেও দিতে হবে। না না, মাথা নাড়বেন না। চেঁচাবেন না। আমার কাছে প্রমাণ আছে।" বলে কিকিরা জামার পকেটে হাত ঢোকালেন। মামুলি খাম বার করলেন পকেট থেকে, তার মধ্যে থেকে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ। কাগজটার ভাঁজ খুললেন। বললেন, "এই কাগজটার মাথার ওপর আপনার হোটেলের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। মেমো স্লিপ। আপনি কী লিখেছেন, পড়ে শোনাচ্ছি। আপনি লিখেছেন, "কেমন করে কী করতে হবে, আমি জানিয়ে দেব। পালোয়ানকে কিছু দিতে হবে। চার-পাঁচ লাগবে। ঝামেলার কাজ।"

কমল যেন লাফ মেরে এগিয়ে আসত, চন্দনের ভয়ে পারল না।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

কমল উঠল না। বসে থাকল।

কিকিরা চন্দনকে ইশারা করলেন। চন্দন এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল।

বিজয় মুস্তাফি। ছিমছাম চেহারা। পরনে প্যান্ট-শার্ট। দু'পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দন অবাক।

বিজয়কে দেখে কমল দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু বলতে যাচ্ছিল। বিজয় হাত তুলে কমলকে থামতে বলল। "তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। অনেকক্ষণ এসেছি। ওয়েট করতে পারলাম না আর। সরি।"

কিকিরাও অবাক হয়ে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

বিজয় যেন ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, "অবাক হবার কোনো দরকার নেই। কমলের কাছে আমি আসি মাঝে-মাঝে। চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। তবে কী কিকিরাসাহেব, আমি বিহার পুলিশের লোক। রতন সিংহ। আজ ক'মাস ধরে ফাঁদ পেতে বসে ছিলাম, ফুলকুমার অ্যান্ড পার্টিকে ধরার জন্যে। কমলবাবু আমার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। জাল প্রায় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম, এমন সময় ফুলকুমার খুন হল। আমার হল মুশকিল। ঘাটের কাছে ভেড়া নৌকো আবার জলে ভাসাতে হল। শেষ পর্যন্ত বাকি কাজটা আপনারাই সারলেন মনে হচ্ছে!"

কিকিরা কোনো কথা বললেন না। বিজয় মুস্তাফিকে দেখছিলেন।

বিজয় মুস্তাফি, মানে রতন সিংহ কিকিরাকে বললেন, "ঘাবড়াবেন না। তেওয়ারিসাহেব আমাকে আপনার চিঠির কথা জানিয়েছেন। নিন, হাত

মেলান।"

কিকিরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কমল দরজার দিকে তাকাল। চন্দন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

হারমোনিয়াম-রহস্য

কিকিরার ঘরে আর যেন জায়গা কুলোচ্ছিল না। রাজকুমার, বিজয় মুস্তাফি মানে রতন সিংহ, ববি, তারাপদ, চন্দন আর কিকিরা। রতন সিংহ আর ববিকে অতিথি হিসেবে ডেকে আনা হয়েছে। সিংহ হয়ত এমনিতেই আসত ; তবু কিকিরা তাকে ডেকে এনেছেন। সন্ধে হয়ে গেছে কখন। বড় বাতিটাই জ্বালিয়ে রেখেছেন কিকিরা। বগলা চা-জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল। চা খেতে-খেতে সাধারণ কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল। রাজকুমার চা খেলেন না, শরবত খেলেন। খাবারে হাত দিলেন না। মানুষটি নিয়ম মেনে চলেন। বাইরে কিছু খান না।

কিকিরাই শেষে সিংহকে বললেন, "সিনাসাহেব, আপনিই আজ শুরু করুন। শুনি।"

বিহার পুলিশের সিনাসাহেব সিগারেট ধরিয়ে বলল, "আমার বলার কথা কম রায়সাহেব। ঘটনাটা ঘটেছিল, ছ'সাত মাস আগে। মধুপুর স্টেশনের ওয়েটিংরুমে এক ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তাঁর কোনো সঙ্গী ছিল না। জিনিসপত্রও ছিল সামান্য। ওঁর অ্যাড্রেস খুঁজতে গিয়ে আমরা ভদ্রলোকের জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করি। জিনিসপত্রের মধ্যে একটা পুতুল ছিল। আধ-হাত মতন লম্বা, একটা জাপানি ডল্। ওই পুতুলটা নাড়াচাড়া করার সময় হঠাৎ পায়ের জুতোটা ভেঙে গেল। খুলে গেলও বলতে পারেন। আর অবাক কথা, পুতুলের ভেতর থেকে দু'টুকরো হীরে, তা ধরুন, পাঁচ-সাত রতি করে তো হবেই, আমাদের হাতে পড়ে। ব্যাপারটা অদ্ভুত! আমাদের এক কর্তা জহুরিকে দিয়ে হীরে দুটো পরখ করিয়ে বললেন, ওর দাম কম করেও হাজার পঞ্চাশ-ষাটের মতন। এই হীরে কোথা থেকে এল, কেমন করে এল, কেনই বা পুতুলের মধ্যে করে আনা হচ্ছিল, এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে আমরা একটাই মাত্র হদিস পেলাম। পুতুলটা কলকাতার নিউমার্কেট থেকে কেনা হয়েছে। না, কোনো রসিদ ছিল না। বাক্স ছিল পেস্টবোর্ডের। তার একপাশে দোকানের স্ট্যাম্প মারা ছিল। ফুলকুমারের দোকানের।"

"ভদ্রলোক মধুপুরের ?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"না। মধুপুরের নন। ভদ্রলোকের টিকিট ছিল কিউলের। পকেটে শ' দুয়েক টাকা, একটা হিন্দি ম্যাগাজিন ছাড়া, আমরা আর কিছু পাইনি। জিনিসপত্রের মধ্যেও কোনো ঠিকানা ছিল না। উনি যে কেন মধুপুরে নেমে

গিয়েছিলেন তাও বোঝা গেল না। এমন হতে পারে, কেউ ভদ্রলোককে ফলো করছিল। হয়ত হীরের জন্যেই। ভদ্রলোক ভয় পেয়েই হোক, বা লোকটাকে এড়াবার জন্যে হোক, মাঝপথেই নেমে পড়েন। এবং হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।"

রাজকুমার বললেন, "আপনারা তার কোনো পাত্তা পাননি ?"

"না। উনি কে, কোথাকার লোক, আমরা জানতে পারিনি। কিউলের টিকিট সঙ্গে ছিল ঠিকই, তবে কিউলের লোক নন। উনি কিউল থেকে অন্য কোথাও চলে যেতেন হয়ত।"

"তারপর ?"

"আমাদের বড় কর্তাদের সন্দেহ হয়, চোরাই-সোনা আর হীরে-চুনি-পান্না, নানা রকম স্টোনের কারবার চলছে ওদিকে। এটা তার প্রমাণ। নেশাভাঙের চোরাই-চালান আমাদের হাতে ধরা পড়ত মাঝে-মাঝে। সোনাদানা, হীরে আমরা আগে পাইনি। আমার কর্তারা ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্যে আমাকে বেছে নিলেন। আমার ওপর ভার পড়ল কলকাতায় এসে ইন্‌ভেস্টিগেট্ করার। আমি বিজয় মুস্তাফি সেজে এখানে আমার কাজ করছিলাম," সিংহ হাসল হালকাভাবে, বলল, "আমার কপাল ভাল, কৃষ্ণা নার্শারির আতাবাবুর সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে আমার। সুবিধেই হয়েছিল কাজের।"

"এখানে এসে আপনি ফুলকুমারের ওপর নজর রেখে যাচ্ছিলেন ?" চন্দন বলল।

"হ্যাঁ। ফুলকুমারের দোকান আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক মনে হয়। একটা কথা বলা দরকার। যে-পুতুলের মধ্যে আমরা হীরে দুটো পাই, সেটা যে-বাক্সে রাখা ছিল, তার একপাশে ফুলকুমারের দোকানের রাবার স্ট্যাম্প ছিল, এ-কথা আগেই বলেছি আপনাদের। কিন্তু সেই সূত্র ধরে ফুলকুমারকে ধরা বা দোষী বলা যেত না, বা বললেও সেটা বোকামি হত।...আমি ওর দোকানের ওপর নজর রাখতে শুরু করি। ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিশে ভেতরের খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করি। কমলকে আমি শেষ পর্যন্ত হাতে আনতে পেরেছিলাম। কমল বুঝতেই পারেনি আমি পুলিশের লোক।"

ববি বলল, "আপনি আমাকে সন্দেহ করতেন।"

সিংহ হাতজোড় করে বলল, "আমরা নানা চালে চলি। আপনাকে সন্দেহ হয়, এটা না দেখালে কমল আমার হাতে থাকত না। সরি, ববিসাহেব। কিছু মনে করবেন না।"

রাজকুমার বললেন, "আপনি কমলকে ধরলেন না কেন ?"

"ধরার সময় হলেই ধরতাম। ফুলকুমারকে হাতেনাতে ধরব বলেই অপেক্ষা করেছি। শুধু ও কেন, ওর সঙ্গে সেইসব রুই-কাতলা, যারা এই ব্যবসাটা চালাচ্ছে। তবে, বলতেই হবে ফুলকুমার প্রচণ্ড চালাক ছিল, ভেরি মাচ্

ক্লেভার। ওকে সরাসরি ধরা সহজ ছিল না। তবে ধরা পড়ত, দু'দিন আগে আর পরে। এমন সময় ফুলকুমার খুন হল। আমাকেও থমকে দাঁড়াতে হল। খুনের ঘটনাটা আমার কাছে মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, কী করা যায়। এমন সময় রায়সাহেব হাজির হলেন," বলে সিংহসাহেব হাত বাড়িয়ে কিকিরাকে দেখাল, "পরের ব্যাপারটা উনিই জানেন, আমি জানি না।" একটু থেমে সিংহ কী মনে করে হাসল। বলল, "ছোট একটা কথা বলে নিই, রায়সাহেব। আমি যে খোঁড়া নই, এটা আপনি ধরতে পারবেন, আমি মোটামুটি সেটা আন্দাজ করেছিলাম। আপনি বড় আচমকা গিয়ে পড়েছিলেন। আমি তৈরি হতে পারিনি। আমার একটা মোজা ধরনের জিনিস আছে, নাইলনের। গায়ের চামড়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, ধরা যায় না। তার রঙ খানিকটা মরা চামড়ার মতন। সেটা আমি খোঁড়া পায়ে পরতাম। পরে তার ওপর প্যান্ট চাপাতাম। সেদিন কমল আমার ঘর থেকে চলে যাবার পর, সবে আমি মোজাটা খুলে লুঙ্গি পরেছি, আপনারা গিয়ে হাজির। ধরা পড়ে গেলাম।" সিংহ জোরে হেসে উঠল।

সামান্য সময় সকলেই চুপচাপ। অল্পক্ষণের বিরাম যেন। তারপর রাজকুমার কিকিরাকে বললেন, "রায়বাবু, আপনার মুখে বাকিটা শুনতে চাই।"

কিকিরা ঘাড় দোলালেন। বললেন, "বলব বলেই আপনাদের সকলকে ডেকেছি রাজাবাবু। কিন্তু কোন্‌টা আগে বলব, কোন্‌টা পরে, তাই ভাবছি। আমার মনে হয়, যেমন-যেমন ঘটেছে তেমন করে বলাই ভাল। তাই নয় ?"

তারাপদ বলল, "আপনার যেমন করে বললে সুবিধে হয়, তেমন করেই বলুন, স্যার।"

কিকিরা বললেন, "তা হলে ম্যাজিশিয়ান ফুলকুমারের ভুতুড়ে হারমোনিয়াম বাজানো দিয়েই শুরু করা যাক। মুখে সব বলার চেয়ে একটু বরং হাতে-কলমে দেখাই। আমার এই ছোট্ট ঠাসা ঘরে আপনাদের সব তো দেখাতে পারব না। আমার কাছে ম্যাজিক দেখানোর জিনিসপত্রও নেই। তবু একটা জিনিস দেখাই। খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন।" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের চারদিক দেখলেন। বললেন, "আমার বাড়িতে হারমোনিয়াম নেই। থাকার মধ্যে রয়েছে ওই পুরনো আমলের গ্রামোফোন, আর রেকর্ড। আপনারা আমার হাত বেঁধে দিন, চোখ বেঁধে দিন। আমি আমার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামোফোনের কাছে যাব। রেকর্ড বার করব। বাজাব। আপনারা আমায় দেখতে পাবেন না। শুধু একটা কাজ করবেন। হাত-পা বাড়াবেন না। আর দেশলাই জ্বালাবেন না। আসুন, কে আমার হাত বাঁধবেন ? ববিসাহেব, আপনি আসুন।" বলে কিকিরা একপাশ থেকে হাত-বাঁধা দড়ি, আর চোখ-বাঁধা কালো রুমাল বার করে দিলেন।

ববি উঠে গিয়ে কিকিরার হাত বাঁধল। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

কিকিরা বললেন, "এবার আমার চোখ বাঁধুন। ভাল করে বাঁধবেন। আমার চোখ বাঁধা হয়ে গেলে, আপনি নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়বেন। চন্দন, তোমার ঠিক হাতের কাছে আলোর সুইচ্ আছে। তুমি আলো নিভিয়ে দেবে। তার আগে জানলার পরদাগুলো টেনে দাও। আলো যেন না আসে।"

কিকিরার কথামতন তাঁর চোখ বাঁধা হল। ঘর অন্ধকার করা হল। ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। শোবার ঘরের হাত-কয়েক তফাতে গ্রামোফোন।

কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিকিরা বললেন, "অধৈর্য হবেন না, আমার আজকাল অভ্যেস নেই। একটু দেরি হবে। ততক্ষণ আপনারা ভূতের নাম জপ করুন।"

রাজকুমাররা বসে থাকলেন। চুপচাপ। সময় কাটতে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। অন্ধকারে বসে থাকল তারাপদরা। তারপর কখন যেন শব্দ হল। ঘষঘষে শব্দ। শেষে গান বেজে উঠল গ্রামোফোনে। রেকর্ড বাজছিল।

কিকিরার গলা শোনা গেল, "চন্দন, আলোটা জ্বেলে দাও।"

চন্দন আলো জ্বালল।

কিকিরা গ্রামোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। হাতের বাঁধন খোলা। চোখের বাঁধন আগের মতনই। হাসছেন।

চন্দন হাততালি দিয়ে উঠল, "দারুণ কিকিরা-স্যার। ওয়ান্ডারফুল।"

"চোখটা খুলে দাও।"

ববি এগিয়ে গিয়ে চোখের বাঁধন খুলল। খুলতে খুলতে বলল, "আলগা লাগছে কিকিরাসাহেব ?" বলে হাসল।

কিকিরা একবার চোখ রগড়ে নিলেন। তাকালেন সকলের দিকে। হাসলেন। বললেন, "আপনারা অবাক হবেন না। এর মধ্যে অদ্ভুত কিছু নেই। একে বলা হয়, ব্ল্যাক আর্ট। মানে কালোর খেলা। কালোয় ঢেকেছে আলো। কালোর মধ্যে কালো দেখা যায় না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আপনি কালো জামা পরে যদি দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনাকে দেখবে কার সাধ্য! এই দেখুন, আমার প্যান্ট কালো, জামা কালো, মায় মাথায় সাদা চুল চোখে পড়ে, সেই ভয়ে একটা কালচে বাঁদুরে টুপি পরেছি। টুপিটা আমার পকেটেই ছিল, হাতের বাঁধন খোলার পর পরে নিয়েছি।"

সিংহ বলল, "জানলার পরদাগুলোও তো কালো।"

"ইচ্ছে করেই টাঙানো হয়েছে সিনাসাহেব। যাতে আলো না আসতে পারে। আর একটা জিনিস দেখুন, গ্রামোফোনটা এমনভাবে রাখা আছে, যাতে আমি খুব সহজে দেওয়াল ধরে সেখানে যেতে পারি। আমার নিজের ঘরবাড়ি, ঘরটাও ছোট, কাজেই আমার আন্দাজ আছে, অভ্যেস আছে।"

ববি বলল, "আপনি হাতের বাঁধন খুললেন কেমন করে ?"

কিকিরা হাসলেন। "আমি ম্যাজিশিয়ান। বাঁধন খোলা আমার পক্ষে একটুও কঠিন নয়। হ্যান্ড-কাফ্ খোলা আরও সোজা। অনেক রকম হ্যান্ড-কাফ্ হয় ম্যাজিশিয়ানদের। যে যেমন পারে এক-একটা গালভরা নাম দিয়ে নেয়। ওর মধ্যে কলাকৌশল আছে। ট্রিক। খানিকটা আবার হাত-পায়ের অভ্যেস।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন, ফুলকুমারের হারমোনিয়াম বাজানোর সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে ?"

"হ্যাঁ," কিকিরা মাথা নাড়লেন, "ফুলকুমার কেমন করে হারমোনিয়াম বাজানোর খেলাটা দেখাত, আমি তার দলের লোকদের জিজ্ঞেস করে-করে জেনে নিয়েছি। সে খেলাটা দেখাত, স্টেজ উইদিন দি স্টেজ করে, আমরা আগে একে বলতাম ডাবল স্টেজ। এখন কী বলে জানি না।"

"লালাজি বলেছিলেন..." তারাপদ কিছু বলতে গেল।

"লালাজি ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর বলতে একটু ভুল হয়েছিল। তিনি দু' নম্বর স্টেজটাকেই স্টেজ বলেছিলেন। আর তিনি বলেননি, বা বলতে পারেননি, ছোট স্টেজের পেছন আর দু' পাশ ঢাকা ছিল। ইট ওয়াজ অল্ ব্ল্যাক। সামনের দিকটা ছিল খোলা। আর সামনে একটা টেবিলের ওপর হারমোনিয়ামটা রাখা ছিল। ফুলকুমার হাত-দুই তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল।"

"আপনি বলতে চাইছেন ফুলকুমার নিজেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যান্ড-কাফ্ খুলে ফেলে ?"

"অবশ্যই। ফুলকুমারের অ্যাসিসট্যান্ট মোতিয়া যে হ্যান্ড-কাফ্ লাগানোর পর চাবিটা দর্শকদের কাছে দিয়ে আসত, ওটা নেহাতই ধাপ্পা। দশটা চাবি দিয়ে এলেও হ্যান্ড-কাফ্ খোলা কিছু নয়।"

"ওকে কেমন করে মারা হল ?"

"ফুলকুমারকে মারা হয়েছে বুদ্ধি করে। প্ল্যান করে। প্রথম দফায় সে একটা গৎ বাজায় হারমোনিয়ামে। বাজনা শেষ হলে, বড় স্টেজের আলো জ্বেলে দেখানো হয়, হ্যান্ড-কাফ্ বাঁধা অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ বাঁধা। তার সামনে হারমোনিয়াম। মানে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়, দেখো হে, ম্যাজিশিয়ান সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।"

"গুড শো !" ববি বলল।

"দ্বিতীয় দফায় যখন নতুন করে ফুলকুমার হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করে, তখন দু' নম্বর স্টেজের পেছনের লুকনো জায়গা থেকে কালো পোশাক পরা কেউ এসে তার মাথার পেছন দিকে মারে। ভারী শক্ত জিনিস দিয়ে মেরেছিল। হাতুড়ি বা কোনো রকম ভারী ওজনের লোহা দিয়ে। ফুলকুমার মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। বাজনা যায় বন্ধ হয়ে। ওই সময় স্টেজ পুরো

অন্ধকার। ব্যাপারটা কী হচ্ছে খেয়াল হতে সময় যায় খানিকটা। আর তারপর যখন আলো জ্বালানো হয়, দেখা যায়, ফুলকুমার মাটিতে পড়ে আছে।"

সিংহ বলল, "হারমোনিয়ামও গায়েব ?"

"তাই হয়েছিল। তখন ওই অবস্থার মধ্যে কেউ হারমোনিয়ামের কথা খেয়াল করেনি। পরে যখন খেয়াল হল, দেখল, বাক্সটা আছে হারমোনিয়ামের। ভাবল, ঠিক আছে। আরও পরে তাদের খেয়াল হল, বাক্সটা আছে, হারমোনিয়াম নেই।"

চন্দন বলল, "কিন্তু কিকিরা, আমরা প্রথমে শুনেছিলাম, ফুলকুমারের হ্যান্ড-কাফ্ মোতিয়া খুলে দিয়েছিল !"

কিকিরা বললেন, "আমার মনে হয়, মোতিয়া হ্যান্ড-কাফ্ খোলার ভড়ং দেখিয়েছিল। পাছে লোকে দেখে ফেলে ফুলকুমারের এক হাতের হ্যান্ড-কাফ্ খোলা, তাই ঝটপট মাটিতে বসে পড়ে অন্য হাতের হ্যান্ড-কাফ্ খুলে দেয়। আসলে সে ধোঁকা দিয়েছিল। ওই রকম একটা সাঙ্ঘাতিক সময়ে, সবাই দিশেহারা, কেউ বুঝতে পারছে না, কী হল, কী করবে !"

"হারমোনিয়ামটা তার আগেই পাচার হয়ে গিয়েছিল ?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। সঙ্গে-সঙ্গে।"

"কেউ দেখতে পেল না ?"

"পাবার কথা নয়। তোমরা লালাজির কাছেই শুনেছ, ফুলকুমার কালো পোশাক পরে খেলা দেখাত। ঠিকই করত। নয়ত ভূতের খেলা জমে না। যে-লোকটা ফুলকুমারকে জখম করেছিল, সেও কালো পোশাকে ঢুকেছিল। হারমোনিয়াম নিয়ে যাবার সময়ও কালো কাপড়ে চাপা দিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।"

"কেমন করে পালাল ?" চন্দন জিজ্ঞেস করল।

"পালানোর পথ ছিল। তোমরা স্টেজটা মনে করে দেখো। সাজঘরের পাশ দিয়ে প্যাসেজ ছিল। সেই প্যাসেজ দিয়ে হলের বাইরে এসে পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালে একটা গুদোমখানার মতন, যত কাঠকুটো, ছেঁড়াফাটা জিনিস জড়ো হয়ে আছে। তার পাশে কল একটা। তার পরই ভাঙা পাঁচিল। একবার পাঁচিল টপকে বেরিয়ে আসতে পারলে আর কে মারে ! সামান্য এগিয়ে গেলেই তো গাড়ি চড়ে পালাতে পারবে।"

তারাপদ মনে-মনে জায়গাটার কথা ভেবে নিল। কিকিরা ঠিকই বলছেন। "ওদের গাড়ি দাঁড় করানো ছিল, তাই না কিকিরা ?"

"নিশ্চয় ছিল। নয়ত পালাবে কেমন করে ?"

চন্দন নিজের মনেই মাথা নাড়ল। ববি সিগারেট ধরাল। সকলকেই উত্তেজিত মনে হচ্ছিল।

রাজকুমার বললেন, "রায়বাবু, ওই লোকটা কে, যে ফুলকুমারকে খুন করল ? কেন খুন করল ?"

কিকিরা কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। পরে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, "রাজাবাবু, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, মোতিয়া ফুলকুমারকে খুন করেছে। পরে বুঝলাম, মোতিয়া নয়। কমল অতি ধূর্ত। সে একটা ছক সাজিয়েছিল। ছকটা কেমন জানেন ? একজনের ওপর ভার পড়েছিল, ফুলকুমারকে জখম করার। ফুলকুমারকে জখম করে সে হারমোনিয়ামটা নিয়ে পালিয়ে আসবে হলের বাইরে। অন্য একজনকে ঠিক করে রেখেছিল কমল, তার ওপর হুকুম ছিল, ভাঙা পাঁচিলের সামনে গা-ঢাকা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে, হারমোনিয়ামটা হাতে পাবার পর সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠবে। যে ফুলকুমারকে জখম করেছিল সে ওরই দলের লোক, ম্যাজিক-পার্টির লোক, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে সব জানত। জানত কেমন করে, কোন্ সময় ফুলকুমারকে জখম করা যায়। আর এটাও জানত, জখম করে পালিয়ে গেলে পুলিশ তাকে সন্দেহ করবে। কাজেই সে আবার স্টেজে ফিরে এসেছিল। তখন ফুলকুমারকে নিয়ে হইচই হচ্ছে। ওই অবস্থায় তার ওপর নজর পড়ার কথা নয়। এই লোকটা কে হতে পারে ?"

চন্দন বলল, "আগে তো মনে হত মোতিয়া। সে কিছুক্ষণ নিজের জায়গায় ছিল না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু মোতিয়া নয়। সেই লোকটার নাম হরিমাধব। ফুলকুমারের ম্যাজিক-পার্টির ম্যানেজার। নতুন ম্যানেজারও বলতে পারেন।"

"হরিমাধব ?" রাজকুমার অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলেন। ভাল করে চেনেনও না ছোকরাকে।

কিকিরা বললেন, "মোতিয়া এই ছকের মধ্যে ছিল। জানত সব। কিন্তু সে ফুলকুমারকে জখম করেনি। তার ওপর ভার দেওয়া ছিল, কমলের ছকমতন যেন সব ঠিকঠাক হয়, ম্যাজিক-শো চলার সময়, সেটা লক্ষ রাখতে। মোতিয়া তার কাজ করেছিল। কিন্তু ভাবতে পারেনি, ফুলকুমারকে ওরা মেরে ফেলবে। ভেবেছিল, ফুলকুমার জখম হবে, চোট পাবে, বেহুঁশ হয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। ফুলকুমার মারা যেতে সে ভয় পেয়ে গেল। তারপর দু'-একদিনের মধ্যে ফেরার হল।"

তারাপদ বলল, "মোতিয়া এখন কোথায় ?"

"পুলিশ হাজতে। আজ সকালে সে নিজে থানায় গিয়ে ধরা দিয়েছে। কমলের হোটেলে সে লুকিয়ে ছিল। কমল ধরা পড়ার পর, সে নিজের থেকে গিয়েই ধরা দিল। ভালই করেছে।"

কিকিরার কথা শেষ হল কি হল না, বাতি চলে গেল। অন্ধকার। লোডশেডিং হয়ে গেল।

হঠাৎ কেমন চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বলছিল না।

শেষে রাজকুমার বললেন, "রায়বাবু, হারমোনিয়ামের আন্দার কোন্ চিজ্ ছিল ? আগার ফাঁকা থাকত তো... !"

কিকিরা বললেন, "কুমারবাবু, রাজাবাবু ! আপনি বহুত কুছ্ জানেন না।" কিকিরা ইচ্ছে করেই একটু হিন্দি কথা বললেন, "আপনি জানতেন না, আপনার ছোট ভাই খেলনার দোকানের নাম করে চোরাই সোনা, পাথর, রিভলবার, আরও হয়ত কিছু বিক্রি করে। ও ছিল স্মাগলারদের বড় এজেন্ট। আপনি এটাও জানেন না রাজাবাবু, আপনার মেজো ভাই, মোহনবাবুর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফুলকুমারের ব্যবসার কথা মোহনভাই জানতে পারে। টাকার লোভ বড় লোভ। ছোট ভাইকে ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা নিত মোহনভাই। পরে ফুলকুমার তার দাদাকে বাধ্য হয়ে নিজের কথা মাঝে-সাঝে বলত। মোহনভাই আবার কমলের সঙ্গে লুকিয়ে যোগাযোগ করত। ফুলকুমারের হাতে নতুন কী এসেছে, তার দাম কত হতে পারে, জানিয়ে দিত। কমল আবার ফুলকুমারকে নজরে রাখত, চাপ দিত, যেন ওই জিনিসগুলো তার হাত দিয়ে বিক্রি হয়। মানে, তার মক্কেলরা কিনতে পারে।"

"কমল বিক্রির ওপর কমিশন নিত ?"

"হ্যাঁ। ফুলকুমারকে নিজের কমিশন থেকে কমলকে ভাগ দিতে হত। সব সময় সেটা পছন্দ করত না ফুলকুমার।"

"সেদিন কী হয়েছিল ?"

কিকিরা বললেন, "মোহনভাই কমলকে আগেই খবর দিয়েছিলেন, লাখ চারেক টাকার দামি পাথর, হীরে, চুনি আর নীলা, ফুলকুমার তার হারমোনিয়ামের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক করেছে। ম্যাজিক দেখানোর পর পাথরগুলো সে অন্য একজন দালালকে দিয়ে দিতে পারে কিংবা কোনো জুয়েলারকে। পাথরগুলো একটা কাগজের প্যাকেটে থাকবে। তুলোর মধ্যে জড়ানো। জিনিসটা থাকবে হারমোনিয়ামের মধ্যে লুকনো। মোহনভাই চায়, অন্যের হাতে গিয়ে পড়ার আগে যেন কমল সেটা হাতিয়ে নেয়।"

সিংহ বলল, "রায়সাহেব, আমার মনে হয়, মোহনবাবুর এখানে একটা চাল ছিল। উনি নিজেই এগুলো ফুলকুমারের কাছ থেকে চুরি করেছিলেন। চোরাইমাল কেমন করে পাচার করবেন, দু'জনের মধ্যে আগেই শলাপরামর্শ হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় সব দিক থেকে ভেবেচিন্তে ঠিক করা হয়েছিল, ফুলকুমারের ম্যাজিক দেখানোর দিন, হারমোনিয়ামের মধ্যে করে পাচার করাই সবচেয়ে সুবিধের।"

কিকিরা বললেন, "বোধহয়, ঠিকই বলেছেন। মোট কথা কমল সেদিন হারমোনিয়াম চুরি করার ছক সাজিয়ে বাজনাটা চুরি করে। কিন্তু... !"

"কিন্তু ! কিসের কিন্তু ?"

"হারমোনিয়ামের মধ্যে কিছু ছিল না। কমল স্বীকার করেছে, সে কিছু পায়নি।"

"সে মিথ্যে কথা বলছে না তার প্রমাণ কী ?"

"প্রমাণ মোহনভাই !" কিকিরা রাজকুমারের দিকে তাকালেন। বললেন, "রাজাবাবু, আপনি কি এ-ক'দিন মোহনভাইকে ভাল করে নজর করেননি ?"

"করেছি, রায়বাবু ! ও দোকানে আসছিল না। বাড়িতে নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকত। কান্নাকাটি করত। ওর স্ত্রী আর আমার স্ত্রী মোহনকে অনেক করে সমঝিয়েছে। আমি ভাবতাম, ফুলকুমারের জন্যে মোহনের এই অবস্থা। ছোট ভাই খুন হয়ে যাওয়ায় নিজেকে ও সামলাতে পারছে না। কেমন করে বুঝব, রায়বাবু, আমার ফ্যামিলিতে..." কথা শেষ করতে পারলেন না রাজকুমার। গলা বুজে গেল।

কিকিরা বললেন, "মোহনভাই আমায় বলেছে, রায়বাবু, উনি জানতেন না ফুলকে ওরা মেরে ফেলবে। ওরা চুরি করবে জানতেন। মেরে ফেলবে ভাবেননি। হারমোনিয়ামের মধ্যে ফুল কিছু নিতে পারেনি। আমি জানি। মোহনভাই বলেছেন—আমার পাপে আমার ভাই মরল। আমাকে জেলে দিন।"

রাজকুমার হঠাৎ যেন কেঁদে ফেললেন। বগলা বাতি এনে ঘরে রাখল।

কিকিরা বললেন, "পুলিশ মোহনভাইকে ছাড়বে না রাজাবাবু ! আপনি থানায় যান কাল সকালে। উকিলের সঙ্গেও কথা বলুন। দেখুন, কার ভাগ্যে কী আছে ! হরিমাধব, মোতিয়া, কমল এখন পুলিশের হেফাজতে। মোহনভাইকেও ছেড়ে দেবে না পুলিশ ! দেখুন কী হয় !"
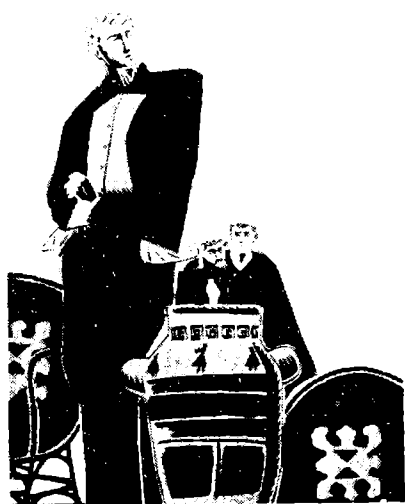
সার্কাস থেকে পালিয়ে

সার্কাস থেকে পালিয়ে

শীত তখনো ফুরিয়ে যায়নি। মাঘের শেষ। এক-একদিন মনে হয়, এই বুঝি শীত গেল, বসন্ত এল। আবার কোনো কোনো দিন শীতের ছোঁয়া থাকে বাতাসে।

সেদিন সামান্য শীত-শীত ভাব ছিল। কিকিরা নিজের ঘরে বসে কী যেন করছিলেন। ড্রয়িং পেপার, পেনসিল, স্কেল, কম্পাস, রঙিন সিসকলম সামনে সাজানো রয়েছে। বাতি জ্বলছিল। ডেস্কের মতন এক কাঠের হেলানো তক্তা তাঁর হাতের কাছে।

এমন সময় সদরে ডোর-বেলের শব্দ। তারপরই তারাপদর গলা। বগলার সঙ্গে কথা বলছে তারাপদ।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তারাপদ আর চন্দন ঘরে এল।

কিকিরা হাতের কাজে সারতে-সারতে আড়চোখে যেন দু'জনকে দেখে নিলেন। মুখে বললেন, "হ্যা-লো ?"

তারাপদ দু' পা এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখল। বলল, "স্যার, আপনি যেন খুব ব্যস্ত ?"

কিকিরা বললেন, "খুব নয়, অল্প-স্বল্প। বোসো। তারপর কী খবর তোমাদের ?"

দিন দশেক এদিকে আর আসা হয়নি তারাপদদের। হপ্তায় অন্তত একবার এ-বাড়িতে না এলে কিকিরা বেশ অখুশি হন। অভিমান হয় তাঁর। চাঁদু ডাক্তার, সে তার হাসপাতালের দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যায়। তারাপদ নিছক কেরানি। তার কোনো কৈফিয়ত কিকিরা কানে তোলেন না।

তারাপদ আর চন্দন বসল।

তারাপদ বলল, "খবর অনেক, স্যার। প্রথম খবর, আমি সর্দি-জ্বরে দিন চারেক কাবু হয়ে পড়ে ছিলাম। দ্বিতীয় খবর, চাঁদু একটা ঝঞ্ঝাট বয়ে এনেছে। আপনি তো আপাতত বেকার... ।"

চন্দন বলল, "আমাদের কথা পরে বলছি। আপনার খবর কী ? ওটা আপনি

কী করছেন ?”

“ড্রয়িং।” কিকিরা গম্ভীর গলায় বললেন।

“ড্রয়িং ! হঠাৎ ড্রয়িং কেন ? কিসের ড্রয়িং ?”

“খাঁচা।”

“খাঁচা ?...বলেন কী ! সন্ধেবেলা বসে-বসে খাঁচা আঁকছেন ?”

তারাপদ তামাশার গলায় বলল, “খাঁচা আঁকতে অত সাজ-সরঞ্জাম লাগে নাকি, কিকিরা ? এ কোন খাঁচা ? বাঘের খাঁচা নিশ্চয় নয়।”

কিকিরা বললেন, “খাঁচার তুমি কী বোঝ ? খাঁচার কত ভ্যারাইটি আছে জান ? বর্মি-খাঁচা দেখেছ ? তিব্বতি-খাঁচা ? ইউ নো নাথিং।”

তারাপদ হাত জোড় করে বলল, “ভেরি সরি সার। আমি কিছু জানি না। এখন দয়া করে বলুন, এই বয়েসে হঠাৎ রং পেনসিল নিয়ে খাঁচা আঁকবার শখ হল কেন ? আমরা তো ওয়ান-টু ক্লাসে পড়ার সময় এইসব এঁকেছি—চায়ের কেটলি, কলা, কমলালেবু, কাপ-ডিশ, গেলাস, খাঁচা... !”

কিকিরা এবার মুখ তুললেন। বললেন, “এ তোমার ওয়ান-টু ক্লাসের খাঁচা নয়। এ হল ম্যাজিক-খাঁচা। ম্যাজিশিয়ানস কেজ।”

“মানে ?”

“মানে, ম্যাজিক দেখাবার খাঁচা, ম্যাজিশিয়ানদের খেলা দেখাবার খাঁচা।”

“ও !...তা এতে কী খেলা দেখানো হবে, সার ?”

“হবে।” মাথা নাড়তে-নাড়তে কিকিরা বললেন, “প্রথমে এই খাঁচায় একটা পাখি থাকবে। ছোট্ট পাখি। পাখি সমেত খাঁচাটা তোমাকে দেখানো হবে। তারপর একটা কালো কাপড় ঢাকা দেব খাঁচার ওপর। দু-চারটে বোল-চাল দিয়ে যেই না কাপড়টা তুলব, দেখবে খাঁচা আছে—পাখি নেই। নো বার্ড অনলি খাঁচা।”

তারাপদ বলল, “বাঃ ! পাখি ফুড়ুত ?”

“নো স্যার। আবার কালো কাপড়টা ঢাকা দেব। দু-পাঁচটা বাত-চিত হবে। কাপড়টা তুলে নেব খাঁচার ওপর থেকে ; দ্য বার্ড ইজ দেয়ার...”

তারাপদ মজার গলায় বলল, “দারুণ ! খাঁচার পাখি ছিল খাঁচায়—তারপর ভ্যানিশ। আবার দেখতে-দেখতে খাঁচায়। তা স্যার, আপনি কি আবার খেলা দেখাবেন ভাবছেন নাকি ?”

“না-না, আমি কেন দেখাব ! হরেন দেখাবে। আমি সব তৈরি করে দিচ্ছি। এ হল ধোঁকাবাজির ব্যাপার। কল-কৌশলের খেলা। চালাকি আর বোকা বানানোর খেলা। খাঁচাটাই আসল। কায়দা করে তৈরি করাতে হয়। আমি ড্রয়িং করে দিচ্ছি, শিয়ালদার সুরি লেনের গঙ্গাপদ খাঁচাটা তৈরি করে দেবে। গঙ্গা হল কলকাতার এক নম্বর মিস্ত্রি, ম্যাজিকঅলাদের মিস্ত্রি।”

চন্দন বলল, “হরেন আবার কে ?”

"ছোকরা ম্যাজিশিয়ান। অ্যামেচার। ব্যাঙ্কে কাজ করে। মাঝে-মাঝে ম্যাজিক দেখায় ছোটখাট জায়গায়। আমার কাছে আসে মাঝেসাঝে।"

এমন সময় চা এল। বগলা চা নিয়ে এসেছে।

চা নিতে-নিতে তারাপদ বলল, "কিকিরা-সার, চাঁদু আপনার জন্যে একটা কেস নিয়ে এসেছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং...।"

কিকিরা চা নিলেন। সরিয়ে রাখলেন ডেস্ক। বগলাই সরিয়ে রাখল।

বগলা চলে যাওয়ার পর কিকিরা চন্দনের মুখের দিকে তাকালেন। যেন বোঝবার চেষ্টা করছিলেন—কথাটা ঠিক, না বেঠিক।

চন্দন মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, স্যার।"

চায়ে চুমুক দিলেন কিকিরা। মুখ তুলে আবার তাকালেন। চোখে কৌতূহল। "কী কেস ?"

চন্দন বলল, "সার্কাসের এক ছোকরার কেস স্যার।"

"সার্কাস ?"

"গোল্ডেন সার্কাস। এখন মার্কাস স্কোয়ারে খেলা দেখাচ্ছে।"

"গোল্ডেন সার্কাস !...ও ! কাগজে যেন বিজ্ঞাপন দেখেছি। নতুন বলে মনে হচ্ছে।

"একেবারে নতুন নয়। বছর পাঁচ-সাতের সার্কাস। বাঙালি মালিক, সার। সার্কাস খুব বড় নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়। আসলে পুরনো অনেক সার্কাস তো ভেঙে গিয়েছে। তারই কিছু-কিছু খেলোয়াড় নিয়ে এই সার্কাস। এরা কলকাতায় বড় আসে না। পাত্তা পাবে না বলে। মফস্বল শহরেই বেশি ঘুরে বেড়ায়। কলকাতায় এক-আধবার আগে এসেছে। সুবিধে করতে পারেনি। এবারে এসে মার্কাস স্কোয়ারে তাঁবু ফেলেছে।...সেই সার্কাসের এক ছোকরা..."

কিকিরা বললেন, "কী করে ছোকরা সার্কাসে ?"

"খেলা দেখায়। খেলোয়াড়।"

"কিসের খেলা দেখায় ?"

চন্দন বলল, "মোটর সাইকেলের। নাম অনিল। পুরো নাম অনিল ভৌমিক। সার্কাসে অনেকে ওকে ঠাট্টা করে 'অলিভার' বলে ডাকে। আসলে ওরা বাঙালি ক্রিশ্চান। অনিলের বয়েস বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। দেখতে ছিপছিপে। গায়ের রং কালো। মাথার চুল কোঁকড়ানো।"

কিকিরা বাধা দিয়ে বললেন, "ডেসক্রিপশন পরে ; আগে কী হয়েছে শুনি।"

চন্দন একবার তারাপদর দিকে তাকাল। যেন তারাপদই বলবে ঘটনাটা। শেষে নিজেই বলল, "সার্কাস থেকে অনিল পালিয়ে এসেছে। ওকে বেশ কিছুদিন ধরে একটা লোক খুন করার চেষ্টা করছিল। মানে, হুমকি দিচ্ছিল।

বারবার থ্রেট করায় ও ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছে।"

কিকিরা বললেন, "কে হুমকি দিচ্ছিল ?"

"সার্কাসেরই অন্য একটা লোক। সেও খেলোয়াড়। পুরনো খেলোয়াড়। সেই লোকটাও মোটর সাইকেল নিয়ে খেলা দেখায়। তার নাম কৃষ্ণমূর্তি। সার্কাসে তাকে সবাই মাস্টার বলে ডাকে। লোকটার দারুণ দাপট সার্কাসে।"

কিকিরা চা খেতে-খেতে তাঁর সেই সরু-ধরনের চুরুট ধরালেন। বললেন, "আরও একটু খুলে বলো। ঠিক ধরতে পারছি না।"

চন্দন ঘটনাটা যা বলল তা মোটামুটি এইরকম :

অনিল আজ বছর দুই হল সার্কাসে গিয়েছে। কৃষ্ণমূর্তি পুরনো লোক। গোল্ডেন সার্কাসের গোড়া থেকেই সে ওই দলে আছে। কৃষ্ণমূর্তি আর অনিল দু'জনেই মোটর সাইকেল নিয়ে খেলা দেখাত সার্কাসে। কৃষ্ণমূতির দেখাত পুরনো খেলা : একটা মস্ত বড় গোল খাঁচা বা গ্লোবের মধ্যে মোটর বাইক নিয়ে বন বন করে ঘুরত। নিচে, ওপরে, পাশে পাক খেত। খুবই চমকপ্রদ খেলা। ভয়ের খেলা। আর অনিল যে-খেলা দেখাত মোটর বাইক নিগে, সেটা অন্যরকম। অনিল খেলা দেখাত ফাঁকায়, সার্কাস রিঙের মধ্যে। একটার পর একটা বাধা টপকানোর খেলা, যেমন প্রথমে টপকাত সার দিয়ে সাজিয়ে রাখা চারটে ড্রাম, তারপর টপকাত আগুন, তারপর জোড়া কাচের দরজা। জোড়া কাচের দরজা মানে দুটো বিশাল কাচ দু'দিকে 'A' অক্ষরের মতন সাজানো থাকত, তার তলা দিয়ে গলে যেত হাই স্পিডে। শেষপর্যন্ত ছিল, স্পট জাম্প।...অনিলের এই খেলাগুলো নতুন ধরনের। সচরাচর কোনো সার্কাসে দেখা যায় না। গ্লোবের মধ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে পাক মারার খেলাটা যতই কেননা চমকপ্রদ হোক, খেলাটা এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। প্রায় সব সার্কাসেই এটা দেখা যায় আজকাল। বোধ হয় তার ফলে, অনিলের খেলা নতুন ধরনের বলে, দর্শকদের ভাল লাগত বেশি, হাততালির ঝড় উঠত। সার্কাসে অনিলের কদর বেড়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণমূর্তি মাস্টারের এটা পছন্দ হয়নি। প্রথমে সে অনিলকে হিংসে করতে শুরু করে। ঘৃণা করত। শেষে তার পেছনে লাগে। এমনকী দু-একবার তাকে জখম করার চেষ্টাও করেছিল। আর হালে তো অনিলকে ক্রমাগত শাসাচ্ছিল। বলছিল, ছোকরাটাকে সে খতম করে দেবে। অনিলের আর সাহস হয়নি। সে ভয় পেয়ে সার্কাস ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

কিকিরা মন দিয়ে সব শুনছিলেন। মাঝে-মাঝে মাথাও নাড়ছিলেন।

তারাপদ বলল, "আমি চাঁদুকে বলেছিলাম, অনিলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। সে থাকলে, আপনি ভাল করে সব শুনতে পেতেন।"

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "তুমি ওই অনিল ছোকরাকে চেনো ?"

চন্দন মাথা নাড়ল। "আগে চিনতাম না। আজ ক'দিন হল চিনেছি।"

"কেমন করে ?"

"আমাদের হাসপাতালে এক সিনিয়র সিস্টার আছেন। নাম মায়া। আমরা তাঁকে মায়াদি বলি। অনিল মায়াদির ভাই।"

"এই সিস্টার তোমাকে তাঁর ভাইয়ের কথা বলেছেন ?"

"হ্যাঁ। আসলে গত সোমবার আমি হাসপাতালে ছিলাম। নিজের ওয়ার্ড ছেড়ে একটু অন্য দরকারে ইমার্জেন্সিতে গিওগছিলাম। ফেরার সময় মায়াদির সঙ্গে দেখা। ছোকরা মতন একজনের সঙ্গে মায়াদি কথা বলছিলেন। তার ডান হাতে ব্যান্ডেজ। আমাকে দেখে ছোকরা তাড়াতাড়ি চলে গেল। মায়াদিকে বললাম, কী ব্যাপার ? মায়াদি তখন আমাকে কথায় কথায় বললেন ব্যাপারটা।"

"ব্যান্ডেজ কেন ?"

"চোট পেয়েছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর পরের দিন মায়াদি আমাকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনিলকে দেখলাম।"

"কোথায় ধরে নিয়ে গেলেন ?"

"তালতলা। মায়াদির বাড়িতে সে থাকছে না ভয়ে। তালতলায় অন্য একটা বাড়িতে অনিল লুকিয়ে রয়েছে। বাড়িটায় নানা ধরনের লোক। অনিল এক বুড়ির কাছে শেল্টার নিয়েছে। ওদের চেনাজানা।"

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। পরে বললেন, "আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না চাঁদু। অনিলকে তাদের সার্কাস পার্টির একটা লোক ভয় দেখাচ্ছে, মেরে ফেলব বলছে। মেরে ফেলব, খুন করব বললেই তো মেরে ফেলা যায় না। তা অনিল কেন কথাটা সার্কাসের মালিক বা ম্যানেজারকে বলল না। সে পালিয়ে এল কেন ?"

চন্দন বলল, "না পালিয়ে এলে তার হয়ত বড় বিপদ হত। কৃষ্ণমূর্তি শুধু পুরনো লোকই নয়, সার্কাসে তার ভীষণ ক্ষমতা। তা ছাড়া লোকটা নাকি নটোরিয়াস।"

"ভাল কথা। তা অনিল সরাসরি সার্কাস ছেড়ে চলে এলে পারত। চাকরি ছেড়ে। পালিয়ে এল কেন ?"

"অনিল আপনাকে ভাল বলতে পারবে। আমায় যা বলল, তাতে মনে হল, সার্কাস দলের সঙ্গে ওর যা কনট্রাক্ট তাতে ও জখম, অসুস্থ বা বড় কোনো কারণ না ঘটলে খেলা দেখাতে বাধ্য। খেলা না দেখালে খেসারত দিতে হবে। টাকাটাও কম নয়।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা আমার মনে হয়, অনিল যেরকম আপসেট হয়ে পড়েছিল—তাতে ওভাবে খেলা দেখানো যায় না। এ-সব খেলায় লাইফ

রিস্ক। সেন্ট পার্সেন্ট কন্‌সেন্‌ট্রেশান দরকার। মন ঠিক না থাকলে, যে-কোনো সময়ে একটা বিশ্রী রকম গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। অনিল হয়ত সত্যিই বড় রকম জখম হত, মারা পড়ত।"

কিকিরা কিছু বললেন না।

সামান্য অপেক্ষা করে চন্দন বলল, "স্যার, আমি কি অনিলকে নিয়ে আসব এখানে ? বা অন্য কোথাও যদি বলেন—তাকে ধরে আনতে পারি।"

কিকিরা ভাবলেন সামান্য। বললেন, "তুমি কি তাকে কিছু বলেছ ?"

"না," মাথা নাড়ল চন্দন, "স্পষ্ট কিছু বলিনি তাকে। তবে মায়াদিকে বলেছি। আপনার কথা বলেছি। মায়াদি আমার কথায় ভরসা করে বসে আছেন।"

তারাপদ বলল, "কেসটা নিয়ে নিন কিকিরা। এর আগে আপনি একজন জাদুকরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। যদিও সে-বেচারি আগেই খুন হয়েছিল। এটা অবশ্য সার্কাস-খেলোয়াড়দের কেস। এ এখনো বেঁচে আছে, হয়ত পরে আর বেঁচে থাকবে না।"

কিকিরা যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। "কেন বেঁচে থাকবে না ? সার্কাস ছেড়ে একজন পালিয়ে এসেছে বলে সে বেঁচে থাকবে না ? এটা কি একটা কথা হল ? অনিল নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে। কিন্তু তার ভয় পাওয়ার পেছনে কতটা মনগড়া ব্যাপার আছে—আমরা তো জানি না। তা ছাড়া সে এভাবে লুকিয়ে থাকবে কেন ? সার্কাসের লোক কি এই কলকাতা শহরে তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে ! আমার তো তা মনে হয় না। এত বড় কলকাতা শহরে লাখ-লাখ লোকের ভিড়ে অনিলকে কেউ খুঁজে বেড়াবে। ...পালিয়ে আসার যে-কারণটা বলছে সেটা ছুতোও হতে পারে। অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। তবু আমি ধরে নিচ্ছি—অনিল যা বলছে তা সত্যি। কিন্তু একটা লোকের শাসানির ভয়ে খেলা দেখানো ছেড়ে পালিয়ে আসবে ?"

চন্দন বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। ঠিক এই কথাই আমি মায়াদি আর অনিলকে বলেছি। কিন্তু অনিলের ধারণা, কৃষ্ণমূর্তি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার নানা ঘাঁটি আছে, চেনাজানা আছে কলকাতা শহরে। সে নিশ্চয় অনিলের খোঁজ চালাচ্ছে।"

কিকিরা কী ভাবলেন। তারপর বললেন, "দেখো চাঁদু, সার্কাস পার্টি এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। দিন কতক পরে তারা এখান থেকে চলে যাবে। তখন আর কে অনিলের খোঁজ করতে আসছে ! অনিল যেমন গা-ঢাকা দিয়ে আছে—সেইভাবেই না-হয় থেকে যাক দশ-পনেরোটা দিন। তারপর আর তার ভয়ের কিছু থাকবে না।"

চন্দন বলল, "হ্যাঁ, তা ঠিক। তবু আমার মনে হচ্ছে, সার্কাস, সার্কাস পার্টি, কৃষ্ণমূর্তি, অনিল—এদের মধ্যে অন্য কিছু ব্যাপার আছে। লুকনো ব্যাপার।

সেটা আমাদের খোঁজ করে দেখলে ভাল হয়।”

কিকিরা ভাবলেন কিছু সময়। বললেন, “বেশ, অনিলকে তবে নিয়ে আসতে পারো। এখানেই নিয়ে এসো তাকে। কাল-পরশু, যেদিন সুবিধে হয়।”

২

পরের দিন, তার পরের দিন তারাপদরা অনিলকে নিয়ে হাজির। কিকিরা বাড়িতেই ছিলেন। আজ আর খাঁচার ছবি আঁকছিলেন না, বসে-বসে গান শুনছিলেন। তাঁর সেই চোঙঅলা পুরনো গ্রামোফোনে কোন আদ্যিকালের এক রেকর্ড চাপিয়ে গান শুনছিলেন। যেমন গ্রামোফোন, তেমনই রেকর্ড। রেকর্ড থেকে খসখসে, অস্পষ্ট এক আওয়াজ বেরোচ্ছিল, গানের সুর বা কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

তারাপদ বলল, “ওটা কার গান শুনছেন, স্যার ?”

কিকিরা বললেন, “গান নয়, বেয়ালা।”

“বেয়ালা ?”

“ওই যাকে তোমরা বলো বেহালা। আগেকার বুড়োরা বলত, বেয়ালা। প্রোফেসর মদন শীলের বেয়ালা শুনছি। মদন শীল ছিলেন জেনাফোন রেকর্ড কোম্পানির মিউজিক টিচার।”

তারাপদ বিনয় করে বলল, “গলা না বেয়ালা বোঝা যাচ্ছে না সার, ভেরি সরি। মদনকে এখন বন্ধ করে দি' ? কী বলেন ! অনিলকে এনেছি।” বলে চোখের ইশারায় অনিলকে দেখাল।

কিকিরা নিজেই উঠলেন। গ্রামোফোন বন্ধ করলেন। পুরনো রেকর্ডটা জায়গা মতন রাখতে-রাখতে বললেন, “তোমরা পুরনো জিনিসের কদর জানো না ! যত্তসব আজকালকার সিনেমার গান নিয়ে নেচে বেড়াও। এই করে দেশটা গেল।” বলতে-বলতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে চন্দনদের বসতে বললেন।

চন্দন অনিলকে বসতে বলল।

কিকিরা বললেন, “কাল না এসে ভালই করেছ। আমি একবার বেরিয়েছিলাম। ফিরতে-ফিরতে সাতটা বেজে গেল। অবশ্য তোমরা বসে থাকলে দেখাত। বগলাকে বলে গিয়েছিলাম।”

চন্দন বলল, “কাল আর হল না। স্যার, এই হল অনিল।”

কিকিরা অনিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, দেখছিলেন যেন ছেলেটিকে। হাতের কব্জির কাছে একটা ব্যান্ডেজ। ক্রেপ ব্যান্ডেজ। কী মনে করে মুচকি হাসলেন। “অলিভার দ্য জাম্পার !”

অনিল কেমন যেন একটু চমকে উঠল। কিকিরাকে দেখছিল।

কিকিরা বললেন, "তোমাদের সার্কাসের বাইরে বড়-বড় দুটো ছবি দেখলাম। কাপড়ের ওপর রংচং করে আঁকা। ট্রাপিজ, বাঘ, সিংহ, এক চাকা সাইকেল, ক্লাউন, তোমাদের খেলা দেখাবার ছবিও।...হ্যান্ডবিলও পেয়েছি হে।"

অনিল বুঝতে পারল। সার্কাস থিয়েটার-সিনেমা নয়। সেখানে কারও নাম থাকে না। খুব বিখ্যাত হলে অন্য কথা। অবশ্য হ্যান্ডবিলে সত্যিই তার নাম থাকে অলিভার দ্য জাম্পার বলে। কিন্তু অনিল তো খেলা দেখাচ্ছে না ক'দিন। পুরনো হ্যান্ডবিল পেয়েছেন বোধ হয় ভদ্রলোক। কিংবা ওরা ইচ্ছে করেই নামটা কাটেনি।

তারাপদ বলল, "আপনি এর মধ্যে সার্কাসেও ঘুরে এসেছেন ?"

হাসি-হাসি মুখে কিকিরা বললেন, "একবার ভিজিট করে এলাম। দেদার হোর্ডিং পোস্টার এঁটেছে বাইরে। রাস্তাতেও দু-চারটে হোর্ডিং দেখলাম। সার্কাসটা জমিয়ে ফেলেছে মনে হল।"

"আপনি কি সার্কাস দেখলেন ?" চন্দন বলল।

"না। এখনো দেখিনি। একদিন যাব দেখতে তোমাদের নিয়ে।"

"তা হলে আপনি কেন গিয়েছিলেন ?"

কিকিরা নিজের জায়গায় বসতে-বসতে বললেন, "খোঁজ-খবর করতে। একবার দেখে আসা ভাল। ...তুমি কখনো ফিশিং, মানে মাছ ধরতে গিয়েছ, চাঁদু ?"

"না।" মাথা নাড়ল চন্দন।

"যারা মাছধরার নেশায় মেতেছে—তারা কোথাও মাছ ধরতে গেলে আগে পুকুর, দিঘি, খাল বা নদীর খোঁজখবর করে আসে, দেখে আসে। যেখানে-সেখানে ছিপ ফেললেই তো ফিশিং হয় না হে ! আগেভাগে খোঁজখবর করে দেখে আসতে হয়।"

তারাপদ বলল, "আপনি কী দেখে এলেন ?"

কিকিরা ধীরেসুস্থে, যেন গল্প শোনাচ্ছেন, হালকা ভাবে বললেন, "আমি কাল বিকেল-বিকেল মার্কাস স্কোয়ারে গেলাম। কাল দুটো শো ছিল। প্রথম শো চলছে তখন। বাইরে তেমন একটা ভিড়ও নেই। সেকেন্ড শো ছ'টায়। আমি গিয়েছিলাম পাঁচটা নাগাদ। দেখলাম, তাঁবুর এখানে-ওখানে ক'টা রঙিন পতাকা উড়ছে, টিকিট কাউন্টারের কাছে কয়েকটা লোক, আশেপাশে কিছু ছেলে-ছোকরা, এক দঙ্গল বাচ্চা, সার্কাসের একটা ছোট তাঁবু—বোধ হয় বাইরের অফিস। একজোড়া কাঠের রং-করা রেলিং সামনে। একটা লোক ফোল্ডিং চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে ছিল। আশেপাশে পান-বিড়ি, ভাঁড়ের চা, ছোলা-বাদামের ফেরিঅলা।"

কিকিরা ছোট করে গোল্ডেন সার্কাসের আশপাশের বিবরণ দেওয়া শেষ করেছেন সবে, তারাপদ বলল, "আপনি শুধু এইসব দেখলেন ?"

"না-না, দু-পাঁচটা খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম।"

"কী খোঁজ পেলেন ?"

"গোল্ডেন সার্কাসে যে ভদ্রলোক ম্যাজিক দেখান, তাঁর নাম আদিনাথ মজুমদার।"

"বাঃ, স্যার, এখানেও ম্যাজিক !"

"এখানেও মানে ! তুমি কি জীবনে সার্কাস-টার্কাস দেখোনি ! প্রত্যেক সার্কাসে একজন করে ম্যাজিশিয়ান থাকে। তারা খেলা দেখায়। হাত সাফাইয়ের খেলা। কেউ টুপির মধ্যে থেকে পায়রা বের করে, কেউ আধ বালতি জল খেয়ে আবার সেটা বের করে, কেউ জ্যান্ত মাছ মুখের মধ্যে পুরে দেয়, আবার বের করে নেয়..."

চন্দন বলল, "আমি দেখেছি স্যার।"

কিকিরা বললেন, "ভাল-ভাল সার্কাসে বড় দরের ম্যাজিশিয়ান রাখে। শুধু ম্যাজিশিয়ান কেন, অনেক রকম খেলোয়াড় রাখতে হয়। কেউ সাইকেলের খেলা দেখায়, কেউ দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটে, কেউ জিমনাস্টিক খেলা দেখায়।"

তারাপদ জানে সবই। বলল, "তা আদিনাথ কি আপনার চেনা নাকি ?"

"না। ও-নাম আমি শুনিনি।"

"তা হলে ?"

"জাতভাইয়ের খোঁজটা নিয়ে এলাম তারাবাবু। কাকে কখন কাজে লেগে যায় !"

"আর কী করলেন ?"

"অলিভার দ্য জাম্পারের খেলাটার খবরও নিলাম। শুনলাম—জাম্পারের অসুখ বলে খেলাটা এখন দেখানো হচ্ছে না। তার বদলে অন্য খেলা দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।" বলে কিকিরা অনিলের দিকে তাকালেন।

অনিল কোনো কথাই বলছিল না। কিকিরাকে দেখছিল। তার কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না, এই রোগা লম্বা মামুলি একটা লোক তার কোন উপকার করতে পারে ? ভদ্রলোককে দেখলে হয়ত মজাদার মানুষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই লোকটির ক্ষমতা কতটুকু ? অনিলের মোটেই ইচ্ছে ছিল না এখানে আসে; দিদির জন্য আসতে হল। দিদি জোর করলেন। ডাক্তারবাবুর কথায় দিদি কেন বিশ্বাস করলেন কে জানে !

কিকিরা অনিলকে দেখতে-দেখতে বললেন, "কী হে জাম্পারসাহেব ! আমি ঠিক বলেছি কি না ! আদিনাথ মজুমদার তোমাদের সার্কাসে ম্যাজিক দেখান না ?"

অনিল মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

"কোথাকার লোক ! কলকাতার ?"

"ডুয়ার্সের লোক। কলকাতাতেও থাকতেন। আগে রয়েল সার্কাসে ছিলেন।"

"কৃষ্ণমূর্তিও তো সাউথ ইন্ডিয়ান ?"

"হ্যাঁ। তবে কৃষ্ণমূর্তি অনেক জায়গায় ছিলেন। কলকাতাতেও অনেক বছর। বাংলা, হিন্দি—দুই ভাল জানেন।"

"কৃষ্ণমূর্তি আর আদিনাথ—মানে মজুমদারমশাইয়ের মধ্যে ভাবসাব কেমন ?"

"বনে না। কৃষ্ণমূর্তিকে অনেকেই পছন্দ করে না।"

"কেন ?"

অনিল একটু চুপ করে থেকে বলল, "কৃষ্ণমূর্তি সকলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। গালমন্দ করেন। লোকটার বড় দেমাক। এমনিতেও নোংরা, রাফ গোছের।"

"তবু তিনি সার্কাসে টিকে আছেন কেমন করে ?"

"মালিকের বন্ধু। গোল্ডেন সার্কাসটা গড়ে তোলার সময় মাস্টার—ওই কৃষ্ণমূর্তি—অনেক করেছিলেন।"

"আচ্ছা ! কৃষ্ণমূর্তি কি সার্কাসের পার্টনার ?"

"জানি না। তবে ওঁর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা থাকে। থাকেন আলাদা ; ভাল-ভাল খাবার খেতে পান। টাকাও বেশি পান।"

"তোমাদের সার্কাসে একটা খোঁড়া মতন লোক আছেন ?"

অনিল অবাক হয়ে বলল, "আপনি কেমন করে জানলেন ?"

"আলাপ হল।"

"হরিশবাবু। হরিশবাবু আগে জিমনাস্টিকের ট্রেনার ছিলেন। নিজে জাগ্‌লারি দেখাতেন। একবার সার্কাসের বাইরের তাঁবুতে আগুন লাগে। হরিশবাবু আগুন নেভাতে গিয়ে জখম হন। এখন আর উনি খেলা দেখান না। মাঝেমাঝে ক্লাউন সাজেন। বেশিরভাগ সময় হরিশবাবু টিকিট ঘরে বসে থাকেন, না হলে বাইরে ঘোরাফেরা করেন।"

কিকিরা বললেন, "হরিশবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। বাইরে ছোট তাঁবুর পাশে টিনের চেয়ার টেনে বসে ছিলেন। বিড়ি টানছিলেন।"

"নিজেই আলাপ করলেন আপনি ?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। লোকটি তো ভালই মনে হল। খানিকটা মনমরা গোছের। ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন, বিড়ি টানছেন। আমি একটা বুদ্ধি খাটিয়ে আলাপটা সেরে ফেললাম।"

"কীরকম বুদ্ধি ?" চন্দন বলল।

কিকিরা বললেন, "এজেন্ট সেজে গেলাম, বুঝলে। মানে দালাল।

কলকাতার যাত্রা দলগুলোর দালাল থাকে বাইরে, দেখেছ না ? মফস্বল শহরের দালাল, কোলিয়ারির দালাল, চা-বাগানের দালাল। আমি খানিকটা অন্যরকম দালাল হয়ে গেলাম। বললাম, আমি হলাম টিসি ইম্‌প্রেসারিও কোম্পানির এজেন্ট। আমরা বাইরে মফস্বল টাউনে নাচ, গান, থিয়েটার, সার্কাস—এইসব দেখাবার ব্যবস্থা করি।"

কিকিরার কথা শেষ হল না, তারাপদ যেন থ মেরে গিয়ে কোনোরকমে বলল, "আপনি এজেন্ট হয়ে গেলেন ? ইম্‌প্রেসারিও কোম্পানির ? বলেন কী সার ?"

"হলাম। না হলে ভাব জমাব কেমন করে। কাজ বাগাবার জন্যে কত কী হতে হয় হে, তারাবাবু।"

"ও। টিসি কোম্পানি বলে আছে নাকি কোনো কোম্পানি ?"

"তোমরাই আছ। তারা-চন্দন কোম্পানি।"

"আমরা ?" তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। তারপর হেসে ফেলল। "সত্যি স্যার, আপনি মাথা খাটাতে পারেন বটে।"

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, "মাথা থাকলেই খাটাতে হয়। না খাটালে মাথা আর মাথা থাকে না, ঘট হয়ে যায়। বুঝলে ?"

চন্দন বলল, "আলাপ করে লাভ হল ?"

"হল সামান্য। যেমন, সার্কাসে কী-কী খেলা দেখানো হয়। ভাল খেলা কী আছে ? কারা খেলা দেখায়—এইসব জেনে নিলুম। হরিশবাবুর মুখেই শুনলুম অলিভার দ্য জাম্পারের খেলাটা এখন বন্ধ আছে। ছোকরার অসুখ করেছে।" বলে একটু থেমে মুচকি হাসলেন। বললেন আবার, "ম্যাজিশিয়ান আদিনাথের নামটা হরিশবাবুর কাছ থেকেই জেনে নিলুম।"

তারাপদ বলল, "তাতে কোনো লাভ হবে ?"

"আগে থেকে বলতে পারছি না। তবে একই জাতের পাখি তো, চান্স পেলে ভাই-ভাই হয়ে যেতে পারি।...তা, হরিশবাবু একদিন নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের সার্কাস দেখতে যাওয়ার জন্যে। বললেন, আপনি আসুন একদিন আমাদের খেলা দেখুন, তারপর মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কথা বলবেন।"

বগলা ট্রে করে চা নিয়ে ঘরে এল। চা আর সামান্য খাবার—কুচো নিমকি, সেউ ডালমুট, শোনপাপড়ি।

চা আর খাবার নামিয়ে দিয়ে চলে গেল বগলা।

"নাও, হাত লাগাও—" কিকিরা অনিলকে বললেন। বলে তারাপদদের দিকে তাকলেন। "কাল-পরশু একদিন সার্কাস দেখতে যেতে হয়, কী বলো ?"

"যান আপনি !" তারাপদ বলল "আপনাকে নেমন্তন্ন করেছে।"

"আমি একা কেন যাব, তোমরাও যাবে—তুমি আর চাঁদু। আমি তো এজেন্ট, মালিক হলে তোমরা। তোমরা পছন্দ করলে তবেই না সার্কাস

কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা হবে।"

চন্দন বলল, "কি যে বলেন আপনি! আমরা মালিক। ইম্‌প্রেসারিওর 'ই' জানি না, কথা বলব! ধরা পড়ে যাব, স্যার।"

"কথা বলতে হবে না ; কথা আমি বলব। তোমরা শুধু হ্যাঁ-হুঁ করে যাবে, মাথা নাড়বে, কপাল কোঁচকাবে। এমন ভাবে করবে যেন, তোমাদের ঠিক পছন্দ নয় সার্কাসটা, বিজনেসের দিক থেকে। আমি শুধু তোমাদের তেলিয়ে যাব। এজেন্ট তো!"

"তারপর?"

"তারপর কিছু না। আসলে, তোমরা যাবে আমার সঙ্গে চারদিক নজর করতে। ওয়াচ করবে। আমার একার পক্ষে চারদিকে নজর করা সম্ভব নয়।"

চন্দন আর তারাপদ কিছুই বলল না। ওরা রাজি।

চা খেতে-খেতে কিকিরা এবার অনিলের দিকে তাকালেন। দেখছিলেন ছোকরাকে। কিকিরার মনে কোথায় যেন একটু খুঁতখুঁত করছিল। ছেলেটিকে দেখলে মনে হয় না ওর মধ্যে বাড়তি সাহস, বেপরোয়া ভাব তেমন একটা আছে। সার্কাসের কয়েকটি খেলা, যেমন ট্রাপিজ, জিপগাড়ি নিয়ে লাফানো, মোটর সাইকেল নিয়ে খাঁচার মধ্যে পাক খাওয়া—এ-সব খেলা দেখাতে হলে বেজায় সাহস, সঙ্কল্প, খানিকটা বেপরোয়া ভাব দরকার হয়। কিকিরার মনে হল, ছেলেটির চেহারা যেমন আছে—তাতে লাফ মারার খেলা দেখানোয় কোনও অসুবিধে নেই। তবে চেহারাই তো সব নয়, মনও দরকার।

কিকিরা অনিলকে বললেন, "তোমার বয়েস কত?"

অনিল চা খাচ্ছিল। মুখ তুলে বলল, "পঁচিশ হয়ে গেছে।"

"তুমি কতদিন খেলা দেখাচ্ছ?"

"দু' বছর।"

"আগে কোনো সার্কাসে ছিলে?"

"না।"

"তা হলে? কে তোমায় খেলা শেখাল? তোমার ট্রেনার কে?"

অনিল কী মনে করে তার গলায় ঝোলানো চেনের লকেটটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। রুপোর চেন, লকেটটা সোনার। ক্রশ। বলল, "আমায় খেলা শেখাতেন সিসিল সরকার।"

"সিসিল!"

"ওই নাম। আমাদের লোক। সিসিল নামমকরা বাইক রাইডার। মোটর সাইকেল রেসিং-এ অনেক প্রাইজ পেয়েছেন। ভাল হকিও খেলতেন।"

"সিসিল কি সার্কাসে ছিলেন?"

"না। সিসিলদের টেলারিং শপ ছিল। নিউ মার্কেটের কাছে। লিন্ডসে

স্ট্রিটে বড় দোকান। নামী দোকান। সিসিল দোকান দেখতেন।"

"সেই দোকান এখন..."

"হাত বদল হয়ে গেছে। সিসিল নেই। মাঝে শুনেছিলাম, ওঁর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ; বেঁচে নেই। পরে শুনলাম, সিসিল দার্জিলিঙে চলে গেছেন।"

"তোমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি ?"

"না স্যার।"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে সিগারেট চাইলেন তারাপদর কাছে। চুরুটে যেন অভিরুচি ছিল না। তারাপদ সিগারেট দিল।

সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিলে কিকিরা অনিলকে বললেন, "তুমি বলছ, আগে তুমি কোনো সার্কাস পার্টিতে ছিলে না। তা হঠাৎ গোল্ডেন সার্কাসে ঢুকলে কেমন করে ?...আমি যতটুকু বুঝি বাবা, সার্কাসে ঢোকা, চাকরি পাওয়া—আর কোনো অফিসে কেরানির চাকরি পাওয়া এককথা নয়। তোমার মতন আনকোরা আনাড়িকে কোন সার্কাস চাকরি দেবে ?"

অনিল মাথা নেড়ে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কেউ দেয় না। আমিও চাকরি খুঁজতে সার্কাসে যাইনি। তালেগোলে ওটা হয়ে গেছে।" বলে অনিল তার সার্কাসে ঢোকার ঘটনার কথা বলল।

সেবার, বছর দুই আগের কথা, শীতের সময় অনিল গিয়েছিল আসানসোলে তার এক বন্ধুর কাছে বেড়াতে। বন্ধুর বাড়ির সিকি মাইলটাক দূরে তখন গোল্ডেন সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। খেলা চলছিল। একদিন অনিল তার বন্ধুর কোয়ার্টারের সামনে বন্ধুরই মোটর বাইক নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল মজা করে। সামনের রাস্তা দিয়ে তখন একটা জিপগাড়ি করে যাচ্ছিলেন গোল্ডেন সার্কাসের মালিক। সঙ্গে সার্কাসের অন্য দু'জন। মালিকের কেমন করে নজর পড়ে গেল অনিলের ওপর। গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ খেলা দেখলেন। তারপর নিজেই এসে দাঁড়ালেন অনিলের সামনে।

কিকিরা বললেন, "মালিকই তোমায় নিজে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সার্কাসে ?"

"হ্যাঁ স্যার। নিজে। আমি সার্কাসে ঢুকব ভাবিনি কোনোদিন। ঢুকে গেলাম। দিদি বারণ করেছিলেন, রাগ করেছিলেন। তবু লোভে পড়ে ঢুকে গেলাম।"

"কিসের লোভ ?"

ইতস্তত করে অনিল বলল, "স্যার, গ্ল্যামারের লোভ। সার্কাসের টেন্ট, গ্যালারি, আলো, রং-চং খেলা—সব কেমন যেন। থ্রিলিং। তবে স্যার, প্রথমে আমি আজকের মতন এত খেলা দেখাতাম না। জানতাম না। দু-তিনটে খেলাই দেখাতাম। তারপর ধীরে-ধীরে নিজে খেলা বের করেছি। প্র্যাকটিস

করেছি দিনের পর দিন। আমার কোনো ট্রেনার সার্কাসে ছিল না। নিজের চেষ্টায় যা পেরেছি করেছি।”

তারাপদ আর চন্দন কোনো কথা বলছিল না। অনিলের কথা শুনছিল। মনে-মনে বাহবা দিচ্ছিল অনিলকে।

কিকিরা সিগারেট নিভিয়ে রেখে দিলেন। বললেন, “তুমি সার্কাসে ঢোকার পর থেকেই কি কৃষ্ণমূর্তি তোমার পেছনে লাগেন ?”

মাথা নাড়ল অনিল। “না। আগে ভাল ব্যবহার করতেন।”

“কখন থেকে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করলেন ?”

“এবারকার সিজিনে।”

“কেন ?”

“জানি না।”

“তিনি তোমায় জখম করার চেষ্টা করেছেন শুনলাম। কেমন ভাবে ?”

অনিল বলল, “কৃষ্ণমূর্তি সাহেব আমাকে, আমার খেলা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে শুরু করলেন গোড়ায়-গোড়ায়। তারপর আমাকে বললেন, তাঁর সঙ্গে ওই লোহার পাতের গ্লোবটার মধ্যে ঢুকে খেলা শিখতে। মানে আমরা দু'জনেই একটা গোল খাঁচার মধ্যে পাক খাব। উনি ক্লক ওয়াইজ্‌, আমি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ। আমার স্যার এই খেলাটা শিখতে বা দেখাতে ইচ্ছে ছিল না। কৃষ্ণমূর্তির জোর-জবরদস্তিতে মাঝে-মাঝে ঢুকতাম। তখন উনি খেলা শেখাবার নাম করে আমাকে জখম করার চেষ্টা করতেন।”

কিকিরা শুনলেন মন দিয়ে। ভাবছিলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, “ওই লোকটা তোমাকে আর কীভাবে শাসাত ?”

“আমার টেন্টের মধ্যে জামার পকেটে, সুটকেসের ওপর ভাঁজ করা কাগজ রেখে দিয়ে যান লুকিয়ে। তাতে গালমন্দ থাকে, শাসানি থাকে।”

“কী লেখেন ?”

“বেশি কিছু লেখেন না। দু-একটা কথা। বড় বড় হরফে। ভয় দেখান, মেরে ফেলার ভয় দেখান।”

“লেখাটা যে কৃষ্ণমূর্তির, তার প্রমাণ কী ? তুমি কি ওঁর হাতের লেখা চেনো ?”

“নিজের হাতে লেখেন না। কাগজ থেকে টাইপ কেটে-কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে ওঁর যা লেখার লেখেন।”

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। শেষে বললেন, “ঠিক আছে। আজ থাক। পরশু আবার কথা হবে। তুমি এখানেই এসো। সন্ধেবেলায়।”

৩

সার্কাস থেকে বেরিয়ে এসে কিকিরা বললেন, "কী চাঁদু, কেমন হল ?"

চন্দন কোনো কথা বলল না। কীই-বা বলবে !

তারাপদ চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "স্যার, আপনার সবই অদ্ভুত। কখন যে কী করেন, বুঝতে পারি না।"

কথাটা তারাপদ মিথ্যে বলেনি। কিকিরা প্রথমে বলেছিলেন, তারাপদ আর চন্দনকে টিসি ইম্‌প্রেসারিও কোম্পানির পার্টনার আর মালিক সাজিয়ে গোল্ডেন সার্কাসে নিয়ে যাবেন। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা কোনো কথা বলবে না। নেহাত যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকুই বলবে। আর তোমরা এমন ভাব করবে, যেন কোম্পানির মালিক হলেও দু'জনেই অকর্মা, বাপের কিছু পয়সা আছে বলে নামকেওয়াস্তে এই কোম্পানি খুলে রেখেছে, নিজেরা তেমন কিছু দেখাশোনা করো না, সবই আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছ ! আমি যা করি—তোমরা না বলো না। আমি হলাম তোমাদের বাপ-জেঠার আমলের লোক। আমাকে খাতির করো তোমরা। ব্যস, বাকি যা সব আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

তারাপদ বা চন্দন কোনো আপত্তি করেনি। ইম্‌প্রেসারিও, কোম্পানি—এর কোনো কিছুই যখন তারা জানে না, তখন কিকিরার হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেই ভাল।

সার্কাসে ঢোকার আগে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "তোমরা এক কাজ করো। দুটো টিকিট কেটে ভেতরে চলে যাবে। একেবারে সামনের দিকে।"

"কেন, আপনার সঙ্গে যাব না ?"

"না। আমি হরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করে—তাঁর সঙ্গে ভেতরে যাব। তিনি যখন তোমাদের—মানে মালিকদের কথা জিজ্ঞেস করবেন, বলব, ওরা নিজেরাই আসবে। ফ্রিতে আসতে চায় না। বলে, তাতে প্রেস্টিজ থাকে না কোম্পানির। খাতির করে নিয়ে গিয়ে ভাল জায়গায় বসাবে, চা-সিগারেট-পান খাওয়াবে—তারপর আমাদের বাগিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করবে। চক্ষুলজ্জা বলে কথা আছে। আমরা নিজেরাই যাব। সার্কাস ভাল লাগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। তারপর অন্য কথা...।"

তারাপদ বলল, "বাঃ।"

কিকিরা বললেন, "বাঃ নয় ! গোড়ায়-গোড়ায় তোমাদের একটু তফাতে রাখতে চাই। বেফাঁস কথাবার্তা বলে ফেললে ধরা পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া আমি চাই তোমরা চোখ-কান খোলা রেখে সব দেখো-শোনো।"

তারাপদরা আর আপত্তি করেনি।

আড়াই ঘণ্টা সময় তারা সার্কাসে বসে-বসে কাটিয়েছে।

সার্কাস ভাঙার পর কিকিরা এসে ধরলেন দু'জনকে। সঙ্গে হরিশবাবু। তারাপদদের টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন মালিকের কাছে।

কিকিরা হরিশবাবুকে বোঝালেন। তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। এরা কিছু না জানিয়েই নিজেরা এসেছে। ওরা একটু ভেবে নিক। দু-চার দিনের মধ্যে আমিই আবার ওদের নিয়ে আসব। তখন বিজনেসের কথা বলা যাবে।

সার্কাস থেকে বেরিয়ে তিনজনে খানিকটা হেঁটে আসার পর কিকিরা বললেন, "কেমন দেখলে সার্কাস?"

চন্দন বলল, "কেমন আর! এ-সব সার্কাস এইরকমই হয়। খুব ভাল নয়, আবার একেবারে রদ্দি নয়।"

"তারাবাবু, তুমি?"

"নতুন খেলা কিছু দেখলাম না। তবে হ্যাঁ, ওই খেলাটা ভাল দেখাল। ড্যাগার থ্রো। আগেও আমি দেখেছি। কিন্তু শেষে যখন লোকটার চোখ বেঁধে দিল, আর মেয়েটাকে দাঁড় করিয়ে ও ড্যাগার ছুড়ছিল—তখন আমার বেশ ভয় করছিল, স্যার।"

চন্দন বলল, "ট্রাপিজ খেলাটাকে বড় ম্যাড়মেড়ে করে দেখাল। আরও ব্রাইট করা উচিত ছিল, কিকিরা। ট্রাপিজই তো সার্কাসের আসল খেলা। আর বাঘ-সিংহ-র খেলা যা দেখাল, টোটালি হোপ্‌লেস। ঝিমোনো দু-চারটে বুড়ো বাঘ-সিংহ নিয়ে চলে না।"

কিকিরা হাসলেন। বললেন, "পাকা মালিকের মতন কথা বলছ চাঁদু!...যাক গে, আর কিছু নজর করলে?"

"কী?"

"সে কি! তোমাদের তবে আনলাম কেন?"

তারাপদ কিকিরার দিকে তাকাল। বুঝতে পারল কথাটা। বলল, "আপনি কৃষ্ণমূর্তির কথা বলছেন?"

"বলছি তো আরও কিছু। কেমন দেখলে কৃষ্ণমূর্তির মোটর বাইকের খেলা?"

তারাপদ বলল, "ভাল। দারুণ রিস্কি খেলা। লোকটা ভাল দেখাল, স্যার। বিশেষ করে ওর ওপর থেকে নিচে নামার খেলাটা। সারকেলগুলো ডেঞ্জারাস!"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "শুনলাম, কৃষ্ণমূর্তি প্রায় গত দশ বছর এই খেলাই দেখাচ্ছেন! খেলোয়াড় হিসেবে পাকা।" বলে একটু থেমে খানিকটা অন্যমনস্কের মতন জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখলে লোকটাকে?"

চন্দন হাঁটতে-হাঁটতে মুখ তুলল। বলল, "লোকটাকে আর দেখলাম কোথায়! গায়ে ওই রেসিং সুট। পুরো শরীর ঢাকা। মাথায় হেলমেট,

মিলিটারি মার্কা, হাতে গ্লাভস, পায়ে ব্রিচেস মার্কা বুট জুতো। সবই তো ঢাকা স্যার। ...তবে উনি যখন খেলার শেষে হেলমেট খুলে দাঁড়িয়ে হাততালি কুড়োচ্ছিলেন—তখন কৃষ্ণমূর্তির মুখটা দেখলাম। দু-চার মিনিটের জন্যে। থুতনির কাছে দাড়ি। জাহাজের সেলারদের মতন দেখাচ্ছিল। চোখ গোল-গোল। নাক বসা।"

তারাপদ বলল, "চেহারার মধ্যে একটা রোবাস্ট ভব আছে।"

কিকিরা বললেন, "লোকে কী বলছিল ? মানে, আরো একটা মোটর বাইকের খেলা যে বন্ধ রয়েছে, লোকে কীভাবে নিচ্ছিল !"

তারাপদ বলল, "দু-চারজন বলছিল বটে, তবে ও নিয়ে খুব যে কথাবার্তা হচ্ছিল—তা নয়।"

ততক্ষণে বড় রাস্তায় এসে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কিকিরা হাত বাড়িয়ে ডাকলেন ট্যাক্সিটাকে।

তারাপদরা ট্যাক্সিতে উঠল।

সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, "আমি হরিশবাবুর সঙ্গে ছিলাম। মালিক ছাড়াও দু-তিনজন খেলোয়াড়কে দেখলাম। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাও বললাম হে। আমার মনে হল, অনিলের খেলাটা বন্ধ রয়েছে বলে ওরা যে মুশকিলে পড়েছে—তাও নয়। অবশ্য মালিক আর হরিশবাবু দু'জনেই বলছিলেন, অন্য খেলাটারও একটা মেজর অ্যাট্র্যাকশান ছিল। লোকে নিয়েছিল খেলাটা। তবে সার্কাসের ব্যবসায় দু-একটা খেলা বাদ গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। লোকে ও নিয়ে মাথাও ঘামায় না।"

"তবে ?"

"আমিও তাই ভাবছি।"

"অনিলের কথা আপনি জিজ্ঞেস করলেন নাকি ?"

"মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ! আমি অনিল বলে কাউকে হালে চিনেছি বা দেখেছি—এ-কথা কি বলা যায় ! খেলাটার কথা জিজ্ঞেস করেছি, খেলোয়াড়ের কথা নয়। আমি বাবা ইম্প্রেসারিও। খেলার ভাল-মন্দ খোঁজ নিতে পারি, কেননা সেগুলো নিয়ে ব্যবসা করব। খেলোয়াড়ের কথা আমি তুলব কেন !"

চন্দন বলল, "অনিল পালিয়ে আসায় ওদের তবে ক্ষতি হচ্ছে না ?"

"হয়ত একটু হচ্ছে, ওরা কিন্তু ভাঙল না। ...বিজনেস সিক্রেট হতে পারে।"

"তা হলে ?"

কিকিরা এবার পকেট হাতড়ে চুরুট বের করলেন। চুপচাপ থাকলেন কিছুক্ষণ। চুরুট ধরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "চাঁদু, অনিল যা বলছে, আর সত্যি কী ঘটেছে—মানে অনিল ছেলেটির কথা কতটা সত্যি আমি বুঝতে পারছি না।"

তারাপদ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এখানে রাস্তায় বাতি নেই। অন্ধকার। হয়ত লোড শেডিং হয়ে গিয়েছে। দোকান-পশারও বন্ধ। রাত হয়ে গিয়েছে। আলো বড় একটা দেখাই যাচ্ছে না। ট্যাক্সির হেড লাইটের আলোও তেমন জোরালো নয়। অবশ্য উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির আলো মাঝে-মাঝে তারাপদদের গায়ে-মুখে পড়ছিল।

তারাপদ বলল, "অনিল কি মিথ্যে কথা বলছে ?"

কিকিরা বললেন, "বলতে পারে।"

চন্দন আপত্তি জানাল যেন। "ও মিথ্যে কথা বলবে কেন ? কী লাভ ? ও যে ভয় পেয়েছে, পালিয়ে এসে লুকিয়ে রয়েছে, এটা তো ঠিকই।"

"হ্যাঁ", কিকিরা কী ভাবতে-ভাবতে ধীরে-সুস্থে বললেন, "সার্কাস ছেড়ে অনিল পালিয়ে এসেছে—এটা সত্যি। ভয় পেয়েছে—তাও হতে পারে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কারণ ও যা বলছে তা আমি মেনে নিতে পারছি না। সব খেলাতেই কম্পিটিশান থাকে। খেলাতেই বা শুধু কেন—সব জায়গাতেই। গাইয়েদের মধ্যে থাকে, থিয়েটারে থাকে, যাত্রায় থাকে—"

"আপনাদের ম্যাজিকেও থাকে।"

"হ্যাঁ, থাকে। আছেও। ...আমার কথা হল, অনিলের খেলা বেশি পপুলার হয়ে যাচ্ছে বলে কৃষ্ণমূর্তি তাকে শাসাচ্ছেন, জখম করার চেষ্টা করছেন, মেরে ফেলতেও পারেন—এইসব কথা কি ঠিক ? শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে খুন-খারাপি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব কি না বলতে পারছি না। অন্য ব্যাপার হলে হতে পারে। এখানে নিতান্ত একটা সার্কাসের খেলা। আমার মাথায় আসছে না চাঁদু !"

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, "কিকিরা, অনিলকে আমি চিনি না। সে কেমন ছেলে তাও জানি না। কিন্তু মায়াদিকে আমি চিনি। সিস্টার হিসেবে মায়াদি কত ভাল আমি জানি। তার চেয়েও বেশি জানি, মায়াদিকে। মায়াদি কখনো মিথ্যে কথা বলবেন না। আর অনিলই মায়াদির একমাত্র ভাই।"

তারাপদ বলল, "অনিলের সঙ্গে আপনি আরও কথা বলুন।"

"বলব বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি।"

"কাল ও আসবে আপনার কাছে।"

কিকিরা কথাটা শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। চুরুটটা দাঁতে চেপেই থাকলেন। ট্যাক্সি অনেকটা এগিয়ে এল।

শেষ পর্যন্ত চুরুটটা আবার জ্বালাবার চেষ্টা করতে-করতে কিকিরা বললেন, "সার্কাসের মধ্যে আমায় ঢুকতে হবে।"

তারাপদ হালকাভাবেই বলল, "খেলা দেখাবেন ?"

"মন্দ নয় ; দেখাতেও পারি।"

"কী খেলা ?" তারাপদ মজা করেই বলল, "ম্যাজিক ?"

"ঠাট্টা করছ ! শোনো হে তারাবাবু, কিকিরা দ্য ম্যাজিশিয়ান এখনো ইচ্ছে করলে দু-চারটে থ্রোট চোকিং খেলা দেখাতে পারে।"

"থ্রোট চোকিং ?"

"ইয়েস স্যার, গলা চোক হয়ে যাবে—মানে ভয়ে তোমার গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ।"

"কী খেলা স্যার ?"

"কাটা মুণ্ডু গড়াগড়ি। টেবিলের এ-পাশ থেকে ও-পাশ, ও-পাশ থেকে এ-পাশ। মুণ্ডুর ওপর আলোর লাল ফোকাস। সেইসঙ্গে অট্টহাসি।"

তারাপদ জোরে হেসে ফেলল। চন্দনও না হেসে পারল না। তারাপদ বলল, "অট্টহাসিটা কে হাসবে ? আপনি ?"

"নো। রেকর্ড বাজবে। আজকাল তো আবার স্টিরিও সিস্টেম।"

আর-এক দফা হাসি হল।

শেষে চন্দন বলল, "কিকিরা, এখন তা হলে আপনি কী করতে চান ?"

কিকিরা বললেন, "আমি সবার আগে আর-একবার অনিলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমরা থাকলে ভাল হয়। তারপর আমি সার্কাসের ভেতরের খোঁজ-খবর করবার চেষ্টা করব। তোমরা কাছাকাছি থাকবে।"

"সত্যি আপনি সার্কাসের অন্দরমহলে ঢুকবেন ?"

"ঢুকতে হবে। না ঢুকলে আসল ব্যাপারটা জানব কেমন করে ! তোমরা যতটা সহজ ভাবছ ততটা সহজ ঘটনা এটা নয় চাঁদু। আমার তাই আন্দাজ হচ্ছে।"

৪

সাতটা বাজল দেখতে-দেখতে।

তারাপদ এসেছে ছ'টারও আগে। চন্দন এল সাড়ে ছ'টা নাগাদ। অনিলের কিন্তু দেখা নেই।

কিকিরা বললেন, "কই গো, তোমাদের জাম্পার অলিভারের যে এখনো দেখা নেই। কী হল তার ?"

তারাপদ খানিকটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল অপেক্ষা করতে-করতে। বলল, "কী জানি, বাড়ি ভুল করল নাকি ?"

কিকিরা বললেন, "তোমরা ভাল করে চিনিয়ে দাওনি রাস্তাটা ?"

"দিয়েছি।"

কিকিরা অন্য কথা পাড়লেন। নিজে অল্প বয়েসে কত ভাল-ভাল সার্কাস দেখেছেন তার গল্প শোনাতে লাগলেন। তখনকার সার্কাসে পশুর খেলা ছিল দেখবার মতন। বাঘ-সিংহ ছাড়াও ঘোড়ার খেলা থাকত, থাকত হাতির

খেলা। এক-একজন রিং মাস্টার যেভাবে সাজপোশাক পরে বেত হাতে এসে দাঁড়াত, মনে হত যেন রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে। আর ট্রাপিজ ? আরে সে-ট্রাপিজ এখন দেখবে কোথায় ? সাহেব-মেম ট্রাপিজের খেলা দেখাত পুরনো 'কুইন সার্কাসে'।

কিকিরার গল্পের মধ্যে অনিল এল।

অনিলকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। খানিকটা জড়োসড়ো—মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ। গায়ের শার্টটা কুঁচকে রয়েছে অনিলের। বোধ হয় ভিড়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে বাসে।

কিকিরা বললেন, "এসো। এত দেরি ?"

অনিল কিকিরাকে আগেই দেখেছিল। তারাপদদের দিকে তাকাল। দেখল ওদের। বলল, "দেরি হয়ে গেল !"

চন্দন বলল, "ঠিকানা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ?"

অনিল মাথা নাড়ল। বলল, "না, রাস্তা গোলমাল হয়নি।" বলে একটু থেমে কিকিরার দিকে তাকাল। "সাড়ে পাঁচটা নাগাদই আমি বেরোতে যাচ্ছিলাম। বাড়ির গলির কাছে একটা লোককে দেখে বেরোতে সাহস হল না।"

"লোক ? কোন লোক ?" চন্দনই বলল অবাক হয়ে।

অনিল বলল, "লোকটাকে চিনি না। আগে কোনোদিন দেখিনি গলিতে। তবে মুখটা কোথাও দেখেছি বলে মনে হল। আজই গলিতে দেখলাম। আমাদের বাড়ির কাছে একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দোকান আছে। মোটর গাড়ির ইলেকট্রিকের কাজ করে। সেল্‌ফ ডায়নোমো। ব্যাটারিও তৈরি করে। সেই দোকানের সামনে কাঠের টুল নিয়ে ঠায় বসে ছিল লোকটা।"

কিকিরা বললেন, "এ আবার কেমন কথা হে ! দোকানের সামনে একটা লোক বসে থাকতেই পারে। হয়ত কোনো কাজ করাচ্ছিল। তুমি তাকে চেনোও না। তা হলে ভয় কিসের ?"

প্রায় তোতলানোর মতন করে অনিল বলল, "লোকটাকে গুণ্ডার মতন দেখতে। দেখলে মাস্‌লম্যান বলে মনে হয়। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। হাতে লোহার বালা। লোকটা বসে-বসে গলিতে যারা আসছে-যাচ্ছে তাদের দেখছিল। আমার মনে হল, সে ওয়াচ করছে।"

"তোমাকে দেখেছে সে ?"

"না। আমি তাকে দেখেছি। ও আমাকে দেখতে পেত। কিন্তু একটা রিকশার আড়াল পড়ে যাওয়ায় সে আমাকে দেখতে পায়নি। ওকে দেখেই আবার আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।"

"তা হলে তুমি কেমন করে বুঝলে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে দোকানের

সামনে বসে ছিল।"

অনিল থতমত খেয়ে বলল, "আগেও আমি তাকে দেখেছি। বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে। তখন কিছু মনে হয়নি। বেরোবার সময় আবার দেখতে পেয়ে—সন্দেহ হল।"

চন্দন বলল, "তোমাদের নিজের বাড়িতে তুমি থাকো না। লুকিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকছ। তোমার আস্তানা সে জানবে কেমন করে?"

অনিল সে-কথার কোনো জবাব দিল না। এমন ভাব করল, যেন সেও জানে না কেমন করে লোকটা এই গলিতে ঢুকে পড়ল।

কিকিরা বললেন, "তুমি তো দেখছি সব ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ। একটা লোককে দেখতে ষণ্ডাগুণ্ডার মতন হতেই পারে। সে আর বিচিত্র কী! কলকাতার অলিতে-গলিতে আজকাল গুণ্ডা মার্কা লোক দেখা যায়। এরকম কাউকে দেখা গেলেই তোমার মনে হবে লোকটা তোমাকে ওয়াচ করছে—এ আবার কেমন কথা!"

অনিল বলল, "লোকটাকে দেখে আমার ভাল লাগেনি।"

তারাপদ বলল, দোকানে জিজ্ঞেস করেছ, লোকটা কে?"

"না।"

"কেন! তাতেও ভয়!" তারাপদ ঠাট্টা করে বলল।

অনিল অস্বস্তি বোধ করছিল। কিকিরা কথা ঘুরিয়ে নিলেন। নিয়ে সার্কাসের চাকরি কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন অনিলের সঙ্গে। তারাপদরা বসে-বসে শুনছিল।

কিকিরা গোড়ার দিকে এমন সব কথা বলছিলেন যা খানিকটা মামুলি। সার্কাসের খেলা, খেলোয়াড়, থাকা-খাওয়া, মোটামুটি আয়, বছরে ক' মাস সার্কাস চলে, ক' মাস বসে থাকতে হয়, ইত্যাদি।

কথাগুলো যেন গল্পগাছার মতন বলতে-বলতে একসময় হঠাৎ কিকিরা অন্য কথায় এসে গেলেন। অনিলকে বললেন, "কৃষ্ণমূর্তি তোমাকে শাসিয়ে যে কাগজগুলো রেখে যেতেন, তার দু-একটা তোমার কাছে আছে?"

মাথা নাড়ল অনিল। না।

"একটাও রাখোনি?"

"না।"

"কথাটা অন্য কাউকে বলেছিলে? দেখিয়েছিলে কাগজ?"

"না।"

"কেন?"

"আমার ভয় করত।"

কিকিরা অনিলকে দেখতে-দেখতে বললেন, "তুমি সার্কাসের খেলোয়াড়। খেলা যা দেখাও তাতেও ভীষণ সাহস দরকার হয়। আর সামান্য ব্যাপারে

তোমার সাহস হল না ? কী করত তোমার কৃষ্ণমূর্তি, সার্কাসের মধ্যে খুন করতেন ?”

অনিল সামান্য চুপ করে থেকে বলল, “আমার সাহস হয়নি। কৃষ্ণমূর্তি বড় ডেঞ্জারাস লোক। আপনারা জানেন না। তিনি সবই পারেন।

“কী পারেন ?” কিকিরা বললেন। “তুমি দু' বছর সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছ বলছ। এই দু' বছরে তিনি এমন কোনো কাজ কি করেছেন যা দেখে তোমার ভয় হয়েছে ? তিনি কি কাউকে খুন করেছেন ?”

“খু-ন ! না।”

“তবে ?”

অনিল ইতস্তত করে বলল, “খুন না করুন, মারধোর করতে গিয়েছেন, খারাপ ব্যবহার করেছেন। অপমানও করেছেন। দু-একজনকে তাড়িয়েও দিয়েছেন। ওঁর অনেক ক্ষমতা। মালিকের ডান হাত।”

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে তারাপদদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক-মুহূর্ত। তারপর আবার অনিলের দিকে তাকালেন। বললেন, “তুমি কি মনে করো প্রফেশন্যাল জেলাসির জন্যে কৃষ্ণমূর্তি তোমার শত্রু হয়ে উঠেছিলেন।”

অনিল কোনো জবাব দিল না কথার।

অপেক্ষা করে কিকিরা বললেন, “তুমি সার্কাসে যে-টাকা পাও মাইনে হিসেবে—কৃষ্ণমূর্তি নিশ্চয় তার বেশি পান ?”

“অনেক বেশি।”

“কৃষ্ণমূর্তির খেলা আমরা দেখেছি। খেলাটা বেশ ভাল দেখান। লোকে পছন্দও করে। দেদার হাততালি পায়। তবু তিনি কেন তোমার খেলাটাকে নিয়ে অত মাথা ঘামাতে যাবেন ?”

অনিল চুপ করে থাকল।

চন্দন বলল, “বোধ হয় নতুন খেলা বলে।”

কিকিরা কান দিলেন না কথাটায়। অনিলকেই বললেন, “তুমি কি মনে কর, খেলা ছাড়াও অন্য কোনোও কারণ আছে শত্রুতার। মানে, এমন কোনো কারণ আছে যাতে কৃষ্ণমূর্তি তোমার শত্রুতা করবেন ?”

অনিল খানিকটা থতমত খেয়ে গেল। পরে বলল, “জানি না। আর কী কারণ থাকবে ?”

“ভাল করে ভেবে দেখেছ অন্য কোনো কারণ নেই।”

মুখ নিচু করে মাথা নাড়ল অনিল।

কিকিরা নিজের জামার পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে হঠাৎ বললেন, “তোমাদের সার্কাসের দলে তোমার কোনো বন্ধু নেই ?”

“আছে।”

"কে-কে ? নাম বলো।"

অনিল বলল, "হরিশবাবু ভালমানুষ। নাইডু বলে একজন আছে—সাইকেলের খেলা দেখায়—তার সঙ্গেও আমার ভাব। ট্রাপিজের রমাকান্ত, সেও ভাল। আরও দু-একজন আছে।"

"কারও কাছে তুমি কৃষ্ণমূর্তির কথা বলোনি ?"

"স্পষ্ট করে বলিনি।"

"কী বলেছ তবে ?"

"ওই—ওই ওঁর মেজাজের কথা, খারাপ ব্যবহারের কথা। আমায় পছন্দ করেন না—এ-সমস্ত কথা বলেছি।"

"তা তারা কী বলেছে ?"

"কী বলবে ! ওঁকে তো সবাই চেনে। বলেছে—ওঁকে এড়িয়ে থাকতে।"

"তুমি তাই থাকতে বোধ হয়।"

"আর কী করব !"

"সার্কাসে কৃষ্ণমূর্তির দলের লোক আছে ? মানে ওঁর সঙ্গে ঘোরে-ফেরে ?"

"আছে। রামু, সদাশিব, কাপুর, আরও দু-একজন। এর মধ্যে রামু হল কৃষ্ণমূর্তির ডান হাত। রামু জিমনাস্টিকের খেলা দেখায়, লিলি বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ভল্ট-এর খেলাও দেখায়। সদাশিব ট্রাপিজের দলে আছে। কাপুর হল সার্কাসের সবচেয়ে ভাল জোকার। খেলাও জানে।"

কিকিরা চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন আবার। চোখ বুজে চুরুট টানতে-টানতে হঠাৎ বললেন, "তুমি না বলেছিলে কৃষ্ণমূর্তি তোমাকে তাঁর নিজের খেলা শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন !"

অনিল মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ। খেলা শেখানোর নাম করে তিনি আমাকে জখম করতে চেয়েছিলেন। বার কয়েক দেখার পর আমি আর খেলাটা শিখতে রাজি হইনি।"

"এ ছাড়া আর কোনোভাবে..."

"হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, গাড়ি নিয়ে যারা খেলা দেখায় তারা যেন যার গাড়ির ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়। নিজেরাই দেখভাল করে গাড়ির। নয়ত বিপদ হতে পারে। নিজের খেলা দেখাবার গাড়ি হবে নিজের পোষা কুকুরের মতন। কুকুর তবু পশু। গাড়ি যন্ত্র। কোথাও একটু গড়বড় থাকলেই খেলোয়াড় শেষ। ভুল আমরা করি না। ছোট একটা ভুল মানেই লাইফ রিস্ক। ...আমার খেলা দেখাবার মোটর সাইকেল আমি কাউকে ছুঁতে দিতাম না। নিজেই চেক করতাম রোজ। কৃষ্ণমূর্তিও তাঁর মোটর বাইক ভাল করে দেখে নেন রোজ। কিন্তু আজকাল আমি মাঝে-মাঝে দেখতাম, আমার বাইকে কেউ লুকিয়ে হাত লাগিয়েছে। এমন একটা গোলমাল করে রেখেছে ভেতরে, যাতে ওই অবস্থায় খেলা দেখাতে গেলে আমি মরব।"

তারাপদ খানিকটা অবাক হয়ে চন্দনকে বলল, "মূর্তি তো পাকা শয়তান। বাইক খারাপ করে রেখে দিতেন !"

অনিল বলল, "এ-সব খেলা অঙ্কের মতন। সব মাপা, হিসেব করা। হাত-পায়ের রিফ্লেক্স, চোখ, মন—সব একই সঙ্গে কাজ করবে। যে-কোনো ছোটখাট ভুল মানেই বিপদ।"

কিকিরা বগলাকে ডেকে চা দিতে বললেন। তারপর অনিলের দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমার কখনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ?"

"দু'বার। তবে ছোট অ্যাক্সিডেন্ট।... এবার একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হত। এই ক'দিন আগেই খেলা দেখাতে যাওয়ার আগে বাইক চেক করতে গিয়ে দেখি, কে যেন আমার বাইকের ব্রেক হালকা করে দিয়েছে! মানে, ঢিলে করে দিয়েছে। সামনের চাকার বাতাস কম। ওই বাইক নিয়ে খেলা দেখাতে যাওয়া মানে মৃত্যু।"

"এটা কবে ঘটেছিল ?"

"সার্কাস ছেড়ে পালিয়ে আসার আগের দিন।"

চন্দন আর তারাপদ একই সঙ্গে আঁতকে ওঠার শব্দ করল।

কিকিরা বললেন, "লোকটা দেখছি ভয়ঙ্কর। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না অনিল, কৃষ্ণমূর্তি এরকম শত্রুতা তোমার সঙ্গে কেন করছিলেন। ওঁর উদ্দেশ্য কী ? তোমায় জখম করে, মেরে ফেলে ওঁর কী লাভ ? কে কত বড় খেলোয়াড় তা নিয়ে রেষারেষি থাকতে পারে। তা বলে সেই রেষারেষি এত দূর গড়াতে পারে বলে আমি ভাবতে পারি না।"

অনিল কোনো কথা বলল না। তারাপদ আর চন্দন নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী যেন বলাবলি করল।

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিলকে বললেন, "অন্য কোনো কারণ আছে বলে তোমার মনে হয় না ?"

"আমি জানি না।"

"ভাল করে ভেবে বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কৃষ্ণমূর্তি কি পাগল ?"

"পাগল বলবেন না, বলুন ক্রিমিন্যাল..." তারাপদ বলল।

অনিল বলল, "একটা কথা স্যার। আমি শুনেছি—বছর চারেক আগে জনি নামের এক ট্রাপিজ খেলোয়াড়কে উনি শেষ করে দিগেছিলেন।"

চমক খেলেন যেন কিকিরা। "কেমন করে ?"

"শেষ খেলার সময় জনি যখন দুলতে-দুলতে ভল্ট খেয়ে পার্টনারের হাত ধরতে গেছে—পার্টনার তার হাত ছেড়ে দিল। আর জনি পড়ল তো পড়ল—একেবারে জালের ধার ঘেঁষে। জাল থেকে লাফিয়ে নিজেকে

সামলাতে পারল না। জালের বাইরে মাটিতে পড়ে গেল।”

চন্দন বলল, “মারা গেল ?”

“না, মারা যায়নি। হাত-পা জখম হল। খোঁড়া পা আর ভাঙা হাত নিয়ে ট্রাপিজের খেলা দেখানো যায় না।”

তারাপদ বলল, “লোকটাকে তো পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল।”

“কোনো প্রমাণ ছিল না। পুলিশে কেমন করে দেবে !”

কিকিরা বললেন, “এটা তা হলে সার্কাসের লোকের সন্দেহ। ...সত্যি কি অন্য খেলোয়াড়টির জনির হাত ধরেনি, বা ছেড়ে দিয়েছিল ? ওটা অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। ট্রাপিজ খেলায় এরকম হয় বলে শুনেছি। সেইজন্যেই তো নিচে জাল থাকে। ...তা যে-লোকটা হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে কি কৃষ্ণমূর্তির শাগরেদ, মানে তাঁর লোক ?”

অনিল বলল, “ওরা তো তাই বলে। আমি যা শুনেছি তাই বললাম।”

“দু'জনের মধ্যে শত্রুতা ছিল ?”

“জনি কৃষ্ণমূর্তিকে কেয়ার করত না। মাঝে-মাঝে দু'জনের ঝগড়াও হত।”

“জনি এখন কোথায় ?”

“সার্কাসে আর সে আসেনি। বছরখানেক বিছানায় পড়ে থাকার পর জনি কী করছে কেউ জানে না। বোধ হয় তার দেশ-বাড়ির কাছেই আছে কোথাও।”

“কোথাকার লোক সে ?”

“ডালটনগঞ্জের।”

কিকিরা অন্যমনস্কভাবে মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কী যেন ভাবছিলেন।

বগলা চা এনে অনিলকে দিল।

তারাপদ আর চন্দন সিগারেট ধরাল। নিচু গলায় কথা বলল।

অনেকক্ষণ পরে কিকিরা বললেন, “আমার কাছে ব্যাপারটা বড় জটিল মনে হচ্ছে, চাঁদুবাবু ! কৃষ্ণমূর্তির উদ্দেশ্য কী ? কেন তিনি অনিলের সঙ্গে শত্রুতা করবেন ? কী লাভ তাঁর ! এক যদি তিনি পাগল হন, গোঁয়ার মুখ্যু—তবেই বোকার মতন এ-সব কাজ করতে পারেন। এরা দু'জনেই সার্কাসে খেলা দেখায়। দু'জনেই অবশ্য মোটর বাইক নিয়ে। কিন্তু আলাদা ধরনের খেলা। প্রোফেশন্যাল জেলাসি থাকার কথা কী ! কী জানি !...ঠিক আছে, কাল থেকে আমি সার্কাসে ঘুরব। দেখি ব্যাপারটা। তারাবাবু তুমি আমার সঙ্গে যাবে। চাঁদুর এখন যাওয়ার দরকার নেই।”

সার্কাসের মালিককে দেখলে বাঙালি বলে মনে হয় না। কিন্তু ভদ্রলোক বাঙালি। নাম, কানাইচাঁদ মল্লিক। মল্লিকবাবুর চেহারায় বেনারসি ছাপ আছে। কাশীর পাণ্ডার মতন দেখতে। নধর চেহারা, গোলগাল, মাথায় মাঝারি, চুল কম—টাক বেশি। গায়ের রং অবশ্য অতটা ফরসা নয়। ভদ্রলোক অনবরত কালো কফি খান, আর যখন কফি খান না তখন পান-জরদা। ওঁর একটা মুদ্রাদোষ আছে। দু-চারটে করে কথা বলেন আর মুখের অদ্ভুত এক ভঙ্গি করেন। হাস্যকর ভঙ্গি। গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা।

কিকিরা আর তারাপদ যখন মল্লিকবাবুর তাঁবুতে এলেন, ভদ্রলোক কিসের হিসেব নিয়ে চেঁচামেচি করছিলেন। ওঁর পরনে ঢোলা পাজামা, গায়ে গরম শার্ট। শার্টের হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

কিকিরাদের দেখে মল্লিকবাবু চেঁচামেচি থামিয়ে সামনের লোকটিকে চলে যেতে বললেন।

কিকিরাদের সঙ্গে হরিশবাবুও ছিলেন।

মল্লিকবাবু খাতির করেই ডাকলেন কিকিরাদের। "আসুন!" বলে সামনের দুটো চেয়ার দেখালেন। একটা কাঠের, অন্যটা ফোল্ডিং। হরিশবাবুকে বললেন, "হরিশ, দো কুরশি আনাও।" মল্লিকবাবু এইভাবেই কথা বলেন, বাংলার সঙ্গে হিন্দি-উর্দু মেশানো থাকে। সার্কাসে নানান জায়গার লোক। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা, মেলামেশা করতে-করতে শব্দগুলো নিজের থেকেই মুখে এসে গেছে। তা ছাড়া মল্লিকবাবু নিজে পূর্ণিয়ায় মানুষ হয়েছেন।

হরিশবাবু গেলেন চেয়ারের কথা বলতে।

কিকিরা কাঠের চেয়ারটায় বসতে গিয়ে সামলে নিলেন। তারাপদকে বললেন বসতে। হাজার হোক তারাপদ হল কোম্পানির মালিক, কিকিরা তো কর্মচারী। যদিও কোম্পানির ব্যাপারে তিনি ওদের অভিভাবক। তুমি-টুমি করেই কথা বলেন।

তারাপদ বসল না। লজ্জা করছিল।

মল্লিকবাবু বললেন, "বসুন। ...লোকগুলো আমার দেমাক খারাপ করে দেয়। চোর-চোট্টার দল।"

কিকিরা হেসে বললেন, "হিসেব নিচ্ছিলেন। ম্যানেজার কোথায়?"

"ম্যানিজার বোখার করে পড়ে আছে। ...ঝামেলা আমার।"

"তা তো বটেই। আপনি আর কতদিক সামলাবেন!"

"রায়বাবু, সার্কাসের মালিক হল গাদ্‌ধা...।" কানাইবাবু 'গাধা' বলেন না, বলেন গাদ্‌ধা। 'দ'-এর ওপর ঝোঁক থাকে বেশি। গাধা বলাটাও তাঁর মুদ্রাদোষ।

কিকিরা হাসলেন। "কী বলেন !"

"সাচ বলি। সার্কাসের যেতনা ঝামেলা সব মালিকের ঘাড়ে।"

হরিশবাবু ফিরে এলেন। একটা ছোকরা গোটা দুয়েক ফোল্ডিং চেয়ার এনে রাখল। কানাই চা আনার হুকুম করলেন। রায়বাবুরা আগের দিন কফি না খেয়ে চা খেয়েছিলেন। মনে আছে তাঁর।

তারাপদরা বসল। বাইরে শেষ শীতের রোদ। ভেতরেও সামান্য রোদ এসেছে তাঁবুর দরজা দিয়ে।

দু-পাঁচটা সাদামাঠা কথার পর কিকিরা বললেন, "আপনার সঙ্গে এবার ব্যবসার কথা বলি মল্লিকবাবু। আমাদের কোম্পানি—তার আগে বলি আমার মালিকের একজন এসেছে..." বলে তারাপদকে দেখালেন। "অন্যজন আসতে পারেনি। কাজে আটকে গিয়েছে। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আমরাই কথা বলব।"

"বলুন।"

"আমরা চারটে জায়গা সিলেক্ট করেছি।" বলে তারাপদকে বললেন, "কাগজটা দেখাও।"

আগে থেকেই সব তৈরি ছিল। তারাপদ পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে কিকিরাকে এগিয়ে দিল।

"নিন দেখুন..." কিকিরা আবার কাগজটা মল্লিকবাবুকে দিলেন।

কানাইবাবু কাগজ দেখতে-দেখতে বললেন, "টিটাগড়, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, তমলুক..."

কিকিরা বললেন, "এই জায়গাগুলোয় আমাদের লোকজন আছে। এখানে কাজ করেছি। আপনি দেখুন।"

কানাইবাবু পান চিবোতে-চিবোতে হরিশবাবুর দিকে তাকালেন। বললেন, "টিটাগড় আচ্ছা ?"

হরিশ বললেন, "মিল এরিয়া। লোক পাওয়া যাবে।"

কিকিরা বললেন, "বিজনেস ভাল হবে।"

পান চিবোতে-চিবোতে গাল-গলা চুলকোতে-চুলকোতে কানাইবাবু কী যেন ভাবলেন। বললেন, "টিটাগড় ঠিক আছে। ব্যারাকপুর..." বলে মাথা নাড়তে লাগলেন। মানে ব্যারাকপুর তাঁর পছন্দ নয়। কেন নয়, তাও বললেন, গত বছরের আগের বছর গিয়েছিলেন সেখানে।

কিকিরা বললেন, "চন্দননগর ?"

"হরিশবাবু ?" মানে হরিশের মতামত জানতে চাইলেন মালিক।

হরিশ বললেন, "বড় জায়গা। মাঠ পাওয়া যাবে।"

"লাভ হবে।"

"হওয়ার কথা।"

কানাই মল্লিক পরের নামটা দেখতে-দেখতে বললেন, "তমলুক !"

কিকিরা তমলুক শহরের গুণগান শুরু করলেন।

তারাপদ অবাক হয়ে কিকিরার কথা শুনছিল। এমন করে কথা বলছিলেন তিনি, যেন কিকিরা তমলুক শহরের লোক।

মল্লিকবাবুর ঠিক পছন্দ হল না তমলুক। না হওয়ার কারণও বললেন। এখন শীত শেষ হয়ে এল। এখানকার পাট চুকিয়ে টিটাগড়ে গিয়ে সার্কাস নামাতে ক'দিন সময় যাবে। টিটাগড় থেকে চন্দননগর। কম করেও তিনটে হপ্তার মতন বসতে না পারলে সার্কাস পার্টির লোকসান হয়। সময় কোথায় তা হলে ! আর গরম পড়ে গেলে সার্কাস চলে না। গরম ছাড়াও ঝড়-বৃষ্টির ভয় আছে গরম থেকে তাই সার্কাস বন্ধ। তবে হাতে সময় থাকলে চন্দননগর থেকে কাছাকাছি কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে।

কিকিরা মেনে নিলেন কথাটা। অন্য কিছু ব্যবসার কথা হল। কিকিরা যদিও ইম্প্রেসারিও ব্যবসার কিছুই জানেন না, তবু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলে সামলে নিলেন তখনকার মতন।

ততক্ষণে চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে।

কিকিরা এবার অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, "আমাদের তো জোর পাবলিসিটি করতে হবে, কাগজে বিজ্ঞাপনও দেব। আপনার সার্কাসের নতুন-নতুন খেলার কথা বললে লোক টানবে। লোকে নতুন চায় মল্লিকবাবু !"

মল্লিকবাবু কয়েকটা খেলার কথা বললেন।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনাদের হ্যান্ডবিলে, বাইরে ছবিতে একটা খেলার নাম দেখেছি। মোটর সাইকেল জাম্প। ওটা কি বন্ধ করে দিলেন ! সেদিন তো শুনছিলাম—খেলোয়াড়ের অসুখ বলে—।"

মল্লিকবাবু হঠাৎ বেজায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "আরে, ওই গাদ্ধা আমায় একদম বুদ্ধু বানিয়ে দিল। এখানে চার-ছ'দিন শো করল, তারপর পালিয়ে গেল। কাউকে কুছ বলল না রায়বাবু, রাস্কেল ভেগে গেল।"

কিকিরা ভীষণ অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "পালিয়ে গেল ! হরিশবাবু বলছিলেন, শরীর খারাপ...। আপনিও..."

"না-না ; বাহারে কী বলব, রায়বাবু ! উ বাত ঠিক নয়। অলিভার ভেগে পড়েছে।"

"ভেগে পড়েছে। কেন ?"

"কেন ? মালুম নেই। গাদ্ধা আছে, ইডিয়ট। বদমাশ।"

"আশ্চর্য ! খেলা দেখাচ্ছিল, পালিয়ে গেল ! আপনারা থানায় জানিয়েছেন ?"

"জানিয়েছি। সার্কাস বহুত ঝামেলার কাম-কাজ রায়বাবু। না জানালে আমাদের দোষ চাপত।"

"কোথাকার লোক ও ?"

"এই কলকাতার। ওর অ্যাড্রেসে লোক পাঠিয়েছি। **নো ট্রেস !**"

কিকিরা বললেন, "কোনও অ্যাকসিডেন্ট ?"

"না। হাসপাতালের রেকর্ড নেই।"

"তাজ্জব ব্যাপার।"

মল্লিকবাবু দুঃখ করে বললেন, ছোকরাকে তিনিই ধরে এনেছিলেন সার্কাসে। "নতুন খেলোয়াড়। বহুত রিস্ক ছিল। ছোকরা দু' বছর আছে সার্কাসে। ভাল খেলা শিখেছিল। আমার সঙ্গে ট্রেচারি করল রায়বাবু। ফের যদি কোনোদিন ফিরে আসে, আমি ওকে দেখে নেব।"

কিকিরা আর কথা বাড়লেন না। বুঝতে পারলেন, অনিলের ওপর ভদ্রলোকের আস্থা ছিল, স্নেহও ছিল।

উঠে পড়লেন কিকিরা। বললেন, এখন উনি যাচ্ছেন, কাল-পরশু আবার আসবেন কথা বলতে।

তারাপদ আর হরিশবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সার্কাসের ছোট-ছোট তাঁবু এ-পাশে ও-পাশে। সার্কাসের মেয়েরা যে যার মতন কাজ করছে নিজেদের। ধোয়াধুয়ি, কাচাকাচির কাজ। ধোপারা যেভাবে কাপড় শুকোয়, দড়ি টাঙিয়ে সেভাবে কিছু শাড়ি-জামা-সালোয়ার শুকোচ্ছে রোদে। কেউ-বা গল্পগুজব করছে। দু-তিনজন জমাদার গোছের লোক বড়-বড় ঝাঁটা নিয়ে আশপাশ সাফসুফ করছে। ও-পাশে, তফাতে কয়েকটা বাঘ-সিংহর খাঁচা, পশুগুলোকে দেখা যায় না, ঘুমিয়ে আছে বা শুয়ে-শুয়ে হাই তুলছে হয়ত। পুরুষদের তাঁবুগুলোতেও হইহল্লা নেই। যে যার মতন ঘোরাফেরা, গল্পগুজব করছে। দুটো ছোকরা নিজেদের মধ্যে বক্সিং প্র্যাকটিস করছিল মজা করে। একদিকে জনা কয়েক তাস নিয়ে বসে পড়েছে।

কিকিরা দেখছিলেন সবই, কিন্তু কাকে যেন খুঁজছিলেন।

হঠাৎ আদিনাথকে দেখতে পেয়ে গেলেন। আদিনাথের পরনে লুঙ্গি, গায়ে গরম চাদর, এক হাতে একটা কলাই-করা মগ। চা খাচ্ছিলেন।

কিকিরা বললেন, "হরিশবাবু, চলুন আপনাদের ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে আলাপ করে যাই। সেদিন ওঁর খেলা দেখলাম খানিকটা। বেশ লাগল। তারাপদ, তোমার কেমন লেগেছে ?"

"ভাল।"

"মফস্বলের লোক ম্যাজিক দেখতে পেলে বর্তে যায়। কেন জানেন, হরিশবাবু ? কলকাতা শহরে বছরে দু-তিনবার করে বড়-বড় ম্যাজিশিয়ানের খেলা দেখানোর প্রোগ্রাম থাকে। মশাই কী বলব, টিকিট নিয়ে মারামারি লেগে যায়। মফস্বলে এসব কোথায় !...তারাপদ, তোমার মনে আছে, আমরা একবার সেই চিনে ম্যাজিশিয়ান ফুং লুং-কে জোর করে বর্ধমানে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম,

ও তো যাবেই না, বলে—আমি হংকং উইজার্ড—আমাকে তোমরা ছোট টাউনে নিয়ে যেতে চাইছ ? আমার মর্যাদা থাকে না। ...তা বুঝলেন হরিশবাবু, চিনে-সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে বর্ধমানে নিয়ে গেলাম। কী বলব মশাই, তিন দিনে আমরাই এজেন্সি কমিশন হিসেবে হাজার পঁচিশ টাকা পকেটে ভরেছিলাম। ফুং লুং তারপর ঢাকায় চলে গেল। সেখানে খেলা দেখিয়ে হংকং ফিরে যাবে।"

তারাপদ জীবনে কোনোদিন ফুং লুং-এর নাম শোনেনি। বর্ধমানে যাওয়া তো দূরের কথা। কিকিরা যা পারছেন বলে যাচ্ছেন। মুখে কিছুই আটকাচ্ছে না। হঠাৎ তারাপদর মাথায় এল, কিকিরাকে একটু জব্দ করা যাক। মজা করেই। গম্ভীরভাবে তারাপদ বলল, "আপনি ফুং লুং বলছেন কেন ! ওর নাম ছিল, চুং কিং চ্যান। আরা আমরা ঠিক পঁচিশ হাজার পাইনি। হাজার কুড়ি হতে পারে।"

কিকিরা একটু হেসে তারাপদর দিকে তাকালেন। "চুং টুং ওর আসল নাম, বাজারে নাম হল ফুং লুং ; ম্যাজিশিয়ানদের একটা করে মার্কেট-নেম থাকে। ফুং লুং নামেই লোকে তাকে জানে। আর কুড়ি-পঁচিশ হাজারের হিসেবটা তুমি ভুল করলে। আমরা হাজার পাঁচেক টাকা এক্সট্রা পাবলিসিটিতে আগেই খরচ করে ফেলেছিলাম—সেটা দিতে হল।"

তারাপদ জব্দ হয়ে হেসে ফেলতে যাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। কিকিরাকে কথায় জব্দ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ততক্ষণে তারাপদরা আদিনাথের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

হরিশবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

কিকিরা জোড় হাতে প্রায় স্তুতি করার মতন আদিনাথ ম্যাজিশিয়ানের প্রশংসা করে বললেন, "আপনি মশাই উঁচু দরের ম্যাজিশিয়ান। সার্কাসে বড় একটা ফার্স্ট রেট ম্যাজিশিয়ান পাওয়া যায় না। কাজচলা গোছের লোক দিয়ে ওরা চালিয়ে দেয়। আপনি সে-জাতের নন। ব্যাপারটা কী জানেন, একটা লোক কনসার্টে বেহালা বাজায়, আর একটা লোক একা গানের মজলিশে বেহালা বাজায়। দুটোয় অনেক তফাত। প্রথমটা হল, গোলে হরিবোল। বুঝলেন না ! দ্বিতীয়টা একেবারে নিজের। তা আপনাকে দেখে জাত চেনা যায়।"

আদিনাথ খুবই খুশি। এভাবে কেউ কথা বলে না। "আপনার ভাল লেগেছে।"

"ভাল কি মশাই, চমৎকার। এই তারাপদও বলছিল—কী বলছিলে যেন তুমি তারাপদ ?"

হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে তারাপদ বলল, "প্রায় হুং লুং-এর ক্লাস।"

"তা ঠিকই। বড়-বড় ম্যাজিশিয়ানের বড়-বড় লেজ। পাবলিসিটি।

ছোটদের তো তা নয়। গেঁয়ো যোগীর অবস্থা...”

হরিশবাবু বললেন, “আদিনাথ মাঝে-মাঝে বলে সার্কাস ছেড়ে চলে যাবে। আমি তাকে আটকে রাখি। বলি, যাবে কোথায় ? এখানে তবু ধরাবাঁধা মাইনে আছে। তোমার পরিশ্রমও কম। বাইরে গিয়ে এক-একা কতটা পারবে !”

“তা ঠিক। ঠিকই বলেন আপনি।”

কথা বলতে-বলতে কিকিরা হঠাৎ মাটিতে নুয়ে পড়ে মাঠ থেকে কী যেন কুড়িয়ে নিলেন। “আপনার গলার চেইন।”

আদিনাথ অন্যমনস্কভাবে একবার গলায় হাত দিলেন। “আমি চেইন পরি না।”

চেইনটা সোনার বলেই মনে হয়। চকচক করছে। সোনালি রং।

“তা হলে কার ! আমি ভাবলাম আপনার... !”

“আমার নয়।”

“হরিশবাবু, আপনি তবে এটা রেখে দিন। খোঁজ করে দেখবেন কার চেইন হারিয়েছে। তাকে দিয়ে দেবেন।”

হরিশবাবু হাত বাড়ালেন। কিকিরা তাঁর হাতের মুঠোয় চেইনটা দিলেন যেন। তারপর আচমকা হাসতে লাগলেন।

হরিশবাবুর হাতে চেইন নেই, কিকিরার হাতেও নয়, মাটিতেও পড়ে যায়নি। একেবারে হাওয়া যেন।

আদিনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, “সে কী ! আপনি এ-সব শিখলেন কোত্থেকে ?”

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, “কম বয়েসে শখ হয়েছিল। শিখেছিলাম একজনের কাছে। শখ মিটে গেল। ...তা শখ মিটলেও আমি মশাই ম্যাজিকের ভক্ত। এই যে তারাপদ—আমার মালিক—এরাও জানে।”

আদিনাথ বললেন, “পাকা হাত আপনার।”

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, “আরে না, এ তো ছেলেমানুষি খেলা। বাচ্চারাও জানে। ...দু-একটা ভাল খেলা শিখেছিলাম একসময়, অভ্যেস নেই, ভুলে গিয়েছি। যদি আপনি অভ্যেস করতে চান, শিখিয়ে দিতে পারি।” বলে তারাপদকে ইশারায় এগোতে বললেন, “চলি স্যার, আবার দেখা হবে।”

ডান দিক দিয়ে ঘুরে খানিকটা এগোতেই একটা তাঁবুর পাশে কৃষ্ণমূর্তিকে দেখা গেল। কৃষ্ণমূর্তির পাশে একজন মিস্ত্রি মতন লোক। দু-পাঁচটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে পাশে। কৃষ্ণমূর্তি তাঁর খেলা-দেখানো মোটর বাইকের কাজকর্ম দেখছিলেন।

তারাপদকে চোখের ইশারায় আসতে বলে কিকিরা কৃষ্ণমূর্তির দিকে এগিয়ে চললেন।

হরিশবাবু বললেন, “যাবেন ওদিকে ?”

"চলুন। একটু আলাপ সেরে যাই।"

তারাপদ সার্কাস দেখতে এসে কৃষ্ণমূর্তিকে দেখেছে। কিন্তু তখন যেন মানুষটাকে দেখা যেত না, যেত সাজপোশাক, হেলমেট, ব্রিচেস-এর মতন জুতো। এখন কৃষ্ণমূর্তিকে স্বাভাবিক চেহারায় দেখা যাচ্ছিল।

মাথায় মাঝারি। গায়ের রং কালো। চৌকো ধাঁচের মুখ। মোটা নাক। থুতনির তলায় ফ্রেঞ্চকাট ধরনের দাড়ি। চোখ বড়-বড়। চেহারাটা দেখলেই বোঝা যায়—গড়াপেটা স্বাস্থ্য। মাদ্রাজি লুঙ্গি আর লাল রঙের সোয়েটার পরে নিজের মোটর বাইরে কাজ দেখাশোনা করছিলেন কৃষ্ণমূর্তি। ভদ্রলোকের বয়েস বোধ হয় বছর চল্লিশ। দু-এক বছর বেশি হতেও পারে।

কিকিরা তারাপদদের নিয়ে কাছে আসতেই কৃষ্ণমূর্তি মুখ তুলে তাঁদের দেখলেন।

হরিশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন কিকিরাদের।

কিকিরা কিছু বলার আগেই কৃষ্ণমূর্তি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হাত-মেলানো হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "আপনার খেলা আমি আর আমার মালিকরা দেখেছেন, মূর্তিসাহেব। বহুত আচ্ছা! স্পেলেন্ডিড, ওয়ান্ডারফুল।"

কৃষ্ণমূর্তি হাসলেন। নিতান্ত ভদ্রতার হাসি।

কিকিরা বললেন, "আমি রয়েল সার্কাসে অনেকদিন আগে এরকম খেলা দেখেছিলাম। ভাল জমাতে পারেনি। আপনি সাহেব আমাদের চার্মিনার করেছেন।"

তারাপদ খেয়াল করেনি প্রথমে। পরে কানে লাগল। চার্মিনার! সে আবার কী! কিকিরার ইংরিজির সঙ্গে তারাপদর কম পরিচয় নয়। কিন্তু চার্মিনার। কিকিরা কি বেমালুম ভুল বলে গেলেন। চার্মড বলতে চার্মিনার। অবাক কাণ্ড!

কৃষ্ণমূর্তি নিজেও অবাক!

কিকিরা কিন্তু হাসছেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "সাহেব, আমাদের পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের মুখে আজকাল এইরকম শুনি। ফ্যান্টা, ফ্যান্টাকোলা, চার্মিনার, লা পাত্তা...। মাফ করবেন।"

কৃষ্ণমূর্তি এবার হেসে ফেললেন।

কিকিরা বললেন, "এই সার্কাসের আপনি এক নম্বর। সিনেমার হল হিরো। সার্কাসের হল বেস্ট প্লেয়ার। সেদিন আপনার খেলা দেখে যখন বাইরে গেলাম—পাবলিক আপনার খেলার কথা বলছিল। তাই না তারাপদ?"

তারাপদ অনেক কিছুই এখন রপ্ত করে ফেলেছে কিকিরার। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কৃষ্ণমূর্তি খুশি হলেন। বললেন, "রিস্কি খেলা।"

আরও দু-চারটে খোশামোদের কথা বলে কিকিরা বললেন, "আমাদের কথা আপনি হরিশবাবুর মুখে শুনলেন। ...সাহেব, এবারের সিজনটা আমাদের ভাল যাচ্ছে না। আপনাদের সার্কাসটা নিয়ে সামথিং করতে চাই। মল্লিকসাহেবের সঙ্গে কথা বলছি। আপনি কী মনে করেন?"

"গুড প্রোপোজাল। মালিক কী বলল?"

"ফাইনাল কথা দেননি। ভাবছেন। ...আপনার সঙ্গে হয়ত কথা বলবেন।"

কৃষ্ণমূর্তির হাতে সিগারেটের প্যাকেট ছিল। লাইটার। চার্মিনারের প্যাকেট। সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিতে-দিতে কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "আমি মালিক নয়, বাবু!"

কিকিরা সিগারেট নিলেন। তারাপদরাও নিল। সিগারেট ধরাতে লাগল ওরা।

কৃষ্ণমূর্তি মোটর বাইকের মেকানিককে কী যেন বললেন। তারপর দু-চার পা সরে এসে দাঁড়ালেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি বললে মালিক না বলবে না, সাহেব। আমি সব খবর রাখি। আপনি এই সার্কাসের গোড়ার লোক। সিনিয়ারমোস্ট...!"

কৃষ্ণমূর্তি হরিশবাবুর দিকে তাকালেন। মানে বোঝাতে চাইলেন, হরিশবাবু তুমিই এ-সব কথা বলেছ?

হরিশ সিগারেট টানতে লাগলেন।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "আমি পুরানা লোক বাবু। সার্কাস শুরু হওয়ার সময় থেকেই আছি। মালিককে হেল্প করেছি। হরিবাবু জানেন। মালিক মরজি করেন তো সব হয়ে যাবে।"

কৃষ্ণমূর্তির বাংলায় দোষ বিশেষ নেই। উচ্চারণগুলোও মোটামুটি ভাল। মনে হয় না লোকটা দক্ষিণের।

"আপনি আমাদের হয়ে যদি একটু দেখেন...।" কিকিরা বললেন।

কৃষ্ণমূর্তি মাথা নাড়লেন সামান্য।

আরও দু-একটা কথা বলার পর কিকিরা বলল, "সাহেব, আপনি এমন ভাল বাংলা বলেন কেমন করে? বাংলাদেশে ছিলেন?"

কৃষ্ণমূর্তি হাসলেন। বললেন, "আমি কলকাতায় পঁচিশ বছর ছিলাম। আমার মা বাঙালি। বাবা সাউথ ইন্ডিয়ান। বাবা ব্রিটিশ আমলে রয়েল নেভিতে ছিলেন। মা এখানে একটা মিশনারি স্কুলে লোয়ার ক্লাসে পড়াতেন।"

কিকিরা অবাক হলেন। তারাপদও।

কৃষ্ণমূর্তি নিজেই বললেন, "বাবু, আমি এখানে লেখাপড়া শিখেছি। ফুটবলার ছিলাম। ...আমার বহুত ফ্রেন্ডস আছে এই শহরে।"

কিকিরার মনে পড়ল, অনিলের কথা। অনিল ঠিকই বলেছিল, কৃষ্ণমূর্তির অনেক বন্ধু আছে কলকাতা শহরে।

কিকিরা ঠিক বুঝতে পারলেন না, আর কীভাবে কথা চালানো যায়। আপাতত আজকের মতন এখানেই শেষ করা ভাল।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে কিকিরা বললেন, "আরে, দশটা বেজে গিয়েছে। চলো তারাপদ।" বলে কৃষ্ণমূর্তির দিকে তাকালেন। "আজ চলি মূর্তিসাহেব। আমাদের কথা একটু মনে রাখবেন স্যার। কাল-পরশু আমরা আসছি আবার।"

কিকিরা আর দাঁড়ালেন না।

সার্কাসের বাইরে আসতে-আসতে হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেল। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের একটা টাটকা প্যাকেট বের করলেন। বড় প্যাকেট, কুড়িটা সিগারেটের। প্যাকেটটা হরিশবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। "এটা আপনার জন্যে এনেছিলাম। ভুলেই যাচ্ছিলাম। নিন...।"

হরিশবাবু ইতস্তত করলেন।

"আরে নিন মশাই, আপনি না থাকলে মালিকের সঙ্গে দেখা করা কঠিন হয়ে পড়ত। নিন।"

প্যাকেটটা নিলেন হরিশবাবু। সার্কাসে তিনি পুরনো লোক। কিন্তু যখন থেকে তাঁর অঙ্গ গিয়েছে তখন থেকেই তিনি খেলোয়াড়ের মর্যাদা হারিয়েছেন। মাইনেপত্রও কম পান। দয়া করে যে তাঁকে রেখে দিয়েছে মালিক—এই না যথেষ্ট। খুবই দুঃখ হয় হরিশের। মনমরা হয়ে থাকেন। কালনার দিকে বাড়ি। বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে। বেঁচেবর্তে আছে কোনো রকমে। মাসকাবারি ক'টা টাকা পাঠানো ছাড়া হরিশ আর কিছু করতে পারেন না সংসারের। নিজের জন্যও পারেন না। বিড়ি টানাই তাঁর অভ্যাস। সিগারেট খাবার পয়সা কোথায়! কেউ দিলে অবশ্য হাত পেতে নেন।

তাঁবুর বাইরে আসতে-আসতে কিকিরা হরিশবাবুকে বললেন, "কৃষ্ণমূর্তিসাহেব আপনাদের সার্কাসের বড় অ্যাট্রাকশান। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ভদ্রলোকের অনেক ক্ষমতা এই সার্কাসে?"

"ক্ষমতা আছে। মল্লিকবাবুর সঙ্গে ভাল সম্পর্ক।"

"উনি কি পার্টনার?"

"না। কে বলল?"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম।"

"মল্লিকবাবু একাই মালিক। তবে শুনেছি মালিকের এক বন্ধু আছেন। ধনিলাল। তাঁর টাকাও আছে সার্কাসে।"

"আচ্ছা! ধনিলাল কোথায় থাকেন?"

"পূর্ণিয়ায়।"

"সার্কাসে আসেন না ?"

"দু-একবার আসতে দেখেছি।"

কিকিরা তারাপদকে ডাকলেন। রাস্তার কাছাকাছি এসে গেছেন। হঠাৎ বললেন, "হরিশবাবু, মূর্তিসাহেবকে তো ধরে এলাম। জানি না, উনি কী পরামর্শ দেবেন মল্লিকবাবুকে। ...তা মূর্তিসাহেব মানুষটি কেমন ?"

হরিশ যেন সামান্য অবাক হলেন। বললেন, "খারাপ কেন হবে। ভাল লোক। তবে কিনা একটু মাথা গরম। বড় কড়া-কড়া কথা বলেন। আবার সার্কাসের কারও কিছু হলে দেখেনও। খারাপ লোক নন কৃষ্ণমূর্তি।"

কিকিরা তারাপদকে ইশারায় কিছু যেন বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

"চলি হরিশবাবু। আবার আসব।"

রাস্তায় এসে কিকিরা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "তারাপদ, কৃষ্ণমূর্তিকে কেমন দেখলে ?"

তারাপদ কী বলবে! বলল, "কিছু বুঝতে পারলাম না। এমনিতে তো ভালই লাগল।"

কিকিরা বললেন, "আমারও খারাপ লাগেনি।" বলে এদিক-ওদিক তাকালেন। "একটা ট্যাক্সি ধরো তো!"

ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

গাড়িতে উঠে কিকিরা বললেন, "তারাপদ, আমি একেবারে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছি।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছিল।

তারাপদ বলল, "কেন ?"

"না, না! ব্যাপারটা কেমন লাগছে হে! অনিল যা বলেছে তার সঙ্গে দেখছি সব মিলছে না। অনিল কী মিথ্যে কথা বলছে ?"

"কেন ? মিথ্যে বলবে কেন!"

"সেটাই তো ধরতে পারছি না।"

৬

বাড়িটা যে কত পুরনো বোঝা মুশকিল। গলির মধ্যে আলোও জোরালো নয়। আসলে এটা গলির গলি। তবে কানাগলি বা বাই লেন নয়। সন্ধের মুখে লোকজনও অত নেই।

কিকিরা তারাপদকে ইশারায় মুখের একটা দোকান দেখালেন। দোকানটা অবশ্য বন্ধ। আজ রবিবার। দোকানের মাথায় হাত দুয়েকের এক

সাইনবোর্ড। একেবারে আনাড়ি লোককে দিয়ে লেখানো সাইনবোর্ড। কাঁচা লেখা। বিটি অটো ইলেকট্রিক হয়ত নাম ছিল। সাইনবোর্ডের অর্ধেকটাই মোছা।

তারাপদ বুঝতে পারল কিকিরা কী বোঝাতে চাইছেন। অনিল সেদিন এই দোকানটার কথা বলেছিল। এখানেই সে ষণ্ডামার্কা একটা লোককে দেখে ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারছিল না।

কিকিরা গলি এবং পাড়াটা ভাল করে দেখতে লাগলেন। কলকাতা শহরের এইসব এলাকায় এমন গলি আছে যা দেখে বেশ বোঝা যায়, পাঁচমেশালি লোকের বসবাস এখানে। বাঙালি পাড়া বলতে যা বোঝায় তা নয় মোটেই, তবে বাঙালিও আছে। বেশির ভাগই অবাঙালি। হিন্দুস্থানী, দু-পাঁচটা বোধ হয় কেরলের লোক, মামুলি কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, এমনকী নেপালিও চোখে পড়ে।

পাড়াটার চেহারা দেখে বোঝা যাগ—বেশ পুরনো। ঘরবাড়িগুলোও সে-আমলের। বেশির ভাগ বাড়িই ইট-বেরোনো, জানলার পাল্লা নড়বড়ে, রংচং নেই। এরই মধ্যে আবার এক জায়গায় বস্তি ধরনের দু-তিনটে ঘর পাশাপাশি।

বাড়ি খুঁজতে কষ্ট হল না কিকিরাদের। চন্দনের কাছ থেকে ভাল করে জেনে এসেছে তারাপদ। চন্দনের আর আসা হল না আজ। রবিবার হলেও অন্য কাজে আটকে গেছে।

কিকিরা তারাপদকে বললেন, "এই বাড়িটা মনে হচ্ছে! তাই না?"

তারাপদ বলল, "হ্যাঁ। চাঁদু বলেছিল—বাড়ির উলটো দিকে একটা ভাঙা টিউবওয়েল আছে।"

"চলো তবে।"

সদর বলে বিশেষ কিছু নেই বাড়িটার। হাট করে খোলাই ছিল। নিচে এপাশে-ওপাশে ভাড়াটে। যে যার নিজের মতন ব্যস্ত। ওরই মধ্যে কোনও ঘরে টেলিভিশন খোলা রয়েছে মনে হল। জোর শব্দ আসছিল।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কিকিরা বললেন, "পেলে হয়?"

তারাপদ বলল, "দেখা যাক। থাকতেও পারে।"

দোতলার সিঁড়ির শেষ মাথায় এক বুড়োর সঙ্গে দেখা। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। যাচ্ছিল কোথাও।

কিকিরা তাকে অনিলের কথা জিজ্ঞেস করলেন। বর্ণনা দিলেন অনিলের চেহারার।

বুড়ো ডান দিকটা দেখিয়ে দিল। বাড়িটার দোতলায় সামান্য ফাঁকা জায়গা। খোলা ছাদ।

দোতলাতেও ভাড়াটেদের হই-হল্লা। কোথাও যেন কিছু একটা হয়েছে।

পোড়া গন্ধ আসছিল।

আচমকা অনিলকে দেখা গেল।

অনিল যেন কোথাও বেরোচ্ছিল, হঠাৎ কিকিরাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ অবাক। "আপনারা ?"

"তোমার কাছেই এলাম।"

অনিল ইতস্তত করছিল।

"কোথাও বেরোচ্ছ ?"

"না, কাছেই। হোটেলে যাচ্ছিলাম।"

"হোটেলে ?"

"কাছেই একটা হোটেল-রেস্টুরেন্ট আছে। ওখান থেকেই রাতের খাবার নিয়ে আসি।"

এই ভর সন্ধেবেলায় রাতের খাবার ! কিকিরা অবাকই হলেন। বললেন না সে-কথা। "ও !...তা খানিকটা দেরি হয়ে গেলে খাবার—"

"পাব। আসুন—।"

অনিল ডাকল কিকিরাদের।

দু-চারটে খুপরি মতন ঘর পেরিয়ে একেবারে শেষের একটা ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় অনিল। ঘরের দরজা বন্ধ। তালা ঝুলছিল।

অনিল তালা খুলতে লাগল।

তারাপদ বলল, "কী হয়েছে ? হল্লা শুনছিলাম।"

"স্টোভের আগুন ধরে গিয়েছিল। নিভে গিয়েছে। কিছু হয়নি।"

ঘরের দরজা খুলে বাতি জ্বালল অনিল।

ঘরটা খুবই ছোট। চিলে কুঠরি বললেও বলা যায়। একটি মাত্র ছোট জানলা। ঘরের মধ্যে একটা ক্যাম্প খাট। বিছানা পাতা রয়েছে। এলোমেলো। ঘরের একপাশে দড়ি ঝুলছে। দড়ির ওপর অনিলের জামাপ্যান্ট ঝোলানো। একটা তোয়ালেও। ঘরের এককোণে বড় কিট ব্যাগ, সুটকেস একটা। আশেপাশে সিগারেটের দোমড়ানো প্যাকেট, টুকরো-টাকরা সিগারেট ছড়ানো। এক প্যাকেট তাস পড়ে রয়েছে বিছানার ওপর। প্যাকিং বাক্সর মতন একটা কাগজের বড় বাক্স। তার ওপর দু পাঁচটা খুচরো জিনিস রেখেছে অনিল। ব্রাশ, টুথপেস্ট, আয়না। পুরনো খবরের কাগজ দিন কয়েকের।

কিকিরা বললেন, "হাতে সময় ছিল ; চলে এলাম। ...তা কেমন আছ ? নতুন কোনো ঝঞ্ঝাট হয়নি তো ?"

মাথা নাড়ল অনিল। "না।"

"কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ ?"

'আমি বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকি।"

"তোমার কাছে কেউ এসেছিল ?"

"না। দিদি এসেছিল পরশু। আর কেউ নয়।"

তারাপদ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ঘরটা দেখছিল। কিকিরা তাকে বলে দিয়েছেন। বলেছেন, তিনি অনিলের সঙ্গে কথা বলবেন যতক্ষণ পারেন, সেই সময় তারাপদর কাজ হবে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখা।

কিকিরা ক্যাম্প খাটের ওপরই বসলেন। বসে তাসের প্যাকেটটা উঠিয়ে নিলেন। "তাস খেল নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"একা-একা।"

"পেশেন্স খেলি। কী করব সারাদিন—"

"তা ঠিক।" তাসগুলো একপাশে রেখে দিলেন কিকিরা। তারপর কী যেন ভাবতে-ভাবতে বললেন, "আচ্ছা, ধরো তুমি সার্কাসে ফিরে গেলে।"

অনিল সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল। "না। কী বলছেন আপনি ?"

"ফিরে গেলে তোমার কোন ক্ষতি হবে ?"

অনিল চুপ করে থাকল। মাথা নাড়তে লাগল।

কিকিরা অনিলকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, "আজ ও-বেলায় আমি সার্কাসে গিয়েছিলাম তারাপদকে সঙ্গে নিয়ে। মল্লিকবাবুর সঙ্গে কথাও হল। আমি তোমার কথা কিছু বলিনি বটে, তবে তোমায় নিয়ে কথা উঠেছিল। ভদ্রলোক তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন মনে হল। তুমি এভাবে পালিয়ে আসায় ভীষণ চটে রয়েছেন।" বলে একটু থেমে অনিলকে বোঝাবার মতন করে বললেন, "আমার কিন্তু মনে হয় তুমি যদি ফিরে যাও তিনি খুশি হবেন। হয়ত গোড়ায় খানিকটা চেঁচামেচি করবেন—, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।"

অনিল চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল। বলল, "আমি যেতে পারি না।"

"কেন পারো না, আমি বুঝতে পারছি না অনিল। তুমি নিশ্চয় জানো—সার্কাসের লোক তোমার দিদির ঠিকানায় তোমার খোঁজ করতে গিয়েছিল ?"

"জানি। দিদি বলেছে।"

"ওরা থানায় গিয়েছিল তা জানো ?"

"আন্দাজ করছিলাম।"

"কৃষ্ণমূর্তির ভয়ে তুমি তোমার পেশা ছেড়ে দেবে। কী করবেন কৃষ্ণমূর্তি তোমার ?"

বলব কি বলব না করে শেষে অনিল বলল, "আমায় খুন করতে পারেন।"

"কেন ? তোমার কী এমন দোষ, কোন্ ক্ষতি তুমি তার করেছ যে তোমায় তিনি খুন করতে যাবেন। খুন করা কি চাট্টিখানি কথা ! চাইলেই করা যায় !"

অনিল কোনো জবাব দিল না।

কিকিরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "তুমি বলেছিলে কৃষ্ণমূর্তি

মল্লিকবাবুর পার্টনার। আমরা খোঁজ করে জানলাম, কথাটা ঠিক নয়। মল্লিকবাবুর পার্টনার অন্য লোক। নাম ধনিলাল বা ধনিয়ালাল।"

অনিল বলল, "আমি শুনেছি, কৃষ্ণমূর্তিও পার্টনার। বাইরে কাউকে বলেন না।"

"ও !...একটু জল খাওয়াতে পারো ?"

"জল !...দাঁড়ান এনে দিচ্ছি।"

ঘরে একটা জলের বোতল ছিল প্লাস্টিকের। বোতলে জল ছিল না। অনিল বোতলটা নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কিকিরা ইশারা করলেন। তারাপদ সরে গেল দরজার কাছে। অনিলকে নজর করতে লাগল।

কিকিরা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অনিলের কিট ব্যাগটা দেখলেন। বন্ধ। চেন টানা। তালা লাগানো। সুটকেসও তালা বন্ধ। কিট ব্যাগ আর সুটকেসের পাশে একটা ছোট সরু কৌটো পড়ে ছিল। কৌটোটা তুলে নিলেন কিকিরা। দেখলেন। নস্যির ডিবে মনে হল। মুখটা খুললেন। গন্ধ পাওয়া গেল। নস্যি। কালো রঙের ডিবেটা বোধ হয় হাড়ের। ডিবের পাশে খোদাই করা ইংরিজি 'N' অক্ষর লেখা। তার তলায় বাঁকাভাবে আরও দুটো খুদে ইংরিজি অক্ষর—জি সি। দেখে মনে হয়, কেউ কাঁচা হাতে নরুন বা ওইরকম কিছু দিয়ে ডিবের গায়ে অক্ষর গুলো লিখেছে।

"অনিল কি নস্যি নয়, তারাপদ ? দেখেছ নিতে ?" কিকিরা হঠাৎ বললেন।

"কই না !"

কিকিরা পকেটে পুরে নিলেন কৌটোটা। পোরার আগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন আবার। একটু ঘাঁটাঘাটি করলেন জায়গাটা। জুতোর বাক্স আর পুরনো কাগজের আড়ালে পেস্ট বোর্ডের ছোট একটা বাক্স। খুবই ছোট। ওপরে লেখা আছে 'ভেনাস চক'। কোম্পানির ছাপ। মানে চক আছে বাক্সটায়। কিকিরা আড়চোখে দরজার দিকে একবার সাবধানে তাকালেন। তারাপদ বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, দেখছে অনিল আসছে কিনা।

বাক্সটার ওপর দিকের ঢাকা আলগা ছিল। কিকিরা তাড়াতাড়ি ভেতরটা দেখে নিলেন। দেখে অবাক হয়ে গেলেন। চক বা খড়ি রাখার বাক্সর মধ্যে কয়েকটা ছোট-ছোট টিউব। একটা টিউব তুলে নিলেন কিকিরা। দেখলেন। গায়ে লেখা আছে সোয়ান কালার। মানে রং। ছবি আঁকার রং। গায়ে ছোট-ছোট হরফে আরও কিছু, চোখের সামনে না ভাল করে ধরলে পড়া যাবে না।

কিকিরা বুঝতে পারলেন না, এত—প্রায় ছ-আটটা রঙের টিউব রাখার মানেটা কী ? অনিল কি ছবি আঁকে ? কই, তা তো জানা ছিল না। আশ্চর্য। ছবি আঁকার অন্য কোনো চিহ্ন তো কোথাও চোখে পড়ছে না।

তারাপদ শব্দ করল।

কিকিরা বুঝতে পারলেন অনিল আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের অজান্তেই যেন একটা টিউব পকেটে ভরে ফেললেন।

অনিল যখন ঘরে লে—কিকিরা জানলার কাছে সরে গিয়েছেন।

"আপনার জল।" অনিল জলের বোতল রেখে একটা গ্লাস নিয়ে এল। কাচের গ্লাস। ঘরেই ছিল। গ্লাস ধুয়ে জল ঢেলে এগিয়ে দিল।

কিকিরা জলের গ্লাস নিতে-নিতে বললেন, "জানলাটা খুলে দেখছিলাম। কোন দিক ওটা?"

"পশ্চিম হবে। খেয়াল করিনি।"

জল খেলেন কিকিরা। আরামের নিশ্বাস ফেললেন। "আজ খানিকটা গরম-গরম লাগছে তাই না!"

অনিল কোনো কথা বলল না।

কিকিরা আরও দু-একটা সাধারণ কথা বললেন।

তারাপদ বুঝতে পারছিল এখানে আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। কিকিরার পক্ষে এখন সরে যাওয়াই ভাল। বলল, "চলুন সার, আমাকে একবার ভবানীপুর যেতে হবে। আপনাকে বাসে তুলে দিয়ে আমি মিনি ধরব।"

কিকিরা বললেন, "হ্যাঁ, চলো।" বলে অনিলের দিকে তাকালেন। "তুমি তো বেরোচ্ছিলে, যাবে নাকি?"

অনিল বলল, "একটু পরে যাচ্ছি।"

পা বাড়িয়ে কী মনে করে কিকির াবললেন, "অনিল, তুমি একবার সার্কাসে ফিরে গিয়ে দেখো না কী হয়! এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

অনিল মাথা নাড়ল। না, সার্কাসে সে আর যাবে না।

"তোমার ইচ্ছে। ...তা আমার ওখানে আসবে কবে?"

"যাব।"

"পরশু এসো। আমি থাকব।"

বড় রাস্তায় এসে কিকিরা বললেন, "তারা, ব্যাপারটা আরও প্যাঁচালো হয়ে উঠল মনে হচ্ছে।

তারাপদ মাথা চুলকে বলল, "দেখছেন কিছু?"

অন্যমনস্কভাবে কিকিরা বললেন, "অনিলের কাছে কেউ আসে না—কথাটা ঠিক নয়। ওর দিদি ছাড়াও নিশ্চয় কেউ আসে। অন্তত এসেছিল।"

"কেমন করে বুঝলেন?"

"এই নস্যির ডিবে।—" নিজের পকেট দেখালেন কিকিরা। "নেশা হল সর্বনাশা। যে-লোক পান, সিগারেট, বিড়ি, নস্যির নেশা করেছে তার পক্ষে নেশা সামলানো মুশকিল। আমার মনে হয়, নস্যিখোর কেউ অনিলের কাছে

আসে, বা এসেছিল। নইলে তার ডিবে ও-ঘরে পড়ে থাকত না। তা ছাড়া ডিবের ওপর নাম খোদাই আছে। 'N'। 'N'-টা কে ? আর জি. সি। জিসি তো গোল্ডেন সার্কাস !"

তারাপদ চমকে ওঠার মতন করে বলল, "কেউ কি ফেলে গেছে !"

"না না, ইচ্ছে করে ফেলে যায়নি। পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে।"

"তা না হয় বুঝলাম—কিন্তু নস্যি নেওয়া কোন লোক অনিলের কাছে আসে জানব কেমন করে ? আসার সার্কাসের লোক বলছেন আপনি ! জি-সি তো অন্য কিছু হতে পারে।"

"দেখি। অনিলকেই হয়তো বলতে হবে। ... আচ্ছা তারাপদ, সার্কাসে আমরা যাদের সঙ্গে দেখা করলাম তারা তো কেউ নস্যি নেয় বলে মনে হল না। নেয় ?"

তারাপদ বলল, "কই, আমি তো দেখলাম না। ... কিন্তু স্যার, বিড়ি, সিগারেট, নস্যি সাধারণ নেশা। এমন নেশা সার্কাসের লোকরা নিশ্চয় করে। তাতে আর কী হল ?"

"না, কী আ হবে।...আচ্ছা আর-একটা কথা বলো তো। অনিল হল সার্কাসের খেলোয়াড়—সে রঙের টিউব নি কী করবে ?"

"রঙের টিউব ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত। সাধারণ একটা চকের বাক্সর মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোট-ছোট রঙের টিউব।"

"আমি দেখিনি স্যার।"

"তোমার দেখার কথা নয়, তুমি বাইরে তাকিয়ে অনিলকে ওয়াচ করছিলে। আমি একটা টিউব উঠিয়ে নিয়েছি। পকেটেই আছে আমার।"

তারাপদ যেন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিল না। নস্যির ডিবে, রঙের টিউব। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক কী ?

অনেকটা হেঁটে এসে কিকিরা বললেন, "রঙের টিউবগুলো ভাল করে আমি দেখিনি। দেশি কোম্পানির, বুঝতে পারলাম। টিউবের ওপর ছাপা কাগজ জড়ানো।"

তারাপদ বলল, "আপনার সন্দেহ হচ্ছে ?"

"সন্দেহ !... তা হচ্ছে বইকি ! জিনিসগুলো তো মনে হল কাগজের আড়ালে লুকিয়ে রাখা।"

"কেন ?"

"বলতে পারছি না।"

"হয়ত এমনি রেখে দিয়েছে।"

"একেবারে অকারণে। অকারণে একটা পেস্টবোর্ডের বাক্সর মধ্যে কয়েকটা রঙের টিউব রেখে দেবে।... আমি তো বাবা বুঝছি না।"

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "স্যার, এটা কি আপনার কোনও ক্লু ?"

কিকিরা কিছুই বললেন না। সিগারেট চাইলেন তারাপদর কাছে।

এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জনে।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "কাল তো তোমার অফিস। আমি সারাদিন বাড়িতেই থাকব। বিকেলে বেরোব। সার্কাসেই যাব। তুমি সোজা সার্কাসে চলে যাবে। পারলে চাঁদুকে নিয়ে যেয়ো।"

তারাপদ বলল, "যেতে-যেতে সন্ধে হবে।"

"তা হোক।"

৭

সার্কাসের তাঁবুর বাইরে হরিশবাবুকে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে শেষে এক জায়গায় বসলেন কিকিরা। গতকাল রবিবার বলে যত ভিড় জমেছিল আজ অতটা ভিড় নেই। কিছু লোকজন তো থাকবেই।

হরিশকে নানা কথায় ভোলাতে-ভোলাতে শেষপর্যন্ত কিকিরা তাঁকে বশ করে ফেলেছিলেন। আবার এক দফা চা, সিগারেট খাওয়ানোর পর কিকিরা বললেন, "আচ্ছা, ওই খেলোয়াড়টির আর কোনও খবর পেলেন না ?"

"কার ? অনিলের ?"

"হ্যাঁ।"

"না। কোনো খবর নেই।"

কিকিরা বললেন, "ছেলেটির খেলা দেখার বড় শখ ছিল আমার। ও থাকলে—বোধ হয় ব্যবসাটা জামানো যেত। কী বলেন ? আমি নিজের ইন্টারেস্টে বলছি মশাই।"

হরিশ মাথান নাড়লেন। "খেলাটা ভালই হত। লোকে নিয়েছিল।"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা হরিশবাবু, ছেলেটি কেন পালাল বলতে পারেন ?"

হরিশ বললেন, "কী জানি। কী যে হল— ?"

কিকিরা চারপাশ দেখে নিলেন। এখানে কেউ নেই। একটু আড়ালে এবং আচ্ছাদনের তলায় তাঁরা বসে আছেন দু'জনে। কিকিরা সাবধানে বললেন, "আপনি কিছু জানেন না ?"

"আমি ?"

"তা হলে মশাই আপনাকে বলি। একটা গুজব আমার কানে এসেছে। বলব আপনাকে ?"

কিকিরা সতর্ক হয়ে বললেন, "আপনারা যতই বাইরে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করুন হরিশবাবু, গুজবটা কিন্তু শোন যাচ্ছে। সার্কাসে এত লোক। কে কখন

বাইরে যাচ্ছে—কার সঙ্গে কথা বলছে তা তো আপনাদের জানার উপায় নেই। তা ছাড়া আজ দশ-বারো দিন ধরে খেলাটা বন্ধ। গুজব তো রটবেই।"

"কিসের গুজব ? কী বলছে বাইরে ?"

"বলব ?"

"বলুন।"

"সেই ছোকরাকে নাকি কেউ প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল সার্কাসের মধ্যে।"

হরিশবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক পলক। তারপর তোতলানোর মতন করে বললেন, "ক-কই।" আমি কিছু জানি না। এরকম গুজব কে রটাল !"

কিকিরা বুঝতে পারলেন হরিশবাবু ধাঁধায় পড়ে গেছেন। তাঁর চোখমুখ বলে দিচ্ছিল, তিনি যেন কিছু লুকোবারও চেষ্টা করছেন। কিকিরা বললেন, "আপনি বলছেন, গুজছ্ মিথ্যে ? কিন্তু মশাই, গুজবটা যে মিথ্যে নয় তা আমি জানি।"

"কেমন করে জানলেন ?"

"আমায় একজন বলেছেন।... হরিশবাবু, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না ! না পারলে আর কী করব !"

হরিশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললেন, "আমাদের ভেতরের কথা বাইরে বলতে নেই, রায়বাবু ! আমি আবার এদের দয়ায় আছি। বুঝতেই তো পারছেন ! আমার মুখ থেকে কোনোও কথা..."

"আরে না, আপনার-আমার মধ্যেকার কথা অন্য লোকে জানবে কেন ?" বলতে-বলতে কিকিরা আবার একটা সিগারেট দিলেন হরিশকে।

হরিশ বললেন, "কী গুজব আপনি শুনেছেন ?"

কিকিরা বললেন, "শুনেছি, কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে অনিল ছোকরার রেষারেষি ছিল। সেটা শেষপর্যন্ত এত বেড়ে যায় যে—"

কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হরিশ বললেন, "কৃষ্ণমূর্তি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছেন ! বলেন কী ! এ-কথা যে বলেছেন সে মিথ্যে, বাজে কথা বলেছেন। বানানো কথা।"

কিকিরা অবাক হলেন না। বললেন, "আপনি জানেন ?"

"জানাজানির কিছু নেই রায়বাবু। কৃষ্ণমূর্তিকে আমি এত বছর ধরে দেখছি। তিনি খানিকটা দেমাক নিয়ে থাকেন, রগচটা, মুখে যা আসে বলে ফেলেন। তবে কাউকে খুন করার মানুষ তিনি নন। আমি আপনাকে বলছি।"

"কৃষ্ণমূর্তিকে আমারও সেদিন ভাল লেগেছে। কিন্তু হরিশবাবু, বাইরে এ-গুজব রটল কেমন করে ?"

"কেউ রটিয়েছে।"

"কেন ?"

"কেমন করে বলব ! হয়ত ইচ্ছে করেই।"

"এমন কে আছে ?"

"বলতে পারব না। থাকতেও পারে।"

"আপনার কাকে মনে হয় ? মানে, মূর্তির সঙ্গে একেবারেই বনে না কাদের ?"

হরিশ সিগারেটের টুকরোটা প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন। বাকিটুকু শেষ করে বললেন, "আমি কাকে সন্দেহ করব। দু একজন থাকতে পারে।"

"কে-কে ?"

"লম্বু। মতিলাল।"

"লম্বু কে ? মতিলালই বা কে ?"

"লম্বু হল নাইডু। সাইকেলের খেলা দেখায়। তার সবচেয়ে ভাল খেলা—এক চাকার লম্বা সাইকেল নিয়ে। আর মতিলাল হল জোকার—ক্লাউন।"

"কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে এদের ঝগড়া নাকি ?"

"মেলামেশা নেই। কেউ কাউকে দেখতে পারে না।"

"অনিলের সঙ্গে এদের বোধ হয় ভাবসার আছে।"

"লম্বুর সঙ্গে বেশি।"

"আচ্ছা, একটা কথা হরিশবাবু ! লম্বু কি নস্যি নেয় ?"

হরিশ কেমন অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ নস্যির কথা কেন ! বললেন, "নস্যির কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ! হ্যাঁ, নেয়।"

কিকিরা যেন শেষমেশে একটা আলোর ঝিলিক দেখতে পেলেন। বললেন, "নাইডুর পুরো নামটা কী ?"

"আমরা তো বুড্ডি বলে জানি।"

কিকিরা এবার নিশ্চিন্ত। এই নাইডু বা লম্বুর সঙ্গে অনিলের নিশ্চয় যোগাযোগ আছে ! নাইডু অনিলের কাছে যায়। লুকিয়ে। কিন্তু কেন ? তার নস্যির কৌটো অনিলের ঘরে পড়ে থাকার আর অন্য কী মানে হয়।

কিকিরা বললেন, "আপনাদের লম্বু বা নাইডু কেমন লোক ?"

"সুবিধের মানুষ নয়।"

"আর মতিলাল ?"

"মতিকে আপনি মালিকের মোসাহেব বলতে পারেন। সব সময় মালিকের কাছে থাকে। মালিক যা বলেন মতিও তাই বলে, জল উঁচু তো জল উঁচু—জল নিচু তো জল নিচু।"

কিকিরা মনে হল, আপাতত আর হরিশবাবুকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়, হরিশকে বেশি ঘাঁটালে সে অন্যরকম সন্দেহ

করতে পারে।

তারাপদ আর চন্দন এসেছিল সময় মতন। কিকিরা খানিকটা সময় কাটিয়ে শেষে একসময় ধীরে-ধীরে কৃষ্ণমূর্তির তাঁবুতে গিয়ে হাজির।

কৃষ্ণমূর্তি সবেই তাঁর খেলা দেখালো শেষ করে তাঁবুতে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এই খেলাটা দেখাবার আগে কৃষ্ণমূর্তি কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। বোধ হয় মনকে সংযত, স্থির রাখার চেষ্টা করেন। খেলা দেখানো হয়ে গেলে তিনি সোজা নিজের তাঁবুতে ফিরে আসেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপের পর যেন ক্লান্তি লাগে বড়। দুর্বল মনে হয় নিজেকে। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নেওয়ার পর জল খান, চা খান। পোশাক-টোশাক খুলে ফেলেন। তারপর বিশ্রাম করেন।

কিকিরা আগেভাগেই সেটা জেনে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণমূর্তি যখন বিশ্রাম করছেন—কিকিরা তামর দুই শাগরেদ নিয়ে তার তাঁবুতে ঢুকলেন।

তাঁবুতে ঢুকেই দু'হাতে তাল বাজাবার মতন করে বললেন, কিকিরা, "অদ্ভুত স্যার। ওয়াণ্ডারফুল। আজ আপনি টেক্কা দিয়ে দিলেন। কী খেলাই দেখালেন সাহেব। আমরা একেবারে দমবন্ধ হয়ে দেখলাম।"

কৃষ্ণমূর্তি এ-সময় কিকিরাকে এখানে দেখবেন ভাবেননি। বললেন, "আপনি ! আপনারা ?"

"আপনাকে সেলাম জানাতে এলাম সাহেব !"

"সেলাম !"

"আজকের খেলা বেস্ট।"

"রোজই দেখাই রায়বাবু !"

"তা তো দেখান। আমরাও দেখেছি। তবু সাহেব—গুড, বেটার, বেস্ট আছে। আজ আরও ভাল লাগল। বেস্ট। নাকি হে তারাপদ ?"

তারাপদরা যথারীতি ঘাড় নাড়ল।

কিকিরা বললেন, 'দেখুন মূর্তিসাহেব। আমার এক চেনা ওস্তাদজি আছেন। রহিম খাঁ। তিনি বলেন, বেটা গানা তো রোজই গা, মাগর এক-কেদিন সুর আপনাই খেলা করে। ...খুব দামি কথা। খেলা আপনি রোজই দেখান। এক-একদিন সেই খেলা আপনাকে ভর করে।"

কৃষ্ণমূর্তি হাসলেন। খুশি হলেন।

কিকিরা নিজেই এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিলেন কৃষ্ণমূর্তিকে। কিনে আনিয়েছেন আগেই। দামি সিগারেট। "আপনার জন্যে এনেছি। রাখুন—।"

কৃষ্ণমূর্তি হাসলেন। কিকিরার উদ্দেশ্য যেন বুঝতে পারছিলেন। বললেন, "ঠিক আছে, দিন। আপনারাও নিন।"

"আপনি নিন আগে। আমরা তো আছি।"

"চা খাবেন ?"

"না না, চা নয়। অনেকবার খেয়ে ফেলেছি। আমার আবার ব্যাড লিভার। আর এরাও এইমাত্র চা খেয়েছে। ম্যাজিশিয়ান আদিনাথ খাইয়েছেন।"

কৃষ্ণমূর্তি নিজেই কথাটা তুললেন। বললেন, "রায়বাবু, আমি মালিকের সঙ্গে কথা বলেছি। মালিক বলছেন, দু'জায়গায় যেতে পারেন। টিটাগড় আর... "

"চন্দননগর।"

"আর হবে না। শীত চলে গেলে সার্কাস সিজ্‌ন খতম হয়ে যায়।"

"শীতের পর কোথায় যান আপনারা ?"

"নর্থ বিহারে দু-এক জায়গায় ঘুরি। তারপর আমরা বেকার।"

"এত জিনিসপত্র,বাঘ, সিংহ, তাঁবু... "

"মালিকের দেশে চলে যায়। আবার দেওয়ালির পর... "

"ও ! আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন তখন ?"

"না। আমি মধুপুরে থাকি। আমার বোনের ফ্যামিলি থাকে মধুপুরে।"

তারাপদ আর চন্দন কোনো কথা বলছিল না। শুনছিল। কৃষ্ণমূর্তিকে ওপর-ওপর বেশ ভদ্র মনে হয়।

নতুন প্যাকেটের সিগারেট বিলি করে কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "রায়বাবু, আপনি কাল মালিকের সঙ্গে কথা বলে নিন।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। বলবেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "মূর্তিসাহেব, একটা কথা বলি। আমরা ব্যবসাদার লোক। বেড়াল যেমন মাছের গন্ধ শুঁকতে চায়, আমরাও দু' পয়সা বেশি রোজগারের কথা ভাবি। শুনেছি, আপনি আগে বড় সার্কাসে ছিলেন। গোল্ডেন সার্কাস বড় নয়। বাইরেও এরা বেশি খেলা দেখায় না। ব্যবস্থা করতে পারে না। তা যেখানেই দেখাক, খেলা নিয়ে কথা। খেলা যত ভাল থাকবে তত লোক আসবে দেখতে। দু-চারটে ভাল খেলা নিয়ে মিয়ে ব্যবসা করা যায় না। যায় ?"

"না," মাথা নাড়লেন কৃষ্ণমূর্তি।

"আপনাদের সার্কাসে আপনি টপ। ট্রাপিজ চলনসই। জন্তু জানোয়ারের খেলা মামুলি। শুনলাম আপনারা— ।"

বাধা দিয়ে কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "এ-বছর একটা নতুন খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলাম। আটকে গেলাম। কামানের মুখ থেকে একটা মেয়েকে ছুড়ে দেওয়া ? খেলা দেখেছেন ?"

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়াচাওনি করল। কিকিরা বললেন, "দেখিনি। তবে এরকম খেলার কথা শুনেছি। কিংবা কাগজে পড়েছি।"

"আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারলাম না। আটকে গেলাম।"

"আচ্ছা, আপনাদের তো আরও একটা মোটরবাইকের খেলা ছিল। দেখানো হচ্ছে না। মল্লিকসাব বলছিলেন, খেলোয়াড় ছোকরা পালিয়ে গেছে।"

কৃষ্ণমূর্তি চুপ। কয়েক পলক দেখলেন কিকিরাকে।

"সত্যি পালিয়ে গেছে? বাইরে আমরা খোঁজ নিচ্ছিলাম। খেলাটা নাকি মন্দ হত না!"

"'আপনারা দেখেছেন?"

"না, না সাহেব। আমরা আসার আগেই খেলাটা বাদ হয়ে গেছে।"

"ও।"

"ছোকরা কি সত্যি পালিয়ে গেছে, স্যার?"

মাথা নাড়লেন কৃষ্ণমূর্তি।

"হঠাৎ পালাল?"

"হ্যাঁ।"

"অদ্ভুত ব্যাপার! হয়েছিল কী?"

'সমালিক কী বলল?"

"উনি কিছু বলতে পারলেন না। বললেন, কী হয়েছিল জানেন না। তবে বাড়িতে খোঁজ করেছিলেন। হাসপাতালেও খোঁজ নিয়েছেন। থানায়—"

কৃষ্ণমূর্তি ক্রমশ যেন বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। বললেন, "নেমকহারাম, বদমাশ। শয়তান।"

কিকিরারা কৃষ্ণমূর্তিকে লক্ষ করছিলেন। মূর্তিসাহেব বেশ উত্তেজিত, মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি রুক্ষ।

"কার কথা বলছেন? ছোকরা বদমাশ?" কিকিরা বোকার মতন ভান করে বললেন।

"বহুত নেমকহারাম। চোর।... আমি ওর পাত্তা লাগাচ্ছি বাবু। দু-একমাস ওই চোট্টা লুকিয়ে থাকবে। বরাবর পারবে না। আমি ওকে হাতে পাব।"

চন্দন আর তারাপদ চোখে-চোখে কী যেন কথা বলল। কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন না। কৃষ্ণমূর্তিকেই লক্ষ করছিলেন। শেষে বললেন, খানিকটা সহজ গলায়, "আপনি তো এখানে থাকছেন না। সার্কাসের সঙ্গে চলে যাবেন। তারপর মধুপুরে গিয়ে থেকে যাবেন বাড়িতে।"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "আমি থাকি না থাকি আমার লোক থাকবে কলকাতায়। ওকে আমি ছেড়ে দেব না রায়বাবু।"

কিকিরা যেন মুখ ফসকে বলছেন, এমনভাবে বললেন, "ছোকরা কি আপনার ভয়ে পালিয়ে গেছে?"

কৃষ্ণমূর্তি সরাসরি সে-কথার জবাব দিলেন না। বললেন, "চোর, চোট্টা,

নেমকহারামরা কাকে ভয় পায় !”

“কী চুরি করেছে, স্যার ?” বলেই কিকিরা নিজের অসাবধানতার জন্য যেন জিভ কাটলেন। “যাক গে। আপনাদের কথায় আমার মতন থার্ড পার্সনের থাকা কেন ? মুখ ফসকে বলে ফেলেছি সাহেব। মাফ করবেন।”

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, “মালিক আপনাকে কী বলেছেন ?”

“উনি তো বললেন, উনি কিছুই জানেন না, ছোকরা কেন পালিয়েছে।”

“জানেন না ? ...না বলেননি ?”

“তা হবে।”

“আচ্ছা ! এবার।”

“হ্যাঁ স্যার, এবার আমরা যাই। ... আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম।”

কৃষ্ণমূর্তি ঘাড় নাড়লেন। ঠিক আছে।”

কিকিরা উঠে পড়লেন। উঠতে বললেন তারাপদদের।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিকিরার কী খেয়াল হল, এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণমূর্তিকে বললেন, নিচু গলায়, “একদিন আসুন না আমাদের ওখানে।”

কৃষ্ণমূর্তি যেন বুঝতে পারলেন না। তাকিয়ে থাকলেন।

কিকিরা বললেন, “আপনার তো রাত্তিরের দিকে খেলা। দুপুর দুপুর একদিন চলে আসুন।”

“আপনাদের অফিসে ? কোথায় অফিস ?”

“অফিসে কী যায়-আসে সাহেব ! আপনি যাব বললে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করব। আসুন একদিন। না হয় একটু খেয়েদেয়েই আসবেন। নেমন্তন্ন জানিয়ে যাচ্ছি।”

“দেখি— !”

“আপনি আসুন। হয়ত আপনাকে একটু-আধটু সাহায্য করতে পারব স্যার।”

কৃষ্ণমূর্তি তাকিয়ে থাকলেন সামান্যক্ষণ। তারপর বললেন, “আপনি কে ?”

কিকিরা হাসলেন। জবাব দিলেন না।

৮

পরের দিন আর সার্কাসে যাননি কিকিরা। যাওয়ার কথাও ছিল না।

তারাপদ আর চন্দন এল সন্ধের মুখে। তার আগেই শেষ শীতের এক পশলা খামখেয়ালি বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটও হয়ত ভেজেনি।

তারাপদরা এসে দেখল কিকিরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখেনি তারাপদরা। তবে কিকিরার সঙ্গে এত

লোকের চেনাজানা যে, সকলকে দেখা বা চেনার উপায় নেই।

তারাপদরা আসার পর-পরই ভদ্রলোক চলে গেলেন।

তারাপদ বলল, "কে স্যার ? আগে তো দেখিনি।"

কিকিরা বললেন, "আমার এক পুরনো বন্ধু। ওল্ড ফ্রেন্ড !"

"আগে কখনো দেখিনি।"

"এদিকে আসে কই যে দেখবে! আমি একটা কাজে ওর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম কাজটা সেরে একবার আসতে দয়া করে। তাই এসেছিল। ওরা হল কাজের লোক বুঝলে তারাবাবু, সময় কোথায় আসার। আমার মতন বেকার আর ক'টা পাবে। আমার হল হাউস ইটিং অ্যান্ড ফরেস্ট ব্যাফোলো ড্রাইভিং।"

চন্দন আর তারাপদ হাঁ হয়ে গেল। "কী বললেন স্যার !"

চন্দরা হো হো করে হেসে উঠল। মেজাজ খুশি থাকলে কিকিরা চমৎকার-চমৎকার ইংলিশ বলেন।

হাসি সামলাতে সময় গেল খানিকটা। তারপর চন্দন বলল, "অনেকদিন পরে আপনার মেজাজ শরিফ দেখছি।"

কিকিরা বললেন, "না। শরিফ একেবারেই নয়। তবে হ্যাঁ, একটু ভাল।"

"কিছু হয়েছে ?"

'আশার আলো—না কী বলে যেন—তাই দেখছে পাচ্ছি।"

তারাপদরা জায়গামতন বসে পড়েছিল।

তারাপদ বলল, "আশার আলোটা কেমন একটু শুনি ?"

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "শুনবে বাবা, তোমাদের শোনাব না তো কাকে শোনাব ! তার আগে বলো তো, কৃষ্ণমূর্তি কোথায় এনে বসাই।"

"মানে ?"

"বাঃ ! কাল তে তাঁকে নেমন্তন্ন করে এলাম।"

চন্দন বলল, "আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু কাজটা কি ভাল করলেন ?"

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বললেন, "খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই কাজটা করলাম। না করে উপায় ছিল না।"

"আমরা তো এবার ধরা পড়ে যাব, স্যার। সত্যি যদি একটা অফিস ঘর থাকত, তা হলে না হয় কৃষ্ণমূর্তিকে অফিসে বসিয়ে তারপর কোনো হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো যেত। আপনি ওঁকে বসাবেন কোথায় ? আমাদের মতলব, পেশা সবই তো তিনি জেনে যাবেন। হয়ত ওঁর মনে সন্দেহও হয়েছে।"

তারাপদ বলল, "কৃষণমূর্তি না আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন সেদিন—আপনি কে ? আমরা অবশ্য আপনার শেষের কথা কিছু শুনিনি তখন—তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলে পরে বাইরে এলেন।

তারপর নিজেই সব বললেন।"

কিকিরা চুরুশ হাতড়াতে লাগলেন। বললেন, "চাঁদু, আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি। কৃষ্ণমূর্তি বা অনিল এরা যদি না নিজের থেকে সব কথা বলে—আমরা আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারব না। জানতেও পারব না। ওদের দু' জনের একজনকে দিয়ে কথাটা বলাতে হবে। অনিলকে আর আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন?"

"ও আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে। তারাপদকেই জিজ্ঞেস করো—"

চন্দন আজ আর অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হল না। সে সবই শুনেছে কিকিরা আর তারাপদর মুখে। শুনে তার খারাপ লেগেছে।

কিকিরা বললেন, "কয়েকটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো। প্রথম হল, অনিল যেভাবে কৃষ্ণমূর্তিকে ভিলেন সাজাতে চেয়েছে আমাদের কাছে—মূর্তিসাহেব তেমন লোক নন। সার্কাসের হরিশবাবু তার সাক্ষী। এমনকী আমি আদিনাথকেও ঠারেঠোরে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, মূর্তিকে কেউ শয়তান, খুনে, বদমাশ ভাবে না। তিনি অহঙ্কারী, মাঝে-মাঝে চেঁচামেচি করেন, রাফ হয়ে ওঠেন—এই একমাত্র তাঁর দোষ। আবার লোকটা বেশ ভাল বলেও শুনলাম। কাজেই অনিল আগাগোড়া কৃষ্ণমূর্তিকে যেভাবে দেখাতে চেয়েছে সেটা ঠিক নয়। নিজের কোনো উদ্দেশ্য মেটাবার জন্যে মূর্তির নামে অত কথা বলেছে।"

চন্দন বলল, "মূর্তিরও কিন্তু প্রচণ্ড রাগ দেখলাম অনিলের ওপর।"

"হ্যাঁ। সে-কথায় পরে আসছি।" কিকিরা এতক্ষণ পরে চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, "অনিল যে মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে—তার আর একটা প্রমাণ, অনিল সার্কাসের লোকের সঙ্গে লুকিয়ে যোগাযোগ রেখেছে। যার সঙ্গে রেখেছে—তার নাম নাইডু বা লম্বু। সাইকেলের খেলা দেখায়। নস্যিখোর। তার নস্যির ডিবে অনিলের ঘরে পাওয়া গেছে। অথচ অনিল আমাদের কাছেও বলেছে, দিদি ছাড়া তারক কাছে কেউ আসে না। অথচ তার কাছে সার্কাসের লম্বু আসে। কেন আসে?"

বগলাচরণ চা নিয়ে এল।

কিকিরা তাঁর চা নিয়ে একটু সোজা হয়ে বসলেন। বগলা চলে গেল।

সামান্য থেমে কিকিরা বললেন, "তোমাদের কি মনে আছে, দ্বিতীয় দিন ও যখন একলা-একলা আসে তখন বলেছিল, ইলেকট্রিকের দোকানে একটা ষণ্ডাগুণ্ডা লোক বসে থাকায় ও ভয় পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিল না। লোকটাকে নাকি ও দোকানে বসে থাকতে দেখেছিল সারাবেলা, তার ঘরের জানলা দিয়ে। পরে বিকেলে যখন রাস্তায় নামল—তখনো লোকটাকে দেখে সে আর এগোতে ভরসা পায়নি। মনে আছে কথাটা?"

তারাপদ আর চন্দন ঘাড় নাড়ল।

কিকিরা বললেন, "এটাও মিথে কথা। আমি সেদিন অনিলের ঘরের জানলা খুলে বাইরে দেখছিলাম। ওটা পশ্চিম দিকের জানলা। ওখান থেকে গলির মুখের ইলেকট্রিকের দোকান দেখা যায় না।"

চন্দন বলল, "ছেলেটা পর-পর এত মিথ্যে কথা বলল কেন?"

কিকিরা বললেন, "সেদিন না হয় দেরি করে আসার জন্যে একটা অজুহাত খাড়া করেছিল। আমি ওটা বাদ দিচ্ছি। হয়ত ওর ঘরে কেউ এসেছিল—তাই দেরি হচ্ছিল।... কিংবা ও বোঝাতে চাইছিল, ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে।"

তারাপদ বলল, "ও ছেলে খুব সেয়ানা, স্যার। তাই তো মনে হচ্ছে।"

কিকিরা বললেন, "আরও একটা জিনিস তোমরা জানো না। তারাপদ খানিকটা জানে। অনিলের ঘরে আমি একটা মামুলি ছোট বাক্স পাই। চক পেনসিল রাখার বাক্স। সেই বাক্সর মধ্যে চকের বদলে কয়েকটা টিউব ছিল। রঙের টিউব। ছোট সাইজের একটা টিউব আমি পকেটে পুরি নিয়ে চলে এসেছিলাম। সেই টিউবটা দেখবে?"

তারাপদ আর চন্দন কৌতূহলের চোখে চেয়ে থাকল।

কিকিরা উঠলেন। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন একপাশে।

ঘরের এককোণে ঝোলানো একটা সেল্‌ফ থেকে কাগজে মোড়া কী যেন নামিয়ে নিলেন। নিয়ে এগিয়ে এসে চন্দনের হাতে দিলেন। "নাও, খুলে দেখো।"

চন্দন কাগজ খুলল। দেখল, রঙের টিউব। টিউবের গায়ে যে ছাপা-কাগজ জড়ানো ছিল সেটা কেউ খুলে ফেলেছে। টিউবের একটা পাশ পুরোপুরি কাটা। সরু করে। গা দিয়ে লাল রং বেরিয়ে প্রায় জমে রয়েছে।

চন্দন কিছুই বুঝল না। তারাপদও দেখল।

কিকিরা বললেন, "অনিল সার্কাসের খেলোয়াড়। ছবি সে আঁকে না। অন্তত তার কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি। তা হলে চকের বাক্সর মধ্যে রঙের টিউব লুকিয়ে রাখার মানে?"

তারাপদ বলল, "কী মানে?"

"মানেটা বলছি।" কিকিরা নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলেন। পকেটে হাত ঢোকালেন। কাগজে মোড়া কী যেন বার করে কাগজটা খুলতে-খুলতে বললেন, "ওই রঙের টিউবের মধ্যে এই প্ল্যাটিনাম নিড্‌ল্—মানে ছুঁচটা ছিল।" ছুঁচটা দেখালেন কিকিরা।

চন্দন উঠে গিয়ে ছুঁচটা হাতে নিল। দেখল। ইঞ্চি চারেক লম্বা ছুঁচ। অনেকটা ক্রুশ কাঁটার মতন সরু। ফিরে এসে তারাপদকে দিল ছুঁচটা।

কিকিরা বললেন, "জিনিসটা আমিই রঙের টিউব থেকে বার করেছি। কিন্তু ওটা যে কী, বুঝতে পারিনি। যে ভদ্রলোককে তোমরা একটু আগে দেখলে

তিনি পাকা লোক। ওঁর দোকান আছে পার্ক স্ট্রিটে। পুরনো জিনিস বেচাকেনা করেন। কিউরিয়ো শপের মতন দোকানটা। দত্তরায় আমার পুরনো বন্ধু। তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম দেখতে। আজ সে ফেরত দিয়ে গেল। বলল, এ একেবারে খাঁটি প্ল্যাটিনাম। সেলাইয়ের ছুঁচের মতন সরু না হলেও সরু। পেনসিলের সিসের মতন মোটা বড় জোর। তাই না?"

"হ্যাঁ," তারাপদ বলল।

"নিড্‌ল্-শেপ। কিন্তু একটা জিনিস ভাল করে নজর করলে দখতে পাবে। ওই নিড্‌ল্-এর একটু মুখে কয়েকটা দানা আছে। চারটে দানা। বালির মতন।"

তারাপদরা দেখল।

কিকিরা বললেন, "এই প্ল্যাটিনাম নিড্‌ল্ রঙের টিউবের মধ্যে লুকিয়ে রাখার মানেটা কী? কে রেখেছে? কেন রেখেছে?"

চন্দন বলল, "স্যার, প্ল্যাটিনাম তো ভীষণ দামি জিনিস। সোনাকেও ছাড়িয়ে যায়।"

"সে পরের কথা। এই জিনিস এখানে কেন? এভাবে কেন? আর অনিলের কাছেই বা কেন?"

এত 'কেনর' একটারও উত্তর তারাপদদের জানা ছিল না। তারা চুপ করে থাকল।

চন্দনের ভাল লাগছিল না। মায়াদির কথায় সে আগ বাড়িয়ে অনিলকে ধরে এনেছিল কিকিরার কাছে। মায়াদি তো তাকে কিকিরার কথা বলেননি। তিনি জানেনই না কিকিরাকে। চন্দন নিজেই গরজ দেখাল। ভাবল, মায়াদির একটা উপকার করা যাক। অনিলও প্রথমে গা করেনি কিকিরার কাছে আসতে। মায়াদি জোর করলেন, কান্নাকাটি করলেন। ভাইয়ের জীবন নিয়ে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ...যা হওয়ার তা তো হয়ে গিয়েছে—এখন কী করা যায়! অনিল ছোকরাকে আর পছন্দ হচ্ছিল না চন্দনের।

কিকিরা বললেন, "তারা, সেদিন তো অনিলকে বলে এলুম একবার আসতে। সে কিন্তু এল না।"

"কেন বলুন তো?"

"তাই ভাবছি। আমি ভেবেছিলাম সে আসবে।... কেন ভেবেছিলাম জানো? অনিল যখন চকের বাক্স খুলে দখেছে—ওর মধ্যে থেকে একটা টিউব গায়েব হয়ে গিয়েছে—ও আমাকে সন্দেহ করবে। করতে পারে। আর সন্দেহ করলে আসা উচিত। তাই না?"

"হয়ত সন্দেহ করেনি বা চকের বাক্সটা খুলে দেখেনি।"

"হতে পারে। আবার এমনও তো হবে পারে—এখন সে বুঝতে পেরেছে আমরা নিতান্তই ভদ্রতা রক্ষা করতে সেদিন তার কাছে যাইনি। কোনো উদ্দেশ্য

নিয়ে গিয়েছিলাম। আর রঙের একটা টিউবও নিয়ে এসেছি চুরি করে। এখন তার সন্দেহ হয়েছে। ভয়ে সে আসতে পারছে না। ভাবছে, যদি ফেঁসে যায়!"

তারাপদ মাথা নাড়ল।

চন্দন বড় করে নিশ্বাস ফেলে বলল, "কিকিরা, আমি কি অনিলের কাছে যাব?"

"এখন নয়। তার আগে কৃষ্ণমূর্তিকে নিয়ে কী করি বলো তো? ওঁকে বেশি দরকার। মূর্তির কাছ থেকে কথা বার করতে না পারলে—আমি ধরতেই পারছি না কিছু।"

"আপনি ওঁকে নিয়ে বসুন তা হলে কোথাও।"

"বসার জায়গা বলতে আমার এই বাড়ি। তাতে আমরা ধরা পড়ে যাব ঠিকই। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি হয়ত সত্যি কথাটা বলতে পারেন। জানি, এটা ঝুঁকি নেওয়া হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।"

তারাপদ আর চন্দন নিজেদের মধ্যে কথা বলল। শেষে তারাপদ বলল, "স্যার, তাই করুন। কৃষ্ণমূর্তিকে এখানেই আনুন। তারপর যা হওয়ার হবে। আমাদের আর কী হবে! ফাঁসি তো হবে না।"

৯

তারাপদই নিয়ে এল কৃষ্ণমূর্তিকে।

চন্দন আসবে দুপুরের পর। হাসপাতাল ফেরত।

কৃষ্ণমূর্তিকে সদর খুলে দিলেন কিকিরা; হাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। "আসুন মূর্তিসাহেব। গরিবের বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আসুন।"

কৃষ্ণমূর্তিকে নিয়ে নিজের ঘরে আসতেই মূর্তি পা যেন আটকে গেল। ভীষণ অবাক হয়ে তিনি ঘরটা দেখছিলেন। কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এরকম বিচিত্র ঘর তিনি জীবনে দেখেননি। এখানে কী আছে আর কী নেই! মুখে কথা আসছিল না মূর্তির। চোখের পলকও যেন পড়ছিল না।

কিকিরা হাসি-হাসি মুখে বললেন, "বসুন!... ওই জায়গাটায় বসুন। আরাম পাবেন। তারাপদ, চায়ের কথা বলো, আগে একটু চা হয়ে যাক। এখন তো মাত্র বেলা এগারোটা।"

কৃষ্ণমূর্তির মুখে কথা ফুটল। "এই ঘর আপনার?"

"ঘর বলতে পারেন, জাদুঘরও বলতে পারেন," কিকিরা তামাশা করে বললেন।

তারাপদ মজার গলায় বলল, "ওলঃ কিউরিয়োসিটি শপও বলতে পারেন।

চোরাবাজারের হরেক জিনিস এখানে পাবেন, মায় বাগবাজারের টপ্পা গাইয়ে, অমুকের গাঁজার কলকে, থিয়েটারের ফুলুট... ।" বলে হাসতে-হাসতে সে চায়ের কথা বলতে গেল ।

কৃষ্ণমূর্তি বসলেন । তাকিয়ে-তাকিয়ে তখনও এই অদ্ভুত ঘরটি দেখছিলেন । শেষে বললেন, "রায়বাবু, আপনি কে ?"

কিকিরা হাসিমুখেই বললেন, "আমি কিকিরা । কিঙ্করকিশোর রায় । ছোট করে কিকিরা ।"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "আর ?...আমি সেদিনও আপনাকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলাম । আপনি জবাব দেননি ।"

কিকিরা বললেন, "আমি সামান্য লোক । নিন একটা সিগারেট খান ততক্ষণে ।" কিকিরা পকেট থেকে ভাল সিগারেট বার করে এগিয়ে দিলেন ।

"আগে একটু জল খাওয়ান ।" এমনভাবে বললেন কৃষ্ণমূর্তি যেন কিকিরার কাছে এসে তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে ।

"বলছি ।" কিকিরা দরজার কাছে গিয়ে বগলাকে জল আনতে বললেন ।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "আপনি আমায় অবাক করেছেন । তবে একটা কথা—আপনারা যে কোনো ইম্প্রেসারিও কোম্পানির লোক নন—সেটা আমি আন্দাজ করেছিলাম ।"

"কেমন করে ?"

কৃষ্ণমূর্তি এবার একটু হাসলেন । বললেন, "রায়বাবু, আমি সার্কাসে অনেককাল আছি । এ লাইনের কথা জানি । মানুষও কম দেখিনি । খেলার তাঁবু কেমন করে পড়ে আমি জানি । আপনি ওখানে একটু গলতি করেছিলেন । পরে ভাবলাম কী জানি হয়ত আপনারা কোম্পানি খুলে সার্কাস পার্টিও বসাচ্ছেন ।"

বগলাচরণ জল নিয়ে এল ।

কৃষ্ণমূর্তি জলের গ্লাস নিলেন । জল খেয়ে ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরালেন ।

কিকিরা বললেন, "স্যার, তবে সত্যি কথাটা বলি । আমি হলাম ম্যাজিশিয়ান । কিকিরা দি ওয়ান্ডার । এখন অবশ্য আর খেলা দেখাই না ।"

"মাঝে-মাঝে দেখান ।"

"মানেটা বুঝলাম না সাহেব ।"

"আদিনাথকে দেখিয়েছেন । আমি শুনেছি । হরিশবাবুও সেই ম্যাজিক দেখেছেন ।"

"ও ম্যাজিক নয়, হাত সাফাই ।"

"তা হল । এখন বলুন আমাকে আপনি কোন সাফাই দেখাতে চান ? এত খাতির করে নেতন্তন্ন খেতে ডেকেছেন যখন—তখন বিনি মতলবে ডাকেননি । আমিও সেটা বুঝে এসেছি ।"

তারাপদ ঘরে এল।

কিকিরা বললেন, "মূর্তিসাহেব, আমার কোনো বদ মতলব নেই। কীই-বা থাকবে! গরিব মানুষ। নিজের মনে থাকি আর ডুগডুগি বাজাই।"

"বলুন, কেন এনেছেন এখানে?"

"বলব স্যার। কিকিরা ভদ্দরলোক। আপনি আসতে না আসতে বিরক্ত করতে সে চায় না। চা-টা খান। একটু জিরিয়ে নিন। সব কথাই বলব আপনাকে।"

"আপনি এখনও বলতে পারেন।"

"চা-টা অন্তত খেয়ে নিন। ...মূর্তিসাহেব আমি ম্যাজিশিয়ান হলেও কুকিং এক্সপার্ট। আপনার জন্যে নিজের হাতে দু-তিনটে খাবারও করেছি। দেখুন, মুখে কেমন লাগে।"

বগলা চা নিয়ে এল।

চা খাওয়া শেষ হল।

কিকিরা তাঁর কথা বলতে লাগলেন। কিছুই লুকোলেন না। যা-যা ঘটেছে অর্থাৎ চন্দন, হাসপাতালের সিস্টার মায়া, অনিল, অনিলের পালিয়ে আসা, লুয়ে থাকা, কৃষ্ণমূর্তির বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, ভয় দেখানো, শাসানো, মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া—ইত্যাদি সবই বললেন একে-এক।

কৃষ্ণমূর্তি একমনে শুনছিলেন সেসব কথা। মুখের ভাবভঙ্গি পালটে যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে। কখনও রাগে মুখ কেমন শক্ত হয়ে উঠছিল, নাকমুখ কুঁচকে যাচ্ছিল ঘৃণায়, কখনও বিড়বিড় করে কিছু বলছিলেন, গালমন্দ করছিলেন অনিলকে।

ককিরার কথা শেষ হওয়ার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কৃষ্ণমূর্তি এমন ভাবে বসেছিলেন যেন রাগে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে কিকিরা বললেন, "প্রথমেই আমার কেমন খটকা লেগেছিল, মূর্তিসাহেব। আমি নাক গলাতে চাইনি। চাঁদু—মানে চন্দনই বেশি গা দেখাল। অবশ্য তার দোষ নেই। অনিলের দিদি মায়ার কথা শুনেই সে ভেবেছিল ছোকরার সত্যিই কোনো বিপদ হতে পারে।"

কষ্ণমূর্তি বললেন, "বুঝতে পারছি। ওই ছেলেটি ...চন্দন—ডাক্তার বললেন না?"

"হ্যাঁ। এখন হাসপাতালে ডাক্তার হয়ে আছে। চাঁদুই প্রথম অনিলকে দেখে।"

"সেই চোর, বদমাশ, স্কাউড্রেলটা এখন কোথায়?"

"কলকাতাতেই লুকিয়ে আছে।...বলব আপনাকে। তার আগে আপনার

তরফ থেকে কিছু শুনতে চাই। আপনি স্যার আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। আর এটাও নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন আপনার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র খারাপ ধারণা থাকলে—এত কথা বলতাম না। আপনাকে নিজের বাড়িতে ডেকেও আনতাম না। শুধু আপনর মুখ থেকে আসল ব্যাপারটা জানার জন্যে আপনাকে এখানে এনেছি। সার্কাসের তাঁবুতে সব কথা হয় না মূর্তিসাহেব। সময়ও হয় না।"

কৃষ্ণমূর্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ভাবলেন। তারপর বললেন, "অনিল কোথায় আপনি জানেন ?"

"জানি। তারাপদও জানে।" বলে তারাপদকে দেখালেন।

"আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন ?"

"যাব। যাব বলেই আপনাকে ডেকেছি। কিন্তু তার আগে আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই সত্যি কী ঘটেছে ?"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "বেশ, আপনাদের আমি বলছি। যা-যা ঘটেছে—বলব। তবে ছোট করে।"

"তাই বলুন।"

কৃষ্ণমূর্তি তাঁর কথা শুরু করলেন। "অনিল কীভাবে সার্কাসে এসে পড়েছিল সে-কথা আপনাদের বলেছে। মিথ্যে বলেনি। মল্লিক তাকে এনেছিল। আমি প্রথমটায় তাকে নজর করতে চাইনি। সার্কাসে এরকম মামুলি খেলোয়াড় দু-চারটে আসে। চলেও যায়। ভেবেছিলাম, মল্লিকের শখ হয়েছে। এনেছে, ছোকরা দু-চার মাস পরে নিজেই চলে যাবে সার্কাস ছেড়ে।...দেখলাম, সে গেল না। বরং তার মন পড়ে গেল সার্কাসে। যত্ন করে খেলা শিখতে লাগল। হরদম প্র্যাকটিস করত। তখন আমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ওকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগলাম। খেলার ব্যাপারেও। ছোকরাকে আমি পছন্দই করেছিলাম রায়বাবু। ভাল লাগত। ভালবাসতাম।"

কিকিরা বললেন, "অনিল নিজেও তা বলেছে। গোড়ায় আপনি তাকে পছন্দ করলেও পরে—"

"মিথ্যে বলেছে। পরেও আমি তাকে ভালবাসতাম। আমি কোনোদিনই নিজে তাকে আমার খেলা শেখাতে চাইনি। সেই বরং আমায় বলত খেলাটা তাকে রপ্ত করিয়ে দিতে। অনিল যদি বলে থাকে আমি তাকে খেলা শেখাবার নাম করে জখম করার চেষ্টা করতাম—তবে সে আগাগোড়া বানিয়ে বলেছে, মিথ্যে বলেছে।"

"আপনি কি তার খেলা দেখানোর বাইকটায় গণ্ডগোল করে রেখে দিতেন ?"

"না। আমি জানি তাতে কী বিপদ হতে পারে।"

"ওকে শাসানোর জন্যে আপনি কাগজ গুঁজে রেখে দিয়ে যেতেন ওর

তাঁবুতে।"

"না। কখনও নয়।"

"কাগজ থেকে অক্ষর কেটে-কেটে শাসানোর কথাগুলো লেখা থাকত বলে ও বলেছে।"

"বানানো কথা—।"

"আমারও তাই মনে হয়েছিল। কাগজের অক্ষর কেটে-কেটে কেউ চিঠি লেখে না। মানে নর্মাল প্রসেস নয়। টাইপ করে লিখতে পারে—হাতের লেখায় যেন ধরা পড়ে না যায়।"

"সে আপনারা জানেন। আমি তাকে চিঠি লিখে কখনও শাসাইনি।"

"শেষের দিকে আপনার সঙ্গে নাকি সম্পর্ক ভাল ছিল না?"

"ভাল ছিল না—! কেন? আমি ওকে কী করেছিলাম? ও যদি নিজে আমাকে এড়িয়ে চলে, আমি কী করব!"

এমন চন্দন এসে হাজির হল।

কিকিরা বললেন, "সেকি! তোমার তো দুপুরে আসার কথা।"

চন্দন আগেই কৃষ্ণমূর্তিকে দেখে নিয়েছে। হেসেছে সামান্য। চন্দন বলল, "কাজ শেষ না করেই চলে এসেছি বলবেন না। আজ একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।"

"ভালই হয়েছে। বসো।"

চন্দন বসল।

কিকিরা কৃষ্ণমূর্তির দিকে তাকালেন। বললেন, "যা বলছিলেন, স্যার! অনিল নিজেই আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কারণটা কী?"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "কারণটা আপনারা জানেন না। আমিও বুঝতে পারিনি। বুঝলাম সেদিন, যেদিন দেখলাম, আমার ট্রাঙ্ক থেকে একটা দামি জিনিস চুরি গিয়েছে। আর অনিলও পালিয়েছে সার্কাস ছেড়ে।"

"কিকিরা বললেন, "কী জিনিস?"

"বাটারফ্লাই ট্রে।"

কিকিরা, তারাপদ চন্ন—তিনজনেই অবাক। 'বাটারফ্লাই' ট্রে? মানে, একটা ট্রে! না অন্য কিছু?

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "সেটা কী জিনিস মূর্তিসাহেব?"

কৃষ্ণমূর্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "একটু বুঝিয়ে না বললে বুঝতে পারবেন না। মুখে বললেও বুঝবেন না। যদি চোখে দেখতেন—বুঝতে পারতেন—সে-জিনিস কী! ওরকম জিনিস দেখেননি। জীবনে দেখবেন বলেও মনে হয় না। ...রায়বাবু, আপনার হয়ত মনে আছে, আমি বলেছিলাম—আমার বাবা লাস্ট ওয়ারের সময় নেভিতে ছিলেন। রয়েল ইন্ডিয়ান নেভিতে। তিনি ছিলেন ওয়ারশিপে—মানে যুদ্ধ জাহাজের রেডিয়ো

অপারেটর। লাস্ট ওয়ারে আমার বাবাকে জাহাজে করে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। বিশেষ করে মেডিটারেনিয়ানে। আমরা বলি ভূমধ্যসাগর। বাবার জাহাজটা পাহারাদারির কাজ করত। আপনারা নিশ্চয় জানেন না, যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়—হিটলারের নাজি জার্মানরা নানা জিনিস স্মাগ্‌ল করে আনত নানা জায়গা থেকে। যেমন, রেডিয়াম, ডায়মন্ড, প্লাটিনাম, আরও অনেক কিছু। প্লাটিনাম দরকার লাগত এরোপ্লেনের কলকব্জার কাজে, অন্য আরও পাঁচটা কাজেও লাগত। নিজেদের চাহিদা মিটাবার জন্যে চোরাই চালানের ওপর ভরসা না করে জার্মানদের উপায় ছিল না। একদিকে বেপরোয়া স্মাগলিং অন্যদিকে তাদের গুপ্তচরদের কাজকর্ম। গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিল সর্বত্র। দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত।" বলতে-বলতে একটু থামলেন কৃষ্ণমূর্তি। যেন দম নিলেন। তারপর বললেন, "এই যে বাটারফ্লাই ট্রে-এর কথা বললাম, এগুলো তৈরি হত ব্রাজিলে। আসত রিও ডি জেনিরো থেকেই বেশিরভাগটা।"

তারাপদ বলল, "ট্রেগুলো কি সোনার ছিল ? হিরেটিরে থাকত ?"

"না। কাচের ট্রে। ব্রাজিলিয়ান গ্লাস। কিন্তু কাচের তলায় যে রঙিন প্রজাপতির চেহারা থাকত—তার কোনো তুলনা নেই। অপূর্ব ডিজাইন। কত রং, কত কারুকাজ, কী সুন্দর! এমন বাহার, রং, সূক্ষ্ম কাজ আপনারা দেখেননি। কল্পনাও করতে পারবেন না।"

কিকিরা কিছু বলার আগেই চন্দন বলল, "প্রজাপতি আঁকা কাচের ট্রে! কী হতে এগুলো ?"

"কী হত—সেটাই রহস্য। জার্মানরা শ'য়ে শ'য়ে এগুলো আনাত চোরাই পথে। তাদের এমব্যাসিতে থাকত, যুদ্ধের বড়-বড় কর্তাদের ঘরে থাকত।"

"কেন ?"

"তা বলতে পারব না। ব্রিটিশরা একসময় এই চোরা চালান ধরতে পারল। তাদের গুপ্তচররা চোরাই পথে আসা ট্রেগুলোর হদিস পেয়ে বেশ কিছু ট্রে পাকড়াও করে নিয়ে যেতে লাগল নিজেদের দপ্তরে। নানাভাবে পরীক্ষা করল। ভাঙল টুকরো-টুকরো করে—তবু কিছু ধরতে পারল না। আজ পর্যন্ত ধরা যায়নি ওগুলো কেন আসত, কী কাজে লাগত জার্মানদের। তবে শেষপর্যন্ত মনে হয়েছিল, ওই প্রজাপতিগুলো দেখতে যতই সুন্দর হোক, শখ করে ওগুলো কেনা হত না, চোরাই পথে আনানো হত না। ওগুলো ছিল সিক্রেট মেসেজ পাঠাবার অদ্ভুত এক ব্যবস্থা। কিন্তু কী গোপন খবর আসত, কীভাবে সেই প্রজাপতির রং আর ডানার নকশা থেকে খবরটা জার্মানরা ধরত তা ব্রিটিশ গুপ্তচররা বুঝতে পারেনি। ওটা রহস্য থেকে গেছে।"

কিকিরা বললেন, "আপনার বাবার কাছে এইরকম একটা ট্রে ছিল ?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধের শেষে বাবা এইরকম একটা ট্রে হাতে পেয়েছিলেন। সেটা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বাবার মুখেই আমি বাটারফ্লাই ট্রে-এর

কথা শুনেছি।”

“আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর—”

“বাবা বেশিদিন বাঁচেননি। পঞ্চাশ পেরোবার আগেই মারা যান। আমাও মাও বছর কয়েক পরে মারা যান।”

কিকিরা বললেন, “এই ট্রে আপনার কাছে ছিল?”

“হ্যাঁ।”

“নিজের কাছেই রাখতেন সব সময়?”

“না। আমি সার্কাসের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। ও-জিনিস নিজের কাছে রাখব কেমন করে!”

“তা হলে?”

“এবার আমার কাছে ছিল। মধুপুরে বোনের কাছেই বরাবর থাকত ওটা। এই মাসখানেক আমার কাছে ছিল। মধুপুর থেকে নিয়ে এসেছিলাম।”

“কেন?”

“কেন!.. গত ডিসেম্বরে আমি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখি। ইংরিজি কাগজে। পারসোন্যাল কলমে। কলকাতার এক ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, তিনি ব্রাজিলিয়ান বাটারফ্লাই ট্রে খোঁজ করছেন। তিরিশ হাজার টাকা কিংবা তার কিছু বেশি তিনি দিতে পারেন ট্রে-এর জন্যে।”

“ও! আপনি ওটা বিক্রি করতে চাইছিলেন।”

“হ্যাঁ। টাকার আমার খুব দরকার রায়বাবু। অন্তত হাজার চল্লিশ।”

“এত টাকা দরকার?”

কৃষ্ণমূর্তি চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরালেন আরও একটা। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, “আপনাদের কাছে কোনো কথাই যখন লুকোলাম না, তখন আর-একটা কথাও লুকোব না। ... বছর চারেক আগে আমি মল্লিকের কাছ থেকে তিরিশ হাজার টাকা ধার করেছিলাম। আমার বোনের জন্যে। তারা বড় অসুবিধেয় পড়েছিল। আমার ভগ্নীপতির পা চলে যায়। তার চিকিৎসা ছাড়াও মধুপুরের বাড়িটা ছেড়ে দিতে হত টাকাটা না পেলে। মল্লিকের কাছ থেকে টাকাটা নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম শোধ করে দেব ধীরে-ধীরে। পারিনি। বরং সেই টাকার সুদ গুনতে হয়েছে আমাকে। এখন বোধ হয় হাজার পঁয়ত্রিশ মল্লিককে দিতে হবে। হালে সে বড় তাগাদা দিচ্ছিল। টাকাটা নাকি সে তার বন্ধু আর পার্টনার ধনিলালের কাছ থেকে নিয়ে আমায় দিয়েছিল।”

কিকিরা বুঝতে পারলেন।

“আমি মল্লিককে বলেছিলাম—এবার টাকাটা আমি দিয়ে দেব। ব্যবস্থা করছি। মল্লিককে আমি ট্রে-টা দেখিয়েছিলাম। কাগজের লেখাটাও।”

কিকিরা যেন এবার অনেকটা পরিষ্কারভাবে ঘটনাটা বুঝতে পারছিলেন।

বললেন, "মল্লিকবাবুকে আগে কখনো ট্রে দেখাননি ?"

"না। তবে ও আমার কাছে শুনেছিল।"

"ট্রে দেখে মল্লিকবাবুর অবস্থা কেমন হল ?"

"অবাক হয়ে গেল। সে সভাবতেই পারেনি এমন জিনিস হতে পারে!"

তারাপদ বলল, "সেই ভদ্রলোক যিনি এই ট্রে কিনতে চেয়েছিলেন—আপনি তার কাছে যাননি। দেখা করেননি ?"

"গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক ছিলেন না। হপ্তা দুয়েকের জন্যে দিল্লি গিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হল, ওই ভদ্রলোক মিড্‌ল ম্যান হয়ে কাজ করছেন। কোনো জার্মান ভদ্রলোক হালে এখানে এসেছেন। ঘোরাফেরা করছেন। চলে যাবেন আবার জার্মানিতে। তাঁর হয়ে এই ভদ্রলোক কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছিলেন।"

কিকিরা বললেন, "কথাটা আপনি মল্লিকবাবুকে বলেছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপরই আপনার বাক্স থেকে ট্রে-টা চুরি যায়।"

"দিন দুই পর।"

"চুরির কথাটা আপনি মল্লিকবাবুকে বলেননি ?"

"বলেছিলাম।"

"কী বললেন উনি ?"

"খানিকটা চেঁচামেচি করল। লাফাল।"

"তখন থেকেই অনিল বেপাত্তা!"

"হ্যাঁ।"

"অনিলকে আপনি ট্রের কথা বলেননি ? দেখাননি তাকে ?"

"কথাটা আগে বলেছিলাম। ট্রে দেখানো হয়নি।"

"চুরির কথাটা সার্কাসের কে-কে জানে ? সকলেই শুনছে নাকি ?"

"আমি কাউকে বলিনি। মল্লিক যদি বলে থাকে।"

কিকিরা মনে-মনে ভাবলেন কী যেন। তারপব বললেন, "মূর্তিসাহেব, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাব। আপনি কি বলতে পারবেন ওটা কী ?"

কিকিরা উঠলেন। ঘরের এককোণ থেকে সেই রঙের টিউব আর প্লাটিনামের নিড্‌ল নিয়ে এসে কৃষ্ণমূর্তির হাতে দিলেন।

কৃষ্ণমূর্তি চমকে উঠলেন। অবাক হয়ে তিনি একবার কিকিরা দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর একবার সেই সরু ছুঁচটা দেখছিলেন। কথা বলতে পারছিলেন না। ভীষণ চঞ্চল যেন। বিহ্বল।

"এ আপনি কোথায় পেলেন রায়বাবু ?"

"কোথায় সে ?"

"জিনিসটা কী মূর্তিসাহেব ?"

কৃষ্ণমূর্তি নিজের কপালে চড় মারলেন। মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন জোরে-জোরে। তারপর বললেন, "এ-জিনিস আপনি পেলেন! কেমন করে ফেলেন! পাওয়ার কথা নয় রায়বাবু। এরকম তিনটে সরু জিনিস বাটারফ্লাইয়ের মাঝখানটায় ছিল পিঠের দিকে। শিরদাঁড়ার মতন জায়গাটায়। আর তার পাশ থেকে আরও সরু-সরু এই একই জিনিস প্রজাপতির পাখনায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। ওর আর নিচের পাখনায়।"

"সবসমেত ক'টা ছিল?"

"পিঠে তিন। পাখনার দু'পাশে দুটো করে, মোট চারটে।"

"মানে সাতটা।"

"হ্যাঁ।"

"এগুলো তা হলে প্রজাপতির মধ্যেই ছিল?"

"কাচের তলায় রায়বাবু! ভেতরে। ছাঁচের মধ্যে।"

"এগুলো কি রঙিন ছিল?"

"আলবাত ছিল। আলাদা-আলাদা রং। তবে রংটা তলার দিকে ছিল না।...আমি বুঝতে পারছি না, এগুলো কে বার করল। কাচের ট্রে না ভেঙে ওই ট্রের একটা জিনিসও বার করা সম্ভব নয়। মাই গড, অনিল কি ট্রে ভেঙে ফেলেছে? হায় হায়! রায়বাবু আমি—আমি, আমার সব চলে গেল। আমি এখন কী করব!" কৃষ্ণমূর্তি পাগলের মত ছটফট করছিলেন। গলা বন্ধ হয়ে এল তাঁর। কেঁদে ফেললেন যেন।

তারাপদ চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। কিকিরাও কেমন হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ কৃষ্ণমীর্তি বললেন, "সে কোথায়? জোচ্চর, বদমাশ, শয়তান—সেই নেমকহারামটা কোথায়? আমি তাকে খুন করব। আমার এত বড় সর্বনাশ সে করল। কোথায় সে?"

কিকিরা নরম গলায় বললেন, "আপনি শান্ত হোন। আমরা আপনাকে অনিলের কাছে নিয়ে যাব। মূর্তিসাহেব, একটু ধৈর্য ধরুন। এখন তার কাছে যাওয়ার সময় নয়।...নিন, চলুন—এবার হাতমুখ ধুয়ে দুটো খেয়ে নিন।..আমাকে বিশ্বাস করুন, আজই আমরা অনিলের কাছে যাব। রাত্তিরে।"

"রাত্তিরে?"

"তখন যাওয়াই ভাল। সে থাকবে। এখন গেলে যদি তাকে না পাই! তা ছাড়া আপনি এখন কোনো কথাই কাউকে বলবেন না। আভাস দেবেন না। রাত্তিরে আপনার খেলা শেষ হলে—আমরা সার্কাস থেকেই অনিলের কাছে চলে যাব।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে-হতে দুপুর গড়াল।

কিকিরার বসার ঘরে চারজনে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

পান চিবোতে-চিবোতে কিকিরা বললেন, "একটা কথা আপনাকে তখন বলা হয়নি, স্যার। ...সার্কাসের লম্বু মানে নাইডুর সঙ্গে অনিলের যোগাযোগ আছে বলে আমার মনে হয়। 'N' লেখা একটা নস্যির ডিবে আমি অনিলের ঘরে পেয়েছি। শুধু 'N' নয়, তলায় আবার ছোট করে 'G.C.' লেখা ছিল। বোধ হয় ওটা গোল্ডেন সার্কাস। ...আমার ধারণা, অনিল সার্কাস ছেড়ে পালিয়ে পাওয়ার পর—আপনাদের সার্কাসে কী হচ্ছে না হচ্ছে—তার খবরাখবর সে অনিলকে দিয়ে আসে।"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "নাইডুকে আজকাল খুব মল্লিকের কাছে যেতে-আসতে বসে থাকতে দেখছি।"

"এখন তো আমার মনে হচ্ছে, মল্লিকবাবুই আসল লোক। ভদ্রলোক অনিলকে দিয়ে আপনার জিনিস চুরি করিয়েছেন। কিন্তু কেন ? উনি কি ঠিক করেছিলেন নিজেই সেই বিজ্ঞাপনের ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসবেন ?"

কৃষ্ণমূর্তি মাথা নাড়লেন। বললেন, "না। মল্লিকের ধারণা প্রজাপতির ওই বাহার আর রঙের তলায় হীরে-চুরি গোছের পাথর-টাথর লুকনো আছে। বিক্রি করলে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার কেন, লাখ দেড়-দুই টাকা সে কামাতে পারে। মূর্খ, ইডিয়েট। ওর মধ্যে হীরেটিরে নেই। এমন অসামান্য জিনিস আপনারা জীবনে দেখেননি।"

তারাপদ বলল, "জিনিসটা নিশ্চয় খুবই সুন্দর। কিন্তু একটা কথা মূর্তিসাহেব। আপনি বলছেন, এক জার্মান ভদ্রলোক কলকাতায় বেড়াতে বা কোনো কাজে এসে ওইরকম একটা ট্রে কিনতে চেয়েছেন। দাম দিয়েছেন তিরিশ হাজারেরও বেশি। এটা একটু বাড়াবাড়ি হল না কী ?"

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, "মনে হয় বাড়াবাড়ি। তবে বাড়াবাড়ি নয়।"

"কেন ?"

"হিটলারের আমলের নাজি জার্মানির হোমরাচোমরাদের কাছে এই বাটারফ্লাই ট্রে-র অন্য মানে ছিল, কদর ছিল, আর দাম ছিল। দাম মানে টাকার দাম নয়। অন্য কোনো দাম। কী দাম আমি জানি না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অমন মাথাওয়ালারাও সেটা ধরতে পারেনি। আমি তো কোন ছার !"

"আপনি কি বলতে চাইছেন—পুরনো কোনো নাজি—"

"জানি না। এখনও কোন-কোনো নাজি নাকি এদেশে-ওদেশে লুকিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে বেঁচে আছে। তারা মাঝেমধ্যে ধরাও পড়েছে। কাগজেই পড়ি। সেরকম বুড়ো কোনো নাজি-র এরকম জিনিস দরকার হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে সিক্রেট কোনো নাজি অর্গানিজেশান এ-সব খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হয়ত তাদের দরকার। যেন দরকার আমি বলতে পারব না।"

চন্দন বলল, "এমনও তো হতে পারে, জিনিসটার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।"

"হতে পারে। হাজারবার হতে পারে।...তবে আমার অত জেনে কী লাভ! আমি ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা পেলে মল্লিকের দেনা শোধ করে দিতাম। মল্লিক আমায় কম কথা শোনায় না। অপমান, অপদস্ত করে। অথচ ওর জন্যে আমি কম কিছু করিনি।"

কিকিরা বললেন, "মল্লিকবাবু তো আপনার বন্ধু।"

কৃষ্ণমূর্তি করুণ মুখে হাসলেন যেন। বললেন, "ওর অসময়ে বন্ধু ছিলাম। এখন নয়। আর বন্ধুরাই তো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে। মল্লিককে অনেক বেশি লোভে পেয়েছিল।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কথাটা যেন মেনে নিলেন।

রাত হয়েছিল খানিকটা।

অনিল ঘরেই ছিল। আচমকা কিকিরাদের দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। ভয় পেল। "আপনারা?"

কিকিরার পেছনে তারাপদ আর চন্দন। কৃষ্ণমূর্তি নেই।

কিকিরা বললেন, "তোমার কাছেই এলাম।"

অনিল তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা ভাল করে অনিলকে দেখতে দেখতে বললেন, "অনিল, তুমি আজ আর আমাদরে ঠকাবার চেষ্টা করবে না। মিথ্যে কথাও বলবে না। আমরা সব জানি। প্রমাণ পেয়েছি। তুমি মূর্তিসাহেবের বাটারফ্লাই ট্রে-র কী করেছ? কোথায় সেটা?"

অনিল বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছিল প্রচণ্ড। তবু বলল, "কী বলছেন আপনারা?"

কিকিরা বললেন, "তুমি জানো কী বলছি! ট্রে কোথায়! চন্দন, তুমি ওই ব্যাগ আর সুটকেসটা দেখো তো!"

চন্দন এগিয়ে যাচ্ছিল, অনিল এসে সামনে দাঁড়াল। "আমার ঘরে এসে আপনারা আমার জিনিসে হাত দেবেন! কী ভেবেছেন আপনারা?"

কিকিরা বললেন, "দরকার পড়লে দেব। তুমি কি ঝামেলা বাধাতে চাও! যদি চাও, আমরা চলে যাচ্ছি, তবে নিচে দুজন পুলিস আছে। গিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।" পুলিসের কথাটা ভয় দেখানোর জন্য বললেন।

পুলিসের নামে অনিল থতমত খেয়ে গেল।

"পুলিস কেন?"

"তোমার কাছে ট্রে আছে কিনা দেখবে!"

"আছে।"

"দেখি।"

অনিল মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

"কী হল?"

"ট্রেটা আমি ভেঙে ফেলেছি। শুধু কাচের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই।"

"কোথায় সেটা?"

"আমার কিট ব্যাগে।"

"তা হলে তুমিই ট্রে চুরি করেছিলে?"

অনিল মাথা আরও নিচু করল।

"কে তোমায় চুরি করতে বলেছিল?"

"মালিক।"

"তোমায় কি টাকা দেবে বলেছিল?"

"হ্যাঁ। টাকা ছাড়াও বিক্রির ভাগ দেবেন বলেছিলেন।"

"তুমি বলছ, ট্রেটা তুমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছ!"

"হ্যাঁ। আপনারা দেখতে পারেন। কাচ ছাড়া আর কিছু পাবেন না।"

'মল্লিককে জানিয়েছ কথাটা?"

"জানিয়েছি।"

"লম্বুকে দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"শুনে তোমার মালিক কী বলেছে?"

"বলেছেন, তিনি কিছু জানেন না। আমার ব্যবস্থা যেন আমি নিজেই করি। আর সার্কাসে ফিরে না যাই।"

কিকিরা নিজের মনে মাথা নাড়তে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর কিকিরা বললেন, "অনিল, তোমায় একটা খারাপ খবর দি। খুবই খারাপ খবর। কৃষ্ণমূর্তিসাহেব আজ খেলা দেখাবার সময় গোলমাল করে ফেলেছিলেন। বিশ্রী অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছেন। অবস্থা খুব খারাপ। হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। কোনো হুঁশ নেই। নাকমুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়ছে। উনি বাঁচবেন কিনা জানি না।...আজ ওঁর মন বড় চঞ্চল ছিল। ডিস্টার্বড ছিলেন। ভুল করে ফেলেছিলেন কোথাও।...কৃষ্ণমূর্তি যদি মারা যান, এর দায় কিন্তু তোমার আর তোমার মালিকের।"

অনিল যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। পাথরের মতন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরা বললেন, "একটা ভাল মানুষকে তোমরা আজ শেষ করলে। এর শাস্তি তুমি পাবে। তুমি না ক্রিশ্চান!"

অনিলের হঠাৎ কী হল, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

হলুদ পালক বাঁধা তীর

হলুদ পালক বাঁধা তীর

সিঁড়িতেই দেখা। তারাপদরা নেমে যাচ্ছিল, কিকিরা উঠে আসছিলেন। সিঁড়িতে যেটুকু আলো তার চেয়েও বেশি অন্ধকার। দু-চারটে ইঁদুরও এই ভাঙাচোরা অন্ধকার সিঁড়িতে দিব্যি ছুটোছুটি করে বেড়ায় রাত্রের দিকে।

মুখোমুখি হতেই তারাপদ বিরক্তির গলায় বলল, "বাঃ, বেশ তো আপনি। আমরা দু'দিন হল আসছি আর ফিরে যাচ্ছি। কোথায় যান আপনি, কিকিরা ?"

কিকিরা বললেন, "কে তোমাদের ফিরে যেতে বলেছে ? আগের দিন আমার রাত হয়েছিল ফিরতে। কাল আমি ফিরে এসে শুনলাম, তোমরা একটু আগেই চলে গিয়েছ। কেন, বগলা তোমাদের বলেনি—আজ আমি না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ?"

"বলেছিল। কিন্তু কত আর অপেক্ষা করব ! চাঁদু কাল সকালের গাড়িতেই বাড়ি যাচ্ছে, ছুটি ম্যানেজ করেছে দিন সাতেকের। ওর কিছু কাজ আছে, তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারে ফিরতে হবে।... আমরা আরও আগে চলে যেতাম ; নেহাত ঝড় উঠল বলে খানিকটা বসে গেলাম।"

কিকিরা বললেন, "আমারও তাই। ট্রাম থেকে নেমেই ঝড়ে আটকে গেলাম। একটা দোকানে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম এতক্ষণ। নাও ওপরে চলো। চলো চাঁদু।"

সময়টা আষাঢ়। কালবৈশাখীর ঝড় ওঠার কথা নয় এখন, বৃষ্টি নেমে যাওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু দু-একদিন ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও বর্ষা নামেনি আজও, উলটে আজ সন্ধের মুখে জোর ঝড় উঠল হঠাৎ, ঠিক যেন কালবৈশাখী। ঝড় উঠলেও বৃষ্টি হল না এদিকে। তবে হতে পারে। আকাশে মেঘ ডাকছে, দু-এক ঝলক বাদলা বাতাসও দিচ্ছিল। দূরে কোথাও হয়ত বৃষ্টি নেমেছে।

ঘরে এসে কিকিরা চা করতে বললেন বগলাকে। তারপর জোব্বা জামার পকেট থেকে দু-একটা ছোট মতন খেলনা আর লুডো খেলার বোর্ডের মতন একটা বোর্ড বার করে রেখে দিলেন। বোর্ডের সঙ্গে কৌটোও ছিল। প্লাস্টিকের চৌকোনা কৌটো। গুটি আর ছক্কা ছিল কৌটোর মধ্যে।

"চাঁদু, তুমি বাড়ি থেকে ফিরবে কবে ?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"পঁচিশ, ছাব্বিশ। পঁচিশ শনিবার পড়েছে। রবিবার বিকেলে ফিরলেই হবে।" চন্দন বলল।

"বাড়িতে মা-বাবা... !"

"মা-বাবা ভালই আছেন। আমার মাসি-মেসোমশাই এসেছেন লন্ডন থেকে। খানিক হইচই হবে বাড়িতে, তাই আর কী !"

"কী করেন মেসোমশাই ?"

"মেসোমশাই কেমিক্যালের লোক। রিসার্চের কাজকর্ম করেন। মাসি চাকরি করেন ব্যাঙ্কে। মাসতুতো ভাই ইঞ্জিনিয়ার...।"

"বাঃ, বেশ ! তা তুমি দিন সাতেকের মধ্যেই ফিরছ !"

"না ফিরে উপায় আছে ! হাসপাতাল— !"

তারাপদ ততক্ষণে কিকিরার নামিয়ে রাখা খেলনাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছে। বলল, "এগুলো কী, স্যার ? আপনি কি বাচ্চা হয়ে যাচ্ছেন নাকি ? খেলনা কিসের ?"

কিকিরা মজার মুখ করে হাসলেন। বললেন, "সেই গানটা শুনেছ ?"

"কোন গান ?"

"পুরনো গান। এককালে ঘরে-ঘরে গাইত। 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে...'। শোনোনি ? কোথা থেকেই বা শুনবে ! তোমরা তখন জন্মাওনি !"

"আপনি নিশ্চয় জন্মেছিলেন— ?" তারাপদ মজা করে বলল।

"শিশু। চাইল্ড !" বলে কিকিরা ডান হাত মাটির দিকে নামিয়ে তখনকার বয়েসটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

"ও ! তা এখন কি খেলা করতে ইচ্ছে হল ?"

"হল মানে, ধরে নিয়ে গেল খেলার জন্যে। বলল, পনেরো হাজার পর্যন্ত দিতে পারে। রাহা খরচ আলাদা। ফিজ্ দশ হাজার আপাতত। অবশ্য যদি কাজের কাজ হয়। নয়ত এই কাজটা হাতে নেওয়ার জন্যে মাত্র পাঁচ হাজার। তিন হাজার টাকা আগাম দিয়েছে।"

তারাপদরা কিছুই বুঝল না। তবে কিকিরার স্বভাবই ওই রকম। গোড়ায় কিছু ভাঙেন না, রহস্য করেন। একটু- একটু করে কৌতূহল বাড়ান। তারপর ধীরে ধীরে আসল কথাটা বলেন।

তারাপদ আর চন্দন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। যেন বলতে চাইল, ব্যাপারটা কী ?

কিকিরা গায়ের জামাটা খুলে ফেলেছেন। কাছাকাছি জায়গা থেকে একটা ছোট মতন তোয়ালে উঠিয়ে নিয়ে মাথা-মুখ পরিষ্কার করে নিচ্ছিলেন। ধুলোবালি উড়েছিল ঝড়ে, মুখে-মাথায় কিরকির করছে। ওই অবস্থায় একটু গানও গেয়ে নিলেন বেসুরো গলায়, 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু

আনমনে— ।'

তারাপদ বলল, "বাঃ, ফাইন ! বিরাট নয়, অবোধ শিশু ! তা স্যার এবার একটু খোলসা করে বলুন তো ব্যাপারটা ?"

কিকিরার কোনো তাড়া নেই। নিজের জায়গায় বসতে-বসতে হাই তুললেন ছোট করে, আলস্য ভাঙলেন হাত তুলে। বসতে বললেন তারাপদকে।

খেলনাগুলো রেখে দিয়ে তারাপদ লুডোর বোর্ডের মতন খেলার জিনিসটা খুলে দেখছিল। একটু অবাক হল, হাসিও পেল যেন, "স্যার, এ তো নতুন দেখছি ! আগে দেখিনি।"

"আগে কী দেখেছ ?"

"লুডো, সাপসিঁড়ি, ঘোড়দৌড়।"

"ওটা হল ক্যাট অ্যান্ড দি মাউস। বেড়াল-ইঁদুর খেলা। ইঁদুরগুলো ভয়ে মরে বেড়াল ছানা পাচ্ছে ধরে।" কিকিরা রসিকতা করে বললেন।

তারাপদ এমন খেলা আগে দেখেনি। তবে বোর্ডের ছবি দেখে অনুমান করেছিল, লুডো, সাপসিঁড়ি, ঘোড়দৌড়ের মতনই কিছু। দান ফেলে এগুতে হবে। মাঝে-মাঝে ইঁদুর। ইঁদুরের গর্ত। ... তা সে পরে দেখা যাবে, আপাতত বোঝা যাচ্ছে না কিকিরার এই বয়েসে বেড়াল-ইঁদুর খেলার শখ হল কেন ?

চা নিয়ে এল বগলা।

কিকিরা চা নিলেন। চন্দনও।

তারাপদ এসে বসল একপাশে।

বগলা চলে গেল।

কিকিরা কয়েক চুমুক চা খেলেন। আরামের শব্দ করলেন। বললেন, "হাতে কাজকর্ম ছিল না অনেক দিন। মাস ছয়েক বেকার। নো মানি, নো ফান্ড। ডাল-ভাত জুটবে কোথ্ থেকে হে তারাবাবু। বাজারের যা হাল। একটা গন্ধ লেবুর দাম এখন দেড় টাকা, তা জানো ?"

তারাপদ হেসে বলল, "আপনি জানেন ?"

"জানি না ! আমি তো তোমার মতন হোটেল-বাবু নই, হ্যান্ড-বার্নিং করে রেঁধে খেতে হয় স্যার !"

চন্দন জোরে হেসে উঠল। "আপনি হ্যান্ড-বার্নিং করেন, না, বগলাদা করে ?"

"বগলা ফিফটি আমি ফিফটি। সেদিন একটা নতুন আইটেম করেছিলাম, পারসি পকৌড়া। দুধ, ডিম, রুটির সাদা টুকরো, টম্যাটো সস, গাজর দিয়ে করতে হয়। তোমরা থাকলে খেতে পারতে।"

"কপালে ছিল না স্যার।"

"আর-একদিন করে খাওয়াব।"

"তা কেসটা এবার বলুন, তারাপদ বলল, "অনেকক্ষণ ধরে

ঝোলাচ্ছেন— !"

কিকিরা চা খেতে-খেতে বললেন, "লালাবাবুকে দেখেছ ? আমার বন্ধু ?"

"না।" বলেই তারাপদ ভুল শুধরে নিল তাড়াতাড়ি, "সেই মণি লাল! তাঁকে দেখেছি। আলাপ হয়নি।"

চন্দন অবশ্য দেখেনি।

"লালাবাবু গত হপ্তায় এসেছিলেন। এসে বললেন, একটা ঘটনা ঘটেছে তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। আমি যদি একবার দেখি...।"

"কেমন মিস্টিরিয়াস ? খুন-জখম ? চুরি ? ভৌতিক কাণ্ডকারখানা ? ব্ল্যাক-মেইল ?"

কিকিরা হাত বাড়ালেন। তাঁর সেই কড়ে আঙুল সাইজের কড়া চুরুট তিনি এখন খাবেন না, একটা সিগারেট চাইলেন।

চন্দন প্যাকেট এগিয়ে দিল সিগারেটের। দেশলাইবাক্সটাও।

কিকিরা সিগারেট ধরালেন।

"আগে থেকে বলা যাবে না খুন-জখম, না, অন্য কিছু! এখন পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি। তবে মর-মর অবস্থা।"

"তার মানে ?"

"মানে এক ভদ্রলোককে হয়ত খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি এখনো মারা যাননি। মারা না গেলেও অবস্থাটা খুবই খারাপ। ভদ্রলোক পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছেন। কথা বলতে পারেন না, মানুষ চিনতে পারেন না, মাঝে-মাঝে হাত-পা একটু কাঁপে বটে কিন্তু নিজের থেকে হাত-পা নাড়াবার ক্ষমতাও তাঁর নেই। ডাক্তাররা বলছেন, জোর সেরিব্রাল স্ট্রোক। স্ট্রোক হলে যেমন হয় সচরাচর সেইরকমই অবস্থা। তাঁরা সেইরকমই ভাবছেন। কিন্তু লালাবাবু আর নটুমহারাজ অন্যরকম ভাবছেন।"

চন্দন বলল, "ডাক্তাররা যা বলছেন—সেটা না-মানার কারণ কী ?"

তারাপদ বলল, "ভদ্রলোক লালাবাবুর কেমন আত্মীয় ?"

কিকিরা এবার সবিস্তারে ঘটনাটা বলতে লাগলেন।

"ভদ্রলোক লালাবাবুর মামাতো ভাই। মানে দাদা। আবার বন্ধুর মতন। নাম রত্নেশ্বর, লোকে রতনবাবু বলে ডাকে। রত্নেশ্বরবাবুর বয়েস পঞ্চাশের ওপর। স্বাস্থ্য খুবই মজবুত ছিল। উনি বরাবর ব্যবসাপত্র করেছেন। পয়সাঅলা লোক। হালে ভদ্রলোক একটা বাস কিনে দিঘা-কলকাতায় চালাচ্ছিলেন। ট্যুরিস্ট সার্ভিস। মাস কয়েক আগে তাঁর খেয়াল হয় ঘাটশিলায় একটা হোটেল খুলবেন। জমি আগেই কেনা ছিল। ... তা হোটেল বাড়ি তৈরি করার কাজে সবেই যখন হাত দিয়েছেন— তখনই ঘটনাটা ঘটল।"

"রত্নেশ্বরবাবুর স্ট্রোক হল ? বা তাঁকে খুন করার চেষ্টা হল ?" তারাপদ

বলল।

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ?"

"ঘাটশিলায়।"

তারাপদ তাকিয়ে থাকল। রত্নেশ্বর থাকতেন কোথায় ? কলকাতায়, না, ঘাটশিলায় ? ভদ্রলোক সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কতটুকু আর জানা হয়েছে ? সামান্য দু-চারটে কথা থেকে কীই-বা বোঝা যায় ?

তারাপদ বলল, "ওঁর বাড়ি কোথায় ? ব্যবসাপত্রর জায়গা ?"

কিকিরা বললেন, "বাড়ি হরিশ মুখার্জিতে। পুরনো বাড়ি। পৈতৃক। ব্যবসাও কলকাতাতে। হরেক রকম ব্যবসা। সাইকেলের সিট, ঘণ্টি, আলো এসব তৈরি করার ছোট কারখানা আছে বেহালায়। কার্বন পেপার, স্ট্যাম্প কালি, স্ট্যাম্প প্যাড তৈরি হয় বেলেঘাটায়। চীনেবাজারে একটা দোকান আছে স্টেশনারির। হালে মস্ত বাস কিনে দীঘা-কলকাতায় চালাচ্ছিলেন। খুচরো আরও কিছু থাকতে পারে ছোটখাট। এজেন্সি গোছের।"

চন্দন বলল, "এতরকম ব্যবসা ! জাত ব্যবসাদার নাকি ?"

"ধরেছ ঠিক। ওঁরা জাত ব্যবসাদার। বাপ-ঠাকুর্দাও ব্যবসা করে গিয়েছেন।"

"এত ব্যবসা একলা সামলাতেন ভদ্রলোক ?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "খোঁজখবর রাখতেন সব ব্যবসারই, তবে নিজে দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না। বেহালার কারখানাটা নিজে দেখতেন। বেলেঘাটার কারবার দেখত নিমাই বলে একটা লোক। সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। রত্নেশ্বরদের আশ্রিত। চীনে বাজারের দোকানে বসত ওঁর নিজের ছোট ভাই যজ্ঞেশ্বর।"

"বাসের ব্যবসা কে দেখত ?"

"নিজেই দেখতেন রত্নেশ্বর। তবে একজন ছোকরা ম্যানেজার ছিল। নাম আনন্দ।"

তারাপদ বলল, "দাঁড়ান, একটু গুছিয়ে নিই, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বেহালা রত্নেশ্বর, বেলেঘাটা নিমাই, চীনেবাজার যজ্ঞেশ্বর, বাস আনন্দ। মানে এই চারজনই ছিল রত্নেশ্বরের ব্যবসার দেখাশোনার লোক। অবশ্য রত্নেশ্বরকে বাদ দিলে তিনজন।"

"হ্যাঁ।"

"গোলমাল ছিল কারও সঙ্গে ?"

"বাইরে অন্তত নয়।"

"আপনি এদের দেখেছেন ?"

"দেখেছি। লালাবাবু পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।"

"দেখে কি কাউকে সন্দেহ হল ?"

"দু-দশ মিনিট দেখেই কি সন্দেহ হয় ? আমার কি পুলিশের চোখ ?"

চন্দন বলল, "সন্দেহের কথা পরে। আগে জানতে হবে হয়েছিল কী যে আপনার বন্ধু লালাবাবু সন্দেহ করছেন রত্নেশ্বরকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। বললেন, "আসল কথাটা হল তাই। তারাবাবু আসল কথাটা ছেড়ে বাকিগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল। একে কী বলে জানো ? বলে, ফেদার গ্যাদারিং।"

চন্দন আর তারাপদ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

"বুঝলে না ?" কিকিরা হেসে-হেসে রঙ্গ করে বললেন, "হাতের মুরগিটা যদি পালিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল আর তোমার হাতে থাকল পালক। তা হলে হলটা কী ? ফেদার গ্যাদারিং হল না ?"

চন্দন আর তারাপদ হেসে উঠল হো-হো করে।

মুখ টিপে হাসলেন কিকিরাও। চণ্ডী বাঁড়ুজ্যের বইয়ে এসব লেখা ছিল।"

"সে কে ?"

"ছিল একজন। তোমরা চিনবে না। মজার প্লে লিখত—তোমরা যাকে বলো নাটক। ফার্স-মাস্টার চণ্ডী।"

"ও !... তা এবার আসল কথাটা বলুন, শুনি।"

কিকিরা ঘাড় নেড়ে বললেন, "আপাতত ছোট করে শুনে নাও। বড় করে বলা যাবে না। কেননা, আমি নিজেই জানি না। কাজে হাত না লাগানো পর্যন্ত জানা যাবে না কী-কী হয়েছিল !"

"ছোট করেই বলুন।"

"ঘটনাটা ঘটেছে ঘাটশিলায়। সপ্তাহ তিনেক আগে। মে মাসে।"

ঘাটশিলাতেই এখন আছেন রত্নেশ্বরবাবু ?"

"না। এখন কলকাতায়। ঘাটশিলা থেকে কলকাতায় এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দিন পনেরো ছিলেন হাসপাতালে। কলকাতার হাসপাতাল— এক্সকিউজ মি চাঁদুবাবু— ভরসা করার মতন জায়গা আর নেই। তা ছাড়া ডাক্তাররাও বললেন, হাসপাতালে পড়ে থাকার চেয়ে বাড়ি নিয়ে যান। আমরা আর কোনো উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে কতদিন পড়ে থাকবেন তাও বলতে পারব না। বাড়িতে অন্তত দেখাশোনা, যত্ন আরও ভাল হবে। পরে যদি অসুবিধে হয়—আবার নিয়ে আসবেন হাসপাতালে।... তা রত্নেশ্বরের বাড়ির ডাক্তার সিনিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়িতেই এনে রেখেছেন।"

"বাড়িতে কতদিন ?"

"এই তো, দিন কয়েক মাত্র।"

"তারপর বলুন। ঘটনাটা যেখানে ঘটে— মানে, ঘাটশিলায় কী হয়েছিল ?"

কিকিরা সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে ফেলে দিয়েছিলেন আগেই। দু' হাতে মাথার বড়-বড় চুলগুলো গুছিয়ে নিতে-নিতে বললেন, "একটু গুছিয়ে বলি, না হলে বুঝবে না। প্রথম কথা, রত্নেশ্বরবাবুর জমি থাকলেও ঘাটশিলায় তাঁর নিজের কোনো বাড়ি ছিল না। তিনি নটুমহারাজের বাড়িটা ভাড়া করে নিয়েছিলেন। মাঝে-মাঝে যেতেন, দশ পনেরো দিন থাকতেন। ঘাটশিলা ওঁর খুব পছন্দসই জায়গা ছিল।"

"তবু নিজে বাড়ি করেননি ?"

"না। করব-করব ভাবতেন। করেননি। জমি তো কেনাই ছিল, সময় মতন করে ফেলব ভাবতেন। পরে মনে হয়, বাড়ি পরে হবে— আগে একটা ছোট হোটেল করা যাক। ব্যবসা ভাল হবে। বিজনেস্‌ম্যান তো ?"

তারাপদ বলল, "তা এবারে তিনি নটুমহারাজের বাড়িতেই ছিলেন..."

"হ্যাঁ, সেই বাড়িতেই ছিলেন। হোটেল-বাড়ির গোড়ার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। ভিত খোঁড়া সবে শেষ। এমন সময়—"

"ঘটনাটা ঘটল।"

"ইয়েস। ঘটনা ঘটল।"

"বলুন একটু ঘটনাটা।"

"একদিন সন্ধের মুখে রত্নেশ্বর বসার ঘরে বসে-বসে বাড়ির নকশাটকশা দেখছিলেন। এমন সময় কে যেন এসেছিল দেখা করতে। কথাবার্তা বলে সে চলে গেল। তার সামান্য পরে নটুমহারাজ ঘরে এসে দেখেন, রত্নেশ্বর চেয়ারসমেত উলটে মেঝেতে পড়ে আছেন। ওই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। বড় একটা টেবিল-বাতি, কেরোসিনের, জ্বলছিল। অন্ধকারই বেশি ঘরে। আলো আর কতটুকু !... নটুমহারাজ প্রথমটায় ধরতে পারেননি। পরে দেখলেন, রত্নেশ্বর অজ্ঞান। সাড়াশব্দ নেই। অবশ্য বেঁচে আছেন।"

"ডাক্তার ?" চন্দন বলল।

"ডাক্তার সেই বাজারের কাছে। লোক পাঠিয়ে আনানো হল।"

"কাছাকাছি কেউ ছিলেন না ?"

"চাঁদু, তোমরা ভাবো সব জায়গাই কলকাতা। অলিতে-গলিতে ডাক্তার। ঘাটশিলার মতন জায়গায় তুমি ক'জন ডাক্তার পাবে যে হাঁক মারলেই ছুটে আসবে।"

তারাপদ বলল, "তারপর ?"

কিকিরা বললেন, "রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে পরের দিন অনেক মেহনত করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান আনানো হল জামশেদপুর থেকে। সেই অ্যাম্বুলেন্সে করে সোজা কলকাতা। সঙ্গে ডাক্তারবাবু ছিলেন। রাস্তার মধ্যে বিপদ ঘটলেও ঘটতে পারত। ঘটেনি। কলকাতায় এনে সোজা হাসপাতালে।"

চন্দন বলল, "কাজটা খুব রিস্কি হয়েছে।"

"উপায় ছিল না।... তা ছাড়া ওঁরা কলকাতার মানুষ। কলকাতা ছাড়া ভরসা পান না।"

তারাপদ বলল, "কে দেখা করতে এসেছিল সেদিন ঘাটশিলায়?"

"সেটাই কেউ জানে না," কিকিরা বললেন।

"সে কী! কেউ জানে না মানে? কেউ দেখেনি?"

"একজন মাত্র দেখেছিল," কিকিরা বললেন, "একটা বাচ্চা মেয়ে। ডাকনাম, ফুটফুটি। রত্নেশ্বরবাবুর ভাইঝি। যজ্ঞেশ্বরের ছোট মেয়ে। সে তখন বড় বারান্দার একপাশে এসে লুকিয়ে বসে ছিল।"

"কেন?"

"তার মা তাকে জোর করে এক গ্লাস দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল বলে পালিয়ে এসেছিল।"

"মেয়েটির বয়েস কত?"

"বছর ছয়-সাত!"

"সে বলতে পারছে না কাকে দেখেছে?"

"লোকটা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় সে দেখেছে। তাও আবছা অন্ধকারে। ওই সময় কৃষ্ণপক্ষ চলছিল। বারান্দায় মাত্র হেরিকেন ছিল একটা।"

"কেমন দেখতে ছিল লোকটা?"

"ভূতের মতন। ফুটফুটি বলছে, ভূত!... আর কিছু বলতে পারছে না। আমি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে জানবার চেষ্টা করছি রোজই। পারছি না।"

তারাপদ খেলনাগুলোর দিকে তাকাল। "এগুলো কি ফুটফুটির জন্যে?"

কিকিরা হাসলেন।

চন্দন আর বসতে পারছিল না। উঠে পড়ল। তারাপদও।

২

পরের দিন খানিকটা বিকেল-বিকেলই এল তারাপদ। শনিবার। তার অফিস ছুটি হয় দুটো নাগাদ। অফিস থেকে সরাসরি আসেনি, হোটেলে নিজের আস্তানায় গিয়েছিল, খানিকটা জিরিয়ে স্নান সেরে জামাপ্যান্ট বদলে যখন বেরুচ্ছে— বৃষ্টি এসে গেল। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল, বাতাসে গন্ধ ছিল সোঁদা-সোঁদা, তবু বৃষ্টি আসেনি। এল বিকেলের দিকে।

জোর বৃষ্টি নয়। খানিকক্ষণ ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল; তারপরই বন্ধ। এবারে কবে যে ঠিক-ঠিক বর্ষা নামবে কে জানে!

কিকিরার বাড়ি আসতে-আসতে প্রায় ছ'টা। গরমের দিন, আকাশ

মেঘলা— তবু আলো মরে যায়নি।

আগের দিন আর বসে থাকার উপায় ছিল না তারাপদদের। চন্দনের কাজ ছিল কয়েকটা, রাত্রের আগেই সেরে রাখতে হবে—সকালেই তার ট্রেন। কাল আসছি, বাকি সব শুনব— বলে উঠে পড়েছিল তারাপদ।

চন্দন যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল, কিকিরা আমি তো থাকছি না। সাতদিন ধরে আমার পেট ফুলবে। তবু একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যাই। ভাল করে না বুঝে হাত বাড়াবেন না। হাসপাতালের কেস নিয়ে অনেক সময় গণ্ডগোল হয়।

কিকিরা মাথা নেড়েছিলেন।

তারাপদ এসে দেখল, কিকিরা বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন।

"বেরুচ্ছেন নাকি ?"

"তোমার জন্যে বসে আছি। চাঁদু চলে গিয়েছে ?"

"সকালেই যাওয়ার কথা।"

"চলুন। যাবেন কোথায় ?"

"রত্নেশ্বরের বাড়িতে।"

"সেটা কোথায় ?"

"এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাও ? হরিশ মুখার্জি..."

"ও ! খেয়াল ছিল না। চলুন।"

"ছাতা কোথায় ?"

তারাপদ হাসল। "নেব ভেবেছিলাম। তারপর দেখলাম বৃষ্টি থেমে গেল।"

কিকিরা হেসে-হেসে বললেন, "কী দেখলে সেটা বড় কথা নয়, কী হতে পারে সেটাও দেখবে। এখন বর্ষাকাল। এক পশলা হয়ে গেছে বলে আর যে হবে না— তুমি জানলে কেমন করে ? ভগবান নাকি !"

"আপনারটা থাকবে, তাতেই হয়ে যাবে—" হাসল তারাপদ।

কিকিরা বললেন, "এক ছাতায় দুটো মাথা... ! বেশ, চলো।"

নিচে এসে তারাপদ এগিয়ে যাচ্ছিল, কিকিরা বললেন, "দাঁড়াও। ওই দেখো— একটা ট্যাক্সি। ওই যে— ! গাছের তলায়। ওটাকে ধরো। যাবে মনে হচ্ছে।"

তারাপদ ট্যাক্সি ধরতে এগিয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে তারাপদ বলল, "খেলনাগুলো নিয়েছেন দেখছি।"

প্লাস্টিকের পাতলা ব্যাগের মধ্যে খেলনাগুলো নিয়েছিলেন কিকিরা। দেখাই যাচ্ছিল। কিকিরা মাথা নাড়লেন। নিয়েছেন।

সামান্য পরে তারাপদ বলল, "স্যার, কাল রাত্তিরে শুয়ে- শুয়ে ভাবছিলাম

ঘটনাটা। ধাঁধা লাগছিল। অনেক কথা শোনাও হয়নি, কাজেই বুঝতে পারছিলাম না।”

“তা ঠিকই। কাল আর সব কথা বলা হল কোথায় ?”

তারাপদ বলল, “কী নাম বলছিলেন যেন ! নটুমহারাজ ! তাই না ?”

“হ্যাঁ।”

“তিনিই প্রথম, যিনি রত্নেশ্বরবাবুকে চেয়ার উলটে পড়ে থাকতে দেখেছেন ?”

“হ্যাঁ।”

“নটুমহারাজ লোকটি কে ? সাধুসন্ন্যাসী ?”

“আমি তো তাঁকে দেখিনি। খবরাখবর করেছি। তাতে জেনেছি, নটুমহারাজ গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী নন। তাঁর কোনো আখড়া, আশ্রম নেই। নিজের সংসার বলতেও নেই কিছু। ঘাটশিলায় অনেকদিন আছেন। লোকাল লোকও বলা যায়। একা থাকেন। একটি কাজের লোক আছে।”

“নটুমহারাজের বাড়ি আছে না ঘাটশিলায় ? আপনি কাল বলছিলেন, রত্নেশ্বর সেই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ওখানে !”

“হ্যাঁ, নটুমহারাজের বাড়ি আছে। বাড়ির সামনের দিকটা তিনি রত্নেশ্বরকে ভাড়া দিয়েছিলেন। বরাবর তাই দিতেন। চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন থেকে। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।”

“নিচে তিনি কোথায় থাকতেন ? বাড়ির সামনের দিক ভাড়া দিতেন বলছেন— তার মানে বাড়ির পেছন দিক ছিল ?”

“পেছন দিকে একটা আউট হাউস মতন আছে। সেখানেই বরাবর থাকেন নটুমহারাজ।”

“আসল বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আউট হাউসে থাকেন কেন ?”

“একা মানুষ। অল্পতেই হয়ে যায়। আসলে বাড়িটা ভাড়া খাটান। সেইরকমই শুনলাম। নিজেরা গিয়ে কথা বললে বুঝতে পারব।”

“ও ! তা হলে—সামনের দিকটা, বড় বাড়িটা, নটুমহারাজ ভাড়া খাটানোর জন্যে রেখে দিয়েছেন ! অন্য ভাড়াটেরাও ভাড়া নিতে পারত তা হলে !”

“পারত। তবে রত্নেশ্বরই বেশি নিতেন। বছরে দু-তিনবার। পুজোয় আর শীতে তো বাঁধা। মাঝে-মাঝে বর্ষায়। অন্য সময় কে আর ঘাটশিলায় ঘর ভাড়া নিয়ে বেড়াতে যাবে !... তুমি কখনো ঘাটশিলায় গিয়েছ ?”

“না।”

“আমি একবার গিয়েছিলাম। দশ-বারো বছর আগে। তার বেশিও হতে পারে। আমার এক শিষ্য গিয়েছিল শো দেখাতে। ধরে নিয়ে গিয়েছিল। একটা রাতই ছিলাম। নো আইডিয়া স্যার। তবে জায়গাটা ভাল শুনি।”

“আমিও শুনেছি।”

"এবার চলো, ভাল করে দেখা যাবে।"

তাকাল তারাপদ। "আপনি ঘাটশিলায় যাচ্ছেন ?"

"যাচ্ছি বইকি ! না গেলে হয় ! ঘটনা যেখানে ঘটল সেখানে না গিয়ে, না দেখে, খোঁজখবর না করে জানব কেমন করে কী হয়েছিল।...আসছে শুক্রবারেই যাব ঠিক করেছি। ক'দিন ছুটি নিয়ে নাও অফিস থেকে। সেভেন ডেজ্... !"

তারাপদ কোনো কথা বলল না।

ট্যাক্সিঅলার হাত ভাল নয়। ছোকরা ট্যাক্সিঅলা বাঙালি। বড় এলোমেলো গাড়ি চালাচ্ছিল। সামনের রাস্তা যেন শুধু তার। বেপরোয়াভাবে অন্য গাড়িকে কাটাচ্ছিল, মানুষজন মানছিল না। একবার ট্রাফিক সিগন্যালও না মেনে এগুতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশের ধমকানি খেল।

কিকিরা সবই নজর করছিলেন। তারাপদকে ইশারায় বললেন, লাইসেন্স নেই বোধ হয়।

তারাপদ মুচকি হাসল।

পকেট থেকে চুরুট বার করে কিকিরা ড্রাইভারকে বললেন, "ও ভাই, তুমি ট্যাক্সিও চালাও ?"

ড্রাইভার ছেলেটি বুঝল না।

কিকিরা তার পিঠে কাঁধের ওপরে হাত রেখে চাপ দিলেন। "তুমি ট্যাক্সিও চালাও ?"

ড্রাইভার ছোকরা একবার ঘাড় ঘোরাল, "কেন দাদু ?"

"তোমাকে মিনিবাসেও দেখেছি।"

"মিনিবাসে ?"

"দেখিনি ?"

"মিনিবাস আমি চালাই না।"

"তা হলে ভুল হয়ে গেল ! তোমার হাত একেবারে মিনিবাসের পাকা হাত।"

ছোকরা ড্রাইভার কিছুই বুঝতে পারছিল না। খানিকটা দোনামোনা অবস্থায় স্পিড কমিয়ে ফেলল। "আপনার কি মিনিবাসের কারবার দাদু ?"

চুরুট ধরাবার চেষ্টা করছিলেন কিকিরা। বললেন, "না, আমার নিজের কোনো মিনি কারবার নেই। তিনি নিয়ে থাকি। তা আমার এক বন্ধুর মিনি আছে। বেলতলার লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টের ঘটকবাবু। তিনি একজন ভাল ড্রাইভার খুঁজছিলেন।"

বেলতলার নামেই হোক কি লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টের ভয়েই হোক ছোকরা চট করে নিজেকে সামলে নিল।

কিকিরা চুরুট ধরিয়ে নিয়েছেন ততক্ষণে।

"দাদু। আমার এক ভাই আছে। যমজ ভাই। সে মিনিবাস চালাতে পারে। মাঝে-মাঝে কন্ডাক্টারি করত। করতে- করতে হাত বানিয়ে ফেলেছে। লাইসেন্স নেই। আপনি তাকে লাগিয়ে দিন না। লাইসেন্সও হয়ে যাবে।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন।

তারাপদ চোখে-চোখে বলল, নিন, এবার বুঝুন ! চালাকি করছিলেন—ধরা পড়ে গেলেন।

কিকিরা কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। "তোমরা যমজ ?"

"আমি আট ঘণ্টার বড়। কাশী ছোট। দাদু, কাশী বি-কম পড়ে। ফুটবল খেলে।"

কিকিরা কেমন যেন লজ্জা পেলেন। ঠাট্টা করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছেন। "তুমি—মানে তোমার নাম তা হলে কী ! ছোট হল কাশী, তুমি তবে কী নিশি না শশি ?"

"কুশি।"

"কুশি ! মানে কী হে !"

"মানে জানি না। বলে, ছোট-ছোট আম। কচি আম !"

"বাঃ !... তুমি লেখাপড়া করোনি ?"

"স্কুল ফাইনাল। চারবার। মাথা মোটা দাদু। কাশী খুব বুদ্ধিমান। বেরেন আছে।"

কিকিরা আপাতত আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, "শোনো হে কুশিবাবা ! আজ আমি যেখান থেকে উঠলাম তোমার ট্যাক্সিতে, তার কাছেই আমার বাড়ি। একদিন সকালবেলায় চলে এসো, গল্প করব। এখন আমাদের নামিয়ে দাও, এসে গিয়েছি।"

সামান্য এগিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়াল।

ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লেন কিকিরা।

দশ-বিশ পা এগিয়ে কিকিরা বললেন, "তারাপদ, তুমি অবাক হচ্ছ ?"

চুপ করে থাকল তারাপদ।

কিকিরা বললেন, "এরকম অনেক পাবে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যাক্ গে, আজ একটা ভাল ছেলের সঙ্গে আলাপ হল।"

বড় রাস্তা থেকে একটু গলির মধ্যে রত্নেশ্বরের বাড়ি। কিকিরা গলিতে ঢুকলেন।

তারাপদ বলল, "আপনি একটা কথা আমায় বলেননি। ঘাটশিলার বাড়িতে তখন কারা ছিলেন রত্নেশ্বরের সঙ্গে ? তাঁর ফ্যামিলি !"

কিকিরা বললেন, "রত্নেশ্বরের একটি মেয়ে— বিয়ে হয়ে গেছে। সে দূরে থাকে, কানপুরে। বাবাকে দেখতে এসেছিল। ফিরে গেছে আবার। রত্নেশ্বরের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ভদ্রলোককে দেখাশোনা করে ছোট ভাই

যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী। যজ্ঞেশ্বরের বড় মেয়ে থাকে আসানসোলে। স্কুলে পড়ায়। ছেলে কলেজে পড়ে। ছোট মেয়ে ফুটফুটি হল রত্নেশ্বরের প্রাণ। উনি যখনই ঘাটশিলায় যান, ভাইয়ের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সঙ্গে যায়। এবারে ছেলে যায়নি। ফুটফুটি আর তার মা সঙ্গে ছিল।"

"অন্য কেউ?"

"কাজের লোকজন। কলকাতার বাড়ি থেকে দু'জন সঙ্গে গিয়েছিল। একজন রান্নার লোক, মেয়ে। আর অন্যজন ফাই-ফরমায়েশ খাটার। কমলা আর গুরুচরণ।"

"আর কেউ না?"

"না। তবে কলকাতা থেকে একজন যেত মাঝে-মাঝে। কর্মচারী ধীরুবাবু। ঘটনার দিন ধীরুবাবু ছিলেন না।

কথা শেষ হওয়ার আগেই রত্নেশ্বরের বাড়িতে পৌঁছে গেল তারাপদরা।

বাড়িটা পুরনো। অন্তত শ'... বছরের তো হবেই। সেকালের ছাঁদছিরি থেকেই বোঝা যায় সেটা। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। সামনে সদর। সদর পেরুলেই ফাঁকা জমি খানিকটা। গাছপালা কয়েকটা। সামনে বারান্দা। বারান্দায় বড়-বড় তিন-চারটে ফুলের টব। দুটো টবে পাতাবাহার, ঝাঁকড়া হয়ে রয়েছে। সামনে বারান্দা। ডান পাশেও বারান্দা। বারান্দার গায়ে-গায়ে ঘর। সামনের বারান্দার বড় ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বাড়িটা দোতলা।

বারান্দায় মাত্র একটা বাতিই জ্বলছিল।

সামনের ঘরটা বসার ঘর। কিকিরাদের পায়ের শব্দে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। "আসুন রায়বাবু!" বলে তারাপদর দিকে তাকালেন।

কিকিরা বললেন, "একটু দেরি হয়ে গেল। চলুন— !"

বসার ঘরের আলো উজ্জ্বল নয়। টিউব লাইট ছিল— কিন্তু জ্বালানো হয়নি।

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। "তারাপদ, ইনি লালাবাবু। আমার পুরনো বন্ধু। দেখেছ হয়ত।... আর লালাবাবু, এ হল তারাপদ। আমার ডান হাত। আরও একজন আছে, চন্দন। ডাক্তার। সে অবশ্য আসতে পারল না। আজ বাড়ি চলে গিয়েছে। দিন সাতেক পরে ফিরবে।"

লালাবাবু বসতে বললেন কিকিরাদের।

তারাপদ লালাবাবুকে দেখছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কি কোনোদিন আলাপ হয়েছে কিকিরার বাড়িতে? মনে পড়ল না। তবে এমন হতে পারে, একদিন সে যখন কিকিরার বাড়ি যাচ্ছিল, ভদ্রলোককে সিঁড়িতে দেখেছে। হয়ত উনি কিকিরার সঙ্গে গল্পগুজব সেরে ফিরে যাচ্ছিলেন। তারাপদ কৌতূহল বোধ করেনি তখন।

কিকিরা বললেন, "কেমন আছেন রত্নেশ্বরবাবু?"

"সেই একই রকম। রতনদাকে খাওয়ানোই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু' চামচ করে গলানো খাবার আর লিকুইড খাইয়ে কতদিন আর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব!"

"ডাক্তাররা কী বলছেন?"

"সেই একই কথা। ভগবানের ওপর ছেড়ে দিন। এইভাবেই পড়ে থাকতে-থাকতে যদি নিজের থেকেই সারভাইভ করতে পারেন খানিকটা, হয়ত পরে কোনো সময়ে দেখবেন, হাত-পাও নাড়তে পারছেন একটু-আধটু। কিছুই বলা যায় না।"

"বুঝেছি।"

"বড় কষ্ট রায়বাবু। একটা ছটফটে মানুষ ওইভাবে বিছানায় পড়ে আছে দিনের পর দিন, এ আর সহ্য হয় না।"

কিকিরা ঘাড় নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারেন সবই। বললেন, "তা লালাবাবু, আমরা যে সামনের শুক্রবার ঘাটশিলায় যাব ভাবছি।"

"বেশ তো। আপনি তো আগেই বলছিলেন।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন?"

"দরকার হলে নিশ্চয় যাব। কিন্তু আমি গেলে এখানে দেখাশোনা করবে কে?"

"যজ্ঞেশ্বর। আরও লোক তো আছে।"

"তা আছে। তবে কী জানেন রায়মশাই, অন্য সময়ে এখানকার ঘরবাড়ি, সংসার সামলানোয় কোনো ঝামেলা ছিল না। আগে কতবার কেউ না কেউ সামলেছে। এবারে বেশ ঝামেলা হবে। রতনদাকে সবসময় নজরে রাখা, ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ...। আমাকেই এ-সব করতে হয়। যজ্ঞেশ্বরটা ভিতু। নার্ভাস!"

কিকিরা বললেন, "সবই বুঝি। তবে অসুবিধে হচ্ছে, আপনি সঙ্গে না গেলে—আমরা কাজে হাত দেব কেমন করে! কাউকে চিনি না। অন্য পাঁচটা দরকার হতে পারে। আপনার যাওয়া জরুরি। ...আপনি চলুন। আমাদের সব দেখিয়ে-শুনিয়ে, বুঝিয়ে না হয় ফিরে আসবেন। কলকাতা থেকে ঘাটশিলা বেশি দূর নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আপনি দরকার মতন আসা-যাওয়াও করতে পারেন।"

লালাবাবু আপত্তি করলেন না।

তারাপদ লালাবাবুকে দেখছিল। চেহারায় আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। গোলগাল গড়ন, গায়ের রং ফরসা, মাথায় চুল কম, টাকই বেশি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। নাক মোটা। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার।

কিকিরা বললেন, "ফুটফুটি কোথায়?"

"ডাকব?"

"জেগে আছে, না, ঘুমিয়ে পড়েছে ?"

"না না, এত তাড়াতাড়ি ঘুমোবে কী ! ওকে বিছানায় ফেলতে ফেলতে ন'টা বেজে যায়। ভীষণ চঞ্চল, দুষ্টু। খানিকটা আগে ওর মায়ের সঙ্গে ফ্রুটি খাওয়া নিয়ে চেল্লাচিল্লি করছিল।"

"তা হলে ডাকুন একবার।"

লালাবাবু চলে গেলেন।

তারাপদ অনেকক্ষণ থেকেই ঘরটা নজর করছিল। ঘর বড়। দরজা-জানলাও পোক্ত। সেকেলে বাড়ির মতনই সব। ঘরের আসবাবপত্র পুরনো ধরনের। ভারী সোফা সেটি, আর্ম চেয়ার একপাশে, কোণের দিকে অ্যাকুইরিয়াম, মাছ, জল কিছুই নেই, ফাঁকা পড়ে আছে, দরজার গা-ঘেঁষে পাতাবাহারের একটা টব। দেওয়ালে দু-তিনটি ছবি, মায় একটা বড়সড় ক্যালেন্ডার।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "স্যার, আপনি অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন ?"

"বলেছি। যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রীর কাছে আলাদা খবর পেলাম না কিছুই। মহিলা যেন মরে আছেন। কথা বলবেন কী, কাঁদেন শুধু।"

"যজ্ঞেশ্বর ?"

"সে কেমন হতভম্ব হয়ে রয়েছে। ভিতুই হয়ত। তবে সে মনে করে না—দাদাকে কেউ খুন করতে গিয়েছিল।"

"আর সেই খুড়তুতো ভাই ?"

"নিমাই। বেলেঘাটার কারখানা দেখত। এই বাড়িতেই থাকত এতদিন, এখন বেলেঘাটাতেই থাকে।"

"ও না এ-বাড়ির আশ্রিত ছিল ?"

"আশ্রিত তো বটেই। তবে হালে অন্য জায়গায় থাকছে। কাজকর্ম দেখার সুবিধে হবে বলে।"

"সে কী বলে ?"

"খুন করার চেষ্টা বলে সে সন্দেহ করে না।"

"কেমন লোক ?"

"দেখতে নিরীহ। তবে বোকা নয়।"

"বাসের কারবার যে দেখত— !"

"আনন্দ। সেটা একেবারে বক্কেশ্বর। টকিং মুখ্যু। অনবরত কথা বলে আর কান চুলকোয়। চেহারাটা যণ্ডামার্কা। মুখ্যু হলেও গোবেচারা নয়।... তা সেও খুনটুনের ব্যাপার বলে মনে করে না।"

"তা হলে ?"

"তা হলে আর কী ! আমি জনে-জনে জিজ্ঞেস করেছি। ধীরুবাবুকে, গুরুচরণকে, কমলাকে। তারা কেউ বলেনি, বাড়ির কর্তাকে কেউ খুন করার

চেষ্টা করেছিল।"

"শুধু লালাবাবু সন্দেহ করেছেন ?"

"লালাবাবু আর নটুমহারাজ। এঁরা দু'জনই অন্য সন্দেহ করছেন। তবে লালাবাবুর প্রথমটায় সন্দেহ হয়নি, নটুমহারাজই মাথায় ঢুকিয়েছেন। নটুমহারাজকে আমি দেখিনি। কথাবার্তাই বা বলব কেমন করে ? ঘাটশিলায় না-যাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। চোখে দেখি, কানে শুনি—তারপর..."

এমন সময় লালাবাবু এলেন। সঙ্গে ফুটফুটি।

ফুটফুটিই বটে ? দেখতে বড় সুন্দর। তবে রোগা। গায়ের রং, গড়ন, চোখমুখে যেন খুঁত নেই। গায়ে পাতলা ফ্রক। মাথার চুল বব করা। বয়েস যে সাতটাত হবে— তা বোঝা যায়।

কিকিরার সঙ্গে ফুটফুটির বেশ আলাপ। এসেই ফুটফুটি বলল, "কী এনেছ ? আমার ফটাফট আননি ?"

কিকিরা পকেট থেকে খেলনাগুলো বার করে কাছে ডাকলেন। "এই যাঃ ! ফটাফট তো ভুলে গিয়েছি পিসিমণি !"

"পিসিমণি বলবে না।"

"মাসিমণি ?"

"না।"

"তা হলে মণি।"

"ফুটফুটি বলবে।" বলতে-বলতে এগিয়ে এসে খেলনাগুলো নিল।

ফুটফুটি যখন খেলনা দেখছে, ভেতর থেকে চা এল।

কিকিরা এবার একটা চকোলেটের প্যাকেট বার করে ফুটফুটিকে দিলেন। বললেন, "ম্যাজিক দেখবে ?"

"দেখব !"

কিকিরা বললেন, "আমি ওপরের দিকে হাত তুলব—আর একটা করে টফি চলে আসবে।"

"কই দেখি ?"

কিকিরা হাত তোলেন মাথার ওপর, আর একটা করে টফি বার করেন মুঠো থেকে।

ফুটফুটি খেলনা ভুলে ম্যাজিক দেখছে। যত অবাক, তত খুশি।

কিকিরা হাতের চার-পাঁচটা টফি ওর ছোট্ট-ছোট্ট হাতে গুঁজে দিলেন।

"কে তোমায় টফি দিল ?" ফুটফুটি জিজ্ঞেস করল।

"ভূত !"

"যাঃ !" ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল ফুটফুটি।

"কেন ?"

"ভূত আবার টফি দেয় নাকি ?"

"চাইলেই দেয়। সেদিন তুমি যে-ভূতটাকে দেখেছিলে তার কাছেও টফি ছিল।"

"মিথ্যে কথা।"

"কেন ! ভূতটার কাছে তুমি কি টফি চেয়েছিলে ?"

"বাব্বা ! আমার বুঝি ভয় করে না। সে দৌড়ে চলে গেল।"

"বড় ভূত নাকি ?"

"অ্যাত্ত বড়।" বলে ফুটফুটি ওপর দিকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করল ভূতটা কত লম্বা ছিল।

কিকিরা বললেন, "ভূতের মুখটা কেমন দেখতে ছিল ?"

"বিচ্ছিরি।"

কিকিরা তারাপদর দিকে আড়চোখে তাকালেন একবার। তারপর ফুটফুটিকে বললেন, "কী পরে ছিল মনে আছে ? ভূতরা ধুতি পরলে একরকম, প্যান্ট পরলে আর-একরকম।"

ফুটফুটি যেন মনে করবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, "প্যান্ট।"

"ঠিক বলছ ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি একলাই দেখলে ? আর কেউ ছিল না কাছে ?"

"না।"

কিকিরা বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাও !"

ফুটফুটি চলে গেল।

চায়ের কাপ তুলে নিতে-নিতে কিকিরা এবার বললেন, "লালাবাবু—, ঘাটশিলায় না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই আন্দাজ করতে পারছি না। আর দেরি করা উচিত নয় আমাদের। শুক্রবারই চলুন।"

৩

ঘাটশিলায় নটুমহারাজের বাড়িটি দেখতে-দেখতে কিকিরা বললেন, "কেমন দেখছ তারাবাবু ?"

তারাপদর ভালই লাগছিল। আগের দিন রাত্রের দিকে তারা এসেছে। একেবারে নতুন জায়গা বলে তারাপদ ঠিক ধারণাও করতে পারেনি স্টেশন থেকে কত দূর, বা এটা স্টেশনের কোন দিকে পড়েছে।

নটুমহারাজের বাড়িতেই তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই বাড়ি—যেখানে রত্নেশ্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন হঠাৎ, কিংবা তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়। তা এই বাড়িতে সব ব্যবস্থাই আছে। রত্নেশ্বর ঘাটশিলায় এসে বরাবর এই

বাড়িতে উঠতেন বলে বাড়িটাকে মোটামুটি গুছিয়ে রেখেছিলেন। শোওয়া-বসা-খাওয়া—কোনো কিছুরই ভাবনা-চিন্তা করতে হত না। সবই ছিল, গোছানো থাকত। আর এবার, যেহেতু রত্নেশ্বর অনেকদিন থাকবেন, একটানা না পারলেও প্রায়ই থাকবেন, হোটেল তৈরির কাজকর্ম দেখবেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, নটুমহারাজের বাড়িটা আপাতত বছরখানেকের জন্য ভাড়া নেওয়া ছিল। সেই ভাড়া এখনো নেওয়া রয়েছে।

একেবারে ভোর-ভোর উঠে পড়েছিল তারাপদ। উঠে দেখল, কিকিরা আরও আগে-আগে উঠে পড়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

চোখমুখ ধুয়ে নিয়ে তারাপদ বাইরে গেল। কিকিরার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

কিকিরা বললেন, "কেমন ঘুম হল হে ?"

"নতুন জায়গা, মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। পরে কখন..."

"হয় ওরকম। তা কেমন দেখছ তারাবাবু ?"

খারাপ লাগার কথা নয়, ভালই লাগছিল তারাপদর। একেবারে ভোরের দিক। সবে সূর্য উঠেছে। আকাশময় রোদ ছড়িয়ে পড়েনি, আলো হয়ে রয়েছে অবশ্য, মাটিতেও রোদ নেই সর্বত্র, ভোরের ভাবটুকু মাখানো আছে ছোট-ছোট গাছপালায়, বাগানে, মাঠে। এখন যদিও আষাঢ়, তবু কোথাও মেঘ দেখা যাচ্ছিল না আকাশে। গরমকালের সকাল। দেখতে-দেখতে রোদ অবশ্য চড়ে যাবে। তবে আপাতত বাতাস ঠাণ্ডা, চারপাশ বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল।

তারাপদ বলল, "জায়গাটা বেশ তো ! পাহাড়ি ধরনের।"

"সামনেই নদী, সুবর্ণরেখা।"

"কই ?"

"ফটকের বাইরে গিয়ে খানিকটা এগুলেই দেখতে পাবে।"

"আপনি দেখেছেন ?"

"আমার তো একটা সারকেল হয়ে গেল। আলো ফোটার আগেই উঠে পড়েছি।"

"উঠে সারকেল দিচ্ছিলেন ?" তারাপদ হেসে বলল।

কিকিরা মাথা নাড়লেন।

"স্টেশন থেকে কতটা দূর, কিকিরা ?"

"খুব বেশি নয়। বাজার-স্টেশন তো গায়ে-গায়ে। এই বাড়িটা ধরো হাঁটাপথে বিশ-পঁচিশ মিনিট। সামান্য বেশিও হতে পারে।"

"বাড়িটা বেশ নিরিবিলি জায়গায়। কাছাকাছি আর বাড়িও দেখছি না।"

"আছে। ওই তোমার ওদিকে দুটো বাড়ি আছে। ছোট। একটা শুরু হওয়ার পর আর শেষ করা হয়নি, সিকি-ফিনিশ্‌ড। আর-একটা আছে, কটেজ ধরনের। খুবই ছোট।"

"তা হলেও ফাঁকা। নিরিবিলি।"

"তা তো হবেই। ঘাটশিলায় কে আর এদিকে ঘিঞ্জির মধ্যে বাড়ি করতে চাইবে?"

কিকিরা আর তারাপদ হাঁটতে লাগলেন। পায়চারি করার মতন ধীরে-ধীরে।

তারাপদ বলল, "এই বাড়িটা আপনি দেখেছেন ভাল করে?"

"না। তবে আইডিয়া পেয়েছি। হাফ্-বাংলো টাইপের বাড়ি। সামনে টানা বারান্দা, ডান পাশে বসার ঘর। বাঁ পাশে একটা ভেতর-ঘর। অন্দরমহল পেছন দিকে। গোটা দুই ঘর থাকতে পারে। রান্না, খাওয়ার ঘর পেছন দিকে। পেছনের বারান্দা ঘেরা রয়েছে জাফরি দিয়ে।"

"আবার কী! ভালই। গাছপালাও তো যথেষ্ট।"

"যথেষ্ট মানে? এ একেবারে জঙ্গল। বড়-বড় গাছই চার পাঁচটা, ঝোপঝাড়, জঙ্গলা বাগান।... নো ক্লিনিং, নো গার্ডেনিং, বুঝলে।" কিকিরা হেসে-হেসে বললেন।

তারাপদ অস্বীকার করতে পারল না। বাড়ির সামনে পাশে গাছপালা যেন বড় বেশি। বাগান নিয়েও কেউ মাথা ঘামাত না। জঙ্গল হয়ে আছে।

"লালাবাবু এখনও ঘুমোচ্ছেন নাকি?" তারাপদ বলল।

"বোধ হয়।"

"স্যার, ওই যে বসার ঘর। এখানেই তো ঘটনাটা ঘটেছে।"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "হ্যাঁ।"

"ঘরটা আমরা কখন দেখব?"

"সকালেই দেখব।"

তারাপদর কী মনে হল, বলল, "স্যার, এতদিন পরে ঘরটা দেখে কি কিছু আন্দাজ করা যাবে?"

কিকিরা মাথা দোলালেন। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "কথাটা ঠিকই তারাপদ! ওঁরা তো বলছেন, ঘটনাটা ঘটার পর প্রথম দু-একদিন সকলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল—তখন কেউ আর ওই ঘরটা নিয়ে মাথা ঘামাতে বসেননি। পরে নটুমহারাজ ঘরের জানালা বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দেন। লালাবাবুকেই শুধু একবার ঘরটা দেখিয়েছিলেন তালা খুলে।"

তারাপদ পাকা গোয়েন্দার মতন বলল, "সার, ধরুন যদি এটা কিলিং-ই হয়, দু'দিনে কেন, দু'ঘণ্টার মধ্যেও প্রমাণ লোপাট হয়ে যাওয়ার কথা।"

"বিলকুল সহি বাত—বিলকুল—!" কিকিরা মজা করে বললেন, হিন্দিতে। তারপর একটু থেমে বললেন, "তবে একটা কথা। বেড়ালেরা সব সময় ইঁদুর চোখে দেখে না, কিন্তু গন্ধ পায়। আমাদেরও নাকের পাওয়ার বাড়াতে হবে। স্মেলিং করতে হবে হে তারাবাবু! লাইক এ ক্যাট।"

"আমার নাক কিন্তু ভোঁতা," তারাপদ বলল মজার গলায়।

"আমার নাক খাড়া ছিল। যৌবনকালে। তারপর হক্সনসাহেবের সঙ্গে পাঁচ রাউন্ড বক্সিং লড়লাম। বেটা এমন পাঁচ সাতটা পাঞ্চ দিল নাকে—যে অমন খাড়া নাকের হাড় ভেঙে সামান্য বসে গেল। নয়ত দেখতে স্মেলিং কাকে বলে!"

তারাপদ হেসে উঠল। "হক্সনসাহেবটি কে?"

"সান অব অ্যান্ডারসন, ব্রাদার অব জনসন। হক্সন আমার বন্ধু ছিল। এমনিতে বরফকলের মালিক, সোডা-লেমনেডের কারখানাও ছিল। টেরিফিক হকি প্লেয়ার, আবার শখের ম্যাজিশিয়ান। জাপানি খেলা দেখাত। ভেরি গুড ফ্রেন্ড।"

"তবু আপনার নাকে ঘুষি মারল...তারাপদ হাসছিল।

"সে তো বেটিং লড়তে গেলে অমন হয়। না পারলে মার খাবে। মার খেলেও হাত-পা ছড়িয়ে নো চিতম্... !"

"নো চিতম্! মানে?" তারাপদ অবাক।

"মানে, হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকবে না। আবার উঠে পড়বে হে!"

তারাপদ হো-হো করে হেসে উঠল।

কিকিরা বললেন, "ধরো এই যে কেসটা আমরা হাতে নিতে যাচ্ছি—এটাতে তো হারতেই পারি, একেবারে চিত হয়ে পড়ে গেলাম। তা বলে কি বুক চাপড়ে হায় হায় করব! নো। নেভার।" বলতে-বলতে কিকিরা চোখের ইশারায় কী যেন দেখালেন।

তারাপদ তাকাল। নটুমহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন, সামান্য তফাতে। তাঁর বাড়ির কাছে, কুয়াতলার পাশেই।

এই বাড়িটার খানিকটা পেছনে—লম্বা টানা ছোট মতন এক বাড়ি। কোনো বাহারি ভাব নেই, একেবারে সাদাসিধে। তবে পাকা দালান। সামনে বারান্দা। পেছনে দুটো ছোট-ছোট ঘর। একপাশে সরু গলি মতন। বোধ হয় পেছনে এক-আধটা ঘর আছে। এইটেই এ-বাড়ির আউট হাউস। নটুমহারাজের আস্তানা।

কাল রাত্রেই, এখানে আসার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। লালাবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য নিছক পরিচয়ই। কথাবার্তা বলার সুযোগ বা সময় তখন ছিল না।

নটুমহারাজ মানুষটিকে দেখলে মহারাজ বলে মনে হয় না। গেরুয়ার কোনো চিহ্ন নেই বেশবাসে। সাদা ধুতি, গায়ে ফতুয়া, একটা পাতলা চাদর—এই হল তাঁর বেশ। পায়ে মামুলি চটি। মাথার চুল বড়-বড়, মেয়েদের মতন; চুলগুলো ঝুঁটি করে মাথার ওপর বেঁধে রাখেন। গোঁফ-দাড়ির জন্য

মুখটা ভাল করে দেখা যায় না। নাক, চোখ, কপালই যা চোখে পড়ে।

মহারাজের চেহারাটি রোগা। তবে পোক্ত। মাথায় বেশ লম্বা। গায়ের রং তামাটে।

কিকিরা তারাপদকে ইশারায় এগুতে বলে কুয়াতলার দিকে পা বাড়ালেন।

নটুমহারাজও এগিয়ে এলেন।

কিকিরা দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন মহারাজকে। "নমস্কার মহারাজ !"

এগিয়ে এসে নটুমহারাজও নমস্কার জানালেন দু'জনকেই।

"এর মধ্যেই উঠে পড়েছেন ?" নটুমহারাজ বললেন।

"অনেকক্ষণ। আমি আগেই উঠেছি, তারাপদ একটু আগে উঠল !... ভোরে-ভোরে পায়চারি করছিলাম খানিকটা। বড় ভাল লাগছিল। ফ্রেশ বাতাস, ফাঁকা জায়গা—, পায়ের তলায় ঘাস—এ-সব আর আমাদের কলকাতায় কোথায় পাব বলুন ? আপনি বোধ হয় ভোরে ভোরেই ওঠেন ?"

"অভ্যেস বরাবরের। স্নান করে নিচ্ছিলাম।"

"এত তাড়াতাড়ি ?"

নটুমহারাজ মাথা নোয়ালেন। "সকালেই কুয়াতলায় দাঁড়িয়ে স্নানও সেরে ফেলি। এখন গরমকাল। আরাম পাই। শরীর ঠাণ্ডা থাকে। বিকেলেও একবার সারতে হয়। এখানে দুপুরটায় গরম পড়ে। সন্ধের পর আর অতটা গরম থাকে না।"

"বৃষ্টি কেমন হচ্ছে মহারাজ ?"

"গত হপ্তায় দিন দুই ভালই হয়েছিল। সবেই বর্ষা পড়ল।"

"কলকাতায় এখনো বর্ষা নামল না। কবে নামবে কে জানে !"

"লালাবাবু ওঠেননি !"

"দেখতে তো পেলাম না।"

"চা খেয়েছেন ?"

"না।"

"আমি দেখছি ! গুরুচরণ..."

"আরে না না, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।"

কিকিরাদের সঙ্গে কলকাতা থেকে গুরুচরণও এসেছে। রান্নাবান্না, চা, জলখাবার তারই করার কথা। গতকাল রাত্রে এখানে এসে পৌঁছবার পর অবশ্য কলকাতার বাড়ি থেকে আনা খাবারদাবার খেতে হয়েছে। না আনলেও চলত, এখানে স্টেশনের কাছে আশেপাশে খাবারের দোকান কম নেই।

নটুমহারাজ বললেন, "তা এক কাজ করুন না। আমার ডেরায় গিয়ে বসবেন চলুন। দশ-পনেরো মিনিট। সেখানেই না হয় এক পেয়ালা চা খাবেন..."

কিকিরা বললেন, "আপনি এখন স্নান করবেন। তারপর জপতপ..."

নটুমহারাজ মাথা নাড়লেন। "স্নান করতে মিনিট দশ পনেরো। জপতপ আমার নেই রায়মশাই। সন্ধেবেলায় নিজের মনে একটু গানটান গাই, দু-চার পাতা পড়ি। চলুন আপনারা, বসবেন সামান্য। সংকোচ করবেন না।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন। "চলো তারাপদ।"

অল্প একটু এগিয়ে নটুমহারাজের ডেরা। বারান্দায় কাঠের চেয়ার, একটা চৌকিও পড়ে ছিল। একপাশে ভাঙা দড়ির খাটিয়াও পড়ে আছে একটা।

নটুমহারাজ বললেন, "বসুন। আমি স্নানটা সেরে আসি। দেরি হবে না। চা আমি নিজেই করব।"

"আপনার লোক ?"

"জটা। সে এখনো আসেনি। এসে পড়বে। কাছেই থাকে।"

"আপনার এখানে থাকে না ?"

"থাকে। ওর দিদির অসুখ। ক'দিন বাড়ি চলে যাচ্ছে সন্ধের পর। ...বসুন আপনারা।" নটুমহারাজ আবার কুয়াতলার দিকে চলে গেলেন।

৪

দেখতে-দেখতে রোদ ছড়িয়ে গিয়েছিল সর্বত্র। সকালের সেই হালকা স্নিগ্ধভাব আর যেন নেই, উজ্জ্বল ঝকমকে হয়ে উঠছিল রোদ।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "মহারাজ, ...আপনাকে বলছি বলে কিছু মনে করছেন না তো !"

"না না, বলুন।"

"বলছিলাম, রত্নেশ্বরবাবু যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েননি, তাঁর যে সেরিব্রাল স্ট্রোক মতন হয়নি, তাঁকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেছিল—এমন সন্দেহ আপনি কেন করছেন ? কী দেখেছেন আপনি যাতে—।"

কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নটুমহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, আমি সন্দেহ করছি। কেন করছি লালাবাবু আপনাকে বলেননি ?"

"বলেছেন। তবে আমার মনে হয়, তিনি গুছিয়ে বলতে পারেননি। তিনি তো এখানে হাজির ছিলেন না। আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।"

তারাপদ কোনো কথা বলছিল না। নটুমহারাজকে দেখছিল আর প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনছিল।

নটুমহারাজ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "রত্নেশ্বরবাবুকে আমি বেশ কয়েক বছর ধরেই চিনি। তিনি আমার বন্ধুর মতনই হয়ে উঠেছিলেন। নানান গল্প করতেন, নিজের কথা বলতেন, পারিবারিক কথাও। আমি যতদূর তাঁকে জানি, তাঁকে দেখছি—তাতে বলতে পারি, তাঁর কোনো ভারী অসুখবিসুখ ছিল না। স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পরিশ্রম করতে পারতেন, খাওয়াদাওয়া করতেন মুখের

রুচি মতন, ধরাবাঁধা মানতেন না। আপনি নিশ্চয় তাঁকে দেখেননি। দেখলে বুঝতে পারতেন, শরীর যেমন বিশাল ছিল, স্বাস্থ্যও ছিল মজবুত। দোষের মধ্যে মাথা গরম মানুষ ছিলেন, চেঁচামেচি করতেন সামান্যতেই। ঠিক রগচটা মানুষ বলব না ওঁকে, বলব—বলব—মাথা গরম স্বভাব। কথা বলার অভ্যেসটাই ছিল চড়া ধরনের। অন্য দোষ বলতে কিছু দেখিনি। পান-জরদা খেতেন। সিগারেট কদাচিৎ। ...ওঁর কোনো অসুখ ছিল না। এমনকী হালেও হয়নি। কেননা রত্নেশ্বরবাবু আমায় বলেছিলেন, কিছুদিন আগে একবার চেক আপ করিয়েছিলেন কলকাতায়। ডাক্তাররা কোনো খুঁত পায়নি। প্রেশার হয়ত অল্পস্বল্প চড়ত কখনো।

"বয়েস কত হয়েছিল ?" তারাপদ বলল।

"চুয়ান্ন। চুয়ান্ন বছর দু-এক মাস হতে পারে।"

"আপনার সন্দেহের কারণটা বলুন— !" কিকিরা বললেন।

নটুমহারাজ বললেন, "কারণ তো একটা নয়, রায়মশাই ; কয়েকটা। এক-এক করে বলি তবে ?"

কিকিরা মাথা হেলালেন। লালাবাবুর মুখ থেকে যা শুনেছেন তিনি, তার মধ্যে ছাড়-ছোড় থাকতে পারে। আসল লোকের কাছ থেকে শোনাই ভাল।

"আমার প্রথম সন্দেহ, সেই উটকো লোকটা। সে কে ? সে কেন এসেছিল, কেনই-বা পালিয়ে গেল লুকিয়ে ?"

তারাপদ বলল, "পালিয়ে গিয়েছিল তা কি আপনি চোখে দেখেছেন ?"

"না, না। আমি যদি দেখতাম তবে তো চিনতেই পারতাম। আমি না দেখলেও তাকে একজন দেখেছে। সে বাচ্চা মেয়ে। রত্নেশ্বরবাবুর ভাইঝি। ও মিথ্যে কথা, বাজে কথা বলবে না। বাচ্চারা এ-সব ক্ষেত্রে বলে না। ও যা বলে—তাতে তো বোঝাই যায়—লোকটা পালিয়েই গিয়েছিল।"

"মেয়েটি তো বলে লোকটা ভূতের মতন দেখতে। আমাদের কি তাই বিশ্বাস করতে হবে ?" তারাপদই বলল।

"না। তবে আমাদের ভাবতে হবে, বেয়াড়া চেহারার কেউ যদি অন্ধকার জায়গা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়—তাকে ভূত বলেই মনে করতে পারে বাচ্চারা। ...চোর-ছ্যাঁচড়ও ভাবতে পারে। তবে এখানে ওই খুকি বলছে ভূতের মতন দেখতে।"

কিকিরা স্বীকার করলেন কথাটা। তাঁরও ওইরকম ধারণা। বললেন, "উটকো লোকটা কে হতে পারে নটুবাবু ? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন ?"

মাথা নাড়লেন নটুমহারাজ। "আমার মাথায় আসছে না, উটকো লোকটা কে হতে পারে ?"

"একটা উটকো লোক হঠাৎ এল আর পালিয়ে গেল কেন, এইটেই আপনার সন্দেহের প্রথম কারণ ?"

"হ্যাঁ। তারপর আমি যখন ওই ঘরে গেলাম, দেখলাম—রত্নেশ্বরবাবু চেয়ার সমেত উলটে মাটিতে পড়ে আছেন। জ্ঞান নেই।"

"ঘরে বাতি ছিল ?"

"টেবিলের বাতিটা জ্বলছিল। কেরোসিন ল্যাম্প।"

"টেবিলের জিনিসপত্র অগোছালো খানিকটা।"

"ও ! তারপর ?"

"আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল। অবশ্য পরে পড়েছে।"

"কী ?"

"তীরের হলুদ পালক।"

"তীর ?"

"তীর-ধনুকের তীর। অ্যারো। ...দেওয়ালে ঝোলানো একটা বোর্ডের ওপর রাখা থাকত।"

কিকিরা আর তারাপদ অবাক হয়ে নটুমহারাজের কথা শুনছিল। লালাবাবুর মুখে তীরের কথা শোনেননি কিকিরা। তা না শুনুন, রত্নেশ্বরের অসুস্থতার সঙ্গে তীরের সম্পর্ক কোথায় ? আর যদি রত্নেশ্বরকে কেউ খুন করার চেষ্টা করে থাকে, তার সঙ্গেও বা কী সম্পর্ক তীরের ? কেউ কি আর তীর ছুড়ে তাঁকে মেরেছে ? অসম্ভব।

কিকিরা বললেন, "বুঝতে পারছি না, মহারাজ ? দেওয়ালে তীরই বা থাকবে কেন ?"

নটুমহারাজ সামান্য চুপ করে থেমে বললেন, "রায়মশাই, বসার ঘরে একটা ছোট দেওয়াল-আলমারি থাকা, দু-চারটে ছবি টাঙানো থাকা নতুন তো নয়। বসার ঘরে, শোওয়ার ঘরে থাকে অনেকেরই। আলমারি না হোক, দেওয়াল থাক। ...ওই ঘরটা তো একসময় আমারই বসার ঘর ছিল। সাজানোও ছিল সেভাবে। ওখান থেকে আমি আসবাবপত্র তেমন কিছু সরাইনি। পড়ে আছে, থাক। কোথায় সরাব ! আমি এখন যে-ঘরে থাকি সেখানে ওগুলো রাখার জায়গা কই ! ...তা দেওয়াল-থাকটায় পাল্লা দেওয়া ছিল, পাল্লার নিচের দিকটা কাঠ, ওপরে কাচ। ওর মধ্যে হাবিজাবি অনেক কিছু পড়ে ছিল। পুরনো। যেমন থাকে। আর দেওয়ালে একটা বোর্ড ঝোলানো ছিল একপাশে ছবিটবি যেমন থাকে। ওই বোর্ডে তিনটে তীরও রাখা ছিল পাশাপাশি। ...আমি আলমারি থেকে নিজের হাতে দু- একটা জিনিস বার করে নিলেও বাকি যেমন ছিল সব পড়েই থাকত। কেউ হাত দিত না। হাত দেওয়ার দরকার হত না।"

"তীরের ব্যাপারটা বলুন ?"

"বলছি। তার আগে বলি, এবারে রত্নেশ্বরবাবু যখন হোটেল-বাড়ি করবার মতলব নিয়ে এখানে এসে চেপে বসলেন, উনি ওই বসার ঘরটাকে একই সঙ্গে

বসা আর অফিসঘর মতন করে ফেললেন। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, ঘরটা সাফ করে দিই—আপনার সুবিধে হবে। উনি বারণ করলেন। বললেন, এখন থাক, পরে দরকার পড়লে দেখা যাবে। কাজেই জিনিসগুলো পড়েই ছিল। ...আর আপনি যে তীরগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছেন, ওগুলো আমার। আমি এককালে ভাল তীরন্দাজ ছিলাম। ওগুলো আমার প্রাইজ! কালা, লালা, পিলা... !"

"মানে? আপনি তীরন্দাজ ছিলেন?" তারাপদর চোখের পাতা পড়ছিল না।

"হ্যাঁ। সে অনেক পুরনো কথা। পরে সে গল্প শুনবেন। এখন যা বলছিলাম—ওই কালা, লালা, পিলা মানে কালো, লাল, হলুদ পালক দেওয়া তীর। এগুলো হল র‍্যাংকিং, ওয়ান টু থ্রির মতন। আমি পেয়েছিলাম একসময়, একই বছরে নয়, পরপর তিন বছর।"

"কে, মানে কারা দিত প্রাইজ?"

নটুমহারাজ একটু হেসে বললেন, "এসব দেহাতি কম্পিটিশান। রাঁচির দিকে একটা মেলায় আদিবাসীরা তখন তীর খেলার কায়দা দেখাত। কম্পিটিশান হত। আমি নেমে যেতাম। এই আর কী!"

কিকিরা কিছুক্ষণ নটুমহারাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু মহারাজ, আপনি হঠাৎ তীরের কথা তুলছেন কেন?"

নটুমহারাজ বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে। ...আপনাকে তবে বলি, রত্নেশ্বরবাবুকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি ভেবেছিলাম, হয়ত তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েছেন, মাথা ঘুরে গিয়েছে, ফেইন্ট হয়ে গিয়েছেন। টেবিলে বরফজলের কুঁজো ছিল। কাচের কুঁজো। জল নিয়ে মুখেচোখে দিতে লাগলাম। লোক ডাকাডাকি করলাম। তখন আমার কিছুই খেয়াল হয়নি। লক্ষও করিনি। ...পরের দিন ঘরটা ভাল করে নজর করতে এসে চোখে পড়ল, ক'টা ছেঁড়া হলুদ পালক মাটিতে পড়ে আছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে কেমন সন্দেহ হল। ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকালাম। দেখি, বোর্ডের মধ্যে রাখা হলুদ পালক গোঁজা তীরটা নেই।"

কিকিরা আর তারাপদ কেমন যেন হতবাক!

নটুমহারাজ সামান্য সময় বসে থেকে বললেন, "আমার সন্দেহের আর-একটা জিনিস দেখাই। একটু বসুন।" বলতে বলতে উঠে গেলেন তিনি।

"কিকিরা— ?" তারাপদ অবাক গলায় বলল।

কিকিরা বললেন, "মিস্টিরিয়াস হে তারাবাবু! হলুদ পালকের তীর। মানে, তীরের পেছনে হলুদ পালক! বুঝতে পারছি না।"

সামান্য পরেই ফিরে এলেন নটুমহারাজ। তাঁর গায়ে সাদা চাদর, উড়নি

ধরনের। চাদরের আড়াল থেকে হাত বার করে কী একটা এগিয়ে দিলেন। "দেখুন! এটা আমি তিন-চারদিন পরে বাড়ির বাইরে ঘুরতে-ঘুরতে আকন্দঝোপের তলায় পেয়েছি।"

কিকিরা জিনিসটা নিলেন। অবাক হয়ে বললেন, "গ্লাভস্। তবে একটা। এ তো সার্জিক্যাল গ্লাভ্‌স নয়। কমার্শিয়াল। কলকাতার চাঁদনি বাজারে পাওয়া যায়। মোটা রাবারের দস্তানা। একটা আঙুল আবার নেই। অনামিকা কাটা। কেটে আঙুলটা ফেলে দিয়ে—মুখটা আবার জোড়া হয়েছে। এ তো বাঁ হাতের।"

নটুমহারাজ বললেন, "এবার আপনি ভেবে দেখুন। আমি আমার সন্দেহের তিনটে কারণ বললাম: উটকো লোক, হলুদ পালক লাগানো তীর গায়েব, চার-আঙুলের দস্তানা।"

কিকিরা দস্তানা হাতে বসে থাকলেন।

খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছিল। কিকিরারা সবাই সেই বসার ঘরে জড়ো হয়েছেন। এই ঘরেই রত্নেশ্বরকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল।

ঘরটা নজর করে-করে দেখছিলেন কিকিরা।

তারাপদ সামান্য সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চারপাশ নজর করছিল। ঘরে লালাবাবু রয়েছেন, রয়েছেন নটুমহারাজ।

ঘটনা ঘটেছে অনেকদিন আগে। মাসখানেক হতে চলল। এই ঘরে, সন্ধেবেলায় বসে কাগজপত্র দেখতে- দেখতেই রত্নেশ্বর চেয়ার সমেত মাটিতে পড়ে যান। তখন-তখনই জ্ঞান হারান। পরে একসময় চেতনা ফিরে এলেও সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁর আর স্বাভাবিক জীবনের কোনো লক্ষণই আর নেই। হ্যাঁ, বেঁচে আছেন এখনও। কিন্তু অক্ষম, পঙ্গু, অথর্ব। মানুষটা কোনো রকমে শরীরে টিকে আছেন, অন্যথায় মৃত বললেও বলা চলে। বড় কষ্টের এই বেঁচে থাকা!

একমাস আগে একদিন কী ঘটেছিল সে অন্য প্রশ্ন। আপাতত কিকিরারা ওই ঘরটাই দেখছেন যেখানে রত্নেশ্বর শেষবার টেবিল চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘেঁটেছেন।

তারাপদ বা কিকিরা কেউই বিশ্বাস করেন না, একমাস আগে যখন ঘটনাটা ঘটে তখন ঘরের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঠিক যেভাবে রাখা ছিল—আজও তা থাকতে পারে। সেটা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, নটুমহারাজ যতদূর সম্ভব ঘরটার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে দেননি। তালা বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন ঘরটা।

কিকিরা ঘর দেখছিলেন। তারাপদও।

বসার ঘর হিসেবে ভালই। মাঝারি ঘর মোটামুটি। জানলা চারটি। একটা ভারী টেবিল। গোটা তিনেক চেয়ার। একপাশে পিঠঅলা বেঞ্চি। দেওয়ালে কয়েকটা পুরনো ছবি। হরিণের মাথা, ক্যালেন্ডার একটা। সেই তীর-রাখা

কাঠের বোর্ড।

কিকিরা বললেন, "ঘরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে নিশ্চয় !"

নটুমহারাজ বললেন, "খানিকটা তো হয়েছে। তখন কে বুঝেছিল... !"

"ওই টেবিলের সামনে রত্নেশ্বর বসে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ওই চেয়ারে ?"

"হ্যাঁ।"

তারাপদ বলল, "কিকিরা, চেয়ার-টেবিল যেভাবে আছে তাতে চেয়ারে বসে সামনের দিকে মুখ তুললেই ঘরে ঢোকার দরজা চোখে পড়ে।"

লালাবাবু বললেন, "দরজার দিকটা পুব। রতনদার বসার চেয়ার-টেবিল ছিল পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে।"

"ওটা তবে দক্ষিণ ? দু' পাশে দুটো জানলা।"

"হ্যাঁ।"

"বারান্দার দিকে—মানে উত্তরেও একটা জানলা রয়েছে। আর পশ্চিমের দিকেও একটা।"

"হ্যাঁ।"

কিকিরা নটুমহারাজকে বললেন, "টেবিলে কী-কী ছিল নটুবাবু ?"

"কাগজপত্র। হোটেলের প্ল্যানের ড্রয়িং কাগজটা। হিসেবপত্রের একটা খাতা। টুকিটাকি রসিদের কাগজ। সব কি আর মনে আছে ?"

"আর কী ছিল ?"

"শরবতের গ্লাস, বরফজলের কুঁজো—কাচের ছোট কুঁজো। পান আর জরদার কৌটো।"

"রত্নেশ্বরের হাতের কাছেই সব ছিল ?"

"সেইরকমই থাকত।"

"টেবিলের বাতিটা কোথায় ছিল ? কেরাসিনের বাতি তো !"

"বাতিটা একটু তফাতে সরানো ছিল। এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই।"

"টেবিলের জিনিসগুলো তো আপনারা তুলে নিয়েছিলেন ?"

"তা তো নিয়েইছি। তখন আর অন্য ভাবনা মাথায় আসেনি।"

"রত্নেশ্বরবাবুর মুখোমুখি টেবিলের এপাশে কি দুটো চেয়ারই ছিল ? মনে আছে আপনার ?"

"একজোড়া চেয়ারই বরাবর থাকত, লোকজন এলে বসার জন্যে।"

তারাপদ ঘরের মধ্যে নড়াচড়া করছিল। দেখছিল। পুবের জানলার পাশে, বাইরে করবী আর কলকে ফুলের ঝোপ। অন্য গাছও আছে। পশ্চিমের জানলার পেছনে মস্ত বাতাবি লেবুর গাছ। বাগানের পাঁচিলটা চোখে পড়ে না, ঝোপে আড়াল পড়েছে।

কিকিরা কিছু বলার আগেই লালাবাবু বললেন, "রায়বাবু, ঠিক এইখানটায় রতনদা পড়ে ছিল।" বলে টেবিলের পেছন দিকে ডানহাতি মেঝেটা দেখালেন।

কিকিরা নটুমহারাজের দিকে তাকালেন। লালাবাবু ঘটনার সময় এখানে ছিলেন না। তিনি পরে শুনেছেন। নটুমহারাজ জানেন ঠিকঠাক। তা ছাড়া তিনিই প্রথম এ-ঘরে ঢুকে রত্নেশ্বরকে পড়ে থাকতে দেখেন।

নটুমহারাজ মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, লালাবাবুর দেখানো জায়গাটাতেই রত্নেশ্বরকে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন তিনি।

কিকিরা কয়েক পা সরে গিয়ে তীর-রাখা বোর্ডটার দিকে তাকালেন। দেখলেন। দেওয়াল-আলমারির পাল্লা খুললেন। দেখলেন ভেতরটা। পুরনো আবর্জনা জমানো আছে বললেও ভুল হয় না। নিচের দিকে ছেঁড়া বই, পাঁজি, রঙের ফাঁকা কৌটো, ব্রাশ, আরও কিছু কিছু। বললেন, "অন্য তীরগুলো ঠিক-ঠিক আছে ?"

"আমি দেখেছি।" নটুমহারাজ বললেন। "প্রথমে ওদিকে তাকাবার কথা মনে হয়নি আমার। তখন কী অবস্থা বুঝতেই পারছেন। রত্নেশ্বরবাবু চেয়ার উলটে মাটিতে পড়ে আছেন। অজ্ঞান। ওঁকে নিয়েই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পরে যখন দেখি, চোখে পড়ল, হলুদ পালক লাগানো তীরের ক'টা ছেঁড়া পালকের টুকরো মাটিতে পড়ে আছে। তখনই আমার নজর গেল দেওয়ালের দিকে।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারছেন।

লালাবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিকিরাই হঠাৎ বললেন, "মহারাজজি, এবার বলুন তো রত্নেশ্বরবাবু যে পড়ে গিয়েছিলেন, শরীরের কোথায়-কোথায় লেগেছিল ? রক্তপাত ?"

নটুমহারাজ বললেন, "ওঁর ভারী-শরীর। ওইভাবে পড়েছেন আচমকা। কয়েক জায়গাতেই লেগেছিল। মাথায় লেগে একটা জায়গা ফুলে গিয়েছিল। নাকেও লেগেছিল। রক্ত পড়েছিল নাক থেকে। ঘাড়ের কাছে কালসিটে। কপাল কেটে গিয়েছিল অল্প।"

কিকিরা মন দিয়ে শুনলেন সব। তারপর বললেন, "ডাক্তার এসে সবই দেখেছিলেন ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"কিছু বলেননি ?"

"না, মানে উনি স্ট্রোক বলেই ধরে নিয়েছিলেন।"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন সামান্য। পরে বললেন, "নটুবাবু, আপনি কি ডাক্তারবাবুকে আপনার সন্দেহের কথা বলেছিলেন ?"

"না," মাথা নাড়লেন নটুমহারাজ, "কী বলব বলুন ! গোড়ায় তো আমার

সন্দেহ হয়নি। পরে হয়েছে।"

"থানায় জানিয়েছেন কিছু ?"

"আজ্ঞে না। থানায় কী জানাব বলুন ! এ তো আমার সন্দেহ। প্রমাণ আমি কোথায় পাব ?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কথাটা ঠিকই। প্রমাণ কিছু নেই। একমাত্র বলা যায়, একটা অজানা, অচেনা লোক রত্নেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সন্ধেবেলায়, ঘটনার আগে। সে চলে যাওয়ার পরই রত্নেশ্বরকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

থানায় যদি জিজ্ঞেস করে, লোক এসেছিল তার প্রমাণ কী, মশাই ? তাকে কেউ দেখেনি। দেখেছে একটা বাচ্চা মেয়ে। দেখেছে সে চলে যাওয়ার সময়। চেহারাও বলতে পারছে না, বলছে, ভূতের মতন দেখতে ! বাচ্চা মেয়ের কথায় বিশ্বাস কী ! সে তো ভুলও বলতে পারে, বা মিছে ভয় পেয়েও বলতে পারে।

কিকিরা বললেন, "লালাবাবুকেই যা বলার বলেছেন তা হলে ?"

লালাবাবু বললেন, "আমাকেই বলেছেন। খুঁচিয়েও যাচ্ছেন নটুমহারাজ। আমি রায়বাবু, এতসব বুঝি না। তবে নটুমহারাজ আমার পুরনো বন্ধু। আমিও তো কম বার রতনদার সঙ্গে এখানে আসিনি। রতনদা আমার দাদা হলেও বন্ধুর মতন ছিল। তাকে যদি কেউ সত্যি-সত্যি খুন করার চেষ্টা করে থাকে তবে আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।"

তারাপদ বলল, "অন্যরাও তো এতদিনে জেনে গিয়েছে যে, আপনি, আপনারা, এখন আর আগের মতন সেরিব্রাল স্ট্রোকের কথাই ভাবছেন না।"

লালাবাবু বললেন, "তা জেনেছে।"

"সকলেই ?"

"হ্যাঁ। যজ্ঞেশ্বর, নিমাই, আনন্দ সবাই জেনেছে।"

"কী বলছে ?"

"বিশ্বাস করছে না। বলছে, এমন হতেই পারে না।"

"আপনি নিজে এখন কী মনে করছেন ?"

লালাবাবু কিকিরার দিকে তাকালেন। বললেন, "দেখুন, আগে আমার মনে হচ্ছিল নটুমহারাজ পাগলামি করছেন। এখন মনে হয়, ব্যাপারটা সত্যি হলেও হতে পারে। কেননা, যে-লোকটা সেদিন এসেছিল—সে তো আর পরে এল না। রতনদা অসুস্থ হওয়ার পর ওই অবস্থায় এখানে দু' দিন ছিল। কত লোক এসেছে খোঁজখবর নিতে। কিন্তু সেই লোকটা তো আর আসেনি।"

তারাপদ বলল, "আপনি কেমন করে জানলেন ?"

লালাবাবু একটু যেন হাসলেন। বললেন, "সেই লোকটা যদি আসত—নিশ্চয় বলত, সেদিন সন্ধেবেলায় সে এসেছিল আর রতনদাকে সুস্থ

অবস্থাতেই দেখেছে। সেটাই স্বাভাবিক হত। নয় কি ?"

নটুমহারাজ বললেন, "অন্যরকমও যদি হত, তার চোখের সামনে রত্নেশ্বরবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যেতেন, সে নিশ্চয় চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করত। কিন্তু সে কিছুই করেনি। পালিয়ে গেছে লুকিয়ে।"

তারাপদ বলল, "তা আপনি কেমন করে বুঝলেন। লোকটা চলে যাওয়ার পরও তো রত্নেশ্বরবাবু অসুস্থ হতে পারেন !"

"আমি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে এসেছি।"

"অথচ লোকটিকে আপনি দেখতে পাননি ?"

"না। আমি এসেছি বাড়ির পেছন দিক থেকে, আর সে সরাসরি এই ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে ফটক খুলে চলে গিয়েছে।"

লালাবাবু বললেন, "যতই যা বলুন, যে এসেছিল সে যদি ভাল লোকই হবে, তা হলে পরের দিন খবরটা যখন রটে গেল ঘাটশিলায়, নিশ্চয় একবার আসত এ-বাড়িতে। বলতে আসত যে, রতনদাকে সে একটু আগেই সুস্থ অবস্থায় দেখে গিয়েছিল।"

কিকিরা অস্বীকার করতে পারছিলেন না যুক্তিটা।

সামান্য পরে কিকিরা বললেন, "এই ঘাটশিলায় কেউ কি শত্রু আছে রত্নেশ্বরবাবুর ?"

"শত্রু ?"

"হোটেল করা নিয়ে কারও সঙ্গে ঝগড়া বা রেষারেষি হয়েছে ?"

"না ; জানি না।"

"হোটেলটা কোথায় হচ্ছে ?"

"এখান থেকে বেশি দূর নয়। নদীর কাছাকাছি।"

"জায়গাটা কতদিন আগে কেনা ?"

"বছর তিন।"

"কোনো নতুন লোক, অচেনা কেউ কি আসত এখানে, হালে ?"

নটুমহারাজ বললেন, "কন্ট্রাক্টর, মুনশি, অন্য দু-একজন যারা আসত—তাদের আমি চিনি। তারা পরেও এসেছে।"

"নতুন কাউকে দেখেননি ?"

"না। মাত্র একজনকে একবার দেখেছি।"

"সে কে ?"

"জানি না। তবে সে কলকাতা থেকে এসেছিল।...বেলায় এল একদিন, দেখা করল। চলে গেল। আর তাকে দেখিনি।"

"আপনি কেমন করে জানলেন কলকাতা থেকে এসেছিল ?"

"রত্নেশ্বরবাবুই বলেছিলেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।"

"তার নাম-ধাম ?"

"কিছুই বলেননি।"

কিকিরা লালাবাবুর দিকে তাকালেন। উনি মাথা নাড়লেন। তিনি জানেন না।

কী ভেবে কিকিরা নটুমহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনি লালাবাবুকে কি আপনার সন্দেহের সব কথা বলেছেন ?"

নটুমহারাজ মাথা নাড়লেন। বললেন, "কেমন করে বলব! আচমকা খবরটা ওঁকে লোক পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টেলিগ্রামের বিশ্বাস কী! তা ছাড়া এখান থেকে কলকাতা যাওয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। লালাবাবু এলেন। আমরা ডাক্তার-বদ্যি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তারপর উনি রত্নেশ্বরবাবুকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। বউমারা গেল যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ট্রেনে। তারপর কলকাতায় রত্নেশ্বরবাবুকে নিয়ে লালাবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উনি তো আর এখানে আসেননি। আসা সম্ভব ছিল না।...আমি চিঠি লিখে-লিখে লালাবাবুকে আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছি।"

"চিঠিতে তীর হারানো, দস্তানা পাওয়ার কথা লেখেননি ?"

"না। চিঠিতে অত কথা লেখা যায় না। লিখলেও উনি বুঝতেন না। তবু আভাস দিয়েছি। লালাবাবুর আসার কথা ছিল এখানে। সাক্ষাতে সব বলতাম।"

মাথা নাড়লেন লালাবাবু। কিকিরাকে বললেন, "রায়বাবু, আমি প্রথম থেকেই আপনাকে বলেছি, এ-সব ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না। একটা মানুষ মরতে চলেছে—তাকে নিয়ে আমি ব্যস্ত। নটুমহারাজ কী লিখতেন—তাও আমি ভাল করে পড়তে পারতাম না। বুঝতাম না।...তবে কাল রাত্তিরে ওঁতে-আমাতে যখন কথা হচ্ছিল—ওঁর কথা শুনেছি।"

তারাপদ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছিল যেন। হঠাৎ বলল, "কিকিরা, সেই লোকটা, যে কলকাতা থেকে এসেছিল, দেখা করে আবার চলে গেল, সেই লোকটার খোঁজ নেওয়া যায় কেমন করে ?" বলে লালাবাবুর দিকে তাকাল। বলল, "আপনি কি এমন কাউকে চেনেন, যার বাঁ হাতে চারটে আঙুল ?"

লালাবাবু মাথা নাড়লেন। "মনে করতে পারছি না।"

৫

তারাপদকে সঙ্গে নিয়ে দুটো দিন ঘোরাঘুরি করলেন কিকিরা। লালাবাবু বা নটুমহারাজকে সঙ্গে নিলেন না। ঘাটশিলা জায়গাটা বিরাট কোনো শহর নয়, হাজারটা গলিঘুঁজি, রাস্তাও নেই; বাড়ি নেই শয়ে-শয়ে—কাজেই এই ছোট শহরটায় ঘুরে বেড়াতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। আর বাড়ি ঘরদোর কম—এমনকি কলকাতার ছোটখাট পাড়াতেও যত দোকানপসার

থাকে—এখানে তাও চোখে পড়ে না। স্টেশনের দিকটাই যা জমজমাট।

কিকিরা তো ঘাটশিলায় বেড়াতে আসেননি, কাজেই হেলেদুলে গা এলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবসর তাঁর ছিল না। উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুরতেন। যদিও বুঝতে পারতেন না, এভাবে ঘুরে বেড়িয়ে কাজের কাজ কিছু হবে কী না!

রত্নেশ্বর যেখানে হোটেল করবেন বলে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছিলেন, কিকিরা সেই জায়গাটাতেও গিয়েছিলেন। অবশ্য লালাবাবুকে সঙ্গে করেই।

জায়গা এবং খোঁড়াখুঁড়ি দেখে কিকিরাদের মনে হয়েছিল, রত্নেশ্বর বড়সড় কোনো হোটেল তৈরির কাজে হাত দেননি। ছোট হোটেল। দোতলার ভিত করেছেন। ঘর ঠিক কতগুলো করতেন, নকশা না দেখলে বলা মুশকিল। হয়ত সাত-আটটা। দোতলার একপাশে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করারও ইচ্ছে ছিল।

লালাবাবুর কথা শুনলে মনে হত, রত্নেশ্বর হোটেলটাকে আপাতত বরাবরের মতন চালাবার কথা ভাবেননি। পুজো থেকে শীতের শেষ—মাত্র চার-পাঁচ মাস—চালাবেন ভেবেছিলেন। ওই সময়টায় লোকজন আসে এখানে বেড়াতে। গরমে, বর্ষায় কে আর আসবে!

কাজটা শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক, হয়ত একটু তাড়াহুড়ো ছিল—কিন্তু কী কপাল, শুরুর সঙ্গে-সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটল যে, উনি আর কোনোদিন এটা শেষ করতে পারবেন না। প্রাণে বেঁচে থাকলেও হয়ত নয়। তা ছাড়া ওভাবে কতদিনই বা আর বাঁচবেন!

সেদিন শেষ বিকেলে তারাপদকে নিয়ে কিকিরা আবার হোটেলের জায়গাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

জায়গাটা ভাল। উঁচু জমির ওপর। খানিকটা তফাতে ঢাল নেমেছে। তারপর এবড়ো-খেবড়ো জমি। জমি ঘুরলো কি পাথর ছোট, বড়। শেষে সুবর্ণরেখা নদী।

হোটেলটা যদি শেষ হত, চালু হয়ে যেত বছরখানেক কি দুয়েকের মধ্যে—কিকিরার ধারণা, রত্নেশ্বর বোধ হয় ব্যবসাটা জমিয়ে তুলতে পারতেন। ছুটি কাটাবার মতনই জায়গা আর পরিবেশ।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "তারাবাবু, সেই যে কথায় বলে, ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস—এ হল তাই।" বলতে-বলতে নিশ্বাস ফেললেন বড় করে।

তারাপদ বলল, "তা ঠিক।...তবে কি কিকিরা, আমার মনে হচ্ছে, গড নয়—অন্য কেউ..."

তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কিকিরা হাত বাড়িয়ে কী যেন দেখালেন। "ওই দেখো?"

"কী ?"

"ভাল করে দেখো।"

হোটেলের ভিত খোঁড়ার পর তার গাঁথনির কাজও শেষ হয়েছিল মোটামুটি। পাশে একটা স্টোর, মানে মালপত্র রাখার গুদোম, যেমন হয় সচরাচর। এ-পাশে ও-পাশে ইটের পাঁজা, পাথরকুচি আর সাদা নুড়ির স্তূপ, কিছু লোহালক্কড়, সুরকি। কাজকর্ম বন্ধ বলে দরোয়ান গোছের জনা দুয়েক আছে গুদোমের কাছেই চালার নিচে।

সাইকেলে করে একজন এগিয়ে আসছিল।

হোটেল তৈরির কাজকর্ম যাদের হাতে ছিল, কন্ট্রাক্টার সিংহি, মুনশি তেজনারায়ণ—এদের সঙ্গে আগেই আলাপ করেছেন কিকিরা। লালাবাবু আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের কোনো কথাই ভাঙা হয়নি। নিষেধ করেছিলেন কিকিরা। রত্নেশ্বর সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ—মরা-বাঁচার ঠিক নেই—এইটুকুই শুধু জানে তারা। অন্য কিছু নয়।

সাইকেল চালিয়ে যে আসছিল সে একেবারে কাছে এসে নেমে পড়ল। রোদে-পোড়া চেহারা, বয়েস বছর চল্লিশ হবে, পরনে মালকোঁচা-মারা ধুতি, গায়ে হাফশার্ট।

কিকিরারা দাঁড়িয়ে থাকলেন।

লোকটা সাইকেল থেকে নেমে দেখল কিকিরাদের। তারপর হাত তুলে নমস্কার জানাল।

"বাবুরা ঘোরাফেরা করতে এসেছেন ?"

কিকিরা লোকটাকে দেখছিলেন। মাথায় মাঝারি। গায়ে মেদ নেই, হাড়-হাড় চেহারা, লম্বা-লম্বা হাত, চেটালো হাড়। মুখ চৌকোনো, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে মতন। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গোঁফটি একেবারে কাঁচাপাকা।

কিকিরা বললেন, "হ্যাঁ, ঘুরতে-ফিরতে।"

"আমার নাম লখিন্দর দাস।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। এমনভাবে নাড়লেন যেন নামটি তাঁর পছন্দ হয়েছে। বললেন, "এখানকার লোক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দেশবাড়ি তমলুক। এখানেই থাকি।"

"কী করা হয় ?"

"আজ্ঞে, একটা ছোট দোকান আছে। স্টেশনের কাছেই। মনিহারি। আর জমি কেনাবেচা দেখি অল্পস্বল্প।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন, লখিন্দর টুকটাক জমির দালালিও করে।

লখিন্দর নিজেই বলল, "এদিক পানে একটা কাজে এসেছিলাম। ওই পশ্চিম দিকে একটা জমি আছে। বেচার কথা চলছে।...তা এদিক দিয়ে যাওয়ার সময়

আপনাদের দেখলাম। আপনার কী জমি... ?" কথাটা শেষ করল না সে।

কিকিরা সরাসরি না বললেন না। মাথাও নাড়লেন না। তাঁর মনে হল, লোকটার সঙ্গে খানিকটা আলাপ জমানো যেতে পারে। স্থানীয় লোক। যদি কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়।

আলাপ জমাবার মতন করে কথা বলতে শুরু করলেন কিকিরা। না, ঠিক জমি কেনার মতলব নিয়ে এখানে ঘুরছেন না, এমনিই বেড়াতে বেড়িয়েছেন ; তবে জায়গাটা যেমন ভাল লাগছে, ছিটেফোঁটা জমি হয়ত কিনতেও পারেন পরে। কেমন দামটাম এখানে ? লোকে কিনছে ? বাঙালি, না বিহারিরাই বেশি কিনছে ?

তারাপদ চুপ করে কথাবার্তা শুনছিল কিকিরাদের।

লখিন্দর বলল, "জমিটমি এখনো এদিকে সস্তা বাবু। ওপারে অবশ্য বেশি। এধারে কম। আগে আর কে জমি কিনতে আসত এখানে ? এখন কেনে। ঘরবাড়ি কত বেড়ে গেছে আগের তুলনায়।"

কিকিরা এবার আচমকা কথা ঘোরালেন। "এখানে—এই জায়গায় একটা হোটেল হচ্ছিল জানো নাকি ?"

"জানি।"

"বাবুকে চিনতে ? হোটেল-বাড়ি যিনি তৈরি করাচ্ছিলেন ?"

মাথা হেলিয়ে লখিন্দর বলল, "চিনতাম। কলকাতার রতনবাবু।"

"জানাশোনা ছিল ? নাকি এমনি চিনতে ?"

"না না, ভালই চিনতাম। বাবুর কাছে গিয়েছি। এই কাজ যখন শুরু হল—এদিক পানে এলে—বাবু যদি থাকতেন, কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, কথা হয়েছে।"

"বাবুর কোনো খবর রাখ ?"

"আজ্ঞে, শুনেছি বাবু হাসপাতালে আছেন। কলকাতায়।"

কিকিরা কী যেন ভেবে বললেন, "হাসপাতালে নয়, বাড়িতে। ভাল নেই।"

লখিন্দর কৌতূহল বোধ করল। "আপনারা ?"

কিকিরা বললেন, "আমরা বাবুর চেনাজানা। ওঁর কলকাতার বাড়িতেও আসা-যাওয়া রয়েছে। এখানে একটা দরকারি কাজে এসেছি। একবার জায়গাটা দেখতে এলাম। মানুষের কী কপাল বলো! কত সাধ করে এই হোটেল তিনি করতে এলেন, আর কী হল ! সবই ভাগ্য !"

লখিন্দর মাথা নাড়ল। আফসোসের মতন করে বলল, "বরাতে না থাকলে জমি-বাড়ি সয় না। এ একেবারে সত্যি কথা, বাবু !...আপনারা উঠেছেন কোথায় ?"

"ওই বাড়িতেই।"

"ওই বাড়িতে !"

"কেন ?"

"না না, এমনি বললাম।...তা আপনারা কি শুনেছেন, এই জমিটমি, ভিত-সমেত নাকি বিক্রি করে দেবেন রতনবাবুর বাড়ির লোক ?"

"কই, না।"

"তবে গুজব। শুনছিলাম, তাই বললাম।"

"গুজব তো রটেই লখিন্দর। তবে এখন যে বিক্রিবাটার কথা হয়েছে এমন শুনিনি। ভবিষ্যতে হতে পারে, জানি না।"

লখিন্দর এবার যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হল। "আমি যাই বাবু !"

"চলো, আমরাও যাই।"

কিকিরা ডাকলেন তারাপদকে। "চলো, ফেরা যাক।"

তিনজনে ফিরতে লাগলেন।

এ-কথা সে-কথার পর কিকিরা হঠাৎ বললেন, "লখিন্দর, এই জমি রতনবাবু যখন কেনেন তখন তুমি কোথায় থাকতে ?"

"আজ্ঞে, এখানেই ছিলাম।"

"জমি কেনার কথা শুনেছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।...উনি নিজেই একদিন বলেছিলেন। তবে হোটেলের কথা বলেননি। বলেছিলেন, বাড়ি করবেন পরে। বড় করে।"

কিকিরা এবার একটা চুরুট ধরালেন। লখিন্দরকে দিতে গেলেন। নিল না সে। বলল, "সিগারেট, বিড়ি আমি খাই না বাবু। পান-জরদা খাই। দিনে তিন-চারটি।"

তারাপদ বুঝতে পারছিল, কিকিরার মতলব অন্যরকম। তিনি ফাঁকফোঁকর খুঁজছেন কোনো কথাবার্তা যদি জানতে পারেন।

হাঁটতে-হাঁটতে একসময় তারাপদই বলল, "হোটেল করার মতলবটা যে কেন এল রত্নেশ্বরবাবুর, কে জানে ! ঠিক কি না কিকিরা ! এখানে একটা বেড়াবার বাড়ি করলেই তো পারতেন। ওঁর তো পয়সার অভাব নেই। ব্যবসাদার মানুষ !"

কিকিরা একবার তারাপদকে দেখে নিলেন। বললেন, "সে ওঁর খেয়াল। তা বাড়িই করুন আর হোটেলই করুন, ভাগ্যে যা লেখা ছিল তা তো হতই। কী বলো লখিন্দর !"

লখিন্দর মাথা হেলিয়ে দিল। ঠিক কথা।

আরও একটু এগিয়ে এসে কিকিরা বললেন, "লখিন্দর, নটুমহারাজকে নিশ্চয় চেনো তুমি।"

লখিন্দর অবাক হয়ে বলল, "চিনব না ? উনি এখানকার লোক।"

"এই জমিটা কি উনিই কিনিয়ে দিয়েছিলেন ?"

"আমি জানি না, বাবু।"

"মহারাজজি মানুষটি বেশ। তাই না! রত্নেশ্বরবাবুর বন্ধু।"

লখিন্দর হঠাৎ বলল, "মানুষ ভাল। তবে ওঁর এক ভাই আছে। এখানে থাকে না। সে বড় খারাপ লোক। ভাইয়ে ভাইয়ে বনিবনা নেই অনেককাল। আগে এখানে থাকত। পরে মহারাজ তাকে তাড়িয়ে দেন। একবার পুজোর সময় ডাকাতি করেছিল। ধরা পড়েও কেমন করে ছাড়া পেয়ে যায়। তারপর থেকে আর আসে না এখানে।"

কিকিরা আর তারাপদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

কিকিরা বললেন, "কতদিন আগে সেটা ?"

"তা... তা বাবু, সাত-আট বছর আগে।"

"কোথায় থাকে সে ?"

"আমি সঠিক জানি না, বাবু।...কেউ বলে জামশেদপুরে থাকে, কেউ বলে ঝাড়গ্রাম। স্বভাব কি আর পালটেছে! শোনা তো যায় না। তবে কে যেন একবার বলছিল, সাপখোপের ধন্বন্তরি হয়েছে। শুনেছি, এখন পয়সাও কামায়।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "এখানে আসে না ?"

"না। অনেককাল আগে একবার দেখেছিলাম। আর হালে একদিন দেখেছি।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন। বললেন, "হালে মানে কতদিন আগে ?"

লখিন্দর যেন মনে-মনে একটা হিসেব করছিল। বলল, "তা ধরুন মাস হতে চলল।"

কিকিরাও একটা হিসেব করে নিলেন। রত্নেশ্বরের অসুস্থতাও ওইরকম সময়ের ঘটনা। দু-পাঁচদিন আগে-পিছে হতে পারে। পরে ভাল করে মিলিয়ে নেবেন হিসেবটা। অবশ্য মহারাজের ভাইয়ের ঘাটশিলায় আসার ব্যাপারটা নিশ্চিত করে জানতে হবে। সময়টাও সঠিকভাবে না জানলে দুটো ঘটনাকে মেলানো যাবে না।

"তুমি কি মহারাজের ভাইকে তখন দেখেছ ? মানে হালে যখন এসেছিল ?"

"দেখেছি।...আজ্ঞে, আমি বললাম না—স্টেশনের কাছে আমার একটা ছোট মনিহারি দোকান আছে। আমি দোকানে বসে বিক্রিবাটার হিসেব করছিলাম, এক সময় চোখ তুলতেই নজর গেল, রাস্তায় একটা লোক রিকশা থেকে নামছে। প্রথমে খেয়াল করিনি, পরে আন্দাজ হল—সহদেববাবু।"

"নটুমহারাজের ভাইয়ের নাম সহদেব ?"

"আজ্ঞে।"

"কী করল সহদেব ?"

"রেল স্টেশনের দিকে চলে গেল।"

"আর দেখনি ?"

"না।" বলেই লখিন্দরের কেমন কৌতূহল হল। বলল, "আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন, বাবু ?"

কিকিরা বুঝলেন, আপাতত আর কৌতূহল জানানো উচিত নয়। একটু সময় নিয়ে এগুনোই ভাল। বললেন, "না, তোমার মুখে শুনলাম কি না, তাই। গল্প-গল্প লাগছিল।...তা লখিন্দর, তুমি কি এখন দোকানে যাচ্ছ ?"

"সন্ধেকালে দোকানেই থাকি আমি।"

"বাঃ, ভালই হল। কাল যদি তোমার দোকানে যাই, দেখা পাব।"

"পাবেন। আমার নাম বললেই দোকান দেখিয়ে দেবে। দুর্গা ভাণ্ডার।"

কিকিরা আর কিছু বললেন না।

৬

নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। রাত হয়েছে খানিকটা। সামান্য আগে বৃষ্টি এসেছে, বাইরে বৃষ্টির শব্দ, গাছপাতাও বাতাসে দুলছে, শব্দ হচ্ছিল। এই বৃষ্টি বেশ আরামের। ঘরের জানলার দুটো খোলা, একটা বন্ধ। খোলা জানলা দিয়ে জলের ছাট আসছিল না।

কিকিরা বললেন, "আপনি তা হলে জানেন না ?"

লালাবাবু বললেন, "না।" বলে মাথা নাড়লেন। "আমি কথায় কথায় একবার শুনেছিলাম, নটুমহারাজের এক ভাই ছিল। তিনিই বলেছিলেন। সেই ভাই কোথায় থাকে, কী করে তা বলেননি। আমার তো মনে পড়ছে না।"

ঘরে নটুমহারাজ ছিলেন না। ওঁরা তিনজনই শুধু আছেন, কিকিরা, তারাপদ আর লালাবাবু।

কিকিরা লালাবাবুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অপেক্ষা করে বললেন, "ভাল করে মনে করুন। ভাই সম্পর্কে কখনও কিছু বলেননি নটুমহারাজ ?"

লালাবাবু মাথা নাড়লেন। "না। আমার খেয়াল হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ—নটুমহারাজ এটুকু বলেছিলেন যে, ভাইয়ের কোনো খোঁজখবরই তিনি রাখেন না।"

তারাপদ বলল, "লালাবাবু, আপনার সঙ্গে নটুমহারাজের জানাশোনা কতদিনের ?"

"বছর তিন-চার। একবার রতনদার সঙ্গে এসে দিন পনেরো ছিলাম। তখনই পরিচয়।... আমি পরে আরও দু-তিনবার এখানে এসেছি রতনদার সঙ্গে ; কিন্তু বেশিদিন থাকিনি। নটুমহারাজের সঙ্গে ওইভাবেই আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব। মানুষটিকে আমার ভাল লাগত।"

কিকিরা বললেন, "রত্নেশ্বরবাবুর সঙ্গে সহদেবের—মানে মহারাজের ভাইয়ের

পরিচয় ছিল ?”

“না। কেমন করে থাকবে ! থাকলে কি রতনদা আমায় বলত না !”

তারাপদ কিকিরাকে বলল, “স্যার, রত্নেশ্বর এখানে আসছেন পাঁচ-ছ' বছর। যদি তাই হয়, আর লখিন্দর যা বলল তা ঠিক হয়—তবে রত্নেশ্বর যখন থেকে আসছেন তার আগে থেকেই সহদেব এখান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ পরিচয় হওয়ার কথা নয়।”

কিকিরা কিছুই বললেন না।

লালাবাবু বললেন, “রায়বাবু, এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কী আছে ! নটুমহারাজকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।”

কিকিরা বললেন, “তা করতে হবে শেষপর্যন্ত। এখন কিছু বলবেন না। কিন্তু একটু দেখেনি।...আচ্ছা, লালাবাবু, লখিন্দর বলল—সহদেব এখন সাপের ধন্বন্তরি হয়ে গিয়েছে। পয়সাও কামাচ্ছে। তার মানে কী ? ও কি ওঝাগিরি করছে ?”

লালাবাবু বললেন, “কেমন করে বলব ! তবে ওঝাটঝার দিন চলে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়। এখন কে আর ওঝাগিরিতে বিশ্বাস করে !... একেবারে গাঁ-গ্রামে, যেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, সেখানে হয়ত ওঝার ডাক পড়ে এখনো। নয়ত কে আর সাপ কামড়ালে ওঝা ডাকে আজকাল। বিশেষ করে সহদেব যদি জামশেদপুর কি ঝাড়গ্রাম শহরের মতন জায়গায় থাকে ! হাসপাতাল পড়ে থাকতে ওঝা ! আমার বিশ্বাস হয় না।”

তারাপদ বলল, “আমাদের ইন্টেরিয়ার গাঁ গ্রামে, জঙলি জায়গায় এখনো অনেক অদ্ভুত কাণ্ড হয়। কাগজে একবার পড়েছিলাম, কোথায় যেন ডাইনি ধরা হয়েছিল। এ সমস্ত জায়গায় ওঝাও থাকে হয়ত।”

কিকিরা অন্য কথা ভাবছিলেন। অন্যমনস্কভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অল্পক্ষণ। তারপর বললেন, লালাবাবু, সহদেবের খোঁজটা কেমন করে পাওয়া যায় বলুন তো ?”

“তাই তো ভাবছি ! নটুমহারাজ ছাড়া...। তবে, তিনিও যদি না জানেন ! আগে মশাই, এত জানতাম না, ভাবিওনি। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি যখন নেই, উনিও কি কোনো খোঁজ রাখেন সহদেবের ! মনে তো হয় না।”

কিকিরা কিছু বললেন না।

খানিকক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

লালাবাবু উঠে পড়লেন। “বসুন আপনারা, আমি একবার গুরুচরণের খোঁজ করে আসি। দেখি, রান্নাবান্নার কতদূর এগুলো।”

উঠে গেলেন লালাবাবু।

কিকিরা সিগারেট চাইলেন তারাপদর কাছে।

সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে হঠাৎ একটু হেসে কিকিরা বললেন, "তারাবাবু, ধাঁধাটা কেমন লাগছে ? কোনো দিশে পাচ্ছ ?"

"না।"

" তা হলে তো ব্যাক ওয়াকিং করতে হয়।"

"মানে ?"

"পশ্চাৎগমন। পৃষ্ঠ প্রদর্শনও বলতে পারো।"

"সে আপনার ইচ্ছে। তবে স্যারকে এতদিন ধরে দেখছি তো, আপনি কি ইজিলি ব্যাক শো করবেন ?" ঠাট্টা করেই বলল তারাপদ।

সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে হালকা ভাবেই কিকিরা বললেন, "দেখো হে, আমি একটা ম্যাজিশিয়ান। স্টেজে ভূত নাচাতেও পারি। কিন্তু এই রক্তমাংসের ভূতকে কেমন করে ধরব ! আমিও বোকা হয়ে আছি।... বেচু দত্ত বলত, ছিপ ফেলার আগে পুকুরটা দেখে নেবে। ঠিক কথাই বলত, তারাবাবু ! এ পুকুরের কোথায় যে মাছ তলিয়ে আছে বুঝতে পারছি না।"

"আপনি কি ছিপ উঠিয়ে নিতে চান ?"

"ওঠাবার কথা উঠছে কোথায় ? এখনো কি ছিপ ফেলেছি !"

"তা হলে এসেছেন কেন ?"

"ফিফটিন থাউজেন্ডের লোভে। লোভে পড়ে হে ! মানুষ মাত্রেই লোভের দাস। যাবৎ লোভং তাবৎ জীবনং..."

তারাপদ হেসে উঠল হো-হো করে। "এই স্যাংসক্রিটটা কি গীতায় আছে ?"

কিকিরা গম্ভীর হয়ে বললেন, "রামায়ণে আছে। মহাভারতেও...।" বলতে-বলতে থেমে গেলেন। কান পেতে যেন কোনো শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন। বারান্দার দিকে কেউ কি এসেছে ? ইশারা করলেন তারাপদকে।

তারাপদ উঠে গেল। দরজার কাছে গিয়ে দেখল বারান্দাটা। অন্ধকার বারান্দা। একটা কুকুর কখন এসে উঠেছে বারান্দায়।

ফিরে এল তারাপদ। "একটা কুকুর। বৃষ্টিতে গা বাঁচাচ্ছে।"

"যা বলছিলাম, লোভ ! লোভে পড়ে রাবণবেটা গেল, গেল দুযুধন !"

"দুযুধন !"

"আরে বাবা, সব কথাতেই খুঁত ধরো কেন ? ছেলেবেলায় বাণী অপেরার যাত্রা দেখেছি। একজন ফেমাস অ্যাক্টার ছিল অপেরায়, ফটিক কয়াল। মেয়ের পার্ট করত ! মা-ঠাকুমার। তো সেই ফটিক কয়াল কখনও দুর্যোধন বলত না, বলত দুযুধন। নিজ পাপে মজিলি রে বাছা দুযুধন...।"

তারাপদ হাসির দমক সামলাতে না পেরে বিছানায় বসে পড়ল।

হাসি-তামাশার মধ্যেই কিকিরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। উঠে পড়ে খোলা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ফেলে দিলেন সিগারেটের টুকরো, বাইরের

অন্ধকার আর বৃষ্টি দেখলেন যেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, "সহদেব আমাকে ভাবাচ্ছে, তারাপদ। রত্নেশ্বরবাবুর কাছে সে-ই কি সেদিন এসেছিল ? যদি এসে থাকে, কেন এসেছিল ? ঘাটশিলায় সে এল কবে ? সেই দিন ? না, আগেই এসেছিল ? যদি আগেই এসে থাকে, ছিল কোথায় ? কবে সে ঘাটশিলা ছেড়ে পালাল ? কে-কে তাকে দেখেছে ? প্রশ্ন অনেক।"

তারাপদ বলল, "আগে আসার দরকার কী ? যদি জামশেদপুর বা ঝাড়গ্রাম থেকে এসে থাকে—তবে সেইদিনই এসেছে। চলেও গেছে সেইদিন। আসা-যাওয়ার গাড়ি পেতে তো তার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

"হতে পারে। যাই হোক সেটা কাল স্টেশনে গিয়ে লখিন্দরকে নিয়ে খোঁজখবর করলেই জানা যাবে।"

"আপনি নটুমহারাজকে বলবেন না কিছু ?"

"এখন নয়। একেবারে নয়। আগে দেখি।"

"নটুমহারাজ তাঁর ভাইয়ের কথা একবারও তোলেননি, কিকিরা।"

"দরকার হয়নি হয়ত। তা ছাড়া তিনি নিজের কথা খুব একটা বলেননি আমাদের।"

তারাপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। সামান্য পরে বলল, "কিকিরা, আমি কিন্তু এখনও ধাঁধায় আছি। সহদেবকেই যদি সন্দেহ করতে হয়—তবে বলব, সে কেন এখানে আসবে, কেনই বা রত্নেশ্বরবাবুকে খুন করার চেষ্টা করবে ? তার কিসের স্বার্থ ? তা ছাড়া রত্নেশ্বরবাবুকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল, এ-কথা ডাক্তার-পুলিশ কেউ তো বলবে না। থানায় কোনো ডায়েরি নেই। ডাক্তারবাবুর মাথাতেও সে-চিন্তা আসেনি। শুধু নটুমহারাজের সন্দেহ থেকে... !"

কিকিরা বাধা দিলেন। বললেন, "দাঁড়াও, আরও দু-একটা দিন যাক। খোঁজখবর করি আগে।... আমি ভাবছি, সহদেব সাপের ধন্বন্তরি হয়েছে—এই কথাটা রটলো কেমন করে ? কে রটাল ? মানেই বা কী কথাটার ?"

বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

লালাবাবু ঘরে এলেন। বললেন, "চলুন রায়বাবু, খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। আজকের বৃষ্টিটা ভালই হচ্ছে। সারারাত চলতে পারে।"

কিকিরা বললেন, "চলুন। এখানকার জলটা ভাল। দু-চার ঘণ্টা অন্তর খিদে পাচ্ছে। চলুন—।"

পরের দিন ঠিক সময়ে কিকিরারা লখিন্দরের দোকানে হাজির। সবে সন্ধে হয়েছে। লখিন্দর দোকানেই ছিল।

ওর দোকান ছোট। মনিহারি জিনিসপত্র বিক্রি হয়।

দোকানের মধ্যে জায়গা কম। একটা ছোট বেঞ্চি দোকানের বাইরে এনে

রাখল লখিন্দর। বসতে বলল। চা আনতে দিল।

সাধারণ কথাবার্তা সারতে-সারতে চা এসে গেল।

চা খেতে-খেতে কিকিরা সাবধানে কথা তুললেন সহদেবের। বললেন, "লখিন্দর, একটা উপকার করো না আমাদের।"

"কী বাবু?"

"সহদেবের একটু খোঁজখবর করে দাও না।"

লখিন্দর অবাক হল! "সহদেববাবুর খোঁজখবর! কেন?"

"সে তোমায় পরে বলব।... তুমি সেদিন তাকে দেখেছিলে—এটা ঠিক তো?"

"নিশ্চয়।"

"সহদেব তোমায় দেখেছিল?"

"না, উনি ব্যস্ত ছিলেন। রিকশা থেকে নেমেই স্টেশনের দিকে চলে গেলেন।"

"কোন রিকশা, তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ। মানিকের রিকশা।"

"সহদেবকে তা হলে রিকশাঅলা ছাড়াও বাজারের আরও কেউ-কেউ দেখেছে। তাই নয়? রেল স্টেশনের কেউ না কেউ দেখে থাকবে।"

"কেন দেখবে না? মানুষ কি বাতাস বাবু যে মিলিয়ে যাবে!"

"ঠিক, একেবারে ঠিক কথা।"

তারাপদ বলল, "তখন কি কোনো ট্রেন ছিল?"

লখিন্দর বলল, "ছিল মশাই।"

"কলকাতার দিকের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিকিরা আর তারাপদ একবার নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

লখিন্দর বলল, "আপনারা অ্যাত্ত খোঁজ করছেন কেন?"

"না, মানে— একটা কথা জানতে চাইছিলাম। নটুমহারাজ তো জানেনই না যে তাঁর ভাই এসেছিল।... আচ্ছা, লখিন্দর তুমি...মানে তুমি তো সহদেবকে ভালই চেনো! আগেও দেখেছ! ও কেমন দেখতে?"

লখিন্দর বলল, "ডাকাতের মতন চেহারা বাবু! মাথায় আমার চেয়েও লম্বা। হাত-পা ইয়া-ইয়া—লোহার মতন। মুখটা একেবারে নেকড়ে বাঘের মতন। দেখলে ভয় হয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, ধরেন আমার রং।"

"হাত-পায়ে কোনো খুঁত আছে?"

"না।"

কিকিরা যেন খানিকটা হতাশ হয়ে তারাপদর দিকে তাকালেন। বাঁ হাতে তবে চারটে আঙুল নয়! গ্লাভ্‌স-এর কথাটা মাথায় ঘুরতে লাগল।

তারাপদ বলল, "এখানে কোনো আস্তানা আছে সহদেবের ?"

"জানি না বাবু। অত খোঁজ রাখি না। সহদেববাবু তো এখানে আসেন না— আস্তানা থাকবে কেন ?"

কিকিরা এবার ওঠার জন্য ব্যস্ত হলেন। লখিন্দরকে বললেন, "তোমায় তবে সত্যি কথাটা বলি লখিন্দর। কাউকে বলো না। আমরা দু'জন কলকাতা পুলিশে চাকরি করি। একটা বড়রকম ডাকাতি খুন রাহাজানির জন্যে একজনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনেছিলাম, সে ঘাটশিলায় পালিয়ে এসেছে গা-ঢাকা দিয়ে। তার খোঁজেই এখানে আসা। তুমি একটু সাহায্য করো। আমাদের একবার নিয়ে চলো সেই রিকশাঅলার কাছে। তারপর একবার স্টেশনে খোঁজ করব, বাজারেও। তুমি সঙ্গে থাকবে। সহদেবকে কে যে সেদিন দেখেছে, কখন-কখন দেখেছে, কোথায় দেখেছে—জানতে হবে।" বলতে-বলতে কিকিরা পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে লখিন্দরের হাতে গুঁজে দিলেন।

লখিন্দর টাকা নেবে না। কলকাতার পুলিশের নাম শুনেই সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। পুলিশ যেখানকারই হোক, তার ছোঁয়া বাঘের ছোঁয়ার চেয়ে দু'গুণ। কী সর্বনাশ ! এঁরা পুলিশের লোক। লখিন্দর যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি !

টাকা ফেরত দেবার জন্য হাত-পা ধরে ফেলল কিকিরার।

কিকিরা বললেন, "তোমার ভয় নেই। কাজের জন্যে আমাদের কিছু খরচা করতেই হয়। তুমি টাকাটা রাখো। আর আমাদের একবার নিয়ে চলো রিকশাঅলার কাছে। স্টেশনে।"

লখিন্দর বাধ্য হয়ে বলল, "চলুন"।

৭

আজ আর বৃষ্টি ছিল না। আকাশে রোদ ছিল, মেঘও ভাসছিল টুকরো-টুকরো। মেঘলা হয়ে আসছিল মাঝে-মাঝে।

বাড়ির বাইরে একটা বড় নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন কিকিরা। পাশে লালাবাবু। তারাপদ পায়চারি করছিল কাছাকাছি। বেলা হয়েছে। দশটা বাজতে চলল।

লালাবাবু বললেন, "আমায় তো একবার কলকাতা যেতে হয়। নিজের কাজকর্মের কথা বাদ দিন, রতনদাকে ওদের হাতে ফেলে এসেছি, সবসময়েই দুশ্চিন্তা হয়।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। বললেন, "হ্যাঁ। আপনি ফিরবেন, আমরাও ফিরব। চলুন, কাল সকালের গাড়িতেই ফেরা যাক।"

"আপনারাও ফিরবেন ?"

"এখানে আপাতত আর কোনো কাজ দেখতে পাচ্ছি না। কলকাতাতেই আমাদের কাজ।... আচ্ছা, লালাবাবু—নটুমহারাজের এই ব্যাপারটার সম্পর্কে কী মনে হয় আপনার ?"

"কোন ব্যাপার ? ভাইয়ের কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ। মহারাজের ভাই সহদেব সেদিন এখানে এসেছিল। আমরা কাল নানা জায়গায় খোঁজ নিয়েছি। অন্তত চার-পাঁচজন তাকে দেখেছে। লখিন্দর, রিকশাঅলা মানিক, স্টেশনের এক টিকিট-চেকার আর একটা মুটে। তারা বলেছে, সহদেবকে তারা দেখেছে একদিন। সেই একদিনটা কিন্তু সেইদিনই—যেদিন নটুমহারাজের বাড়িতে ঘটনাটা ঘটে। সহদেব সেদিন কেন এসেছিল এখানে ? কেনই বা রাত্রের মধ্যেই পালিয়ে গেল ?"

লালাবাবু খানিকটা আগে কিকিরাদের মুখে সব কথা শুনেছেন। শুনে তিনি কিছু বলেননি। শুধু অবাক হয়ে এলোমেলো কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন। তাঁর কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তো বলবেন কী !

কিকিরা বললেন, "সহদেব কেন এসেছিল ? কার কাছে এসেছিল ? নটুমহারাজ কি কিছু জানেন না ? যদি না জানেন, তবে অন্য কথা। আর যদি জানেন, তবে কেন তিনি কথাটা লুকোবার চেষ্টা করছেন ?"

লালাবাবু মাথা নাড়লেন। "আমিও বুঝতে পারছি না। তবে রায়মশাই, এই ঘটনার সঙ্গে যদি ভাইয়ের সম্পর্ক না থাকে, তিনি বলবেন কেন ? অবশ্য আগে দেখতে হবে, ভাইয়ের আসার কথা সত্যিই তিনি জানেন কি না। তা আপনি নটুমহারাজকে জিজ্ঞেস করুন না সরাসরি।"

"ভাবছি। ভাবছি এখনই করব, না, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আগে সহদেবের খোঁজ করে তারপর কথাটা তুলব কি না।"

তারাপদ কাছে এসে দাঁড়াল। কাল রাত্রে বাদলা পোকার কামড় খেয়ে তার গালের একটা জায়গা লাল হয়ে আছে।

লালাবাবু বললেন, "কলকাতায় সহদেবকে কি পাওয়া যাবে !"

"যেতে পারে। ওই যে ওই লোকটা—কী নাম যেন তারাপদ—যার কাছে আমরা গেলাম, ওই তোমার বাজার ছাড়িয়ে একেবারে শেষে—পুরনো রাজবাড়ি..."

"গোকুল। বাজারের লাস্ট পয়েন্টে থাকে—ওপাশটায়। রুপোর গয়নাটয়না বেচাকেনা করে। সুদে টাকা খাটায়।"

"হ্যাঁ। একমাত্র ও-ই সহদেবের ঠিকানা বলতে পারল। সে অবশ্য বলল, সহদেবের সঙ্গে এর মধ্যে তার দেখা হয়নি।"

"সহদেবের ঠিকানা সে জানল কেমন করে ?"

"একবার কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়েছিল রাস্তায়। যোগাযোগ তখন থেকেই। গোকুল কলকাতায় গেলে সহদেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে

আসে।"

"এগারো নম্বর শেতল সরকার লেন।" তারাপদ বলল।

কিকিরা বললেন, "দোকান আর বাসা। একই বাড়িতে। দোকানটা কিসের জানেন, লালাবাবু ?"

"না।"

"বিষ বিক্রি হয়। সাপের।"

লালাবাবুর আর চোখের পাতা পড়ছিল না। বিশ্বাস করতেও পারছিলেন না। বললেন, "বলেন কি, সাপের বিষ বিক্রির দোকান আছে ? আমি তো জন্মেও শুনিনি মশাই !"

কিকিরা বললেন, "ওষুধবিষুধের কাজে সাপের বিষ লাগে শুনেছি। এমনও শুনেছি, অনেকে সাপ পোষে বিষ বিক্রি করার জন্যে। আবার সাপ নিয়ে যেখানে গবেষণা হয়, তার ল্যাবরেটারিও আছে। আমি নিজে এ-সব দেখিনি। জানি না। একজনকেই শুধু জানি, কুণ্ডু—জগৎ কুণ্ডু, সে কার্নিভালে সাপের খেলা দেখাত। মুখের মধ্যেও সাপের মুণ্ডু ঢুকিয়ে দিত দেখেছি। গা সিরসির করত আমার। কুণ্ডুর বাড়িতে নাকি সাপের খাঁচা ছিল।"

তারাপদ বলল, "সহদেবের নামে এখানে যা রটেছে, সাপের ধন্বন্তরি সে—সেটা গুজব। রটনা। একজন শুনেছে এক, বলেছে অন্য। সে আবার আরেক জনকে হয়ত বলেছে। এইভাবেই রটে গিয়েছে। তবে বোঝা যাচ্ছে, সহদেব সাপখোপ নিয়ে কোনো কারবার করে। সেটা কী—আমরা জানি না। জানতে হবে।"

লালাবাবু বললেন, "রায়বাবু, আমি ছাপোষা মানুষ, ঘরসংসার করে আর নিজের ছোট ব্যবসা নিয়ে পড়ে থাকি। জগতের বারো আনাই জানি না। আমি তো বুঝতে পারছি না, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে ?"

কিকিরা বললেন, "আমিও বুঝছি না। দেখুন শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় !... একটা কথা, লালাবাবু ?"

"বলুন ?"

"রত্নেশ্বরবাবু কতদিন আগে এই জমি কিনেছিলেন ?"

"বছর তিনেক। সঠিকভাবে জানতে চাইলে কলকাতায় ফিরে বলতে পারব। দলিলপত্র দেখে।"

"কার জমি ?"

"তা বলতে পারব না।"

"যখন কেনেন, তখন তো উনি বাড়ি করার কথাই ভেবেছিলেন।"

"তাই বলত, রতনদা। বলত, কিনে তো রেখে দিই। পরে দেখা যাবে।"

"তিনি আর কিছু বলতেন ?"

"আমি শুনিনি।"

"জমি নিয়ে কোনো মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল কখনো ?"

"না। জানি না।"

"আর-একটা কথা। ওঁর কোনো ব্যবসায়িক শত্রু ছিল না তো !"

লালাবাবু মাথা নাড়লেন। "ব্যবসায় কম্পিটিশন থাকে রায়বাবু। সব ব্যবসাতেই থাকে। কম্পিটিশন থাকা মানে শত্রু থাকা নয়। রতনদার কোনো শত্রু ছিল বলে আমি জানি না।"

ইতস্তত করে কিকিরা বললেন, "ভাইয়ের সঙ্গে তো ভালই সম্পর্ক ছিল !"

"কী বলছেন আপনি ! ভাই ছাড়া আর ছিল কে ? ছোট ভাইয়ের স্ত্রী আর তার ছেলেমেয়েরাই ছিল প্রাণ।"

"তা ঠিক। ওই নিমাই ছেলেটি কেমন ?"

লালাবাবু বললেন, "নিমাই আজ বারো-চোদ্দ বছর রতনদাদের বাড়িতে আছে। শান্তশিষ্ট স্বভাব। বিশ্বাসী। ওর ওপর বিশ্বাস আছে বলেই রতনদা হালে ওকে বেলেঘাটার কারবারটা একাই দেখতে দিয়েছিল। আর এখন নিমাই বেলেঘাটাতেই থাকে।"

কিকিরা কী মনে করে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। "চলুন, ঘরে যাওয়া যাক। গরম লাগছে।"

হাঁটতে হাঁটতে লালাবাবু বললেন, "কাল তা হলে আমরা কলকাতায় ফিরছি ?"

"হ্যাঁ। একসঙ্গেই ফিরব।"

"এখানে কি গুরুচরণকে রেখে যাব ? আবার যদি আসেন আপনারা ?"

"না। আমি অন্তত আর আসব না—এটাই যেন মহারাজ জানেন।"

তারাপদ বলল, "কিন্তু স্যার, যদি দরকার হয় ?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, "তারা, বনে পথ হারিয়ে গেলে বারবার ঘুরতে নেই। তাতে আরও নাজেহাল হতে হয়। তখন যে- কোনো একটা পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভাল। মনে রেখো, কোনো না কোনো সময় তুমি ঠিকই বনের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। কেননা বনের শেষ আছে।... আমি আর এখানে পড়ে থাকার কারণ দেখছি না। কলকাতায় বরং বেশি দরকার আমাদের। এক নম্বর দরকার সহদেবকে, আর দু'নম্বর দরকার চাঁদুকে।"

"চাঁদুকে ?"

"হ্যাঁ ; চাঁদুকে। চাঁদুকে দিয়ে একবার দেখাতে হবে রত্নেশ্বরবাবুকে। ভাল করে। সে নতুন ডাক্তার। তার যদি দরকার হয় চেনা কোনো বড় ডাক্তার নিয়ে আসবে। তিনি এসে দেখবেন রত্নেশ্বরবাবুকে।"

লালাবাবু বললেন, "রায়মশাই, রতনদাকে তো বাড়ির ডাক্তারবাবুই দেখেন। তিনিও বড় ডাক্তার এনেছিলেন।"

"সবই ঠিক লালাবাবু। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এখান থেকে যখন আপনারা রত্নেশ্বরবাবুকে নিয়ে যান—তখন ভেবেছিলেন তাঁর স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তারবাবুও তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু কেউ কি অন্য সন্দেহ করে ওঁর শরীর ভাল করে পরীক্ষা করেছিলেন? করেননি। কলকাতার হাসপাতালেও যখন ভরতি করেছেন রোগীকে—স্ট্রোকের রোগী বলেই করেছেন। হাসপাতালও কি আর অন্য কিছু ভেবেছে, না, সন্দেহ করেছে!... সে যাই হোক, চাঁদুকে আমার দরকার।"

দুপুরে গুমোট লাগছিল।

কিকিরারা যে-ঘরে আছেন তার জানলাগুলো মাঝারি। দক্ষিণের জানলাগুলো খোলাই ছিল। ওপাশে, জানলা ঘেঁষে গাছপালা, করবীঝোপ, কাঁঠালচাঁপা। ছায়া রয়েছে জানলার গায়ে। অন্যদিকের জানলা বন্ধ। রোদ আসছে তখনো।

এই গুমোটে ঘুম আসার কথা নয়। ইলেকট্রিক পাখা তো নেই যে বনবন করে মাথার ওপর ঘুরবে। মাঝে-মাঝে হাতপাখা নেড়েই গায়ের ঘাম শুকোবার চেষ্টা করছিলেন কিকিরা। তারাপদ ওরই মধ্যে দু-একবার তন্দ্রার ঘরে নাক ডেকে ফেলছিল।

শেষপর্যন্ত কিকিরা উঠে বসলেন বিছানায়। "ওহে, নোজ্ কলিং জেন্টস!"

সাড়া নেই তারাপদর।

আবার ডাকলেন কিকিরা।

তন্দ্রা ভেঙে গেল তারাপদর।

"ইয়ং ম্যান তোমরা, এত ঘুমোও কেমন করে! এই গরমে!"

"ঘুমোইনি, চোখ লেগে গিয়েছিল।"

"ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নোজ্ কলিং করছ, আবার বলছ ঘুমোওনি। নাও, উঠে পড়ো।"

হাই তুলতে-তুলতে উঠে বসল তারাপদ। বলল, "এই দুপুরে শুয়ে থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল স্যার?"

"চলো, ওই ঘরটা একবার দেখব।"

"কোন ঘর?"

"বসার ঘর। চাবি তো তোমার কাছে।"

চাবিটা চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছিলেন কিকিরা।

বিছানা ছেড়ে উঠে তারাপদ জল খেল। মাটির কুঁজোয় রাখা জল ঠাণ্ডা। জল খেয়ে বলল তারাপদ, "চলুন।"

নিজেদের ঘর থেকে বাইরে এসে তারাপদ দেখল, দুপুর শেষ হয়ে এলেও রোদ যেন গনগন করছে তখনও। তাকানো যায় না বেশিক্ষণ। বাতাস

গরম। সকালের সেই টুকরো মেঘগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। গরম বাতাসের ঝাপটায় গাছের পাতা ঝরছে মাঝে-মাঝে, শুকনো পাতা।

বারান্দা পেরিয়ে বসার ঘর।

তারাপদ তালা খুলল। আজ ক'দিনই কিকিরার কথা মতন ঘরটার তালা-চাবি তারাপদই রাখছে।

কিকিরা ঘরের জানলাগুলো খুলতে-খুলতে বললেন, "তারা, এই ঘরটার ছবি তোমার মনে থাকবে? মানে যেমনটি যা আছে—"

বাধা দিয়ে তারাপদ বলল, "এতবার দেখলাম, মনে থাকবে না!"

"থাকলেই ভাল।"

"আপনি এখন হঠাৎ কী মনে করে ঘরটা দেখতে এলেন আবার?"

"ঘর দেখতে আসিনি। এসেছি তীরগুলো দেখতে।"

"তীর!...আগেও দেখেছেন, স্যার।"

"দেখেছি। আবার দেখব। ভাল করে।"

"কেন?"

"এই তীরগুলো একেবারে মামুলি ব্যাপার নয় মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, নটুমহারাজ বলছেন, রত্নেশ্বর যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে, সেখানে হলুদ পালক লাগানো তীরের দু-একটা হলুদ পালকের ছেঁড়া টুকরো পাওয়া গিয়েছিল! মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ। তীরটাও আর পাওয়া যায়নি। গায়েব হয়ে গিয়েছিল।"

"ইয়েস!... এখন বাপু বলো তো, হলুদ পালকের তীরের ওই পালকের টুকরো কেন রত্নেশ্বরবাবুর গায়ের কাছে পড়ে থাকবে। আর কেনই বা তীরটা হাপিশ হয়ে যাবে?"

"নটুমহারাজও তো সেই কথাই বলেছেন।"

"বলেছেন বইকি! বলেছেন—বলেছেন—"বলতে-বলতে কিকিরা দেওয়াল থেকে তীর-রাখা ঝোলানো বোর্ডটা নামিয়ে নিলেন। পাতলা কাঠের বোর্ড, মাঝখানে সামান্য গর্ত, লম্বা করে গর্ত করা, এক-একটা তীর সেই গর্তের মধ্যে বসানো ছিল। দুটো তীর এখনো আছে, তৃতীয়টা নেই—হলুদ পালক লাগানো তীরটা।

কিকিরা টেবিলের ওপর বোর্ডটা রাখলেন। বার করে নিলেন দুটো তীর।

তীর-ধনুকের তীর সচরাচর যতটা লম্বা হওয়ার কথা—এই তীরগুলো তত লম্বা নয়। হাতখানেক লম্বা বড়জোর। এর গা বাঁশ-কঞ্চির নয়, কাঠ জাতীয় জিনিসেরও নয়, কোনোরকম পাকা বেতেরও নয়। লোহার। এমন লোহা, যাতে মরচে ধরে না। স্টিল ধরনের জিনিস, হয়ত মিশেল আছে ধাতুর। মুখের ফলা স্টিলের। বেশ ধারালো। তীক্ষ্ণ। আর পালকগুলো পাখিরই। কালো পালকঅলা তীরের পালকগুলোয় ধুলো জমেছে। যা স্বাভাবিক। লাল

পালক দেওয়া তীরের পালকগুলো মোরগের বলে মনে হল। কালোগুলো হয়ত কাকের। বাকি যেটা ছিল, হলুদ আর সবুজ পালক দেওয়া সেই তীরটা নেই।

তীরগুলো দেখতে-দেখতে কিকিরা বললেন, "তারাপদ, তোমার কী মনে হয় ?"

"কিসের ?"

"এই তীরগুলো দেখে— ।"

"ছোট। আসল তীর নয়।"

"আসল তীর হবে কেন ! এগুলো তো প্রাইজ পাওয়া তীর। প্রাইজে যে মেডেল দেয় সেটি আসল না, নকল ! প্রাইজটাই তো আসল—তাই না !"

তারাপদ মাথা নাড়ল। হেসে বলল, "আমি স্যার কোনোদিন মেডেল পাইনি। চোখে দেখেছি। আপনিই ভাল জানবেন। অনেক মেডেল পেয়েছেন— !"

"থার্টি সিক্স ! ছত্রিশ ! কিকিরা দি গ্রেট ম্যাজিশিয়ানের টার্গেট ছিল একশো। অর্ধেকও হল না। হাতটাই বেজুত হয়ে গেল। আর হাত গেলে ম্যাজিশিয়ানের থাকল কী ! আমাদের সময় হাতই ছিল আসল, এখন হয়েছে শুধুই চালাকি, বুদ্ধি। যার মগজে যত চালাকি বিদ্যে, সে তত বড় ম্যাজিশিয়ান।" বলতে-বলতে কিকিরা কালো-পালক দেওয়া তীরের মুখটা খুলে ফেললেন। খুলে অবাক হয়ে বললেন, "ওহে তারা, দেখো, দেখো। এই ধারালো মুখটা প্যাঁচ-সিস্টেমে তীরের আগায় আটকানো। বাঃ ! ফাইন। মুখটা আটকে তার ওপর শক্ত চামড়ার সরু ফিতে দিয়ে জড়ানো। ভেরি বিউটিফুল।"

তারাপদ বলল, "কী বিউটিফুল ?"

"কায়দাটা।... আরও একটা জিনিস দেখো, ফলার মাঝখানের ডগাটা—মানে যেটা গিয়ে গিঁথবে সেটার মুখ কত সরু। মুখ একেবারে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ যেন। তাই না !"

তারাপদ কিছু বলল না।

কিকিরা তীর দেখা শেষ করে বললেন, "তোমার কী মনে হয় ?"

"কিসের ?"

"নটুমহারাজ বলেছেন, তিনি ভাল তীরন্দাজ ছিলেন। ভাল কথা। ভেরি গুড। তিনটে তীর তিনি প্রাইজ পেয়েছেন। তিন বারে। ভেরি গুড। কিন্তু তারাবাবু, এ-সব তো পুরনো কথা। অনেক আগেই হয়েছে। এখনো তীরগুলো এত তকতকে থাকে কেমন করে ! হাউ ? আর এগুলো যদি এ-ঘরে এইভাবে খোলা পড়ে থাকবে দিনের পর দিন— মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—তা হলে কত ময়লা জমা উচিত ছিল বলো ! তেমন তো মনে হচ্ছে

না।”

তারাপদ সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, “আপনি কী বলতে চান ?”

“সেটাই তো বলতে পারছি না। নটুমহারাজ কি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন ?”

“তিনি ধোঁকা দেবেন কেন ? কাকে দেবেন ? কেনই বা দেবেন ? তিনি নিজে যদি জোর না করতেন লালাবাবু এইসব খুনখারাপির কথা ভাবতেন না।”

“আমিও তাই বলি। মহারাজ নিজেই সন্দেহটা জাগিয়েছেন। কিন্তু কেন ? তাঁর কিসের স্বার্থ ?”

“আমি তো...। স্যার, সহদেবের কথা শোনার পর থেকে আপনার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।”

“সন্দেহ ? না, ধোঁকা ?... সহদেব সম্পর্কে একটা কথাও তিনি বলেননি। কেন বলেননি ? ভাইয়ের সঙ্গে বনিবনা নেই বলে ? সম্পর্ক নেই বলে ? সেদিন সহদেব এখানে এল আর গেল— তিনি কিছুই জানলেন না ? সহদেব কোথায় এসেছিল ! কার কাছে ? রিকশাঅলা মানিকের কথা যদি সত্যি হয়— তবে বলতে হবে— এই বাড়ির দিকেই কোথাও এসেছিল সহদেব। মানিক যেখান থেকে সহদেবকে রিকশায় তোলে, সেটা এদিকেরই কোনো জায়গা থেকে।

তারাপদ কিছুই বলল না।

তীর-রাখা বোর্ডটা দেওয়ালে জায়গামতন ঝুলিয়ে রাখলেন কিকিরা। রাখার সময় দেওয়ালে হুক-পেরেকগুলো দেখলেন নজর করে। একটু যেন হাসলেন। বোর্ড রেখে ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেন অন্যমনস্কভাবে।

“তারা, এই টেবিলে রত্নেশ্বর বসেছিলেন। তাই না !”

“হ্যাঁ।”

“তাঁর পিঠের দিকের জানলা খোলা ছিল নিশ্চয়। গরমের দিন। জানলা বন্ধ করে কেউ কি বসে ?”

“না। মনে হয় না।”

“জানলার ওপাশে বাতাবিলেবুর গাছ। কত বড়। তাই না ?”

“হ্যাঁ।”

কিকিরা হঠাৎ বললেন, “নটুমহারাজকে কি কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যাবে ? গেলে ভাল হত।”

তারাপদ বলল, “বলে দেখুন।”

কলকাতায় ফিরে এসে চন্দনকে পাওয়া গেল। দিন দুই হল ফিরে এসেছে ও।

চন্দনের মেডিকাল মেসে এসে তারাপদ বলল, "ফিরে এসেছিস! বাঁচা গেল। তোর জন্যে ছুটতে-ছুটতে এলাম।"

"তোরা কবে ফিরেছিস?"

"কাল।... আজ বিকেলে তোর ডাক পড়েছে। কিকিরা ওয়েট করছেন।... শোন, আমি এখন অফিসে যাচ্ছি। ক'দিন কামাই হয়ে গেল। বিকেলে আমি কিকিরার কাছে চলে যাব স্ট্রেট। তুই ওখানে চলে যাস।"

চন্দনের তাড়া ছিল। হাসপাতালে যেতে হবে। দেরি হয়ে গিয়েছে খানিকটা। বলল, "আমি ফিরে এসেই খোঁজ করেছি। বগলাদা বলল, তোরা ফিরিসনি। এমনিতেই আজ আর-একবার খোঁজ করতে যেতাম। তা ব্যাপার কেমন দেখলি?"

"গোলমেলে। অনেক কথা। এখন আর সময় নেই। আমি চলি। তুই কিকিরার কাছে গেলেই শুনতে পাবি। চলি।"

তারাপদ আর দাঁড়াল না।

বিকেলে চন্দন যথারীতি কিকিরার কাছে হাজির। কলকাতাতেও বর্ষা নেমে গিয়েছে পাকাপাকিভাবে। রোজই দু-চার পশলা বৃষ্টি হচ্ছে।

বৃষ্টির মধ্যেই চন্দন এল। অল্পসল্প ভিজেছে। হাতের ছাতায় বৃষ্টির ছাট আটকায়নি।

কিকিরা একটা শুকনো তোয়ালে এগিয়ে দিলেন। "এসো, চাঁদু। নাও মুখ-হাত মুছে নাও। আমি তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

হাত- মুখ মুছে বসল চন্দন। বলল, "কেমন কাটল ঘাটশিলায়?" বলে হাসল একটু। "মানে কী দেখলেন!"

"বসো আগে। চা খাও। বলছি।"

"তারা বলছিল, গোলমেলে ব্যাপার।"

"গোলমেলে তো হবেই। জগৎ সংসারে কোন্‌টা সোজা, বাবা? এই যে আমাদের চোখ, নাক, কান এগুলোই কি কম গোলমেলে! বাইরেটা সোজা, ভেতরটা জটিল। তুমি ডাক্তার, কত গোলমেলে অসুখ নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায় তোমাদের। তাই না?"

চন্দন হেসে বলল, "আপনাদের কথা বলুন! বাড়ি গিয়েও আমার শান্তি হচ্ছিল না।"

"কেমন করে হবে বলো! আমরা হলাম তিন চাকার গাড়ি। দু'চাকায়

চলতে গেলে টলে যাই।”

চন্দন জোরে হেসে উঠল।

কিকিরা মজা করে বললেন, “থ্রি হুইলার টেম্পু!”

ঘাটশিলার কথা শুরু করলেন কিকিরা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। শব্দটা জোর নয়। জলো বাতাস আসছিল ঘরে। মন দিয়ে কিকিরার কথা শুনছিল চন্দন। মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করছিল।

এরই মধ্যে চা এল।

চা খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ কিকিরা চন্দনকে ঘাটশিলার ব্যাপারটা বোঝালেন। শেষে বললেন, “আজ তোমায় নিয়ে হরিশ মুখার্জিতে যাব। তারা আসুক। এলেই বেরিয়ে পড়ব!”

“আমি সেখানে গিয়ে—”

“রত্নেশ্বরবাবুকে ভাল করে দেখবে একবার। তাঁর অসুখের রিপোর্টগুলোও পড়বে।”

“স্যার, এটা কি ভাল হবে? ওঁকে অন্য ডাক্তাররা দেখেছেন, হাসপাতালেও ছিলেন উনি। সিনিয়ার ডাক্তাররাও নিশ্চয় দেখেছেন। আমি জুনিয়ার ডাক্তার। তা ছাড়া এইসব কেস আমি দেখিনি। আমার ঠিক এক্সপিরিয়ান্স নেই।”

“তবু একবার দেখবে।”

“আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় দেখব।”

“আমার যেটা জানার দরকার তোমায় বলি। তুমি ভাল করে দেখবে— ওঁর শরীরে কোনো ইনজুরি আছে কি না!”

চন্দন অবাক হল। বলল, “একটা লোক যদি আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যায়—তার ইনজুরি থাকতেই পারে। কম বা বেশি। তার ওপর আজ মাসখানেক পরে— সেই ছোটখাট ইনজুরির কী পাব?”

“পাও না-পাও দেখবে।”

মাথা নাড়ল চন্দন। দেখব।

কিকিরা বললেন, “আরও একটা খবর জোগাড় করতে হবে। আজ সকালেই আমি বেরুচ্ছিলাম, বকা দত্ত এসে আমার কাজ পণ্ড করে দিল।”

“বকা দত্ত আবার কে?”

“শিপ মার্চেন্ট।”

“শি-প মার্চেন্ট! আরে বাব্বা, সে তো তবে কোটি কোটিপতি... !”

“আরে না না, এ শিপ জলে ভাসে না। জাহাজি ব্যাপার নয়। বকা দত্ত হল গুঁড়ো মশলার কারবারি। ওদের মশলার ট্রেড মার্ক, জাহাজ। একসময় নাকি জাহাজে করে মশলাপাতি আমদানি রপ্তানি হত এদেশে—তাই ওরা জাহাজকে ট্রেড মার্ক করেছে। আমি বকার নাম দিয়েছি শিপ মার্চেন্ট।”

চন্দন বেজায় জোরে হেসে উঠল।

কিকিরা বললেন, "বড্ড বকে। বক্কেশ্বর। তা সে এল। কিছুতেই ওঠাতে পারি না। যখন উঠল ততক্ষণে বেলা হয়ে গিয়েছে। আর তেড়ে বৃষ্টি এসে গেল। আটকে গেলাম। জরুরি কাজটা হল না।"

"কী কাজ ?"

"তুমি বলতে পারবে। এই কলকাতা শহরে সাপখোপের বিষ নিয়ে কোথায় ব্যবসা হয় জানো ?"

চন্দন ভীষণ অবাক ! তার মাথায় ঢুকছিল না। বলল, "না। কেন ?"

"শেতল সরকার লেন বলে একটা গলি আছে। শুনলাম গলিটা নাকি নিমতলার দিকে। সেখানে সহদেব থাকে। ওর কথা তো তোমায় বলেছি।"

চন্দন একটু আগেই শুনেছে সহদেবের কথা।

কিকিরা বললেন, "আমি এ-ব্যাপারে কিস্যু জানি না, চাঁদু ! তবে কোথায় যেন পড়েছি, বিষাক্ত পোকামাকড়, সাপ, বিছে-টিছে সাপ্লাই করার ব্যবসাও কেউ-কেউ করে। এগুলো নিয়ে নাকি গবেষণার কাজ হয়, ল্যাবরেটারির কাজে লাগে।"

চন্দন বলল, "তা হতে পারে। আমি খোঁজ করতে পারি। জুলজির লোকরা জানবে। ফিজিওলজির লোকরাও জানতে পারে।"

এমন সময় তারাপদ এল।

এসে বলল, "ভাল বৃষ্টি হচ্ছে, তবে এখনো রাস্তায় জল দাঁড়ায়নি। গাড়িঘোড়া চলছে। বৃষ্টিটা শুনলাম নর্থেই বেশি হয়েছে।"

কিকিরা বললেন, "তোমরা বসো, আমি তৈরি হয়ে নিই।"

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার সেই নাতি কুশি আসছে। মিনিবাসের কাশীর ভাই কুশি।"

"ওকে টাইম দেওয়া আছে। আসারই কথা।" কিকিরা বললেন।

হরিশ মুখার্জির বাড়ির বাইরের ঘরে বসে কিকিরা, তারাপদ আর যজ্ঞেশ্বর কথা বলছিলেন। যজ্ঞেশ্বরকে দেখলেই বোঝা যায়, নিরীহ ভিতু মানুষ। ব্যবসাদার বলে মনে হয় না, চোখে-মুখে চালাকির চিহ্ন নেই, চটপটে স্বভাবেরও নয়। কথায়, বার্তায় বিনয়ী।

কোনোরকমে সময় কাটানোর মতন করে কথা হচ্ছিল। বৃষ্টি এখন নেই। তবে বাদলার ভাবটা এই প্রথম রাতেই বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে।

আরও খানিকটা পরে চন্দন আর লালাবাবু ঘরে এলেন।

কিকিরা তাকালেন।

চন্দন সামান্য গম্ভীর।

"কেমন দেখলে ?" কিকিরা বললেন।

"একই রকম।... একটা ব্যাপার মনে হল, রত্নেশ্বরবাবুর চোখ যেন একেবারে ভ্যাকান্ট নয়। উনি—কী বলব, বোধ হয় বুঝতে পারছেন মানুষজন।"

লালাবাবু বললেন, "পায়ের আঙুলগুলো আরও বেশি নাড়াচ্ছে।"

কিকিরা বললেন চন্দনকে। "তোমায় যা বলেছিলাম... !"

"দেখেছি। গায়ে পুরু করে পাউডার মাখানো রয়েছে। তবু আমার মনে হল, হাত, পিঠ, বুকে আঁচড়ানোর দাগ আছে।"

লালাবাবু বললেন, "প্রথমে আরও বেশি ছিল। রতনদা এমনিতেই একটু গা, বুক, হাত চুলকোত, মানে আঁচড়াত। তার ওপর ঘাটশিলার গরমে গায়ে ঘামাচি হয়েছিল, গলা, বুক, পিঠ ভরে গিয়েছিল। আমরা যখন প্রথমে নিয়ে এলাম—সারা গা আঁচড়ে আঁচড়ে দগদগে করে ফেলেছে। এখন তো আর হাত নাড়তে পারে না, অনবরত পাউডার দেওয়া হচ্ছে, পাখা চলছে।"

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "কোথাও কোনো ক্ষত ?"

চন্দন মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, ওঁর বাঁ দিকের হাতের ওপর কিছু ফুটেছিল, বা কেটে গিয়েছিল। জায়গাটা এখনো লালচে হয়ে আছে সামান্য। ইরাপসান রয়েছে। কাটা জায়গায় চামড়া পড়েছে বটে নতুন, তবে চারপাশে হামের মতন ইরাপসান।"

কিকিরা শুনলেন। ভাবলেন কিছু। তারাপদকে বললেন, "তারাপদ, ঘাটশিলার বসার ঘরের পেছনের জানলাটা কোন দিকে ছিল ? মানে, যে-চেয়ারে বসেছিলেন রত্নেশ্বরবাবু, তার কোন দিকে !"

"বাঁ দিকে।"

কিকিরা তখন আর কিছু বললেন না, ইশারা করলেন উঠে পড়ার।

বাইরে এসে কিকিরা বললেন, "একটা ট্যাক্সি ধরতে পারবে ?"

"বাড়ি ফিরবেন তো ?"

"হ্যাঁ, বাড়ি। তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাব।"

"চলুন বড় রাস্তায়, দেখি... ।"

এখন আর বৃষ্টি নেই। সারা বিকেলের বৃষ্টিতে আবহাওয়া ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। বাতাস কেমন ভারী হয়ে আছে, আর্দ্র।

চন্দন বলল, "কী ভাবছেন কিকিরা ?"

"ভাবছি, নটুমহারাজের কথাই হয়ত সত্যি।... তবে যতক্ষণ না সহদেবকে দেখছি—বলতে পারছি না জোর করে।"

"আপনি বলছেন, এটা খুনের ঘটনা ?"

"খুনের চেষ্টা। অ্যাটেম্প্ট।"

"কে করেছে ?"

"সেটাই রহস্য। কে করেছে ? কেন ? কী তার স্বার্থ ?"

"মানে মোটিভ ?"

"হ্যাঁ। রত্নেশ্বরকে কে খুন করার চেষ্টা করবে ? কেনই বা করবে !... শোনো চাঁদু, কাল আমি যেমন করে হোক সহদেবকে খুঁজে বার করব। তোমাদের পাব কখন ?"

"বিকেলে।"

"একটু তাড়াতাড়ি করবে। নিমতলার দিকে গলিঘুঁজি খুঁজে বার করা কষ্টের। তার ওপর যদি বৃষ্টিবাদলা হয়...।"

তারাপদ বলল, "অফিসে ওদিককার লোক আছে। শেতল সরকার লেনের খোঁজটা নিয়ে নেব আমি।"

"ভালই হবে। কাল চারটে সওয়া চারটে নাগাদ..."

"স্যার, আমার অফিস !"

"ছুটি নিয়ে নিয়ো ঘণ্টাখানেক আগে। বোলো, কিকিরাকে নিমতলায় নিয়ে যেতে হবে।"

চন্দন হেসে ফেলল।

তারাপদ পালটা ঠাট্টা করে বলল, "নিয়ে যাচ্ছি বলতে পারব না, স্যার ; বলব— যেতে হবে আমাদের।"

৯

একপাশে, ঘুপচি মতন একটা জায়গায় বসে সহদেব কী যেন করছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলল।

কিকিরা সহদেবকে দেখছিলেন। লখিন্দরের কাছে যেমন বর্ণনা শুনেছিলেন, চেহারায় তার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। লখিন্দর খানিকটা বাড়িয়ে বলেছে, বা তার চোখ ভুল করেছে। সহদেব মাথায় অবশ্য খুবই লম্বা। কিন্তু তার চেহারা বিশাল নয়। গড়াপেটা, শক্ত। চেটালো হাড় হাতের। গায়ের রং কালো। মুখ ভোঁতা ধরনের। বড়-বড় চোখ। মাথার চুল রুক্ষ।

"কী চাই ?" সহদেব বলল।

কিকিরা চারপাশে তাকালেন। দোকানের মতনই সাজানো ঘর। একপাশে বড় অ্যাকুইরিয়ামে মাছ। আর একটা কাচের বাক্সে কিছু বিছে-পোকামাকড়। অন্যদিকে তারের জাল দেওয়া চৌকো খাঁচায় তিন-চারটে সাপ। বেজি গোছের একটা জন্তু কাঠের তাকের ওপর, যদিও মরা।

"কী চাই ?"

"আপনিই সহদেববাবু !"

"হ্যাঁ।"

"এই যে দোকানটা—বাইরে লেখা আছে 'রেপটাইল এম্পোরিয়াম'—এটা আপনারই দোকান তো ?"

"হ্যাঁ। তবে এটা মুদি-মশলার দোকান নয়, শাড়ির এম্পোরিয়াম নয়—। এখানে অন্য ব্যাপার..."

হাসলেন কিকিরা। "জানি। আমি একটা জরুরি দরকারে এসেছি।"

"কী দরকার ?"

"আমার একটু বিষ দরকার। ধরুন দশ মিলিগ্রাম বা এক চামচ।"

"বিষ।" সহদেব থতমত খেয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখছিল কিকিরাকে। লোকটা বলে কী ?

"এই ধরুন পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।"

সহদেব এগিয়ে এল। তিরিক্ষে গলায় বলল, "আপনি কে মশাই ? কে আপনি ? কী বলছেন ? আমি বিষ বিক্রি করি। এটা বিষ বেচার দোকান ? কে বলেছে আপনাকে— ?"

কিকিরা মুখ টিপে হাসলেন। "গোকুল। ঘাটশিলার গোকুল...।"

সহদেব চমকে উঠল। বিশ্বাস হল না। মাথা নেড়ে বলল, "গো-কু-ল ! গোকুল বলল ! সে কেমন করে বলল ! আমি তো বিষের কারবার করি না। কে আপনি ?"

"আপনি বিষ বেচেন না ?"

"না। আমি নিজে বেচি না।"

"আমি শুনলাম..."

'ভুল শুনেছেন। এখানে দু-একটা ওষুধের কোম্পানি আছে। তাদের যখন বিষধর সাপের দরকার হয়, বিষটিষের জন্যে—আমায় জানালে আমি আমার চেনাজানা সাপুড়েদের খবর দি। ...বিষ বেচার লোকও আছে। অন্য। তারা বেআইনি কারবার করে না।"

"তা হলে এগুলো ?"

"এগুলো মামুলি সাপ। ...কলেজের কাজে ব্যাঙ, ইঁদুর, গিনিপিগ, পোকামাকড় দরকার হলে আমি অর্ডার নিয়ে সাপ্লাই করি।"

"ও ! তা হলে আপনি আপনার দাদাকে বিষ সাপ্লাই করেননি ?"

"দাদা ! কে দাদা ?"

"নটুমহারাজ।"

সহদেব যেন কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। সে বোধ হয় ভাবতেও পারেনি—নটুমহারাজের নাম তাকে শুনতে হবে ! অবাক, বিহ্বল, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সহদেব।

কিকিরাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। শেষে বললেন, "তা হলে আপনাকে সত্যি কথাটা বলি সহদেববাবু। আমি হলাম 'কেটিসি' গোয়েন্দা এজেন্সির লোক। আমাদের কোম্পানির আরও দু'জন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একটা মামলা হাতে নিয়েছি। তদন্ত করছি। ঘাটশিলায় রত্নেশ্বরবাবু

বলে এক ভদ্রলোককে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। নটুমহারাজের বাড়িতে। আপনি খুনের দিন সেখানে হাজির ছিলেন। সন্ধেবেলায়। আপনাকে অনেকেই দেখেছে।”

সহদেব কেমন যেন হয়ে গেল। “আমি খুন করেছি? কী বলছেন আপনি?”

“করেননি?”

“না, না। ধর্মত বলছি, না। বিশ্বাস করুন।”

“নটুমহাজকে বিষ জুগিয়ে দিয়েছিল কে?”

“আমি জানি না।”

“সহদেববাবু, আপনার বাঁ হাতটা আমি দেখতে পাচ্ছি। চারটে আঙুল।”

সহদেব নিজের বাঁ হাত তুলল। দেখল। দেখাল কিকিরাকে। বলল, “একটা আঙুল বাদ দিতে হয়েছে অপারেশন করে। বিষাক্ত একটা বিছে কামড়েছিল।”

“রত্নেশ্বরবাবুর ঘটনাটা ঘটার পর—ওই বাড়ির বাইরে একটা কর্মাশিয়াল গ্লাভ্‌স পাওয়া যায়। বাঁ হাতের। চারটে মাত্র আঙুল।’

সহদেব এবার বসে পড়ল চেয়ারে। মাথা তুলতেও পারছিল না।

কিকিরা দু' মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন আবার। চন্দন আর তারাপদ ভেতরে এসে দাঁড়াল।

শেষপর্যন্ত মুখ তুলল সহদেব। তাকিয়ে থাকল। দেখল তারাপদদের। তারপর বলল, “আমি খুন করিনি। বিশ্বাস করুন। দাদাকেও আমি বিষ জুগিয়ে দিইনি।”

“কিন্তু আপনি সেদিন ও-বাড়িতে গিয়েছিলেন।”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“সে অনেক কথা।”

“কী কথা?”

“এভাবে বলা যায় না। আপনারা বুঝবেন না।”

“আপনি কতকাল আগে ঘাটশিলা ছেড়ে চলে এসেছিলেন?”

“অনেকদিন।”

“কেন?”

“আমায় থাকতে দেয়নি।”

“আপনি ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?”

“না। ডাকাতির মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছিল।”

“কে জড়িয়েছিল?”

“দাদা।”

"কেন ?"

"বলেছি তো, অনেক কথা। ...ওই ভদ্রলোক কেমন আছেন ?"

"আপনি জানেন না ?"

"খোঁজ নিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, ওঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।"

"উনি বেঁচে না-থাকার মতনই।"

"ইস ! ...কার মরার কথা, আর কে মরে !"

কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন, তারপর সহদেবকে বললেন, "আপনি কি আমাদের সব কথা বলবেন ?"

"বলব ! এখন পারছি না। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।"

"জল খান। বসুন খানিকক্ষণ।"

সহদেব উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে খেল। কিকিরার ইশারায় চন্দন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিল সহদেবকে।

সিগারেট ধরাল সহদেব। কিকিরাও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না।

হঠাৎ সহদেব বলল, "কার পাপ কে বয় ! পাপ করল আমার দাদা, আর তার দায় পড়ল আমার ঘাড়ে। জগতে এমনই হয়।"

কিকিরা বললেন, "সহদেববাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন ?"

"কোথায় ? থানায় ?"

"না, না, থানায় নয়। এই কাছেই। হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে। যেখানে রত্নেশ্বরবাবু আছেন। তাঁকে দেখবেন একবার। আমার মনে হয় ওঁকে দেখলে হয়ত আপনি নিজের থেকেই সব কথা বলতে চাইবেন।"

কী যেন ভাবল সহদেব। বলল, "যেতে পারি। কিন্তু আপনারা যদি আমায় থানায় নিয়ে যান।"

"না, যাব না। বিশ্বাস করতে পারেন।"

"নিয়ে গেলে আমি কিছু বলব না। আপনারা একটা কথাও আমার মুখ থেকে জানতে পারবেন না।"

তারাপদ কিছু বলল কিকিরাকে। কিকিরা মাথা নাড়লেন। সহদেবকে বললেন, "আপনি চলুন। থানা থেকে আমার আসিনি। আপনাকে নিয়েও যাব না থানায়। আমাদের যা জানার, সেটা জানলেই খুশি হব।"

"বেশ, তবে চলুন। এখন ক'টা বেজেছে ?"

"ছ'টা, সোয়া ছ'টা।"

"দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে পারব ?"

"পারবেন না কেন ?"

"তা হলে চলুন।"

ঘরে সকলেই ছিলেন : লালাবাবু, কিকিরা, যজ্ঞেশ্বর। ছিল তারাপদ আর চন্দন।

সামান্য আগে সহদেব গিয়েছিল রত্নেশ্বরের ঘরে। সঙ্গে ছিলেন লালাবাবু আর চন্দন।

রত্নেশ্বর ঘুমিয়ে পড়েননি। যেমন থাকেন—অর্ধচেতনার মধ্যে— হুঁশ আছে কিন্তু সাড়া নেই— সেইভাবেই শুয়ে ছিলেন।

সহদেবকে তিনি চিনতে পারুন না-পারুন, তাকিয়ে থাকলেন। চোখ সামান্য যেন চঞ্চল হল, চোখের পাতা পড়ল বার কয়েক। পায়ের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। হাতের আঙুল বেঁকাবার চেষ্টাও যেন করলেন, পারলেন না।

চন্দন বলল, "আর না, চলুন।"

বাইরের ঘরে এসে চন্দন বলল, "উনি বোধ হয় এই অবস্থাতেও আপনাকে আন্দাজ করতে পারছিলেন সহদেববাবু, উত্তেজিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন...।"

সহদেব কিছুই বলল না। তাকে বড় হতাশ, বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

হরিশ মুখার্জির বাড়ির বসার ঘরে সকলেই রয়েছে তখন। আলো জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সহদেব বলল, "দেখুন, আমার যা বলার, বলব। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ নেই। আমি খুন করিনি।"

একটু থেমে আবার বলল সহদেব, "গোড়া থেকেই সব বলি আপনাদের। তবে আগাগোড়া সব কথা কি বলা যাবে! আপনারা বুঝে নেবেন।

"আমার আর আমার দাদার সম্পর্ক রক্তের নয়। আমার দাদা পালিত পুত্র। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। মা-বাবার কোনো সন্তান ছিল না বলে একসময় দাদাকে ওঁরা পালিত পুত্র হিসেবে নিয়েছিলেন। আট বছর পরে আমার জন্ম। আমি আসার পরও মা-বাবা দাদাকে অনাদর, অবহেলা করেননি। বাড়ির বড় ছেলের মতনই সে থাকত।

"বাবা মারা যাওয়ার সময় দাদার বয়েস ছিল বাইশ। আমার চোদ্দ। দাদা তখন থেকেই বেয়াড়া। মাঝে-মাঝেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেত। কোথায়-কোথায় ঘুরত, কী করত, কেউ জানে না। তবে দাদার টাকা-পয়সার ওপর টান ছিল, লোভ ছিল। মায়ের গয়নাগাটি সে চুরিচামারি করেছে। ধরাও পড়েছে। গ্রাহ্য করেনি।

"মা মারা গেলেন দাদার বয়েস যখন তিরিশ। আমি বাইশ বছরের। মা মারা যাওয়ার পর আমাদের মাথার ওপর আর কেউ থাকল না। দাদা হল মুরুব্বি। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল শুরু করে দিল দাদা। তার

চেয়েও বড় কথা, ওই যে 'মহারাজ' কথাটা, ওটা কথার কথা নয়। মুসলমান বাদশাদের আমলে মহারাজ মান সিংকে—আমাদের পূর্বপুরুষ সাহায্য করেছিলেন রসদ আর লোকজন দিয়ে। মান সিংয়ের দয়ায় আমরা বিস্তর জমিজায়গার জমিদারি পাই, সেইসঙ্গে পাই ওই উপাধি 'রাখাওয়া রাজা'। রাখাওয়া শব্দটা পরে বাদ দিয়ে মহারাজই বলা হত। ওটা আমাদের বংশগত উপাধি। বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তানই উপাধিটা ব্যবহার করতে পারবে—অন্য কেউ নয়। উপাধি যার, সে-ই বিষয়-সম্পত্তির বড় ভাগিদার, তার কথাই প্রজারা মানবে। তার অধিকার আর সুবিধে অনেক বেশি।

"দাদার সঙ্গে আমার গোলমাল শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই। দাদা এত নীচ, ইতর যে, আমাকে পড়াশোনাও শেষ করতে দেয়নি। নয়ত আমি পাটনা থেকে ল' পাশ করতাম কবে!

"আইনসম্মতভাবে আমিই তো সব পাওয়ার যোগ্য। দাদা তো পালিত পুত্র। কিন্তু দাদা বছরের পর বছর আমাকে ধোঁকা দিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে অন্যদের শত্রু করে তুলেছে। দুর্নাম রটিয়েছে আমার। এমনকি খুন করার চেষ্টাও করেছে। পারেনি।"

"শেষপর্যন্ত দাদা চালাকি করে আমাকে ডাকাতি আর রাহাজানি মামলায় ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিল। হাত ফসকে আমি বেরিয়ে আসি।

"তখন থেকে আমি রুজি-রোজগারের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। শেষপর্যন্ত কলকাতায় আমার ওই দোকান নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আমার যে কী কষ্টে দিন কেটেছে, আপনারা জানেন না। এখনো আমি গরিব। আর আমার দাদা, যার ভিখিরি হওয়ার কথা, সে মহারাজ। আমার কী ভাগ্য!"

সহদেব চুপ করল। করে অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে সস্তা সিগারেট বার করে ধরাল।

অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সহদেব কী বলতে যাচ্ছিল, কিকিরা বাধা দিয়ে বললেন, "নটুমহারাজের সঙ্গে আপনার সম্পত্তি আর টাকা পয়সা নিয়ে বিরোধ চলছিল?"

"চলছিল। তবে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। শেষে যখন শুনলাম—দাদা আমার মায়ের চিতার জমিও এক হোটেলঅলাকে বিক্রি করে দিয়েছে, তখন—"

"মায়ের চিতার জমি?"

"ওই জমিটাতে আমার মায়ের সৎকার করা হয়েছিল। ওটা আমাদের জমি।"

লালাবাবু বললেন, "কে বলল! ও জমি তো অন্য লোকের। আমি দলিল দেখেছি হালে।"

"আপনি জানেন না। দাদা বেনামি করে রেখেছে অনেক জমি। ওই জমি

এক বিহারি বাবুর নামে বেনামি করা ছিল। মাধো সিং।"

লালাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "হ্যাঁ। ঠিক।"

কিকিরা বললেন, "আপনি কি ওই জমি... ?"

সহদেব বলল, "দাদাকে আমি লিখলাম, তুমি একা সর্বস্ব লুট করে খাচ্ছ। আমি ভিখিরির মতন একপাশে পড়ে আছি। যদি তুমি আমাকে আমার প্রাপ্যর কিছু অন্তত না দাও, তবে এবার আমি তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে আমি সাবধান করে দিলাম।"

"তারপর ?"

"দাদা দরাদরি করতে নামল।"

"চিঠি লিখে ?"

"না, লোক মারফত।"

"কোন লোক ?"

"গোকুল।"

"আমি সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত নামলাম।"

"নটুমহারাজ রাজি হলেন ?"

"হ্যাঁ। রাজি হবে না কেন! আমি তো আট-দশ লাখও চাইতে পারতাম। পারিবারিক গয়নাগাটিই কি কিছু কম আছে! তার ওপর জমি-জায়গা।"

কিকিরা বললেন, "আপনি কি সেদিন টাকা আনতে... ?"

"টাকা আনতেই গিয়েছিলাম। এবার আর গোকুলের মুখের কথায় যাইনি। দাদাকে চিরকুট লিখে দিতে হয়েছিল। সেই চিরকুট আমার কাছে আছে।"

কিকিরা তারাপদর দিকে তাকালেন।

তারাপদ বলল, "আপনাকে সেদিন টাকা আনতে যেতে বলেছিলেন নটুমহারাজ ?"

"হ্যাঁ। লিখেছিল—ওই সময়ে দাদা একা বসার ঘরে থাকবে; অপেক্ষা করবে আমার।"

"কিন্তু ওই বাড়ি যে রত্নেশ্বরবাবুদের ভাড়া দেওয়া ছিল— ?"

"সে-খবরও পেয়েছিলাম। তবে বসার ঘরে দাদা থাকবে ধরে নিয়েছিলাম। এমন তো হয়, একটা ঘর দাদা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছিল ?"

"তা হয়।"

"কিংবা দাদা সেদিন ওই ঘরেই বসে থাকবে আমার জন্যে—এমন একটা ব্যবস্থা করেছিল।"

কিকিরা বললেন, "ঘরে ঢুকে আপনি নটুমহারাজকে দেখতে পেলেন না ?"

"না। অন্য এক ভদ্রলোককে দেখলাম। আমি চিনি না। খালি গায়ে বসে নক্শা-কাগজপত্র দেখছিলেন। আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমি কে, কেন এসেছি জিজ্ঞেস করলেন। পালিয়ে আসতে পারছিলাম না। কাজেই

মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এ-কথা সে-কথা বলছিলাম।"

"কী পরিচয় দিলেন?"

"যা মুখে এল তখন।... ততক্ষণে আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম ইনিই সেই হোটেলওয়ালা, এখানে ভাড়া রয়েছেন। কাজেই কথা ঘোরাতে দেরি হল না।"

"এর পর কী হল আমি বলব?" তারাপদ বলল।

"বলুন!"

"আপনি যখন উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে ফিরে আসার জন্যে—"

"উনিও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন", সহদেব বলল, "এমন সময় একটা কী হয়ে গেল। একটা তীর এসে তাঁর হাতের কাছে লাগল। উনি যন্ত্রণায় শব্দ করে—জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। চেপে ধরে ঘষতে লাগলেন। তারপরই দেখি ভদ্রলোক টলছেন। আমি ভয় পেয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। পালিয়ে গেলাম। পালিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল উনি টলতে-টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন।"

লালাবাবু বললেন, "কী সর্বনাশ! কে তীর মারল?"

কিকিরা বললেন, "নটুমহারাজ। নটুমহারাজ তীরন্দাজ লোক। অবশ্য উনি যাকে মারতে গিয়েছিলেন সে-মানুষ রত্নেশ্বর নয়, সহদেব। পেছনের জানলা দিয়ে তীর ছোড়ার সময়, রত্নেশ্বর হঠাৎ উঠে পড়ায়, লক্ষ্য ভুল হয়ে যায়, রত্নেশ্বরের হাতে লাগে।"

"আমি তখন কিছুই আর দেখিনি, পালিয়ে এসেছি," সহদেব বলল।

লালাবাবু বললেন, "তীরে বিষ ছিল?"

"অবশ্যই", চন্দন বলল, "তীরের মুখে ভাল মতন বিষ ছিল, মারাত্মক বিষ, নয়ত এমন হয় না।"

"কী বিষ?" কিকিরা বললেন।

সহদেব নিজের থেকেই বলল, "আমি কমবিস্তর বিষের কথা জানি। কেননা, যারা বিষ খোঁজে, ল্যাবরেটারিতে কলেজের রিসার্চের কাজে, আমি বিষ-অলাদের কাছে নিয়ে যাই বা পাঠিয়ে দিই। একটা বিষ আছে—সাধারণত বালির দেশে পাওয়া যায়। রাজপুতানায় পাওয়া যায়। এটা আসলে সাপের বিষ নয়, বিছে ধরনের সাপের বিষ। Echis Carinatus গোত্রের এক ভাইপারের বিষের মতন। ভয়ঙ্কর বিষ। ভয়ঙ্কর। সিংভূমের নদী-পাহাড়েও এই বিছে সাপ পাওয়া যায়। বিষটা দু-চার মাসেও নষ্ট হয় না। রাখার নিয়ম আছে। এই বিষ শরীরের রক্তের পক্ষে ভীষণ খারাপ।"

চন্দন অবাক হয়ে সহদেবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

একেবারে চুপচাপ সবাই। কেউ আর কথা বলতে পারছে না।

শেষে কিকিরা বললেন, "সহদেববাবু, নটুমহারাজের তো কেউ নেই। তবু

উনি এমন লোভী হবেন কেন ? অর্থ, অলঙ্কার, সম্পত্তি... !"

সহদেব বলল, "একসময় দাদার সব ছিল, এখন নেই। আর লোভ মশাই আগুনের মতন, জ্বলতে শুরু করলে নিভতে চায় না। পুরাণে কী দেখেছেন ? মহাভারতের কথাই ধরুন, দুর্যোধনের লোভ কি শেষদিন পর্যন্ত মিটেছিল ! আপনাদের নটুমহারাজ যক্ষ হয়ে বেঁচে আছে। যক্ষ হয়েই মরবে।"

তারাপদ বলল, "মানুষ বড় অদ্ভুত হয়।"

কিকিরা বললেন, "তারাপদ, নটুমহারাজ চালাকি করে সহদেবকে খুনের আসামি করতে চেয়েছিলেন। উটকো লোক, চার আঙুলঅলা একটা গ্লাভ্‌স, হলুদ পালক দেওয়া তীর—। কোনোটাই ধোপে টিকল না। উটকো লোক সহদেব আমাদের চোখের সামনে ; চার আঙুলের দস্তানাটাও ধোঁকাবাজি। সহদেবের যে আঙুল নেই, দস্তানায় তার ভুল হয়েছে। সহদেবের নেই মধ্যমা, দস্তাদায় অনামিকার আঙুলটা ছিল না। নটু চালে ভুল করেছেন। আর তীরগুলো বসার ঘরে থাকার কোনো কারণই ছিল না। উনি পরে সেগুলো সাজিয়ে রেখেছেন।"

"কেমন করে জানলেন ?"

"আমি দেওয়ালের পেরেক দেখেছি। ওগুলো, হুক-পেরেকগুলো বরাবর ছিল না। নতুন করে গাঁথা হয়েছিল। পেরেকগুলোর রং চকচক করছিল।"

লালাবাবু কিছু বলার আগেই যজ্ঞেশ্বর লাফিয়ে উঠে বলল, "নটুকে পুলিশে দেব। এতবড় শয়তান, ভণ্ড লোক ! মার্ডারার।"

কিকিরা বললেন, "লালাবাবু, আমরা সবাই সহদেবকে নিয়ে ঘাটশিলায় যাব। এই শনিবারেই।" বলে সহদেবের দিকে তাকালেন। "নটুমহারাজের চিঠিটা আপনি সঙ্গে রাখবেন সহদেববাবু।"

তারাপদ বলল, "স্যার, রবিবার করুন। শনিবারেও আমার অফিস রয়েছে।"
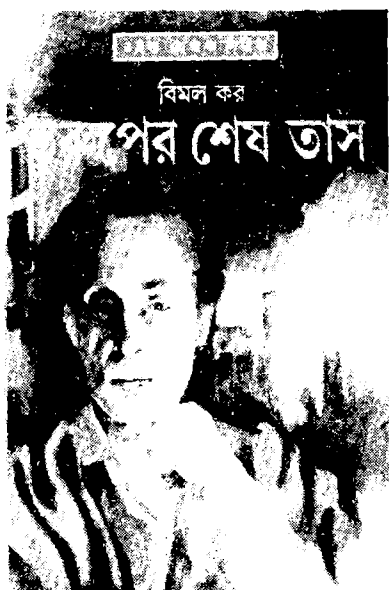
তুরুপের শেষ তাস

তুরুপের শেষ তাস

কিকিরার গলা শোনা যাচ্ছিল। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। তারাপদ ভেতরে গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। বগলা কাছেই ছিল; ইশারায় ডাকল তাকে। নিচু গলায় বলল, "কে বগলাদা ?"

বগলা দেখল তারাপদকে। কী বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে গম্ভীর মুখ করে বলল, "জানি না।"

"নতুন লোক ?"

"যাও না, ভেতরে গিয়ে দেখো।"

ভেতরে যাওয়া উচিত হবে কি না তারাপদ বুঝতে পারছিল না। কিকিরার এই ফ্ল্যাটে আড়াইটে কি তিনটে ঘর। বগলাদার সরু-মতন ঘরটাকে আধখানা ধরলে আড়াই, নয়ত তিন। কিকিরার দুটো ঘর। একটা তাঁর শোওয়ার ঘর, অন্যটা বসার—মানে কিকিরা-মিউজিয়াম। বাকি যা থাকল তা রান্নাঘর আর বাথরুম।

তারাপদ হালকাভাবে বলল, "বগলাদা, তোমার কর্তাবাবুকে বলো না একটা অফিসঘর করতে। এ ভাবে চলে না। আমরা এসে দাঁড়িয়ে থাকব!"

বগলা বলল, "দাঁড়াবে কেন, চলে যাও ভেতরে। তোমাদের তো ফ্রি পাস।"

'ফ্রি পাস' কথাটা শুনে তারাপদ হেসে ফেলল।

বগলার এখন দাঁড়াবার সময় নেই। হাতে একটা প্লাস্টিকের বালতি ব্যাগ, কিছু কেনাকাটা করতে বাইরে যাবে।

ইশারায় তারাপদকে এগোতে বলে বগলা সদরের দিকে চলে গেল।

তারাপদ কিকিরার বসার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বার-দুই কাশল। মানে সাড়া দিল। তারপর পা বাড়াল।

ঘরে ঢুকে তারাপদ অবাক! কিকিরা একা। তাঁর সেই রাজসিংহাসনে বসে আছেন জোব্বা চাপিয়ে। হাতে একটা কাচের গ্লাস। গ্লাসটা তাঁর মুখের সামনে।

যেন আকাশ থেকে পড়েছে তারাপদ, অবাক হয়ে বলল, "এ কী! আপনি একা। আমি ভাবলাম কারও সঙ্গে কথা বলছেন! বগলাদাও আমাকে আচ্ছা জব্দ করল তো!"

কিকিরা হাসলেন।

"আপনি কি যাত্রা থিয়েটার করছিলেন, স্যার?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। "না হে তারাবাবু, প্র্যাকটিস করছিলাম। সব ভুলে যাচ্ছি। চর্চা না থাকলে কি আর পারা যায়!"

"কিসের চর্চা করছিলেন?"

"ভেন্‌ট্রো...।"

"ভেনট্রো! সে আবার কোন পদার্থ?"

"ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। শর্ট করে ভেন্‌ট্রো। আজকাল তো তোমাদের সবই শর্ট। ক্যালি, ফ্যান্টা, কত কী!"

তারাপদ রগড় করে বলল, "তা হঠাৎ এই দু'-নম্বরি গলা করার চেষ্টা কেন, স্যার? আপনার গলা তো বেশ ভাল! রামপ্রসাদী থেকে নিধুবাবু—সবই গাইতে পারেন।"

কিকিরা হাতের গ্লাসটা জোব্বার পকেটে ঢুকিয়ে অন্য একটা ছোট মোটা গ্লাস আরেক পকেট থেকে বের করে নিলেন। নিয়ে মুখের সামনে ধরলেন। দু-চারবার চেষ্টা করার পর অন্যরকম এক গলা শোনা গেল। শোনা গেল কে যেন বলছে, "তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক টাকার। যখন চাইব তখনি তোমায় দিতে হবে। না দিলে কী হবে—তুমি ভাল করেই জানো।"

তারাপদ বুঝতে পারল, কিকিরা চেষ্টা করেও পুরোপুরি গলার স্বর পালটাতে পারছেন না। সেটাই স্বাভাবিক। অনভ্যাসে এরকমই হওয়ার কথা। তারাপদ হাসিমুখে বলল, "স্যার, আপনি কি কাউকে ব্ল্যাকমেল করবেন ঠিক করেছেন?"

কিকিরা মুখের সামনে থেকে কাচের গ্লাস সরিয়ে নিলেন। বললেন, "তারা, সেই ভুজঙ্গ কাপালিকের কথা মনে আছে! সেঁয়াশ! ভুজঙ্গ একেবারে এক্সপার্ট ছিল এ-ব্যাপারে। আমি ঠিক পারছি না। অভ্যেস নেই।"

"ও, এক্সপার্ট হওয়ার চেষ্টা করছেন নাকি?"

"ওই একটু-আধটু।" কিকিরা গ্লাস রেখে দিলেন। বললেন, "ওই—ওই যে—ওখানে বুকসেল্‌ফের মাথায় একটা ভাঁজ-করা খবরের কাগজ রয়েছে, ওটা নিয়ে এসো।"

তারাপদ কিছুই বুঝল না, তবু এগিয়ে গিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে এল।

"বোসো," কিকিরা বললেন, "পাতা ওলটাতে হবে না। ওই পাতাতেই দাগ দেওয়া আছে একটা জায়গায়। সেটা পড়ো।"

তারাপদ বসল। কাগজে দাগ দেওয়া জায়গাটাও দেখতে পেল। খানিকটা জায়গা জুড়ে বড়-বড় অক্ষরে কিসের যেন বিজ্ঞপ্তি। পড়তে গিয়ে বুঝল, ঠিক

বিজ্ঞপ্তি নয়, শোকপ্রকাশ। অর্থাৎ কেউ মারা গিয়েছিল, তার স্মৃতির উদ্দেশে মৃতের ঘনিষ্ঠজন শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কাগজে আজকাল হামেশাই এ-সব দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ সময়েই তার আকারটা হয় ছোট। এটা সে-তুলনায় বড়।

কিকিরা বললেন, "পড়লে ?"

"পড়লাম।"

"আবার পড়ো। জোরে-জোরে।"

তারাপদ পড়ল : "আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মেজোবাবু ও রাহা ব্রাদার্সের অন্যতম মালিক ধরণীমোহন সেন গতবছর (পয়লা ফাল্গুন) ঠিক আজকের দিনটিতে—অকস্মাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর মৃত্যুদিনটি আমাদের পক্ষে মহা শোকের দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর মানুষের হাত নেই। তবু, দুঃখ হয় এই ভেবে যে, মেজোবাবুর মৃত্যু বড় রহস্যময়। এই রহস্যের কোনো হদিস আজ পর্যন্ত করা গেল না। মেজোবাবুর মৃত্যুদিনে তাঁর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই। মহিমচন্দ্র রাহা ও রাহা ব্রাদার্সের কর্মিবৃন্দ। ১ ফাল্গুন, ১৩৯৯।"

পড়া শেষ করে তারাপদ কিকিরার দিকে তাকাল।

কিকিরা সামান্য চুপচাপ থাকার পর বললেন, "কী মনে হল ?"

"এটা কবেকার কাগজ ?"

"গত হপ্তার। আজ ফাল্গুন মাসের আট তারিখ।"

"আপনি নিজে...।"

"না না, আমি মোটামুটি সবই দেখি ; তবে ওই কাগজটা আমায় মহিমচন্দ্র রাহা দিয়ে গিয়েছেন।"

"মহিমচন্দ্র ?"

"হ্যাঁ। নিজের হাতে দিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনার চেনা ?"

"না। আমার এক বন্ধুর মুখে আমার কথা শুনে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"কবে ?"

"আজই। তুমি আসার খানিকটা আগে চলে গেলেন।"

তারাপদ অন্যমনস্কভাবে হাতের ঘড়িটা দেখল। এখন সোয়া ছয়। ফাল্গুন মাস বলে এখনো আলো আছে। তবে ম্লান হয়ে এসেছে। মহিমচন্দ্র হয়ত, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ চলে গেছেন। তারাপদ খানিকটা আগে এলে ভদ্রলোককে দেখতে পেত।

তারাপদ বলল, "মহিমচন্দ্র কি আপনার নতুন ক্লায়েন্ট ?"

"আমার নয়, আমাদের।"

"কেটিসি এজেন্সির ?" তারাপদ হাসল।

কিকিরাও তামাশা করে বললেন, "এজেন্সি নয়, সার্ভিস। কেটিসি সার্ভিস। সার্ভিসের মধ্যে একটা সামাজিক কর্তব্যের ভাব আছে বুঝলে না!" বলে তিনি জামার নানা পকেট হাতড়ে নিজের চুরুট আর দেশলাই বের করলেন। "সোশ্যাল ব্যাপার তারাবাবু—।"

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "স্যার, এবার থেকে আপনার সোশ্যাল মক্কেলদের কাছ থেকে একটা এগ্রিমেন্ট সই করিয়ে নেবেন। আর অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে নেবেন—হাজার পাঁচেক। সোশ্যাল ডোনেশান। নয়ত সার্ভিস চালু রাখা যাবে না।"

চুরুট ধরাতে ধরাতে কিকিরা বললেন, "হবে, হয়ে যাবে তারাবাবু। মহিমচন্দ্র গত এক বছরে হাজার চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দান করেছেন। অবশ্য দান নয়, অনুদান। বা বলতে পারো, তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে।"

তারাপদ যেন চমকে উঠল। টাকার অঙ্কটা মগজে গোলমাল পাকিয়ে ফেলছিল। গলার স্বর আটকে যাচ্ছিল। "চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা!"

"হ্যাঁ।"

"কে করেছে ? মানে কে ব্ল্যাকমেল করেছে ?"

"শেখর গুহ বলে একটা লোক। মহিমচন্দ্র সেইরকম বলেন!"

"মানে ? বলেন মানে ! ব্ল্যাকমেল করে যে টাকা নিচ্ছে, তাকে মহিমচন্দ্র ধরতে পারেন না ? টাকা দিচ্ছেন, অথচ— ! আমার মাথায় ঢুকছে না, কিকিরা।"

কিকিরা চুরুট টানলেন বার-কয়েক। পরে বললেন, "শেখর গুহ লোকটাকে ভালই চেনেন মহিমচন্দ্র। হাড়ে-হাড়ে চেনেন। কিন্তু টাকা নেওয়ার সময় সে লোক-মারফত নিচ্ছে। নিজে হাজির থাকছে না। মহিমচন্দ্র তাই বললেন।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

"আরও অদ্ভুত ব্যাপার আছে, তারা। ওই যে কাগজে যেটা পড়লে, সেটা কিন্তু মহিমচন্দ্র বা রাহা ব্রাদার্সের কর্মীদের কেউ ছাপতে দেয়নি।"

তারাপদ যেন কেমন বোকা হয়ে গেল। কাগজে একটা স্মৃতিশ্রদ্ধার বিজ্ঞপ্তি ছাপা হল, অথচ যাদের নাম রয়েছে, তারা কেউ সেটা ছাপতে দেয়নি, এ কেমন করে হয় !

অবিশ্বাসের গলা করে তারাপদ বলল, "কী বলছেন আপনি ?"

"আমি বলিনি, মহিমচন্দ্র বলছেন।"

"তিনি বলেন কেমন করে ? ভূতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে এল কাগজে ?"

"মহিমচন্দ্র বলছেন, তিনি কাগজের অফিসে খোঁজ করেছেন লোক পাঠিয়ে। কাগজওয়ালারা বলেছে, একজন এসে নগদ টাকা দিয়ে ওটা ছাপতে দিয়ে গিয়েছিল। ওই বিজ্ঞপ্তিটায় আপত্তিকর তো কিছু নেই। বরং এ-সব

...ক্তিগত বিজ্ঞপ্তির একটা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে। কাগজওয়ালারা ছেপেছে। বিজ্ঞপ্তি যে দিয়ে গিয়েছিল, তার নাম-ঠিকানাও খাতা আর রসিদ বইয়ের ডুপ্লিকেট দেখে দিয়ে দিয়েছে কাগজের অফিস।"

তারাপদ বলল, "কে দিয়েছিল ?"

"যেই দিক, নামটা আসল নয়, নকল। ঠিকানাও ফল্‌স। মহিমচন্দ্র খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, ওই ঠিকানা আর নাম দুটোই মিথ্যে।"

তারাপদ কোনো কথা বলল না। তার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। সবই কেমন গোলমেলে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর তারাপদ বলল, "স্যার, কাগজে ঘটা করে ওই শোক জানানোর কী মানে ? যারা জানাবার তারাই যখন জানাল না, বাইরের লোক লুকিয়ে তা জানাতে যাবে কেন ?"

কিকিরা বললেন, "কেন তা বুঝতে পারলে না ?"

"না।"

"মাথায় কী আছে হে !"

"গোবর।"

তামাশায় কান দিলেন না কিকিরা। "আমার মনে হয়," উনি বললেন, "ওটা নিতান্ত বাৎসরিক শ্রদ্ধাশোক জানানো নয় হে, চালাকি করে একটা সন্দেহ জানিয়ে দেওয়া।"

"সন্দেহ !"

"হ্যাঁ, ওই যে লিখেছে মৃত্যু-রহস্যের কোনো হদিস হল না ! লিখেছে না ?"

তারাপদর খেয়াল হল। "হ্যাঁ, লিখেছে।"

"তার মানে মহিমচন্দ্রদের ভয় দেখানো যে : বাপু, ধরণীমোহনের মারা যাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয়, সেটা ভুলে যেয়ো না।" কিকিরা একটু থামলেন। আবার বললেন, "ওটা যে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছে সে খুব বুদ্ধিমান, পাকা লোক। জানাচ্ছে শোক, কিন্তু তলায়-তলায় সন্দেহটা বেশ পাকাপাকিভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। একেবারে 'পাবলিক' করে দিয়েছে হে তারাপদ। মহিমচন্দ্র বা রাহা ব্রাদার্সের লোকরা শুধু নয়, যে দেখবে সেই অবাক হবে, ভাববে, ধরণীমোহনের মৃত্যুর রহস্যটা তা হলে এমন কী যে, হদিস হল না !"

তারাপদ বুঝতে পারল মোটামুটি।

"মহিমচন্দ্র বুঝি এইজন্য এসেছিলেন ?" তারাপদ বলল।

"হ্যাঁ। তিনি এসেছিলেন এই কথা বলতে যে, ধরণীমোহন আচমকা মারা গেলেও সেটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়—সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে ওই লেখাগুলো ছাপানো হয়েছে। তার ফল হয়েছে এই যে, অনেকের ব্যাপারটা নজরে পড়েছে। কেউ-কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন। মহিমচন্দ্র নিজেও

ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। তিনি কিছু জানালেন না, অথচ তাঁর আর রাহা ব্রাদার্সের কর্মীদের নাম করে এইরকম একটা জিনিস ছাপিয়ে দেওয়া হল !”

তারাপদ বলল, “উনি কাকে সন্দেহ করছেন ? মানে, কে এমন কাজ করতে পারে বলে ওঁর মনে হয়।”

“শেখর গুহ।”

“ও ! শেখর গুহ ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেয়, আবার কাগজে নোটিস ছাপিয়ে ভয়ও দেখায়।”

“হ্যাঁ !”

“কেন ?”

“ভয় না দেখালে মহিমচন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে না।”

“টাকা তো পাচ্ছে।”

“এ-পর্যন্ত পেয়েছে। কিন্তু আর যদি না পায় ! ভয়টা মহিমের মনে সবসময় জাগিয়ে রাখতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে।...আমার তাই মনে হয়।”

“শেখর যে টাকা চায়, কেমন করে চায় ?”

“কীভাবে চায় বলছ ? মহিমচন্দ্রকে ফোন করে টাকা চায়। নিজে টাকা নিতে যায় না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দেয়।”

“স্যার, মহিমচন্দ্র কী ধরনের মানুষ ? তিনি একটা লোককে এইভাবে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন কেন ? কেনই বা পুলিশকে জানাচ্ছেন না !”

কিকিরা বললেন, “সেটাই তো কথা তারাপদ, মহিমচন্দ্র কী ধরনের মানুষ ! তাঁর অত ভয়ই বা কিসের ? কাকেই বা ভয় !”

২

চন্দন খানিকটা দেরি করে এলেও তারাপদ তাকে আরাম করে বসতেও দিল না। তার আগেই মহিমচন্দ্র-সংবাদ শুনিয়ে দিল। পড়তে দিল কাগজটাও।

চন্দন এমনিতে শান্ত ভদ্র ছেলে, স্বভাবে একেবারেই রুক্ষ নয়; কিন্তু আজ রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল তুচ্ছ কারণে। দোষ চন্দনের নয়। এক-একজন থাকে যারা খানিকটা তেরিয়া গোছের। সামান্যতেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সেইরকম এক লোকের সঙ্গে বৃথা ঝগড়া করে চন্দনের মেজাজ খারাপ হয়েছিল। মহিমচন্দ্রের ব্যাপারটা ও মন দিয়ে শুনল না।

চা খাওয়ার পর্ব মিটে যাওয়ার পর চন্দনের যেন খেয়াল হল। হঠাৎ বলল, “কিসের ব্ল্যাকমেল ?”

“বা ! কিসের ব্ল্যাকমেল। তুই কি ঘুমোচ্ছিলি নাকি ?”

“মন দিয়ে শুনিনি।”

"কেন, তোর মন কোথায় ? হাসপাতালে রোগী মেরেছিস ?"

"রাস্তায় একটা লোককে চড় কষিয়েছি। এমন বাজে লোক। পায়ে পা লাগিয়ে চেঁচাতে আসে !...যাক গে, কী কেস তোদের বল !"

তারাপদ আবার বলল।

সবটা অবশ্য বলতে হল না ; চন্দনের কিছু-কিছু মনে ছিল। মোটামুটি ব্যাপারটা সে বুঝে নিল।

"রাহা ব্রাদার্স-এর কিসের কারবার, কিকিরা ?" চন্দন জানতে চাইল।

কিকিরা বললেন, "রঙের কারবার।"

"রঙ ? কিসের রঙ ?"

"পেন্টস ! কারখানা আছে রঙের। বাজারে কিছু ছোটখাটো রঙের ব্যবসায়ী আছে ; সবাই তো এক নম্বর রঙ কিনতে পারে না। দামে খানিকটা সস্তা পড়ে এমন রঙ চায়। ছাপোষা লোকদের কাজে দেয়। মফস্বলে ভালই চলে।"

"কোথায় কারখানা ?"

"হাওড়া।"

চন্দন এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, "মহিমচন্দ্র আর ধরণীমোহন—একজন রাহা অন্যজন সেন—কোম্পানির নাম রাহা ব্রাদার্স—ভেতরের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কিকিরা ? ধরণীমোহন কে ছিলেন ?"

কিকিরা বললেন, "ব্যাপার তেমন গোলমেলে নয়। পার্টনারশিপ বিজনেস। মহিমচন্দ্রের বড়দাদা ব্যবসাটা শুরু করেন। রাহা ব্রাদার্স নামে। পরে তাঁর বন্ধু ধরণীমোহন ব্যবসায় যোগ দেন। কোম্পানির নাম পালটানো হয়নি। মহিমচন্দ্রের বড়দাদা ছিলেন বড়বাবু। কারখানার লোক তাঁকে বড়বাবু বলে ডাকত। ধরণীমোহন আসার পর তিনি হলেন মেজোবাবু।"

"মহিমবাবু কি ছোটবাবু ?"

"তা হবে।...যা বলছিলাম, বড়বাবু মারা গিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। তিনি মারা যাওয়ার পর মেজোবাবু—মানে ধরণীমোহন কোম্পানির মাথা ছিলেন। তাঁর পরামর্শ মতনই কোম্পানি চলত। তা তিনিও গত বছর মারা যান।"

"কেমন করে ?"

"মহিমচন্দ্র বলছেন, হঠাৎ মারা যান। হার্ট ফেল।"

"হার্ট ফেল না করলে আর মারা যাবেন কেন ? কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেলের কারণ ? কোনো অসুখ ছিল হার্টের ?"

"না, তেমন কিছু নয় ! হাঁপানির একটা টেন্‌ডেন্‌সি ছিল। মাঝে-সাঝে ব্রিদিং ট্রাব্‌ল হত। সামান্য ব্লাড সুগার। তার বেশি কিছু ছিল বলে কেউ জানে না।"

চন্দন কী ভাবল, বলল, "কিকিরা, হার্টের ছোটখাটো গোলমাল বলে আমরা প্রথমে যা তেমন একটা পাত্তা দিই না, সেটা হয়ত আসলে কোনো বড় গোলমাল। আগে ঠিকমতন ধরতে না পারলে হঠাৎ বড় একটা কিছু হয়ে যেতেও পারে।"

তারাপদ বলল, "মানে তুই বলছিস, ধরণীমোহন স্বাভাবিকভাবেই মারা যেতে পারেন !"

"অবশ্যই পারেন। আমি তো তাঁকে দেখিনি, কেমন করে জানব তাঁর কী রোগ ছিল ! যে-ডাক্তার দেখতেন ভদ্রলোককে, তিনি বলতে পারেন।"

কিকিরা বললেন, "সেটা আমরা খোঁজখবর করে জেনে নেব। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে, ধরণীবাবুর মারা-যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়—এটা বলার কারণ কী ? তাও আবার চালাকি করে কাগজে ছাপানোর ব্যবস্থা করা। এটা যদি শেখরই করে থাকে, কেন করেছে ? শুধুমাত্র ধাপ্পা দিয়ে ব্ল্যাকমেল করা ? আর মহিমচন্দ্রই বা ভয় পেয়ে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছেন কেন ?"

তারাপদ হেসে হিন্দি করে বলল, "ডালমে কুছ কালা হ্যায়।"

চন্দন কিকিরাকে জিজ্ঞেস করল, "শেখরটা কে কিকিরা ?"

"ধরণীমোহনের ছোট ভাগ্নে।"

"ভাগ্নে ! ছেলেটেলে নয় ?"

"না। ধরণীমোহন বিয়ে-থা করেননি। তাঁর সন্তান থাকার কথা নয়। দুই ভাগ্নে ছিল। বড় ভাগ্নে চা-বাগানে কাজকর্ম করে, ডুয়ার্সে। ছোট ভাগ্নে শেখর। সে নাকি বরাবরই বদ ধরনের ছেলে। মামাকে অনেক জ্বালিয়েছে। মামার কাছে থাকতও না আজকাল। আলাদা থাকত, সিঁথির দিকে। কী করত কেউ জানে না।"

"এখন সে কোথায় থাকে ?"

"মহিমচন্দ্র তা বলতে পারলেন না। বললেন, খোঁজ করে বলতে হবে।"

"মহিমচন্দ্রের বয়স কত ?"

"প্রায় পঞ্চাশ-টঞ্চাশ।"

"শেখরের ?"

"তিরিশ-বত্রিশ শুনলাম। মহিম বললেন।"

"ধরণীমোহনের বয়স কত ছিল ?"

কিকিরা সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। খেয়াল হওয়ার পর বললেন, "মহিমচন্দ্রের চেয়ে বড় ছিলেন। উনি যখন মারা যান, তখন ওঁর বয়স আটান্ন-ঊনষাট।"

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কিকিরাকে আমি বলছিলাম, মহিমচন্দ্র ছেলেমানুষ নন, বোকাও নন, তিনি ব্যবসাদার মানুষ। শেখর তাঁকে ধাপ্পা মেরে এক বছর ধরে টাকা নিচ্ছে, আর ভদ্রলোক পুলিশের কাছে যেতে পারছেন না ! কারণটা কী ?

নিশ্চয়ই তাঁর কোনো গোলমাল আছে ভেতরে। নয় কি?"

চন্দন বলল, "আমারও তাই মনে হয়।" বলে কিকিরার দিকে তাকাল। "আচ্ছা কিকিরা, শেখর নাহয় অন্য লোক মারফত টাকা নেয়। কিন্তু টাকা নেওয়ার আগে সে মহিমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে কেমন করে?"

"ফোনে।"

"ফোনে! কোত্থেকে ফোন করে?"

"যে-কোনো জায়গা থেকে। ফোন করার অসুবিধে কোথায়? পাবলিক ফোন আছে, দোকান আছে।"

"নিজের নাম বলে?"

"বলে।"

"কোথায় টাকা দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, তাও বলে?"

"বলে। একই লোককে একবারের বেশি দু'বার টাকা নিতে পাঠায় না।"

"যে টাকা নিতে আসে, তাকে মহিমচন্দ্র চেনেন কেমন করে? শেখর কি কোনো চিঠি লিখে দেয়?"

"তুমি পাগল হয়েছ! চিঠি লিখে দেবে! শেখর একটা সাঁটের কথা, মানে চিহ্নের কথা বলে দেয়। যেমন হয়ত বলল, যে নিতে যাবে তার চোখের চশমার ফ্রেমটা হবে সোনালি, বা হয়ত বলল, অমুক লোকটার পকেটের রুমাল হবে খয়েরি, গলায় কালো টাই থাকবে, এইরকম আর কি!"

তারাপদ বলল, "এত জেনেও মহিমচন্দ্র পুলিশকে খবর দিচ্ছেন না! মানে, তিনি পুলিশ ডেকে ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভয় পাচ্ছেন! তাঁর এই ভয় দেখেই মনে হয়, ভদ্রলোক কোনো গুরুতর ব্যাপার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। পাপকর্ম করলে তো ভয় থাকবেই।"

কিকিরা বললেন, "সেটা খুব স্বাভাবিক। মহিমবাবুকে সন্দেহ হতেই পারে। কিন্তু তারাপদ, আমি বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক যদি পাপকর্ম করেই থাকবেন তবে আমার কাছে আসবেন কেন? ক্রিমিন্যালরা নিজেদের বাঁচাবার জন্যে উকিল ধরে। উকিল সব জেনেশুনেও তার মক্কেলকে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করে। আমি তো বাবা পুলিশ কোর্টে ক্রিমিন্যালদের হয়ে ওকালতি করি না! আমার কাছে কেন!"

তারাপদ বা চন্দন কেউই সেটা বুঝতে পারছিল না। মহিমচন্দ্র শেখরকে টাকা দিচ্ছেন বারবার, অথচ পুলিশকে জানাচ্ছেন না। আবার তিনিই এসেছেন কিকিরার কাছে সাহায্য চাইতে। অদ্ভুত ব্যাপার!

কিকিরা এবার উঠে পড়লেন দু' হাত মাথার ওপর তুলে, দু' পাশে ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। ক্লান্তি লাগছিল বোধ হয়। হাই তুললেন। তারপর বললেন, "এখন থাক। পরে ডাকব। দাও, একটা ফুঁ দাও তোমাদের।"

'ফুঁ' মানে সিগারেট। চন্দন সিগারেট দিল।

তারাপদ বলল, "কিকিরা, আপনি বলেছিলেন—দু-এক হপ্তার মধ্যে বেড়াতে বেরোবেন। বিষ্ণুপুর যাবেন! কী হল?"

"গেলেই হয়। চাঁদু দিন ঠিক করুক।"

"আমি ঠিক করছি," তারাপদ বলল, "এপ্রিলের গোড়ায় চলুন। না হয় মার্চের কুড়ি-বাইশ..."

কিকিরা বললেন, "মন্দ নয়। তার আগে একবার পালিত লেন-এ যেতে হবে।"

"পালিত লেন? সেটা কোথায়?"

'আনন্দ পালিত নয়, এ হল হেম পালিত। শিয়ালদার দিকে।"

"সেখানে কী?"

"মহিমচন্দ্রের বাড়ি। তিনি আমায় যেতে বলে গিয়েছেন।"

"ও!...তার মানে, আপনি এখন মহিম নিয়ে ফেঁসে গেলেন! বিষ্ণুপুর হচ্ছে না?"

"কেন হবে না! মহিম-কেসটা যদি মিটে যায় হে, প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে চলে যাব।"

"আচ্ছা! কত টাকা দেবেন মহিম?"

"সে কাজের খাটুনি বুঝে। তা পাঁচ-সাত হাজারের কম তো নয়।"

তারাপদ উঠে পড়ল, ইশারা করল চন্দনকে, অর্থাৎ, নে উঠে পড়, আর নয়।

কিকিরা মানুষটি বিচিত্র। তিনি যে লাখ টাকার মালিক তা নন। সামান্য টাকাপয়সা তাঁর আছে ব্যাঙ্কে। তা বলে এত পয়সা নেই যে, পায়ের ওপর পা তুলে বছরের পর বছর কাটাতে পারেন। যারা তাঁর কাছে আসে, সাহায্য চায়—তাদের কাছ থেকে তিনি অনায়াসেই দশ-বারো হাজার নিতে পারেন। কিন্তু নেন না। যে যা দিল, তাতেই খুশি। ফলে দু-চার হাজারের বেশি আয় হয় না। অথচ টাকা কিকিরার দরকার।

চন্দনও উঠে পড়েছিল।

তারাপদ বলল, "শুনুন কিকিরা, একটা সাফ কথা বলে দিচ্ছি! মহিমচন্দ্র একজন ব্ল্যাকমেলারকে বছরে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে দিচ্ছেন। আপনাকে যদি তিনি পাঁচ হাজার অ্যাডভান্স না করেন—আমরা এতে নেই।"

কিকিরা বললেন, "ওহে তারাবাবু, আমি ব্ল্যাক নই, হোয়াইট। পাঁচ কেন হে, পনেরোও নিতে পারি, তবে কাজ বুঝে। আগে কাজটা দেখি—তবে না টাকাপয়সার কথা!"

"তা হলে আপনি কাজ বুঝুন। আমরা চলি।"

"তা যাও। তবে কাল এখানে তুমি চলে আসবে, বিকেল-বিকেল আমরা পালিত লেন-এ যাব।"

তারাপদ কিছু বলল না।

৩

পালিত লেনকে ঠিক গলি বলা যায় না। রাস্তা খানিকটা চওড়া। তবে বেশিরভাগ ঘরবাড়ি সেই আদ্যিকালের। কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই। ওরই মধ্যে দু-চারটে বাড়ি পুরনো হলেও পরে তার রকমফের হয়েছে। অন্যরকম দেখায় খানিকটা।

মহিমচন্দ্রদের বাড়িটা কিন্তু গলির মধ্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতন। প্রথমে ধরা যায় না, দু-চার পা এগিয়ে গেলে বোঝা যায়, গলির গা ছুঁয়ে আট-দশ গজ প্যাসেজ। ফটকের মতন খানিকটা জায়গা ; ভেতরের দিকে সামান্য ফাঁকা জমি। তার গায়ে বাড়ি। ফটক থেকে বিশ-পঁচিশ পা এগুলে দোতলা বাড়িটা চোখে পড়ে। পুরনো বাড়ি, কিন্তু সামনের দিকে ভেঙেচুরে নতুনভাবে সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। রঙচঙ করা, হাল ফ্যাশানের গ্রিল, বাহারি ব্যালকনি। সামনের জমিতে অল্পস্বল্প বাগান, গাড়ি রাখার গ্যারাজ।

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার মক্কেল ধনী লোক। বাড়ির চেহারা দেখছেন না !"

কিকিরা বললেন, "রঙ কারখানার মালিক, গরিব হবে কোন দুঃখে !"

"তা হলে অ্যাডভান্সটা আজই চেয়ে নেবেন। নগদ।"

"তুমি তো বেশ মানি-ক্যাচার হয়ে পড়েছ ?"

হেসে ফেলল তারাপদ। বলল, "মানি-ক্যাচার কী জিনিস, কিকিরা ?"

"মানি ক্যাচিং যারা করে তারাই মানি-ক্যাচার। আগেকার রেল এঞ্জিনে কাউ-ক্যাচার থাকত, দেখেছ ?"

"মনে করতে পারছি না, স্যার।"

"থাক, মনে করতে হবে না। ওই লোকটাকে ডাকো, বলো— মহিমচন্দ্রকে খবর দিতে।"

বারান্দার সিঁড়ির কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কিকিরাদের দেখছিল। তারাপদ তাকে ডাকল।

লোকটা কাছে এলে তারাপদ বলল, "মহিমবাবুকে খবর দাও, বলো রায়বাবু এসেছেন। তাঁর আসার কথা ছিল।"

লোকটা দেখল কিকিরাকে, তারপর চলে গেল।

এখনো আলো আছে। বিকেল পড়ে যাওয়ার পরও এ-সময় আজকাল আলো থাকে। যদিও ফাল্গুন মাস, বসন্তকাল, তবু গরম পড়ে আসছে।

কিকিরা বললেন, "মহিমচন্দ্র বাড়িতেই। গাড়ি রয়েছে দেখছি।"

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনি কি একটা জিনিস নজর করেছেন ?"

"কী ?"

"এই বাড়ির দু-চারটে বাড়ি আগে একটা ফার্নিচার পালিশের ছোট দোকান দেখলাম। দোকানের বাইরে একটা ছেলে স্কুটার দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের দেখছিল।"

কিকিরা বললেন, "দেখছিল তো কী হয়েছে! দেখতেই পারে। আমরাও তো রাস্তার লোক দেখি।"

"দেখা আর নজর করা এক জিনিস নয়। আমরা এ-বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত ও নজর করেছে।"

কিকিরা কিছু বললেন না।

তারাপদ বলল, "চাঁদু কাল বলছিল, মহিম লোকটাই প্যাঁচালো। ওর কোনো মোটিভ আছে।"

"থাকতে পারে। খানিকটা না এগিয়ে কিছু বলা যাবে না।"

ততক্ষণে সেই লোকটা বাড়ির ভেতর থেকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে রীতিমত খাতির করেই কিকিরাদের ডাকল। "আসুন— বসবেন চলুন। বাবু আসছেন।"

নিচেই একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে কিকিরাদের বসাল লোকটা। ঘরের আলো জ্বেলে দিল। দরকার ছিল না, তবু জ্বালল। পাখাটাও চালিয়ে দিল। ধীরেই চলছিল পাখা।

এটা যে মহিমচন্দ্রের বসার ঘর— বৈঠকখানা, বোঝা যায়। সেইভাবেই সাজানো। সোফা-সেটির সঙ্গে একটা ডিভানও আছে। বাড়তি কিছু চেয়ার। ঘরের দেওয়াল-আলমারিতে নানারকম সাজাবার জিনিস। দেওয়ালে দু-চারটে ছোট-বড় ছবি। বড় করে বাঁধানো একটা ফোটোও ছিল। মহিমচন্দ্রের বাবারই বোধ হয়। কিকিরা ঘরটা দেখছিলেন। তারাপদও দেখছিল, তবে সে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মহিমচন্দ্র এলেন।

ঘরে ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারাপদকে দেখলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনি ফিরে এসেছেন! ভাবছিলাম, কী জানি আপনি হয়ত কারখানা থেকে এখনো ফেরেননি!" বলে একটু হাসলেন কিকিরা, তারাপদকে দেখালেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হল তারাপদ জুনিয়ার। আমার শাগরেদ। আমার মশাই দুই জুনিয়ার শাগরেদ, একজনকে নিয়ে এলাম। আরেকজন হল ডাক্তার। চন্দন। তাকে আজ আনা হল না। পরে আপনার সঙ্গে চন্দনের আলাপ হবে।"

মহিমচন্দ্র ইতস্তত করে বললেন, "আপনার শাগরেদদের কথা জানতাম না। আগে কিছু বলেননি!"

কিকিরা হালকা ভাবেই বললেন, "কাল আপনি আর কিছুক্ষণ থাকলেই

তারাপদকে দেখতে পেতেন। চন্দন অবশ্য অনেক পরে এসেছিল।"

এগিয়ে এসে মহিমচন্দ্র বসলেন, "এঁরা তবে আপনার লোক?"

"হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে কাজ করি। একা সবদিকে চোখ রাখা যায় না।... আপনি আমার সামনে যা বলতে পারেন, এদের কাছেও তা বিশ্বাস করে বলতে পারেন।"

"ও! কিন্তু...."

"কিন্তুর কিছু নেই, মহিমবাবু। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তা ছাড়া কালই আমি এদের কাছে আপনার কথা বলেছি।"

"বলে ফেলেছেন?"

কিকিরা মাথা হেলালেন। না বললে কাজ করব কেমন করে? আপনার যদি আপত্তি থাকে, তা হলে আমার পক্ষে—"

"না, না, তা নয়। আমি তো আপনার সাহায্য চেয়েছি।"

"তা হলে নির্ভাবনায় থাকুন।"

মহিমচন্দ্র গলা তুলে ডাকলেন, "অনাদি, অনাদি।"

সেই লোকটি আবার এল।

অনাদিকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন মহিমচন্দ্র। অনাদি চলে গেল।

কিকিরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, "মহিমবাবু, কাল তো সব কথা হয়নি। সময় হয়ে ওঠেনি। আপনার ব্যাপারটাই ভাবছিলাম কাল। আরও কিছু কথা যে জানা দরকার।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "বলুন, কী জানতে চান?"

"আপাতত দু-একটা কথা বলুন। ধরণীমোহনের একটা অংশ তো আপনাদের রাহা ব্রাদার্সে আছে। নয় কী?"

"আছে। আমার দাদা অহীনচন্দ্র যখন রঙ কারখানা শুরু করেন—তখন নিজেদের টাকাতেই করেছিলেন। বছর কয়েক পরে মেজোবাবু—মানে ধরণীদা আসেন। তাঁর টাকাপয়সা ছিল না। কিন্তু মাথা ছিল। অসম্ভব পরিশ্রমী ছিলেন। দাদার বন্ধু ধরণীদা। দাদা ওঁকে কোম্পানিতে নিয়ে নেন। ওয়ার্কিং পার্টনার হিসেবে। পরে তাকে অংশীদারও করে দেন কোম্পানির।"

"সমান-সমান?"

"না। প্রথমে আমাদের বারো, ওঁর চার। পরে ওটা দশ-ছয় হয়। মানে ছয় ভাগের অংশীদার।"

"ধরণীবাবু লাভের অংশ পেতেন?"

"বরাবর। এই টাকা থেকে মেজোবাবু ছোট একটা ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন বেলগাছিয়ার দিকে।"

"সেখানে কে-কে থাকত?"

"এখন কেউ থাকত না। একা মেজোবাবু থাকতেন। তবে ফ্ল্যাট তো হালে

কিনেছেন, বছর তিন-চার আগে। এর আগে ভাড়াবাড়িতে থাকার সময় এককালে সবাই থাকত, মেজোবাবু, মানুপিসি—মানে মেজোবাবুর বিধবা দিদি, দুই ভাগ্নে।”

মহিমচন্দ্র পুরনো কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন। ধরণীমোহন একসময় বিধবা দিদি আর ভাগ্নেদের নিয়েই থাকতেন। মানুষও করেছেন ভাগ্নেদের—অন্তত আট-দশ বছর তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করেছেন শেষের দিকে। বড় ভাগ্নে ধীরাজ স্বভাবে ভাল, বুদ্ধিমান। সে কাজকর্ম করতে-করতে চা-বাগানে চাকরি জুটিয়ে চলে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় মাকে। মা অবশ্য চা-বাগানেই মারা যান। আর শেখর বরাবরই অবাধ্য, বদমাশ ধরনের। মেজোবাবু তাঁর ছোট ভাগ্নেকে নানাভাবে শোধরাবার চেষ্টা করেন। এমন কি, তাকে রঙ কারখানাতে এনে কাজকর্ম শেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বভাব মন্দ হলে যা হয়— শেখর কাজকর্ম তো শিখলই না, কোম্পানির টাকা মেরে পালিয়ে গেল। মেজোবাবু তখন থেকেই ছোট ভাগ্নের মুখদর্শন করতেন না। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারাপদ ধরণীমোহনের বৃত্তান্ত শুনতে-শুনতে মহিমচন্দ্রকে দেখছিল। মামুলি চেহারা, গোলগাল, আধ-ফরসা, মাথার চুল ছোট-ছোট, কোঁকড়ানো, চোখে চশমা। ভদ্রলোককে দেখলে বোঝা যায় না— তিনি কোম্পানি চালানোর বুদ্ধি ধরেন। সাদামাঠা মনে হয়। তবে মুখ দেখে কি মানুষ চেনা যায়! মহিমচন্দ্রের চোখের মণির রঙ যেন খয়েরি, মাঝে-মাঝে চকচক করে ওঠে। ওইখানেই যা একটু অন্যরকম মনে হয়।

কিকিরা কথা বলছিলেন। বললেন, “শেখরের দাদার নাম কী বললেন যেন?”

“ধীরাজ।”

“বয়েস কত?”

“আমার চেয়ে অনেক ছোট। বছর আটত্রিশ।”

“শেখরের বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ হবে?”

“হ্যাঁ।”

“শেখর যে এভাবে আপনার কাছ থেকে টাকা নেয়, আপনি তার দাদাকে জানিয়েছেন?”

“মহিমচন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বললেন, “না।”

“নয় কেন?”

কোনো জবাব যেন মুখে এল না মহিমচন্দ্রের। শেষে অবশ্য বললেন, “জানাইনি, কারণ দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আর নেই। সে তার ছোট ভাই সম্পর্কে কিছু জানতে চায় না। খোঁজখবরও রাখে না! মেজোবাবু যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাকে সে ভাই বা আত্মীয় বলে মনে করে না।”

"ধরণীবাবুর ফ্ল্যাট, টাকাপয়সা, কোম্পানির লাভ থেকে পাওয়া অংশ, এসব কে পাবে ? দুই ভাগেই তো ?"

"না," মাথা নাড়লেন মহিমচন্দ্র, শেখর কিছু পাবে না। মেজোবাবু সেটা লেখাপড়া করে গেছেন। ধীরাজ পাবে। ধীরাজ কলকাতার ফ্ল্যাট পাবে, আর বছরে কুড়ি হাজার টাকা। মেজোবাবুর পাওনা টাকা— যা কোম্পানি থেকে পাওয়া যাবে, তার থেকে কুড়ি হাজার টাকা মাত্র। আর বাকি টাকা দেওয়া হবে সীতাপুরের কুষ্ঠাশ্রমকে।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "কুষ্ঠাশ্রমকে ?"

"হ্যাঁ। মেজোবাবু বরাবরই ওই আশ্রমকে টাকা দিতেন।"

অনাদি ট্রে সাজিয়ে চা আনল। চা আর মিষ্টি।

"নিন রায়মশাই, একটু চা খান।"

চা দিয়ে অনাদি চলে গেল।

চা খেতে-খেতে মহিমচন্দ্র নিজেই বললেন, "আপনি আমায় কাল বলছিলেন, আমি কেন পুলিশকে খবর দিচ্ছি না !... দেখুন, ওটা তো সহজ কাজ। ওই কাজটা আমি করতে পারছি না কেন— তা আমার পক্ষে আপনাকে বলা সম্ভব নয়। আগেই আমি সে-কথা বলেছি। কিছু মনে করবেন না রায়মশাই, সংসারে এমন জিনিস থাকে যা অন্যকে বলা যায় না। যদি বলতে পারতাম, আমি বেঁচে যেতাম। আপনার কাছেও ছুটতে হত না।... আপনি পারলে আমাকে শেখরের হাত থেকে বাঁচান। নয়ত, নয়ত..." কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মহিমচন্দ্র।

তারাপদর যেন মনে হল, মহিমচন্দ্র কোনো শক্ত জালে জড়িয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে আসার উপায় নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তিনজনেই চা খেতে লাগলেন মুখ বুজে।

শেষে কিকিরা বললেন, "শেখরকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?"

"না। ও যে কোথায় থাকে, আমি জানি না।"

"তবু— ?"

"আমি তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি... তবে দু-তিনটে জায়গার কথা আমি বলতে পারি, সেখানে চেষ্টা করতে পারেন।"

"কোন-কোন জায়গা ?"

"সিঁথির দিকে একটা বাড়িতে সে থাকত, সেখানে খোঁজ করতে পারেন। বাড়ির নম্বর আমি জানি না। শুনেছি, বাড়ির কাছাকাছি র‍্যাশন শপ আছে।"

"আর ?"

"বউবাজারের মলঙ্গা লেন-এর আশেপাশে একটা সস্তা হোটেল আছে— সেখানেও সে থাকত।"

"আর ?"

"হ্যারিসন রোডে ওকে দেখা গিয়েছে। চশমার দোকানে।"

"শেখর কি চশমা পরে ?"

"হ্যাঁ। ওর চোখ বেশ খারাপ।"

"ওর একটা ফোটো আমাদের দেখাতে পারেন ?"

"পারি।"

"আর-একটা কথা মহিমবাবু ! ধরণীমোহন কীভাবে মারা যান ? মানে, ঠিক কীভাবে ?"

"সে তো আগেই বলেছি।"

"হার্ট ফেলিওর বলেছেন। কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেলিওর কেন ?"

"তা বলতে পারব না। ডাক্তার যা বলেছেন, তাই জানি।"

"ডাক্তার কি ধরণীবাবুর নিজের ? ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার মুখার্জি। বিকাশ মুখার্জি।"

"ঠিকানা ?"

মহিমচন্দ্র ঠিকানা বলতে পারলেন না, জায়গাটা বুঝিয়ে দিলেন।

কিকিরা এবার উঠলেন। বললেন, "আজ চলি।.... ও, ভাল কথা, শেখরের একটা ফোটো যদি এনে দেন !"

"খুঁজে বের করতে হবে। কাল আপনাকে পাঠিয়ে দেব।"

"তাই দেবেন।"

৪

ডাক্তার বিকাশ মুখার্জির বয়স হয়েছে। প্রবীণ মানুষ। তাঁর চেম্বার আর ডিসপেনসারি দেখলে মনে হবে, বেশ পুরনো। কোনো বাহার নেই। ম্যাড়মেড়ে। সাধারণ মানুষ, গরিব-গুরবোদেরই ভিড় বেশি সেখানে।

ডিসপেনসারিতেই শেষপর্যন্ত বিকাশ ডাক্তারকে ধরলেন কিকিরা। মিথ্যে একটা পরিচয় দিয়ে। উপায় ছিল না। তা হোক—তবু অনেকটা বেলায় ধরতে পারলেন। একাই এসেছেন কিকিরা। তারাপদ অফিসে, চন্দন তার হাসপাতালে।

ডাক্তারবাবু মানুষটি ভাল। তবে কথা বেশি বলেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

কিকিরা সবিনয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ধরণীমোহনের কথা তুলতেই বিকাশ ডাক্তার যেন মহাভারত খুলে বসলেন। হাজার কথা। ধরণীমোহন কেমন বিশ্বাস করতেন তাঁর ডাক্তারকে, কতটা মান্য করতেন তাঁকে—এ-সব কথা দিয়ে শুরু করে ধরণীমোহনের পুরনো কথা, এমন কি, বেলগাছিয়ায় ফ্ল্যাট কেনার

পেছনেও যে ডাক্তারের বারো আনা উদ্যোগ ছিল, তাও বুঝিয়ে দিলেন।

মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ ডাক্তারবাবুর একতরফা বক্তৃতা শোনার পর কিকিরা বললেন, "উনি মারা গেলেন কীভাবে?"

"হার্ট ফেল করে। সাম কাইন্ড অফ ব্লকিং ... মশাই, সে কী বলব আপনাকে। সেদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ ধরণীবাবুর বাড়ি থেকে লোক এল। কাজের লোক, জগন্নাথ। এসে বলল, বাবুর বুকে খুব কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছেন, আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। ... ব্যাগ আর কয়েকটা ইঞ্জেকশন হাতে ছুটলাম। এদিকে আবার সেদিন একটা মিনিবাস অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে হাঙ্গামা বেঁধে গিয়েছে... ছুটতে-ছুটতে গিয়ে দেখি, ধরণীবাবু বিছানায় ছটফট করছেন, বমি করেছেন, বুকে অসহ্য কষ্ট, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা, স্প্যাজ্‌ম হচ্ছে—। প্রেশার, হার্ট—সবই দেখলাম। একটা ইঞ্জেকশনও দিলাম। অক্সিজেনের জন্যে লোক পাঠালাম। ভাবলাম, এই মুহূর্তে হাসপাতালে পাঠাতে না পারলে তো পেশেন্টকে বাঁচানো যাবে না। ... কিন্তু আমাদের অবস্থা বোঝেন। হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে করতে রোগী মারা গেলেন।"

"বাড়িতেই।"

"হ্যাঁ। আমার চোখের সামনে।"

কিকিরা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আরও কিছু কথা জানার আছে। কিন্তু তিনি তো আর পুলিশের লোক নন। প্রাইভেট কোনো গোয়েন্দা অফিসেরও অফিসার নন, কাজেই খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে সাত-সতেরো প্রশ্ন করা যায় না। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করবেন। এমনিতেই তো তিনি প্রথমে কথা বলতে চাননি। কেন বলবেন? অজানা অচেনা একজন লোকের সঙ্গে নিজের মৃত এক রোগীর বিষয় নিয়ে কথা বলতে কোন ডাক্তারই বা চায়! কিকিরা এ-সব জানতেন। কাজেই গোড়াতেই মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি একটা জমিজমা সংক্রান্ত কারবারের একজন কর্মচারী। ধরণীমোহনের কিছু জমি ছিল তাঁদের হাতে। তিনি মারা যাওয়ার পর সেই জমির ভাগীদার নিয়ে কোম্পানি খোঁজখবর করছে। তার আগে কিছু সাধারণ মামুলি কাগজ-কলমের কাজ থাকে। কিকিরা সেই কাজ সারতে ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছেন। রুটিন ওয়ার্ক বলতে যা বোঝায় এটাও তাই।

ডাক্তারবাবুর মেজাজ বুঝে কিকিরা এবার বললেন, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ওঁর কোনো ভারি অসুখ ছিল?"

"না। এই বয়েসে যা হয়, সামান্য হার্টের গোলমাল। নেগলিজেব্‌ল। তবে অ্যাজমা ছিল বছরে দু-একবার করে পড়তেন বিছানায়। আর অসুখ বলতে ব্লাড সুগার বাড়ত মাঝে-মাঝে। বেশি বাড়ত না। খাবারদাবার ধরাকাটা করে সেটা ম্যানেজ করা যেত।"

"তবে তো ভয় পাওয়ার মতন ..."

"না, না, একেবারেই নয়। ... একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—ধরণীবাবুর দুটি বদ অভ্যাস ছিল। অকারণ আজেবাজে ওষুধ খেতেন। অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আর মাথা ধরার ওষুধ তো মুড়ি-মুড়কির মতন খেতেন। দরকার নেই, তবু খেতেন। মনের বাতিক। কতবার বারণ করেছি—শুনতেন না। বলতেন, আরে এগুলো তো ইনোসেন্ট, এতে আর ক্ষতি কী হবে। ... বুঝলেন মশাই, উনি যেদিন মারা যান, সেদিনও আমি এসে দেখি—ধরণীবাবুর মাথার কাছে অ্যান্টাসিডের পাতা। পাতা প্রায় শেষ। পর পর কত যে খেয়েছেন, ঠিক নেই।"

কিকিরা আর কথা বাড়ালেন না। সুতো বেশি টানলে ছিঁড়ে যেতে পারে।

"ডাক্তারবাবু, এবার অন্য একটা কথা।"

"বলুন ?"

"ধরণীবাবুর ওয়ারিশান বলতে দুই ভাগ্নে।"

"হ্যাঁ। ধীরাজ আর শেখর।"

"আপনি চেনেন ?"

"চিনি। তবে কম। ধীরাজ চা-বাগানে থাকে। কলকাতায় কমই আসত। মামার কাজের সময় এসেছিল।"

"শেখর ?"

"তাকে দেখেছি। কাজের সময়ও দেখেছি। ওই ছোকরা ভাল নয়। রাফিয়ান টাইপের। ভদ্রঘরের ছেলে হয়েও অতি অসভ্য, রুড। অপদার্থ ছেলে !"

"যদিও আমাদের জানার কথা নয়, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ধরণীবাবু কি ভাগ্নেদের সম্পর্কে কিছু বলতেন আপনাকে বন্ধু হিসেবে ?"

"শেখরের নাম উচ্চারণ করতেন না বড়। ধীরাজকে ভালবাসতেন।"

কিকিরা এবার উঠতে-উঠতে বললেন, "শেখর থাকে কোথায় ?"

"জানি না।"

"ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, চলি— ! আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলাম। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।"

মুখার্জি ডাক্তার মাথা হেলালেন, "নমস্কার।"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে কিকিরা হঠাৎ বললেন, "ভাল কথা, এতক্ষণ কথা বললাম, আপনাকে তো একটা জরুরি জিনিস দেখানো হয়নি।" বলে পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা পুরনো খবরের কাগজ বের করলেন। করে এগিয়ে দিলেন। "এই দাগ দেওয়া জায়গাটা একবার পড়ুন।"

ডাক্তার অবাক হয়েছিলেন। তবু কাগজটা নিয়ে পড়লেন দাগ-দেওয়া জায়গাটা। পড়া শেষ করে বললেন, "পড়লাম।"

"কিছু নজরে পড়ল ?"

"না।"

"ওই যে লিখেছে, মৃত্যু-রহস্য, মানে হঠাৎ মারা যাওয়ার পেছনে যে-রহস্য আছে, তার কোনো কিনারা করা যায়নি। দেখেছেন ?"

কাগজটা আবার দেখলেন মুখার্জি ডাক্তার। তারপর বললেন, "ননসেন্স। কোনো মানে হয় না। এ-সব বাজে কথা। শুনুন মশাই, একটা কথা পরিষ্কার বলি ! ডাক্তার ভগবান নয়। অনেক লোকই হঠাৎ মারা যায়, অ্যাপারেন্ট কোনো রিজ্ন থাকে না। কেন মারা গেল, তা বলা যায় না। হাজার কারণ থাকতে পারে ! যাক গে, এ-সব বাজে কথার কোনো মানে নেই। নিন আপনার কাগজ।"

কিকিরা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন। নমস্কার জানিয়ে চলে এলেন ঘর ছেড়ে।

রাস্তায় নেমে কেমন যেন হতাশ লাগছিল তাঁর। ডাক্তারবাবু মানুষটি ভাল। তিনি যে কিছু লুকোবেন, তাও মনে হল না। ধরণীমোহনের ডেথ সার্টিফিকেট তিনিই দিয়েছেন। কোনোরকম সন্দেহ হলে কখনোই তিনি সার্টিফিকেট দিতেন না। মুখার্জি ডাক্তার এমন মানুষ যে, তাঁকে দিয়ে জোর করে বা টাকা খাইয়ে মিথ্যে ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

তা হলে কেন ওই মৃত্যু রহস্যের কথা লেখা হয়েছে ? কেন ? কী উদ্দেশ্য নিয়ে ? শুধুই কি মহিমচন্দ্রকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের জন্য ! তাই বা হবে কেন ? কোনো কারণ নেই, মিথ্যে একটা ধোঁকা দিয়ে টাকা আদায় ! আর মহিমচন্দ্র সব জেনেশুনে, বুঝেও ধাপ্পাবাজের হাতে হাজার-হাজার টাকা গুঁজে দিচ্ছেন গত একটি বছর ধরে ! আবার এ-কথাও বলছেন যে, কেন তিনি দিতে বাধ্য হচ্ছেন তা বলতে পারবেন না। মানে, তিনি কারণটা গোপন রাখতে চাইছেন ! অদ্ভুত !

কিকিরা কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন। মহিমচন্দ্রের ওপরই তাঁর রাগ হচ্ছিল। ভদ্রলোক চান, সাপ মরবে অথচ লাঠি ভাঙবে না। বা রে মজা !

সন্ধের মুখে-মুখে তারাপদ আর চন্দন একই সঙ্গে এল। চন্দনকে তার মেডিকেল মেস থেকেই ধরে এনেছে তারাপদ। সেইরকমই কথা ছিল।

ঘরে পা দিয়েই তারাপদ বলল, "স্যার, মলঙ্গা লেনের আশেপাশে খোঁজখবর করে দুটো হোটেল পেলাম। দুটোই তিন নম্বর ক্লাসের, চার নম্বরও বলতে পারেন। থার্ড ক্লাস ! মামুলি। ওর মধ্যে একটা হোটেলে শেখরের খোঁজ পাওয়া গেল। ম্যানেজার আধ-বুড়ো, কানে কম শোনে, তবে ওস্তাদ লোক। প্রথমে মুখ খুলতে চায় না। অনেক ভজিয়ে-ভাজিয়ে, শেখরের খবর পেলাম। হোটেলের খাতার পাতা উলটে তার নামও বের করল ম্যানেজার। শেখর

সপ্তাহ দুই আগেও ওই হোটেলে ছিল।"

কিকিরা বললেন, "মানে ক'দিন আগেও ছিল। পয়লা ফাল্গুনে যখন ওই শ্রদ্ধাঞ্জলি কাগজে বেরোয়, তখনো ছিল নাকি! আচ্ছা, শেখর কি ওই হোটেলে প্রথম আস্তানা গাড়ে?"

"না। ম্যানেজার বলল, পুরনো পার্টি। আর দু-একবার এসে থেকেছে।"

"হোটেলের খাতায় নিজের ঠিকানা কী দিত?"

"বালুরঘাট। বলত, বিজনেস করে, তাই মাঝে-মাঝে আসতে হয় কলকাতায়।"

"কিসের বিজনেস?"

"তা বলেনি।" বলে তারাপদ নিজের জায়গায় বসল। আবার বলল, "অফিস পালিয়ে সারা দুপুর আপনার কাজ করেছি, কিকিরা। কাল আমায় সেকশান-ইন-চার্জের দাবড়ানি খেতে হবে।"

কিকিরা কান দিলেন না কথাটায়। বললেন, "সিঁথি! সিঁথির খবরটার কী হল?"

"অফিসের এক বন্ধুকে বলেছি। হরিপদ। সিঁথিতেই থাকে, বেণী কলোনিতে। বলেছে খোঁজ এনে দেবে।"

"একটু তাড়াতাড়ি চাই হে, তারাপদ। দেরি করলে ক্যাচ করার অসুবিধে হবে।"

চন্দন বলল, "কেন?"

কিকিরা বললেন, "কেন? মহিমচন্দ্র যা বলছেন, তা যদি হয়—তবে দিন দশেক আগে শেখর শেষ টাকা নিয়েছে। পয়লা ফাল্গুনের আগে-আগেই। টাকাও নিয়েছে, আবার কাগজে শাসিয়ে রেখেছেও। এবারে নিয়েছে হাজার বারো। টাকা নেওয়ার পর মাস দেড়-দুই আর ও উৎপাত করে না। কাজেই শেখর আবার কবে টাকা চাইবে—তার জন্যে আমরা বসে থাকতে পারি না।"

চন্দন বলল, "কিন্তু একটা পাকাপাকি ঠিকানা ছাড়া শেখরকে পাবেন কেমন করে?"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। কথাটা ঠিকই। তবে, অজানা অচেনা মানুষকে খুঁজে বের করতে হলে তো এইভাবেই খোঁজ নিয়ে নিয়ে বের করতে হবে। বললেন, "কলেজ স্ট্রিটে কোন্ চশমার দোকানে তাকে দেখা গিয়েছিল ... !"

চন্দন বলল, "কিকিরা, কলেজ স্ট্রিটে কি একটা চশমার দোকান? কোন্ দোকানে সে গিয়েছিল, কেমন করে ধরব?"

"চেষ্টা করতে হবে।"

কথা ঘুরিয়ে চন্দন বলল, "আপনার প্রোগ্রেস কতদূর?"

"ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। কথাবার্তাও হয়েছে।" বলে কিকিরা ডাক্তার মুখার্জির কাছে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার বিবরণ দিলেন।

চন্দন মন দিয়ে সব শুনল। ভাবছিল। পরে বলল, "ধরণীবাবুর তো দেখছি কমসম করেও অনেক রোগ ছিল : ব্লাড সুগার, হার্ট ..."

"মুখার্জি ডাক্তার বললেন, ওগুলো নেগলিজিব্‌ল। বয়েস হয়েছিল ভদ্রলোকের, সামান্য গোলমাল তো থাকবেই।"

"তা ঠিকই।"

"তবে যেটা ঝামেলা করত সেটা অ্যাজমা !"

"অত অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খেতেন কেন ? অ্যাসিডিটির রোগ ছিল ? আলসার ..."

"তা কিছু বললেন না।"

"আর মাথা ধরার ওষুধ। সেটাই বা অত খেতেন কেন ?"

"বাতিক হয়ত।"

"পকেটে সবসময় ওষুধ থাকত ?"

"হ্যাঁ।"

"কী ট্যাবলেট, নাম জানতে চেয়েছিলেন ?"

"না। সেটা বাড়াবাড়ি হত।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা স্যার, ডাক্তার মুখার্জি বলেছেন—তিনি যখন রোগীকে দেখতে যান, তখনো বিছানার পাশে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেটের পাতা ছড়ানো ছিল।"

"তাই বলেছেন। দেদার ট্যাবলেটও খেয়ে ফেলেছিলেন ধরণীমোহন। হয়ত, বুকের ব্যথা ওঠায় ভেবেছিলেন গ্যাসের জন্যে ব্যথা হচ্ছে।"

চন্দন কী ভেবে বলল, "আপনি কি ডাক্তার মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি ওঁর কাছে যাওয়ার পর ধরণীমোহন শুধু বুকের কষ্টের কথা বলেছিলেন, না—এমন কিছু বলেছিলেন যাতে মনে হয়, কোনো ওষুধ-বিষুধ খেয়ে হঠাৎ তাঁর এই কষ্ট হতে শুরু করেছে ?"

কিকিরা তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, না, তিনি জিজ্ঞেস করেননি। তাঁর মাথাতেই আসেনি।

"তুমি হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন ?" কিকিরা বললেন।

"বলছি এইজন্যে যে, যদি কেউ তাঁকে এমন কোনো ট্যাবলেট খাইয়ে থাকে যেটা তাঁর পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর ! এ কেস অব পয়জনিংও তো হতে পারে।"

কিকিরা শুনলেন। ভাবলেন। তারপর বললেন, "তা কেমন করে হবে ! কে পয়জনিং করবে ! তা ব্যাপারটা জানা কঠিন নয়। ওটা অবশ্য ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বা একবার গিয়ে দেখা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে।"

তারাপদ বলল, "স্যার, পয়জনিং ! আরেব্বাস ! এ তো ডেঞ্জারাস ব্যাপার ! কে করবে পয়জনিং ? কেন করবে ? মহিমচন্দ্র কি এটা জানেন, বা অনুমান

করেন ?”

কিকিরা বললেন, “দাঁড়াও, অত হুড়োহুড়ি করে একটা ধারণা করে ফেলে লাভ নেই। মহিমবাবুর সঙ্গে আমরা কথা বলব। ধরণীবাবু মারা গিয়েছেন বাড়িতে। কারখানার অফিসে নয়। কাজেই মহিমকে ঝট করে চেপে ধরার অসুবিধে আছে। ধীরে-ধীরে জট খুলতে হবে।”

তারাপদ আর কিছু বলল না।

বগলা চা দিয়ে গেল।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, “তারাপদ, আমার মনে হয়—মহিমচন্দ্রদের, মানে রাহা ব্রাদার্সের রঙ কারখানায় একবার যাওয়া উচিত। সেখানে কিছু খোঁজখবর পাওয়া যেতে পারে। ধরণীমোহনের মারা যাওয়ার দিন সেখানে কিছু ঘটেছিল কি না, বা ওই কারখানায় মাঝেমধ্যে কোনো ঘটনা ঘটত কি না, খোঁজ নেওয়া দরকার। আর দরকার শেখরকে ক্যাচ করা।”

“প্রথমটায় ঝঞ্ঝাট নেই, স্যার, দ্বিতীয়টায় আছে।”

“থাকবে না।”

“থাকবে না ! কেমন করে ?”

“একটা মতলব ভাবছি। নট ইয়েট ফাইনাল। পরে বলব।”

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, “স্যার, আপনার খেলার এখন কোন্ রাউন্ড চলছে ? সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন তো ! তারপর না ফাইনাল !” বলে হাসতে লাগল।

৫

রাহা ব্রাদার্সের রঙ কারখানা ছোটই। তবে তুচ্ছ করার মতন নয়। এখানে চায়না ব্ল্যাক, প্রিমিয়ার, সাদা রঙ—চলতি কথায় যা বলা হয়—সবই তৈরি হয়। সাদা, সবুজ, লাল, কালো—এই সব রঙ তৈরি হয় আর প্যাকিং হয়ে যায়। কারখানা ছোট হলেও একটা শৃঙ্খলতা আছে। কর্মচারী বেশি নেই।

রঙের কিছুই বোঝেন না কিকিরা। তারাপদও নয়। তবু বিকেলে কারখানাটা একবার দেখে কিকিরা মহিমচন্দ্রের ঘরে এলেন। তারাপদ থাকল বাইরে। কিকিরা বলেছেন, কর্মচারীদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে যদি কোনো খবর জোটাতে পারে সে।

মহিমচন্দ্র বললেন, “আসুন। কারখানা দেখা হল ?”

মহিমের সামনের চেয়ারে বসতে-বসতে কিকিরা খুশির গলায় বললেন, “মশাই, একটা কথা আছে জানেন তো ? এক ফোঁটা মধু, এক কলসি গুড়ের জলের চেয়ে ভাল। আপনাদের কারখানা দেখে তাই মনে হল। কাজ অল্প,

কিন্তু রঙটঙ ভাল। হাই ক্লাস। পরিবেশটাও নোংরা নয়।"

মহিমচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, "এটাই আমাদের বিজনেস মটো। যা করব যত্ন করে করব। অনেক বড় কোম্পানিও আমাদের জিনিস কেনে। কিনে নিজেদের নামে চালায়।"

"কেন কিনবে না! ... ভাল জিনিস পেলে কেউ ছাড়ে!"

"চা খাবেন? না কোল্ড ড্রিংকস?"

"চা।"

মহিমচন্দ্র ঘণ্টি বাজিয়ে কাকে ডাকলেন। "চা নিয়ে এসো। ভাল করে আনবে। ... আপনার শাগরেদটি কোথায়?"

"বাইরে ঘুরছে। আসবে এখুনি ...।"

মহিমচন্দ্র কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কিকিরা বললেন, "এটা আপনার অফিস?" বলতে-বলতে ঘরটা দেখতে লাগলেন। একটা ঘর পার্টিশান করে দুটো ঘর করা হয়েছে। কাঠের পার্টিশান। চার ফুট মতন উঁচু, মাথায় ফুটখানেক কাচ। জানলা মাত্র দুটি। মহিমচন্দ্রের অফিসঘরটি সাধারণ ভাবেই সাজানো। লোহার আলমারি, ফাইল র‍্যাক, খুচরো কাগজপত্রর স্তূপ। দু-চারটে রঙের টিন। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ক্যালেন্ডার। বাঁধানো দুটি ছবি—মহিমচন্দ্রের বাবার আর দাদার।

কাঠের পার্টিশানের একটি জায়গায় ফাঁক। টিকিটঘরের কাউন্টারের মতন। পাশেই মহিমচন্দ্রের টেবিল। টেবিলের ওপর টেলিফোন, ফাঁকা জায়গাটির পাশেই।

কিকিরা ধীরেসুস্থে নিজের চুরুট ধরালেন। বললেন, "আপনার পাশের ঘরটা কি ধরণীবাবুর অফিসঘর ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ওখানেই উনি বরাবর বসতেন বোধ হয়!"

"বরাবর। আর এই যে ঘর, অফিস, চেয়ার, এখানে আমার দাদা বসতেন।"

"আপনি?"

"আমি তখন বেশিরভাগ সময় আমাদের স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে বসতাম। পার্টি আর জিনিসপত্র সাপ্লাই নিয়ে থাকতাম।"

"এখন ওখানে কে বসে?"

"আমাদের এক কর্মচারী, তবে আত্মীয়।"

"আত্মীয়! কেমন আত্মীয়?"

"দাদার শ্যালক। কান্তিলাল।"

দু-তিনটে ছোট-ছোট টান মারলেন কিকিরা চুরুটে। তারপর বললেন, "আচ্ছা, মহিমবাবু, আপনার আর ধরণীবাবুর অফিসের মধ্যে কাঠের পার্টিশান।

আপনারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন কেমন করে ?”

মহিমচন্দ্র হাসলেন, “একটু জোরে কথা বললেই শোনা যায়, পাঁচ ফুট, সাড়ে পাঁচ ফুটের পার্টিশানে কী কথা আটকায় ! মাথার ওপর ফাঁকা। অবশ্য জরুরি কথা বলতে হলে ওঁর ঘরে যেতাম। উনিও আসতেন।”

“তা ঠিক। ... ফোনও তো একটা দেখছি।”

“একটাতেই কাজ হয়ে যায়। পার্টিশানের এ-পারে ও-পারে আমাদের টেবিল। ফোনটা এখন আমার টেবিলে, ওটা ওই ফোকর দিয়ে ওঁর টেবিলে ঠেলে দিতাম দরকারে। উনিও দিতেন। অসুবিধে কিছু হচ্ছিল না। এ-অফিসে দুটো ফোন। একটা কারখানার স্টোর রুমে রাখতে হয়। আর কত ফোন রাখবে কোম্পানি ?”

“তা ঠিক। তারপর আজকাল যা ফোনের হাল ! ... ইয়ে, আপনারা তা হলে যে যার ঘরে বসেই কথাবার্তা বলতে পারতেন।”

“হ্যাঁ। জরুরি কথা হলে ঘরে যেতাম।”

মহিমচন্দ্রের বেয়ারা চা নিয়ে এল। তিন কাপ। তারাপদ কিন্তু তখনো আসেনি।

“আপনার শাগরেদকে ডেকে পাঠাই ?”

“পাঠান।” কিকিরা চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, “একটা কথা বলুন তো মহিমবাবু, সেদিন কি এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিল যাতে ধরণীবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন ?”

মহিমচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন কিকিরার দিকে। পরে বললেন, “কেন, আপনাকে আগে বলিনি ?”

“না। মনে পড়ছে না।”

“বলেছি। আপনার খেয়াল নেই। বা হয়ত আমারই ভুল হয়েছিল বলতে।” মহিমচন্দ্র বললেন, “দুপুরে একটা ফোন এসেছিল মেজোবাবুর। ওপাশে তিনি ফোন ধরেছিলেন, কী কথা হয়েছিল আমি বলতে পারব না। তবে মেজোবাবু যেরকম জোরে জোরে কথা বলছিলেন, তাতে বুঝলাম তিনি ভীষণ রেগে গিয়েছেন। গালিগালাজও করছিলেন।”

“কাকে করছিলেন আপনি জানেন না ?”

ইতস্তত করলেন মহিমচন্দ্র। শেষে বললেন, “মনে হল শেখরকে।”

তারাপদ এল। বসল একপাশে। কিকিরা ইশারায় চায়ের কাপ দেখালেন। মানে, নাও, চা খাও।

সামান্য পরে কিকিরা বললেন, “পরে আপনি নিশ্চয় ধরণীবাবুর ঘরে যান। তাঁকে দেখতে।”

“হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।”

“খুব উত্তেজিত দেখলেন ?”

"ভীষণ উত্তেজিত। মেজোবাবু বরাবরই একটু রগচটা, তবে সেদিন যেন রাগে ফেটে পড়ছিলেন।"

"আপনাকে কিছু বলেননি ?"

"না। শুধু বলছিলেন, এত সাহস ওর, আমাকে ধমকায়। লোফার, রাস্‌কেল...।"

"কাকে বলছিলেন ?"

"জানি না। ... নাম বলেননি।"

"উনি কি অসুস্থ বোধ করছিলেন তখন ?"

"খানিকটা তাই। মেজোবাবুর পকেটে, ড্রয়ারে সবসময় ওষুধ থাকে। এই মাথা ধরছে, এই অ্যাসিডিটি হচ্ছে। যখন-তখন ওষুধ খান।"

"আপনি ওঁকে ওষুধ খেতে দেখলেন ?"

"হ্যাঁ। একটা ওষুধ আবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। আনতে দেওয়া হল।"

"তারপর ?"

"আমি মেজোবাবুকে বাড়ি যেতে বললাম। শরীর খারাপ লাগছে, অযথা বসে থেকে কী লাভ !"

"উনি চলে গেলেন ?"

"ওষুধটা এল। উনি একটা ট্যাবলেট খেলেন। তারপরও বসে থাকলেন খানিকক্ষণ। শেষে আমি জোরাজুরি করতে উঠে পড়লেন। চলে গেলেন।"

"কিসে ?"

"ভ্যানগাড়িতে। আমাদের কোম্পানির একটা ভ্যানগাড়ি আছে। ডেলিভারির কাজে লাগে। ওই গাড়িতেই মেজোবাবু চলে গেলেন।"

"আপনার তো নিজের গাড়ি আছে। মেজোবাবুকে পৌঁছে দিতে গেলেন না কেন ?"

"যেতে চেয়েছিলাম। উনি কিছুতেই রাজি হলেন না। জেদি মানুষ। বললেন, স্ট্র্যান্ড রোডের দোকান হয়ে বাড়ি যাবেন।"

কিকিরা সামান্য চুপ করে থাকলেন। চা শেষ হয়েছে। তারাপদও শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা রেখে দিল।

আরও খানিকটা অপেক্ষা করার পর কিকিরা বললেন, "ধরণীবাবু কি বাসে, ট্যাক্সিতে কারখানায় আসতেন ?"

"না, বর্ধনবাবুর গাড়িতে। দু-পাঁচদিন বর্ধনবাবুর গাড়ি আমরা পাচ্ছিলাম না। গাড়ির কাজ হচ্ছিল বলে অন্য গাড়ি ভাড়া নিতাম।"

"কার গাড়ি ?"

"এক হিন্দুস্থানির।"

"চেনেন তাকে ?"

"না, মুখে চিনি, এদিকেই ভাড়া খাটে। সেদিন তখন গাড়িটা ছিল না।"

কিকিরা এবার ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উঠতে উঠতে বললেন, "মেজোবাবুর খবর আপনি কখন পান ?"

"সন্ধেবেলায়।"

"তাঁর বাড়ি গিয়ে কী দেখেন ?"

"মেজোবাবু মারা গিয়েছেন।"

কিকিরা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। পরে বললেন, "আজ চলি মহিমবাবু। ... কাল-পরশু একবার আসুন না আমার কাছে।"

"যাব। আমি মশাই বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছি।"

"অকারণ নার্ভাস হচ্ছেন কেন ! দেখুন না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। ... ভাল কথা, কাগজে আমিও একটা বিজ্ঞাপন ছাপছি। আপনার নামে নয়। তবে ব্যাপারটা আপনাদের।"

মহিমচন্দ্র যেন আঁতকে উঠলেন। "আবার বিজ্ঞাপন !"

কিকিরা হেসে বললেন, "উপায় কী ! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বলে একটা কথা আছে না ! এ হল সেই প্রসেস।"

তারাপদও উঠে পড়েছিল।

কিকিরারা ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মহিমচন্দ্র বললেন, "একটু পরে আমিও তো উঠব। একসঙ্গেই যাওয়া যেত আমার গাড়িতে।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। হেসে বললেন, "আজ নয় স্যার, অন্য একদিন যাব। আজ একটু কাজ আছে।"

কারখানার বাইরে এসে কিকিরা বললেন, "কী হে, সমাচার কী ?"

তারাপদ বলল, "খুব বেশি কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। তবে দুটো জবর খবর পেয়েছি।"

"যেমন ?"

"এই কারখানায় শেখরের দু-তিনজন ইয়ার দোস্ত আছে।"

"কে-কে ?"

"একজন ড্রাইভার। ছোকরা। ভাল নাম জটিলেশ্বর। জটা বলে ডাকে সবাই। জটার বাড়ি বউবাজার।"

"অন্য দু'জন ?"

"কালী ঘটক। সে কারখানায় কাজ করে। থাকে বড়বাজারে।"

"তিন নম্বর ?"

"ফণীশ্বর। ফণী বলে ডাকে লোকে। সে কিছুই করে না। নামে ইনচার্জ।"

কিকিরা বললেন, "এদের সঙ্গে শেখরের মেলামেশা হল কবে ?"

"শেখর যখন এখানে কাজ করতে এসেছিল, তখন।"

কিকিরার মনে পড়ল, একসময় ধরণীমোহন তাঁর ছোট ভাগ্নেকে রঙ কারখানায় নিয়ে এসেছিলেন কাজকর্ম শেখার জন্য। কিন্তু সে কিছুই শেখেনি, শিখতে চায়নি। টাকা চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারাপদ বলল, "স্যার, একটা জিনিস লক্ষ করলাম। এই কারখানায় শেখরের দু-একজন হেভি সাপোর্টার আছে। মেজোবাবুর অ্যান্টি পার্টি। স্পষ্ট করে কিছু না বললেও বোঝা যায় তারা ধরণীবাবুর ওপর খুশি ছিল না।"

"কেন?"

"মেজোবাবু কড়া লোক ছিলেন। কাজের গোলমাল দেখলে গালমন্দ করতেন। চুরিচামারি ধরতে পারলে চোরের বারোটা বেজে যেত।"

"এরকম চোর কে?"

"একজনের কথা তো শুনলাম, জটা। জটিলেশ্বর।"

"তার কোনো শাস্তি হয়েছিল?"

"চাকরি চলে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে হাতেপায়ে ধরে চাকরিটা বজায় রেখেছে।"

"মহিমচন্দ্র সম্পর্কে কী শুনলে?"

"কাজকর্মে পাকা নয়, তবে মানিয়ে নেন সকলের সঙ্গে।"

কিকিরা অনেকটা হেঁটে এসেছিলেন। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন রাস্তার মোড়ে। ট্যাক্সিটা ধরতে বললেন তারাপদকে।

ট্যাক্সিতে উঠে কিকিরা বললেন, "কলকাতা। ধর্মতলা।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

একটা সিগারেট চাইলেন কিকিরা।

তারাপদ সিগারেট দিল।

সিগারেট ধরিয়ে কিকিরা বললেন, "তারা, শেখরকে আমাদের পাওয়া চাই।"

"কেমন করে?"

"চেষ্টা করলে একটা লোককে ধরতে পারব না, তা কী হয়! নিশ্চয়ই পারব। তুমি যাদের কথা বললে—তারা কেউ-না-কেউ শেখরের খোঁজ দিতে পারে। কিন্তু এখন আমি সে-পথে যাব না। অন্য পথে তাকে টোপ গেলাব।"

"কেমন টোপ?"

"সম্পত্তির টোপ!"

"সম্পত্তির টোপ! কোথায় পাবেন সম্পত্তি?"

"সম্পত্তি পাব না। কিন্তু ডাক্তার মুখার্জিকে যেভাবে বাগিয়েছিলাম, শেখরকেও সেইভাবে বাগাতে চাই। দেখি কাজ হয় কি না!"

তারাপদ ভরসা পেল না, তবু বলল, "দেখুন !"

৬

মহিমচন্দ্র যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। রায়মশাই এ কী পাগলামি করেছেন ! বললেন, "এ আবার কী করেছেন ?"

কিকিরার ঘরে সন্ধেবেলায় চারজনই বসে আছেন : কিকিরা, মহিমচন্দ্র, তারাপদ আর চন্দন। চন্দনকে আজই প্রথম দেখলেন মহিমচন্দ্র।

কিকিরা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন মহিমের কাছ থেকে। হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "এ হল ফাঁদ। লোভের ফাঁদ পাতা ভুবনে ! কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে ! অন্‌লি ওয়ান স্টেপ স্যার, অ্যান্ড ইউ ফল। শেয়াল, কুকুর, হাতি, বাঘ, পাখি সব প্রাণীই ফাঁদে ধরা পড়ে। মানুষও।"

মহিমচন্দ্রের ঠিক পছন্দ হল না রসিকতাটা। গুরুগম্ভীর ব্যাপারের মধ্যে হাসি-তামাশার কী আছে ! বিরক্ত মুখে বললেন, "একে আপনি ফাঁদ বলছেন ! আমি কিছু বুঝলাম না।"

কিকিরা হালকাভাবেই বললেন, "বুঝলেন না কেন, মশাই। জলের মতন সোজা ব্যাপার। শেখরের কোনো একটা ফাঁদে—আপনি পা জড়িয়ে ফেলেছেন। দিস ইজ অ্যানাদার ফাঁদ। সোনালি ফাঁদ, সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজের খাতায় ধরণীমোহন সেনের নামে বিঘে দুই বসতবাটি-কাম-কমার্শিয়াল প্লট কেনা আছে, আর আছে পাঁচ একর ধানী জমি। জায়গাটা বর্ধমানে। দুর্গাপুর থেকে তিরিশ কিলোমিটার মাত্র। সোনালি ডেভালাপমেন্ট জানতে পেরেছে ক্রেতা ধরণীমোহন মৃত। এখন তাঁর জীবিত ওয়ারিশানরা হয় আইনসঙ্গত প্রমাণ দিয়ে জমিটা নিয়ে নিন নিজেদের হাতে, না হয় এখনকার বাজারদরে সোনালি ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজকে বেচে দিক।... এই তো ব্যাপার মশাই। ভেরি ইজি।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "মেজোবাবু এরকম কোনো জমি-জায়গা কেনেননি।"

"কেনেননি তো বয়েই গেল ! কিন্তু এখন কিনেছেন, ১৩৮৬ সনে।"

"কী যে বলছেন আপনি !"

"আমি ঠিকই বলছি। সোনালি কোম্পানির তরফ থেকে এই সাধারণ নোটিসটা পরশু কলকাতার তিনটে বাংলা পত্রিকায় বেরুবে। মনে রাখবেন, সলিসিটার বা আইন-মোতাবেক নোটিস নয়। কোম্পানির সাধারণ নোটিস। বলতে পারেন এজেন্টের নোটিস বা খোঁজখবর।"

"তারপর ?"

"তারপর নোটিসেই বলা থাকবে, ওয়ারিশানরা যেন অবিলম্বে সোনালি কোম্পানির কলকাতার অন্যতম এজেন্ট কিঙ্করকিশোর রায়ের সঙ্গে বিকেল

চারটে থেকে ছ'টার মধ্যে তাঁর বাড়িতে দেখা করেন। দেখা করে কথা বলেন। তিনি পরবর্তী আইনের ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দেবেন।"

মহিমচন্দ্র মাথা নাড়তে লাগলেন। "এ আপনার ছেলেমানুষি বুদ্ধি।"

"এই বুদ্ধি করেই ধরণীবাবুর ডাক্তারের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি। কথাবার্তা বলেছি। শেখর খোঁজ নিলেই সেটা জানতে পারবে।"

"কিন্তু সে খোঁজ নেবে কেন ? তা ছাড়া সে জানে, মামা তাকে কিছু দিয়ে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেসব হল জানা ব্যাপার। ধরণীবাবু বেঁচে থাকার সময়। কিন্তু তাঁর হঠাৎ মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির ভাগীদার সে তো হতে পারে আইনত। শেখর লোভী। সে একবার কি ব্যাপারটা দেখতে চাইবে না !... কী তারাপদ, তোমার কী মনে হয় ?"

তারাপদ একটু ভেবে বলল, "রিস্‌ক নিতেই পারে। দেখতে পারে, সত্যি তার মামার এমন কোনো সম্পত্তি আছে কি না ! থাকলে সে অনায়াসে তার দাবি জানাতে পারে।"

চন্দন বলল, "কিকিরা স্যার, আপনি একটু কারেকশান করুন বরং। ওয়ারিশানদের নাম দিয়ে দিন। লাইফ ইনসিওরেন্সে যেমন 'নমিনি'দের নাম থাকে—সেইরকম।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না। তা হবে না।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "আপনি কি মনে করেন শেখর এই নোটিস পড়বে ? পড়ে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসবে ?"

"না আসতেও পারে। কিন্তু উপায় কী ! শেখরের ঠিকানা যখন আপনি জানেন না—তখন তাকে আমি ধরব কেমন করে ? আমার হাতে আর কোনো উপায় নেই। ধরে নিন, এ হল আন্দাজে ঢিল ছোড়া, লেগে গেলেও যেতে পারে।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "শেখর কলকাতায় আছে আমি জানি। আমার কাছ থেকে সেদিনও সে টাকা নিয়েছে। তা ছাড়া কলকাতা ছাড়া তার যাওয়ার জায়গা আছে বলে আমি জানি না।

"কিন্তু বাড়ি ? কোথায় থাকে সে ?"

মহিমচন্দ্র যেন বাধ্য হয়েই বললেন, "রায়মশাই, আমি যখন আপনার হাতে সব তুলে দিয়েছি—তখন আর আপনার কাজে বাধা দেব না। যা ভাল বুঝবেন করবেন। তবে একটা কথা বলি, সোনালি না কী নাম বললেন কোম্পানির—সেই লোকের সঙ্গে দেখা করতে শেখর এ-বাড়িতে আসবে ? এটা কী অফিস ? এলেই তো সন্দেহ করবে ?"

কিকিরা বললেন, "আমি সব ভেবেছি স্যার ! একটা দু' হাতের অফিস ভাড়া করে বসে থাকা আরও রিস্‌কি হবে। কার মুখে কী শুনবে কে জানে ! তার

চেয়ে এই ভাল। সে তো অফিসে আসছে না—এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। লেখা আছে বাড়িতে যোগাযোগ করতে।"

"না-হয় এল ! তারপর ?"

কিকিরা হাসলেন। "একবার আসুক। যদি আসে—তার পরের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না।" বলে তারাপদদের দেখালেন, "আমার দুই শাগরেদকে দেখছেন তো ! বগলাও আছে।"

মহিমচন্দ্র আরও খানিকক্ষণ বসে উঠে পড়ছিলেন।

কিকিরা বললেন, "আপনার কিছু খরচপত্র লাগবে ! এই বিজ্ঞাপনটা কাল তারাপদ কাগজের অফিসে-অফিসে দিয়ে আসবে। স্পেশ্যাল বিজ্ঞাপন।"

মহিমচন্দ্র অ্যাটাচি খুলে টাকা বের করলেন। কী ভাবলেন যেন, তারপর দু-তিন হাজার টাকা এক থোকে বের করে এগিয়ে দিলেন।

"আমি উঠি ?"

"আসুন।"

"তারা আপনাকে নিচে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

"না না, কী দরকার !"

"যাক না !... আচ্ছা মহিমবাবু, আপনার গাড়ি কে চালায় ?"

"দুর্গা।"

"বিশ্বাসী !"

"বলেন কী ! কবে থেকে গাড়ি চালাচ্ছে !"

"জটা বলে আপনাদের কোম্পানিতে এক ড্রাইভার আছে না ?"

মহিমচন্দ্র অবাক হলেন। "হ্যাঁ। কেন ?"

"সে ভ্যান চালায় ?"

"চালায়। ডেলিভারি ভ্যান। রঙের ছোট-বড় কৌটো ডেলিভারি দিতে যেতে হয় দোকানে। অন্য কাজও থাকে খুচরো। জটা শুধু ড্রাইভার নয়, বিল আদায়ও করে।"

"ও আগে কী করত ?"

"এই কাজই করত। কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন ?"

"করছি। জটার সঙ্গে শেখরের ভাব ছিল ?"

মহিমচন্দ্র এবার কেমন চমকে গেলেন। তাকিয়ে থাকলেন। কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

কিকিরা বললেন, "সেদিন ওই ডেলিভারি ভ্যানে ধরণীবাবু অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। জটা সেদিন গাড়ির ড্রাইভার ছিল।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "রায়মশাই, মেজোবাবু জোর করে জটাকে নিয়ে ডেলিভ্যারি ভ্যানে বাড়ি যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, ফেরার পথে কোনো কাজ আছে, সেরে ফিরবেন।"

"কী কাজ আপনি জানতেন না ?"

"না।"

"আপনাকে বলেননি ?"

"না।"

"পরে, যখন ওইরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল—আপনি কিছু জানতে চাননি ?"

"পরে চেয়েছিলাম।... জটা বলল, গাড়িতে সামান্য জিনিস ছিল—স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে নামিয়ে দেওয়ার পর মেজোবাবু বললেন, একবার ডেকার্স লেনে যেতে। সেখানে আধঘণ্টা মতন ছিলেন। তারপর বাড়ি যান।"

"ডেকার্স লেনে কে থাকে ?"

"আমি জানি না।"

"আন্দাজও করতে পারেন না ?"

"না।"

চন্দন হঠাৎ বলল, "অত শরীর খারাপ সত্ত্বেও ডেকার্স লেনে গেলেন !"

"তাই গিয়েছিলেন।"

"তখনো শরীর খারাপ লাগছিল, না, একটু ভাল মনে করছিলেন ?"

"কেমন করে বলব ?"

"জটা কী বলল ?"

"জটা বলল, তখনকার মতন একটু ভাল।"

"ও !" চন্দন এবার কথা ঘুরিয়ে নিল। "মহিমবাবু, একটা সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করছি।"

মহিমচন্দ্র তাকালেন।

চন্দন বলল, "ধরণীবাবুর শুনলাম ওষুধ খাওয়ার খুব বাতিক ছিল। হরদম অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আর মাথা-ধরার বড়ি খেতেন। এই বাতিক নিশ্চয় অনেকদিনের ?"

"হ্যাঁ। তবে ইদানীং বেড়ে গিয়েছিল।"

"কতদিন ?"

"তা দু-তিন বছর।"

"কোন ওষুধ খেতেন বলতে পারেন ?"

"বলা মুশকিল। খেয়াল মতন খেতেন। যখন যেটা বাজারে উঠত বা কেউ বলত—সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কিনে এনে খেতে শুরু করতেন। আবার ক'দিন পরে ছেড়ে দিতেন। পাগলামি।"

"এরকম অভ্যেস অনেকের থাকে। নিজেরাই ডাক্তার।...তা আপনি কি জানেন, সেদিন উনি কোন ওষুধ খাচ্ছিলেন ?"

"না মশাই, জানি না।"

"মনে করতে পারেন ?"

"না।" মহিম মাথা নাড়লেন। "মেজোবাবুর টেবিলে ওষুধের পাতা—স্ট্রিপ পড়ে থাকতে দেখেছি। ওই যে আজকাল যেমন পাওয়া যায়—একদিকে প্লাস্টিক অন্যদিকে রাংতা বা কাগজ—ওই ধরনের।"

চন্দন চুপ করে গেল।

মহিমচন্দ্রই হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, সন্দেহের গলায়, "আপনি এ-সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? ওষুধের সঙ্গে কী সম্পর্ক ?"

চন্দন মাথা নাড়ল। সতর্ক হয়ে গেল। বলল, "না—এমনি জিজ্ঞেস করছি। ওষুধ মানেই যে সবসময় ভাল, তা তো নয়। খারাপও হয়ে যায়। ধরণীবাবু যেভাবে আচমকা মারা গেলেন..." কথাটা আর শেষ করল না চন্দন।

মহিমচন্দ্র আর অপেক্ষা করলেন না। বরং হঠাৎ একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে কিকিরাকে বললেন, "আমি চলি রায়মশাই।"

"আসুন। তারাপদ আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিক।"

তারাপদ উঠে পড়েছিল।

পা বাড়িয়ে মহিমচন্দ্র কিকিরাকে বললেন, "আপনি শেখরকে হাজির করতে পারবেন কি না আমি জানি না। যদি পারেন, খুব সাবধান ! শেখর যত চালাক, তত নিষ্ঠুর। ওর কাছে ছোরা-ছুরি থাকে, হয়ত পিস্তলও। ওর সঙ্গে সাবধানে কথা বলবেন। নজর রাখবেন।"

কিকিরা একটু হেসে বললেন, "মহিমবাবু, আমি তো আদতে ম্যাজিশিয়ান। পিস্তল, ছোরা-ছুরি দেখলে ম্যানড্রেকের মতন ভেলকি দেখিয়ে দেব।"

৭

তিন-চারদিন পরে এক বিকেলে বগলা এসে বলল, একটি ছেলে দেখা করতে এসেছে।

কিকিরা ঘড়ি দেখলেন। সোয়া পাঁচ। সাড়ে পাঁচ কিংবা পৌনে ছয়ের আগে তারাপদ আসতে পারবে না। তারাপদ বা চন্দন একজন কাউকে দরকার হতে পারে বলে তিনি সেইরকমই ব্যবস্থা করেছেন। মানে যে এসেছে সে যদি শেখর হয়—তবে শেখর চলে যাওয়ার পর তাকে ফলো করতে হবে। লোকটার পাত্তা জানা দরকার কিকিরার।

কিকিরা একটু গুছিয়ে নিলেন নিজেকে, তারপর বললেন, "কেমন ছেলে ? চোখে চশমা আছে ?"

"আছে।"

"ত্রিশ-বত্রিশ বয়েস ?"

"তা হবে।"

"ডাকো।... চা করবে আমাদের জন্যে... ।"

বগলা চলে গেল। একটু পরেই ঘরে এল শেখর।

কিকিরা চিনে নিতে পারলেন। ফোটো দেখেছেন। পরনে পাজামা, গায়ে ঝুলওয়ালা রঙিন পাঞ্জাবি। পোশাক পরিচ্ছন্ন। দেখতে বেশ ভালই শেখরকে। মাথার চুল কোঁকড়ানো। গায়ের রং ফর্সা। চিনে নেওয়া সত্ত্বেও কিকিরা অবাক হওয়ার ভান করে তাকিয়ে থাকলেন শেখরের দিকে।

শেখর ঘরে ঢুকে কেমন সন্দিগ্ধভাবে কিকিরাকে দেখতে লাগল। ঘরটাও তাকে রীতিমতন অবাক করছিল।

কিকিরা নিজের পরিচয় দিলেন। "আমার নাম কিঙ্করকিশোর রায়। সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্টের একজন এজেন্ট। কলকাতার। আপনি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কাগজে নোটিস দেখে?"

"হ্যাঁ। আমার নাম শেখর গুহ।"

"শেখর গুহ! ...ও! বসুন, বসুন। বসে পড়ুন। আমার এই ঘর এইরকমই। ফেয়ারলি প্লেস... !" বলে নিজেই হাসতে লাগলেন।

"ফেয়ারলি প্লেস?"

"লোকে তাই বলে, সাজানো-গোছানো দেখে ঠাট্টা করে বলে। বলুক। নামে কী আসে-যায়!"

"আপনি আমার নামটা যেন শুনেছেন মনে হচ্ছে!" শেখর বলল।

কিকিরা হাসতে-হাসতে বললেন, "আমাদের জানতে হয়, স্যার। যে-কাজ করি, সেটা বড় ভজকটো। ...মানে, আমাকে ডাক্তার মুখার্জির কাছে যেতে হয়েছিল। তিনি তো ধরণীবাবুর ডাক্তার ছিলেন। শেষ সময়েও দেখেছেন। ডেথ সার্টিফিকেট লিখেছেন, তাই না! তিনি আপনাদের কথা বললেন!"

"মুখার্জির কাছে কেন গিয়েছিলেন?"

"বলেন কি, স্যার! এ কোশ্চেন অব ডেথ! কোম্পানির ঝ্যাকড়া কত। শিওর হতে হবে একশো ভাগ। আপনি কর্পোরেশান থেকে মামার মৃত্যুর পর ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছেন?"

শেখর এবার ফাঁপরে পড়ে গেল। "না।"

"না কেন? এক বছর হয়ে গেল! এখনো ডেথ সার্টিফিকেট বের করতে পারলেন না!"

শেখর ইতস্তত করতে লাগল। "জানতাম না। মানে, সময় হয়ে ওঠেনি।"

"অবশ্য কর্পোরেশন থেকে কাজ বের করা কঠিন। ভীষণ সময় নেয়। কেউ কিস্যু করে না স্যার।... কিন্তু সার্টিফিকেটটা যে দরকার। লিগ্যালি

দরকার।”

শেখর কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল। “সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্ট এন্টারপ্রাইজের এই অফিস— !”

“অফিস ! অফিস কেন হবে ! আমাদের মেইন অফিস দুর্গাপুরে, আসানসোলেও বড় অফিস আছে। দু-চার জায়গায় ছোটখাটো অফিসও করেছি। কলকাতায় স্যার আগে কিছু করিনি। ভাল জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন জোকায় একটা নিজেদের জমি কিনেছি।”

শেখর বলল, “কলকাতা ছাড়া ব্যবসা হয় !”

“কলকাতায় স্যার আমাদের কে আর পুঁছবে ! এখানে গণ্ডায়-গণ্ডায় প্রোমোটার। মফস্বলে আমাদের কাজকর্ম হয়। কলকাতার লোক এই দশ-বারো মাইল এলাকা ছাড়া বোঝে না। বাইরের লোক বোঝে। আর আমাদের মেইন কারবার তো বর্ধমান জেলা নিয়ে। কোম্পানিও নতুন বলতে পারেন।”

কিকিরা বুঝতে পারছিলেন শেখর তাঁকে সন্দেহ করছে। তাতে অবশ্য তিনি ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন না।

“মামার এই সম্পত্তি নিয়ে এতদিন পরে আপনাদের কোম্পানি মাথা ঘামাচ্ছে ! এক বছর পরে ?”

কিকিরা হাসলেন। “স্যার ঠিক খোঁজখবর রাখেন না। মৃত মানুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে এক বছর তো কিছুই নয়, দশ বছরও হতে পারে। আইনের অনেক মারপ্যাঁচ আছে। তা ছাড়া ধরণীবাবু কোথাও লিখে যাননি তাঁর মৃত্যুর পর কে-কে ওয়ারিশান হবে ! উনি মারা গেছেন জানতেই আমাদের ছ'-সাত মাস কেটে গেল। তারপর খোঁজখবর শুরু করতে গিয়ে এখান-ওখান। ডাক্তার মুখার্জি। ...আরে মশাই, কাগজে ওই যে নোটিস—শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাপা হল—তারপরই তো বেশি করে টনক নড়ল আমাদের।”

শেখর পকেট থেকে বিলেতি সিগারেটের প্যাকেট বের করল। “ও ! ওটা আপনাদের চোখে পড়েছে ?”

“পড়বে না ! কতখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হয়েছে !”

“সিগারেট খান ?”

“দিন। আমি হলাম মিনি চুরুটের ভক্ত। গেঁয়ো লোক স্যার। মানকরে বাড়ি। কলকাতায় একটা আস্তানা রেখেছি—নানান কাজ করতে হয় বলে। জ্যাক অব অল ট্রেড্স।”

শেখর লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিল। নিজেও ধরাল।

বগলাকে ডাকলেন কিকিরা। “কী হল চায়ের ? ও বগলা ?”

সাড়া দিল বগলা।

সিগারেট খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "এবার একটু কাজের কথা হোক।"

"হোক। ...তার আগে আমায় একটু জল খাওয়ান যদি! যা গরম!"

কিকিরা বললেন, "সে কী স্যার! আনছি।" বলে নিজেই উঠে পড়লেন জল আনতে।

ফিরে এলেন সামান্য পরে জল নিয়ে। এগিয়ে দিলেন জলের গ্লাস।

"আপনি আর আপনার দাদা মৃত ধরণীবাবুর সোনালি কোম্পানির জমিজমার ওয়ারিশান," কিকিরা বললেন, "তাই না!"

"জমি তো মামার। আপনি সোনালি কোম্পানির নাম করছেন কেন?"

কিকিরা আগেভাগেই সব ভেবে রেখেছিলেন। বললেন, "অবশ্য, অবশ্য। জমি আপনার মামার। কিন্তু একটা শর্ত যে ছিল, স্যার। জমি নেওয়ার সময় বাকি কিস্তি—সে প্রায় কিছুই নয়—পাঁচ-সাত হাজার টাকা—শোধ করে দিতে হবে। তারপর দলিল রেজিস্টারি হবে।"

শেখর তাকাল। "ও! তাই!"

"এখন স্যার তিনটে কাজ আপনাকে করতে হবে। মানে আপনাদের। কর্পোরেশান থেকে ডেথ সার্টিফিকেটটা জোগাড় করুন, বাকি কিস্তিটা দিয়ে দিন, আর আইন মোতাবেক একটা চিঠি দিন আপনারা—ব্যস!"

বগলা চা আর মিষ্টি এনে দিল।

"এ-সব আবার কেন?" শেখর বলল।

"কিছু না। আপনি আমার ক্লায়েন্ট। আপনাদের জন্যেই আমরা।"

শেখর হঠাৎ বলল, "ক্লায়েন্টের জন্যে আপনি কী করেন?"

কিকিরা বুঝতে পারলেন। তিনিই টোপ দিয়েছেন যে! হেসে বললেন, "স্যার, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

"ও তো বুঝলাম। এখানে অবস্থা..."

"ডেথ সার্টিফিকেট, উকিল—এ দুটো আমার হাতে ছাড়তে পারেন।"

"কত লাগবে?"

"সে আর কী বলব! হবে। কিন্তু আপনার দাদা—"

"বাদ দিতে পারেন না?"

"বা-দ! তা কেমন করে হয়! আইন বলে কথা!"

"রাখুন আইন। আইন মানেই বে-আইন। ...কেন, আমার মামা আমাকে একলা কিছু জমি-জায়গা দিয়ে যেতে পারে না?"

কিকিরা যেন ভাবতে-ভাবতে বললেন, "তা পারেন। তবে ওই পুরনো কাগজপত্রে একটু জাল-জালিয়াতি করতে হবে। মানে, দেখাতে হবে যে—আপনাকেই একমাত্র ওয়ারিশান করেছিলেন জমি-জায়গার।"

চা খেতে-খেতে শেখর বলল, "তাই করবেন।"

"স্যার, অনেক খরচ পড়ে যাবে।"

"আপত্তি নেই। আমি যদি মালিকানা সোনালিকেই বেচে দিই—আপনারা তো নেবেন বলেছেন—তা হলে কত পেতে পারি ?"

"বাজারদরই পাবেন। সামান্য কম।"

"কত পাব ?"

"হিসেব করে বলতে হবে। আন্দাজ চল্লিশ, বেশি হলে পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ।"

"বেশ। আপনি পাঁচ পাবেন। ...সব মিলিয়ে।"

কিকিরা এবার একটু হাসলেন। বললেন, "কম হয়ে যাচ্ছে। অনেক কাজ স্যার। ...তার ওপর এই যে একটা ফ্যাকড়া বাঁধিয়ে রেখেছে।"

"কিসের ফ্যাকড়া ?"

"পড়েননি ? দেখেননি মন দিয়ে ! রাহা কোম্পানির ওই ছাপানো লেখায় যে বলা আছে, মৃত্যুটা রহস্যময়। তার কোনো কিনারা আজ পর্যন্ত হল না। ধরুন, হঠাৎ করে কেউ যদি ওই প্রশ্নটা তোলে !"

শেখর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। "ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমার ব্যাপার।"

কিকিরা কিছু বললেন না।

শেখর এবার উঠে পড়ল। "আপনি এগিয়ে যান, আমি আছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে শিয়ালদার মুন হোটেলে যাবেন। তেতলায় বাইশ নম্বর ঘর।"

"বাইশ নম্বর। ...তা আপনি একদিন আসুন না স্যার। আমি একটু নাড়াচাড়া করে দেখি সব।"

"আমি আসব ?"

"আসুন না !"

"কবে ?"

"আসছে হপ্তায়। বুধবার।"

"ঠিক আছে।"

শেখর উঠে পড়ল।

কিকিরা তাকে এগিয়ে দিতে গেলেন।

সিঁড়িতে তারাপদর সঙ্গে দেখা।

তারাপদ কিছু বলবার আগেই কিকিরা বললেন, খানিকটা রাগের গলায়, "বাড়িভাড়া নিতে আসার এটা সময়, মশাই ! সারাদিন করছিলেন কী ? ...ওপরে যান, আমি আসছি।"

তারাপদ দেখল শেখরকে। বুঝতে পারল। ফোটো দেখেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল তারাপদ।

নিচে নেমে শেখর বলল, "আপনার বাড়িওয়ালা ?"

"বাড়িওয়ালার কর্মচারী। এদিককার দু'-তিনটে বাড়ির মালিক এক মুসলমান ভদ্রলোক। তাঁর অন্য কিছু ছোটখাটো কারবারও আছে। ছোকরা সেখানে কাজ করে।"

নিচে নেমে শেখর সামান্য দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ট্যাক্সি ধরল।

"আসি মশাই।"

"আসুন স্যার।"

"ওহো, ভাল কথা। আপনার ঘরে বোধ হয় আমি সিগারেটের প্যাকেটটা ফেলে এসেছি। খেয়ে নেবেন।"

কিকিরা আরও একটু হেসে বললেন, "আপনি বড় অন্যমনস্ক। পকেটের মানিব্যাগটাও পড়ে গিয়েছিল। এই নিন। নিয়ে যান।" কিকিরা ব্যাগ দিলেন শেখরকে।

কিকিরা ফিরে এসে দেখলেন, তারাপদ তার নিজের কোণের জায়গাটিতে বসে আরাম করে সিগারেট টানছে। চোখ প্রায় বোজা। সিগারেটের চেহারাটা লম্বা। বোঝাই যায়, শেখরের ফেলে যাওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিয়েছে তারাপদ।

কিকিরাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বললেন, "হ্যা-ল্‌-লো, তারাবাবু! কী বলেছিলাম!"

তারাপদ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বিলেতি সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

"ফেলে গিয়েছে। শ্রীমান শেখর গুহ... !" কিকিরা বললেন।

"ফেলে গিয়েছে, না, আপনাকে দিয়ে গিয়েছে ?"

"দিয়ে গিয়েছে! গিফ্‌ট... !"

"উইথ এ নোট—টাকা নয় স্যার, শুধু একটা লাইন। প্যাকেটের মধ্যেই আছে।"

কিকিরা অবাক হলেন। "তাই নাকি ? কই দেখি... ৷" প্যাকেটের মধ্যে রাংতার আলতো কাগজে লেখা : 'চালাকি হইতে সাবধান।' কাগজটা পাট করে গুঁজে দেওয়া। দেখলেন কিকিরা। অবাক হয়ে বললেন, "বাঃ, এ তো একেবারে বুনো ওল হে!"

"আপনাকে ভেলকি দেখিয়ে গেল।"

"তা ঠিক। গোড়া থেকেই কারবারের রকম-সকম জানে। তবে বাছাধন পালাতে পারবে না। কমিশন কেটে নিয়েছি।"

"আপনার কমিশন ?"

"ওই আর কী ! খরচা !"

"চমৎকার।"

"তারাবাবু, শেখর আমায় সাবধান করে দিয়ে গেছে! নিজেও ধরা পড়েছে যে! ওর মানিব্যাগ থেকে যে আমিও কিছু উদ্ধার করেছি।"

তারাপদ তাকাল। "উদ্ধার করেছেন?"

"পকেট মেরেছি।"

"পকেট মেরেছেন?"

কিকিরার যেন কিছুই হয়নি, স্বাভাবিক ভাব করে শেখরের ফেলে যাওয়া প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে আঙুলে ঠুকতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো! শেখর কথার মধ্যে এক গ্লাস জল খেতে চাইল। আমি উঠে গেলাম বগলাকে বলতে। নিজেই জল নিয়ে এলাম। এরই মধ্যে ও কাজটা সেরে রেখেছিল। আমি ওর পাঞ্জাবির পকেটে চকচকে ডট পেন দেখেছি। তবু বলব, ছোকরা বুদ্ধিমান। আমার ঘরে এসে আমায় বোকা বানিয়ে গেল! কিন্তু নিজেও যে কত বড় বোকা বনে গেছে—হোটেলে গিয়ে বুঝতে পারবে। আগেও পারতে পারে—মানিব্যাগ খুললে।"

তারাপদ বলল, "বুঝলাম না।"

কিকিরা জামার পকেট থেকে কয়েকটা টুকরো কাগজ আর একটা চাবির রিং বের করলেন। রিংয়ে দুটিমাত্র চাবি।

কাগজগুলো কিকিরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে একবার দেখেছিলেন। এবার ভাল করে দেখলেন। বললেন, "একটা রসিদ। হোটেলের। এই কাগজটা ব্যাঙ্কের। খুচরো। স্লিপে টাকা জমা দিয়েছে। 'শেখরচন্দ্র গুহনিয়োগী' নামে। বেনামী অ্যাকাউন্ট। বোধ হয়, তারিখ দেখে মনে হচ্ছে, মহিমচন্দ্রের কাছ থেকে শেষ টাকা নেওয়ার পর সেই টাকার কিছুটা গচ্ছিত রেখেছিল। আর তিন নম্বর কাগজটায় একটা ফোন নম্বর লেখা আছে। তলায় আবার লেখা 'বারো'। কার ফোন—নাম নেই।"

"চাবি দুটো?"

"বোধ হয় হোটেলের।" কিকিরা ভাল করে দেখলেন। বললেন, "আমায় ধাপ্পা দিয়ে বলে গেল শিয়ালদার মুন হোটেলের তেতলায় বাইশ নম্বর ঘরে থাকে। রসিদে দেখছি, এটা নিউ সেন্ট্রাল হোটেল। প্রিন্সেপ স্ট্রিট।"

তারাপদ হাসল। "আপনাকে তা হলে...!"

কথা শেষ হওয়ার আগেই চন্দনের গলা পাওয়া গেল।

চন্দন ঘরে আসতেই তারাপদ মজার গলায় বলল, "চাঁদু, কিকিরার সঙ্গে শেখরের মোলাকাত হয়ে গেছে। একটু আগে। শেখর একেবারে স্যারের কৃতিত্বে মুগ্ধ। বিলেতি সিগারেট প্রেজেন্ট করে গিয়েছে। খা। স্যারের কাছে আছে।"

তারাপদর রগুড়ে কথাবার্তায় কান দিলেন না কিকিরা। চন্দনকে বসতে

বললেন। তারপর কী ঘটেছে বিকেলে, তার বৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন।

চা নিয়ে এসেছিল বগলা।

চা খেতে-খেতে বৃত্তান্ত শোনানো শেষ হল।

চন্দন বলল, "আপনার এত কষ্টের সোনালি তো তা হলে ডকে উঠে গেল কিকিরা। ধরা পড়ে গেলেন।"

কিকিরা মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, "ধরা না দিলে ধরা যায় না অনেক সময়। শেখরকে যখন একবার খুঁজে পেয়েছি, তাকে কি আর পালাতে দেওয়া যায়! হয় ওকে ফিরে আসতে হবে এখানে, না হয় আমি যাব।"

"নিউ সেন্ট্রাল হোটেলে?"

"হ্যাঁ, সেখানে যাব। ব্যাঙ্কে যাব। ব্যাঙ্কের কাগজটা বেশি কাজে লাগবে। বেনামা অ্যাকাউন্ট। সেখানে আবার কী ঠিকানা দিয়েছে কে জানে!"

"ফোনের নম্বরটা কার? ওর হোটেলের?"

"বুঝতে পারছি না।"

"মহিমচন্দ্রের নিশ্চয়ই নয়।"

"না। মহিমচন্দ্রের ফোন নম্বর টুকে রাখার কারণ নেই।" বলতে-বলতে কিকিরা হঠাৎ চন্দনকে বললেন, "চাঁদু, এক কাজ করো। নিচে চলে যাও। বড় রাস্তায় দীননাথ স্টোর্স পাবে। ফোন আছে দোকানে। আমার নাম করে ফোন করতে চাইবে। টাকা নিতে চাইবে না ছোকরাগুলো। কল-চার্জ দিয়ে দিয়ো জোর করে। নাও, চলে যাও—এই নাও ফোন নম্বর। ধরবার চেষ্টা করে দেখো—কার নামের ফোন। ...নিচে একটা নম্বরও আছে, বারো। কিসের নম্বর?"

চন্দন ফোন নম্বরের টুকরো কাগজ নিয়ে চলে গেল।

কিকিরারা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অন্তত দশ-পনেরো মিনিট পরে ফিরে এল চন্দন। কেমন যেন বিমূঢ়। বলল, "স্যার, এই ফোন তো নার্সিং হোমের। রিপন স্ট্রিটের নার্সিং হোম। নার্সিং হোম শুনে আমি তাজ্জব! তারপর কী খেয়াল হল, বারো নম্বর আর শেখরের নাম বলতেই নার্সিং হোম থেকে বলল, "পেশেন্ট ঠিক আছে।"

কিকিরা আর তারাপদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

৮

গায়ে গা লেগে যাওয়ায় শেখর দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। সামান্য রুক্ষ চোখেই।

"স্যরি।"

"গায়ের ওপর এসে পড়ছেন যে!"

"এসে পড়িনি, ঠেলা খেয়ে গায়ে পড়ে গিয়েছি। নার্সিং হোমের বেরুবার জায়গাটা এত ন্যারো।"

"ঠিক আছে।" শেখর পা বাড়াল।

"আপনার পেশেন্টের কত নম্বর ঘর?"

শেখর রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। নার্সিং হোমে লোক ঢুকছে, বেরিয়ে আসছে। জায়গাটায় ভিড়। তাকাল পাশের লোকটার দিকে। "আপনার দরকার?"

"এমনি! আমারও এক পেশেন্ট আছে এখানে। আমি ডাক্তার।"

"ডাক্তার!"

চন্দন হাসল। তার স্টেথ্‌সকোপটা প্যান্টের পকেটে উঁকি দিচ্ছিল। গায়ে কোনো অ্যাপ্রন নেই।

চন্দন আলাপি গলায় বলল, "আমার ডিরেক্ট পেশেন্ট নয়। এক বন্ধুর পেশেন্ট। বলেছিল, একবার দেখে যেতে। কেসটা একটু সিরিয়াস। তবে ক্রাইসিস কেটে গিয়েছে অনেকটা।"

"ও! ভাল!"

"আপনার পেশেন্ট ... ?"

"গাড়ির ধাক্কা। মাথায় লেগেছিল!"

"মাথায়! তবে তো ..."

"এখন অনেকটা ভাল।"

"গুড নিউজ!"

বলতে বলতে শেখর আরও খানিকটা ফাঁকায় আসতে পাশের ফুটপাথ থেকে কে যেন এগিয়ে এল। "গুড ইভ্‌নিং, স্যার।"

শেখর তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। সেই লোকটা। রায়।

কিকিরা আবার বললেন, "গুড ইভ্‌নিং স্যার।"

কথার জবাব দেবে না ভেবেছিল শেখর। তাকিয়ে চলে যাবে ভাবছিল, চোখে পড়ল আরও একজনকে—তারাপদকে।

শেখর বুঝতে পারল, পালিয়ে লাভ নেই, মুখোমুখি দাঁড়ালেই ভাল।

"কী দরকার আপনার?" শেখর বলল।

"আমায় চিনতে পারছেন না!"

"বেশ পারছি।"

"আপনি স্যার আমায় ভুল ঠিকানা দিলেন! সব ভুল!"

"আপনি নিজে কি আমাকে সত্যি কথাটা জানিয়েছেন। চালাকি করতে গিয়েছিলেন আমার সঙ্গে! সোনালি ল্যান্ড ডেভোলাপমেন্ট ...! নিজের ভাঁড়ার ঘরে বসে ল্যান্ড ডেভোলাপমেন্ট ... !"

"ভাঁড়ার ঘর বলছেন কী! ওটা আমার জাদুঘর।"

"জাদুঘর! মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ! ... শুনুন মশাই, বটতলার বই পড়ে

ছিচকে গোয়েন্দা হওয়া যায়—আসলে মুখ্যু মাথামোটারা আপনার মতন গোয়েন্দা হয়—ভাঁড় !”

“স্যার, আমি গোয়েন্দা নই। আমার বাপ-ঠাকুরদা কোনোকালে গোয়েন্দা ছিল না। বিলিভ মি !”

“আপনি কী ?”

“কিকিরা। কিঙ্করকিশোর রায় থেকে কিকিরা। কিকিরা দি ম্যাজিশিয়ান।”

“তা বুঝতে পারছি। পকেটমার ম্যাজিশিয়ান।”

কিকিরা রাগ করলেন না ; হাসতে হাসতে বললেন, “শুনুন শেখরবাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই। আমরা যদি বসে বসে দুটো কথা বলতাম, ভাল হত। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না। চলুন না, কোথাও বসি। বড়জোর আধঘণ্টা।”

শেখর মাথা নাড়ল। “আপনি ওই মহিম লোকটার ভাড়া করা গোয়েন্দা !”

“কে বলেছে আপনাকে ?”

“আমার লোক আছে। আপনারা দু'জন হাওড়ায় রঙ কারখানায় গিয়েছিলেন। হেম পালিত লেনের বাড়িতেও আসা-যাওয়া করেন।”

তারাপদ অনেক আগেই কিকিরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চন্দন ঠিক শেখরের পেছনে।

কিকিরা বললেন, “কারখানার লোক আপনাকে জানিয়েছে ?”

“জানাবার লোক আমার অনেক আছে।”

“আমি স্যার সত্যিই মুখ্যু। তবে গোয়েন্দা নই। ... এখন কথা হল—আপনি আমাদের সঙ্গে বসে কথা বলতে চান, না ওই নার্সিং হোমে যে পড়ে আছে, তার ভাল চান !”

“মানে !”

“আমি জটার কথা বলছি। জটিলেশ্বর—” বলে চন্দনকে ইশারায় দেখালেন। “ও চন্দন। ডাক্তার। হাসপাতালে আছে। আমার শাগরেদ। ... একটা কথা আছে জানেন তো, দি ফ্ল্যাগ অব ধর্ম ফ্লাইজ উইথ দ্য উইন্ড। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কলটাকে আমি পতাকা করে নিয়েছি।” একটু থামলেন কিকিরা, মুচকি হাসলেন। “যাই বলুন, আপনার মানিব্যাগে পাওয়া টুকরো কাগজগুলো, ওই ফোন নম্বরটাও আমাদের ভীষণ কাজে লেগেছে।”

“বুঝেছি।”

“চন্দন ওই ফোন নম্বরে ফোন করতে ওরা রিপন স্ট্রিটের এই নার্সিং হোম থেকে সাড়া দিল। তারপর চন্দন থতমত খেয়ে আপনার নাম বলল, আর ফট করে বারো নম্বরটা বলে দিল। ব্যস—সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল ওই নার্সিং হোমে বারো নম্বর পেশেন্ট আপনার লোক। অন্তত চেনা লোক।”

শেখর বলল, “অনেকটাই এগিয়েছেন তা হলে ! বাকিটাও এগিয়ে যান।

যদি আটকে যান, আমার কাছে আসবেন। আমার হোটেলে। আসল হোটেলে। তবে জানবেন, জটাদার যদি কিছু হয়—সে আমি আপনার মক্কেলকে ছাড়ব না। আমি তাকে খুন করব, যদি দরকার হয়। ... নিন, সরুন। ভদ্রলোকের এক কথা। কথা বলতে হয় আমার হোটেলে আসবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমায় ভয় দেখাবেন না।" শেখর কিকিরার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক, তেমনই নাটকীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিকিরা বললেন, "চলো।"

প্রায় চুপচাপ খানিকটা এগিয়ে এসে কিকিরা চন্দনকে বললেন, "চাঁদু, জটিলেশ্বরের ইনজ্যুরি কেমন ?"

"সিরিয়াস নয়।"

"তবে যে বলছে ..."

"হাতে রেখে বলছে।"

"জটার এই অ্যাক্সিডেন্টের কথা মহিমচন্দ্র আমাকে বলেননি। চেপে গেছেন। আর একটা ব্যাপার দেখেছ ? ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র তিন-চার দিন আগে। মানে, মহিমের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের পর—"

তারাপদ বলল, "স্যার, আপনার সোনালির নোটিশ যেদিন কাগজে ছাপা হল, সেই দিনই বোধ হয়।"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন।

চন্দন বলল, "এই নার্সিং হোমে আমার নিজের জানা চেনা তেমন কোনো ডাক্তার নেই। তবে মনোজদা এখানে কেস নেয়। মনোজদার পেশেন্ট থাকে। তাকে বলে নার্সিং হোমে ঢুকেছি। দু-একজনের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছি। ডাক্তারে-ডাক্তারে চট করে ভাব হয়ে যায়, জানেন তো ! আপনি ভাববেন না, এদিকটা আমি ম্যানেজ করব !"

কিকিরা একটা চুরুট ধরাবার জন্য দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন। বললেন, "জটার হল অ্যাক্সিডেন্ট, আর তাকে নার্সিং হোমে ঢুকিয়ে দিল শেখর। ব্যাপারটা মন্দ নয় !"

তারাপদ বলল, "তা এখন কী করবেন আপনি—"

"কী করব ! কেন, শেখর তো বলেছে সে ভদ্রলোক। এক কথার মানুষ সে। তার হোটেলে গিয়ে কথা বলতে বলেছে—অবশ্য যদি আমরা কথা বলতে চাই। ... তা যাব বইকি ! শেখরের হোটেলেই যাব। দেখা যাক কী হয় !"

দরজা খুলে দিল শেখর। দরজায় কিকিরা। দেখল কিকিরাকে।

"কী, ভেতরে আসব?"

"আসুন।"

"আমার সঙ্গীরাও আছে।"

"সঙ্গী! ডাকুন তাদের।"

কিকিরা তারাপদদের ডাকলেন।

দরজা বন্ধ করে দিল শেখর।

হোটেলের ছোট ঘর। মামুলি আসবাব। বিছানা ছাড়া বসবার চেয়ার দুটি মাত্র।

কিকিরা বললেন, "ভদ্রলোকের এক কথা, আপনিই বলেছিলেন। বলেছিলেন, দরকার থাকলে দেখা করতে পারি। কালই আসতাম, পারিনি। আজ এলাম।"

"বসুন।"

হোটেল-ঘরের বিছানাতেই বসলেন কিকিরা। তারাপদদের বসতে বললেন ইশারায়। ওরা চেয়ারে বসল।

কিকিরা কিছু বলার আগেই শেখর বলল, "বলুন, কী বলতে চান?"

কিকিরা বললেন, "আপনি কাল মহিমবাবুকে ফোন করেছিলেন?"

শেখর দু' মুহূর্ত দেখল কিকিরাকে। "হ্যাঁ।"

"আবার টাকা চেয়েছেন?"

"চাইতেও পারি। মহিম রাহা বলেছে আপনাকে!"

"টাকা তো আর পাবেন না।"

শেখর ভুরু কোঁচকাল। "পাব কি পাব না, আপনি কেমন করে জানলেন? রাহা আপনাকে পাঠিয়েছে?"

"হ্যাঁ বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। আমি নিজে এসেছি। ... আপনার তহবিলে তো অনেক টাকা জমা পড়েছে। আর কেন?"

"আরও পড়বে। আসলের সঙ্গে মাঝে-মাঝে সুদ দিতে হয়। আপনাদের যখন লাগিয়েছে, তখন সুদ তো দিতেই হবে।"

কিকিরা দেখলেন শেখরকে। একটু হাসলেন। "কাউকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা অপরাধ, তা আপনি জানেন! যে-কোনো ধরনের ব্ল্যাকমেইলিং—ক্রিমিন্যাল অফেন্স!"

"জানি।"

"ব্যাপারটা পুলিশ পর্যন্ত গড়াতে পারে।"

"মহিম রাহা পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনাদের পাঠাল কেন? তাকে বলুন

না, পুলিশের কাছে যেতে।"

কিকিরা সামান্য অপেক্ষা করে বললেন, "অগত্যা তাই যেতে হবে। ... আর পুলিশের কাছে গেলে আপনিই কি ছাড়া পাবেন—, নানা জালে জড়িয়ে পড়বেন।"

"তাই নাকি ! যেমন ?" শেখর মুখ টিপে হাসল যেন।

"আপনি জানেন না বুঝি কোন-কোন জালে জড়াতে পারেন !" বলতে-বলতে কিকিরা পকেট থেকে কী যেন বের করলেন। দেখালেন না। বললেন, "যদি বলি, ধরণীমোহন সেন—আপনার মামাকে—আপনি মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন—।"

শেখর হঠাৎ চটে গেল। "না। আমি কোনো ষড়যন্ত্র করিনি। আর ধরণী সেন আমার মামাও নয়।"

কিকিরা কেমন থমকে গেলেন। তাকালেন তারাপদদের দিকে। তারাও অবাক হয়ে শেখরকে দেখছিল।

"মামা নয় ! কী বলছেন ! সবাই জানে আপনি ধরণীবাবুর ভাগ্নে।"

"সবাই কী জানল, তাতে আমার কী এসে-যায় ! আমি ধরণী সেনের ভাগ্নে নই।"

"তবে আপনি কে ?"

"ধরণী সেনের সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আমি ওঁর দিদির নিজের ছেলে নই। পালিত পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই। ওঁকে আমি 'মা' বলতাম। ধরণী সেনকে 'মামা' বলতাম ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি কোনোদিন ভাগ্নের মতন ব্যবহার, আলাদা কোনো স্নেহ-মমতা পাইনি। তিনি আমায় পছন্দ করতেন না।"

কিকিরা অবাক হয়ে গেলেন। তারাপদরাও যেন বোকার মতন শেখরের দিকে তাকিয়ে থাকল।

শেখরের চোখমুখের ভাব, তার স্পষ্ট ও শক্ত কথা বলার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, সে মিথ্যে কথা বলছে না। তবু কিকিরা সামান্য সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, "মহিমবাবু তো আমাদের এ-কথা বলেননি ?"

"সে আপনারা জানেন। মহিম রাহা আপনাদের কানে-কানে কী বলেছে—আপনারাই বুঝবেন। আমি নয়।" শেখর কঠিনভাবেই বলল।

"ডাক্তার মুখার্জিও একবার বললেন না ?"

"দরকার মনে করেননি। বা বলতে চাননি। ধরে আনুন না তাঁকে, দেখি তিনি কী বলেন ? ... আপনি ভাববেন না, ভদ্রলোক আমার ওপর সদয়। আমার ধরণীমামাটি যেমন বোঝাতেন, তিনি তেমনই বুঝতেন। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম !"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনি শেখর গুহনিয়োগী নামে একটা চোরাই

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখেন। তার কাগজ আমি ...”

“রাখি ; ওই নামেই রাখি। ওটাই আমার আসল নাম ও পদবি। ধরণী সেনের নিজের ভাগ্নের পদবিও অবশ্য গুহ। আমি গুহনিয়োগী। আমার বাবা নিয়োগী ছিলেন। মা—যিনি আমায় পালন করেছেন—ধরণী সেনের বিধবা দিদি—তিনি নিজেদের গুহ পদবিটা বাড়তি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো মা ভাবতেন তাতে ভাল শোনাবে।”

কিকিরা তারাপদ আর চন্দনের দিকে তাকালেন। তারাপদ কী মনে করে শেখরকে বলল, “ ... আমরা শুনলাম, আপনি বরাবরই মামার অবাধ্য ছিলেন।”

শেখর অস্বীকার করল না। সহজভাবে ঘাড় হেলিয়ে বলল, “ছিলাম। উনি যেমন আমায় পছন্দ করতেন না, আমিও করতাম না। উনি তো মাকে অনেকবার বলেছিলেন—আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে। ওঁর কথা ছিল—এক গাছের ছাল অন্য গাছে লাগে না। মা আমায় ছাড়তে চাননি। মায়ের জন্যেই ও-বাড়িতে থাকতে পারতাম।”

“আপনার নিজের বাবা-মা ?” তারাপদ আবার বলল।

“ছেলেবেলা থেকেই কেউ ছিল না। মা মারা যায় অসুখে। বাবা আগুনে পুড়ে। বাবা কারখানায় কাজ করত। কারখানাতেই অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়। আমি অনাথ হয়ে পড়ি। আমার কেউ ছিল না। ধরণীমামার বিধবা দিদি আমায় নিজের কাছে রেখে পালন করেন। উনি আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন।”

কিকিরা কী ভেবে বললেন, “ধরণীবাবু আপনার জন্যে কিছুই করেননি—এ-কথা তো ঠিক নয়। আপনাকে সাধ্যমতন ভাল করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি, একসময়ে আপনাকে রঙ কারখানায় কাজে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন, যাতে আপনি কাজকর্মে মন দেন, নিজে দাঁড়াতে পারেন ! তাই না ?”

শেখর এবার ঠিক বিরক্ত হল না, বরং একটু হাসল। তারপর বলল, “মহিমদা—ও ভাল কথা, মহিম রাহাকে আমি বরাবরই ‘মহিমদা’ বলি। ‘মামা’ বলি না। মহিমদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন ছিল একসময়—শুনবেন নাকি ?”

“বলুন !”

“মহিমদা তখনও রঙের দোকানে বসত—স্ট্র্যান্ড রোডে। বড়বাবু মারা গিয়েছেন। ধরণীমামা আমাকে রঙ কারখানায় নিয়ে এলেন। মায়ের জোরাজুরিতে। আমি রঙ কারখানায় এসে স্টোরে বসতাম। জিনিসপত্রের হিসেব রাখতাম। স্ট্র্যান্ড রোডের দোকানে জিনিস পৌঁছে দিতাম। মহিমদার সঙ্গে আমার গলাগলি হল খুব। দু'জনে মিলে বুদ্ধি করে রঙের স্টক গোলমাল করতে শুরু করলাম। মহিমদা রোজই কিছু-কিছু জিনিস টানতে লাগল।

খাতায়পত্রে হিসেবে তার আঁচড়ও থাকল না। আমরা দু'জনে সেই টানা জিনিসের টাকা পকেটে পুরতে লাগলাম।"

তারাপদ বে-খেয়ালে বলে উঠল, "চুরি— ! এ তো সেরেফ চুরি। নিজেদের জিনিস নিজেই চুরি !"

"আমি কী বলেছি চুরি নয়," শেখর ঠাট্টার গলায় বলল, "পরের জিনিস চুরি করলে লোকে চোর বলে। নিজের জিনিস সরিয়ে দু' পয়সা আড়ালে কামালে তাকে হাতখরচা বলে। ... তা আমার বেলায় তিন-চারশো টাকা হাতে আসত মাঝে-মাঝেই। রঙের দামটাম জানেন ! জানেন না। যাক্‌গে, এই চুরি ধরা পড়ল। ধরণীমামা আমাকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিলেন কারখানা থেকে। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢালতে পারেননি এই যা ! অকথ্য গালমন্দ শুনতে হল। মহিমদা কিন্তু সাধুপুরুষ বনে গেল। বলল, সে কিছু জানে না। চুরিচাপাটি যা করার, আমিই করেছি। আমি আর জটাদা। ..."

"জটাকেও তো চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ধরণীবাবু !"

"হ্যাঁ। কেঁদেকেটে সে পার হয়ে গেল। আমি কান্নাকাটি করিনি—হাতেপায়েও ধরিনি, ফলে আমাকে জুতোপেটা খেয়ে কারখানা ছাড়তে হল, বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিলেন মামা। ... মা আর সহ্য করতে পারলেন না, নিজের ছেলের কাছে চা-বাগানে চলে গেলেন।"

সামান্য চুপচাপ। কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন।

শেখর বলল, "মহিমদা তো কোম্পানির মালিক—বড় মালিক—চোর হয়েও সে দিব্যি কারখানায় এসে ছোটবাবু হয়ে বসে পড়ল। আর আমি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বেশ মজার ব্যাপার ! তাই না ! তখন থেকেই আমি মহিমদাকে বলেছিলাম—তোমায় আমি কিন্তু ছাড়ব না বলে রাখলাম।"

শেখর ঘরের একপাশে সরে গিয়ে জল খেল। সিগারেট ধরাল। বেপরোয়া ভঙ্গি।

কিকিরা বললেন, "তা হলে তো দেখছি, আপনিই রাগ মেটাতে, প্রতিহিংসা মেটাতে ..."

কিকিরাকে কথা শেষ করতে দিল না শেখর। রুক্ষ গলায় বলল, "যা খুশি ভাবতে পারেন আপনারা ! রাগ-প্রতিহিংসা তো থাকবেই। পাঁচজনের সামনে জুতো খাওয়ার আর গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া—অত সহজে ভোলা যায় না।"

"কিন্তু ধরণীবাবু মারা যাওয়ার—"

"মারা যাওয়া— !" শেখর অদ্ভুত গলায় বলল, তার চোখ কুঁচকে উঠেছে।

চন্দন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি ; চুপচাপ কথা শুনছিল। এবার বলল, "মারা যাওয়া সম্পর্কে আপনার দেখছি খুব আপত্তি !"

"হ্যাঁ, খুবই আপত্তি !"

"কেন ! ডাক্তারবাবু বলছেন, আচমকা হলেও ধরণীবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়।"

"আমি তা মনে করছি না।"

কিকিরা বললেন, "আপনি যে তা মনে করছেন না—আমরা জানি। খবরের কাগজে আপনি সেটা বোঝাবারও চেষ্টা করেছেন। ওই লেখাটা তো আপনিই ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ?"

"আমিই করেছি।"

"কেন ? মহিমবাবুকে ভয় দেখিয়ে রাখার জন্যে ! অন্য পাঁচজনের যাতে চোখে পড়ে—তার জন্যে ?"

"যা মনে করেন আপনারা।"

"আমরা তো মনে করছি, ভয় দেখিয়ে আপনি টাকা রোজগারের ব্যবস্থা ভালই করে নিয়েছেন।"

"খাঁটি কথা," শেখর মুখ টিপে হাসল। "আমার তো মশাই রঙের কারখানা নেই, বাড়ি নেই কলকাতায়, গাড়ি নেই, টাকা গচ্ছিত নেই ব্যাঙ্কে। ধরণী সেন আমায় দু' পয়সা দিয়েও যাননি। ... টাকা কার না দরকার ! আমারও দরকার বইকি !"

চন্দন বলল, "তা বলে আপনি অনর্থক একজনকে ভয় দেখিয়ে টাকা রোজগার করবেন !"

"অনর্থক যদি হয়—তবে সে ভয় পাচ্ছে কেন ! যান না—তাকে গিয়ে বোঝান অনর্থক ভয় না করতে।"

কিকিরা এবার উঠে দাঁড়ালেন। ধীর গলায় বললেন, "শেখরবাবু, আপনি দাবার চালটা চেলেছেন আপনার মাথা খাটিয়ে। পালটা চালের কথা ভাবেননি। ... আচ্ছা, চলি। নমস্কার।"

হোটেল থেকে বেরুবার আগে কিকিরা তারাপদকে বললেন, "তারা, একবার অফিস-ঘর ঘুরে আসছি ; তোমরা এগোও।"

তারাপদরা বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তায়।

এই হোটেল-পাড়াটা নানা ধরনের মানুষের। আশেপাশের দোকানগুলোও যেন সাধারণ পাড়ার মতন নয় ; কোথাও পাঞ্জাবি খানাপিনার দোকান, কোথাও চিনে ছেলেরা জটলা করছে, চা-শরবতের ব্যবস্থা, বেশ জাঁকালো পানের দোকান—এন্তার ঠাণ্ডিপানি আর পান বিক্রি হচ্ছে, কোথাও বা একনাগাড়ে রেকর্ড বাজছে হিন্দি গানের। ওরই মধ্যে মামুলি এক ডিসপেনসারি, এমন কি, ফলের দোকানও।

এখন রাত নয়। সন্ধে শেষ হয়ে আসছে। দু-একটা সাধারণ দোকান বন্ধ হয়ে এল।

তারাপদ হঠাৎ বলল, "চাঁদু, কী বুঝছিস ?"

চন্দন প্রথমে কোনো জবাব দিল না কথার, পরে বলল, "কী বুঝব ! দুই-ই সমান।"

"মানে ?"

"যেমন মহিমচন্দ্র, তেমনই শেখর। সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি আর কী !"

"যা বলেছিস ! কিকিরা বড় প্যাঁচে পড়ে গেছেন।"

চন্দন কিছু বলার আগেই কিকিরা এসে পড়লেন।

"নাও, চলো।" কিকিরা বললেন।

তিনজনে হাঁটতে-হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে আসার পর তারাপদ বলল, "স্যার, এর পর— ?"

কিকিরা অন্যমনস্ক ছিলেন। জবাব দিলেন না।

চন্দন বলল, "কিকিরা, আপনি বরং মহিমকে বলুন : পেটে কথা রেখে মুখে শেখরকে 'ব্ল্যাকমেইলার' বলে লাভ নেই। সাফসুফ কথা বলতে বলুন। মহিম যে নিজেও সাধুপুরুষ নয়— এ তো জানতেই পারলেন।"

তারাপদ বলল, 'নিজেদের কোম্পানির জিনিস নিজেই টানত। ডেঞ্জারাস।"

কিকিরা কোনো জবাব দিলেন না।

হাঁটতে-হাঁটতে ট্রাম রাস্তা।

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "চাঁদু, জটার অ্যাক্সিডেন্টটা কবে যেন হয়েছে ?"

চন্দন নির্দিষ্ট করে দিনক্ষণ বলতে পারল না।

তারাপদ বলল, "এই তো গত হপ্তায়। আপনাকে না বললাম সেদিন।

"কাগজে সোনালি ল্যান্ড ডেভালাপমেন্টের নোটিসটা বেরুবার পর-পর। তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় যেন হয়েছে ?"

চন্দন বলল, "বলছে তো মিশন রো-য়ে। তাই শুনেছি।"

"জটার বাড়ি কোথায় ?"

"কলুটোলা।"

"যাঃ, কলুটোলা নয়—বউবাজার," তারাপদ বলল।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। সামান্য পরে বললেন, "মহিমচন্দ্র বড় অদ্ভুত মানুষ ! জটার অ্যাক্সিডেন্টের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন না সেদিন। আমি যখন বললাম, উনি শুধু বললেন—হ্যাঁ, গাড়ির দরজা খুলে পড়ে গিয়েছিল শুনলাম। হাত-পায়ে খানিকটা চোট লেগেছে। ... পরে যখন শুনলেন, ও নার্সিং হোমে আছে—তখন অবাক হয়ে বললেন, সে কী ! কে ওকে নার্সিং হোমে ভরতি করল ? আমি তো করিনি। তারপর যখন শুনলেন, শেখর

জটাকে নার্সিং হোমে ঢুকিয়েছে, তখন কেমন নার্ভাস হয়ে গেলেন।” কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী ভাবছিলেন কে জানে! শেষে আচমকা বললেন, “চাঁদু, জটাই আমাদের চাবিকাঠি। হ্যাঁ, জটা। ... ওর দায়িত্ব তোমার। ওকে ছাড়বে না। যা সম্ভব সবই করবে।”

১০

মহিমচন্দ্রকে বড় অসহায় দেখাচ্ছিল। তিনি কোনো কথাই যেন আর বলতে পারছেন না।

কিকিরারা আজ অনেকক্ষণ হল এসেছেন মহিমের বাড়িতে। তখন আর আলো নেই। সন্ধেও হয়নি পুরোপুরি। খানিকটা আগে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ঘূর্ণি উঠেছিল। ঝড়ও হয়েছে এক দমকা। আকাশ মেঘলা; আবহাওয়াও গুমোট।

মহিমের বসার ঘরে অনেকক্ষণ ধরেই কথাবার্তা হচ্ছিল। কিকিরা আর তারাপদ সামনে বসে। চন্দন নেই।

কিকিরা বললেন, “শেখরের সব কথাই আপনাকে বলেছি। সে যা বলেছে, আপনি অস্বীকার করতে পারেন? শেখর যে ধরণীমোহনের নিজের ভাগ্নে নয়, এটা তো ঠিকই!”

মহিমচন্দ্র সামান্য মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ।

“ধরণীমোহন তাকে কখনোই নিজের আত্মীয়-পরিজন বলে মেনে নিতে পারেননি, এটাও ঠিক!”

“হ্যাঁ।”

“শুধু দিদির জন্যে কাছে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন?”

“শেখর নিজেও ভাল ছিল না। মেজোবাবুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত না। বড় অ্যারোগান্ট ছিল।”

“সে অন্য কথা। তার স্বভাব।... এটাও আপনি স্বীকার করবেন যে, কোম্পানির জিনিস কারখানা থেকে সে বের করে নিত খাতাপত্রে না দেখিয়ে। মানে দোকানে জিনিস নিয়ে যাওয়ার সময় চুরি করত। আর আপনি তখন দোকানে বসতেন। চোরাই জিনিস বিক্রির টাকা দু'জনে ভাগবাঁটরা করতেন।”

মহিমচন্দ্র মাথা নিচু করে নিলেন।

“আচ্ছা মহিমবাবু, আমি ধরে নিচ্ছি যে, অন্যায়টা আপনারা ভাগাভাগি করে করতেন। কিন্তু আপনি নিজেও যে-অন্যায় করতেন, সেই একই অন্যায় কাজ করার জন্যে যখন ধরণীবাবু শেখরকে পাঁচজনের সামনে অপমান করে তাড়ালেন—তখন একটা কথাও কেন বললেন না?”

ইতস্তত করে মহিমচন্দ্র বললেন, “বলে লাভ হত না। মেজোবাবু শেখরকে

রাখতেন না।"

"আপনার দাদা তখন বেঁচে?"

"প্রাণে বেঁচে ছিলেন—তবে অসুস্থ। হার্টের রোগ ছিল। তিনি মারাও যান মাস কয়েক পরে।"

"তার মধ্যেই আপনি দোকান ছেড়ে কারখানায় চলে এসেছেন।"

"এসেছি।"

"জটা—জটিলেশ্বরকে তা হলে কে বাঁচাল? আপনি, না আপনার দাদা?"

"জটা মেজোবাবুর হাতে-পায়ে ধরেছিল। আর—"

"আপনিও বলেছিলেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"জটার অবস্থা ভাল নয়। চাকরি গেলে..."

কিকিরা একটু বাঁকা করে হাসলেন, "তা ঠিক নয় মহিমবাবু! জটাকেও আপনারা দু'জনে—শেখর আর আপনি চোরাই জিনিসের ভাগবাঁটরা থেকে টাকা দিতেন। দিতেন, কেননা সে শুধু ভ্যান নিয়ে দোকানে আসত না—আপনাদের চোরাই কাজে পার্টনার ছিল। ...ওকে হাতে রাখায় আপনার লাভ হবে ভেবেছিলেন।"

মহিমচন্দ্র চুপ করে থাকলেন।

কিকিরা একটা চুরুট ধরিয়ে নিলেন। যেন সময় নিলেন কথা বলার। পরে বললেন, "জটা আপনার লোক, না, শেখরের?"

"আমার কারখানায় কাজ করে। লোক আমার।"

"না, না, তা বলছি না। বলছি, কার দলে সে? আপনার, না শেখরের?"

অল্পসময় চুপচাপ থাকার পর মহিমচন্দ্র বললেন, "এখন দেখছি, শেখরের। আগে এতটা বুঝিনি। মেজোবাবু মারা যাওয়ার পর থেকে সে যে শেখরের লোক হয়ে যাবে পুরোপুরি—বুঝতে পারিনি।"

কিকিরা কথা পালটালেন, "জটার অ্যাক্সিডেন্টের খবর আপনি আগে আমাদের বলেননি কেন?"

"বলার মতন কী ছিল রায়মশাই! কলকাতার রাস্তায় লোকে হোঁচট খেয়ে পড়বে, গাড়ির খোলা দরজায় হেলান দিতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে—একে কি অ্যাক্সিডেন্ট বলে! আমি শুনেছিলাম, জটা দোকান থেকে পান কিনে মুখে পুরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আমাদের ভ্যানগাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে। সামনের চাকা হঠাৎ গড়িয়ে যায়। টাল সামলাতে না পেরে সে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। হাতে-পায়ে লেগেছিল সামান্য। ব্যস। একে অ্যাক্সিডেন্ট বলে?"

"ভ্যানটা ফিরিয়ে আনল কে?"

না, শাঁটুল। শাঁটুল তো ভ্যানেই থাকে। জটার হেল্‌পার। গাড়ি ও পারে। সে তো সঙ্গেই ছিল।"

জটার কাছ থেকে আপনি কোনো খবর পাননি ?"

"শুনেছিলাম, হাত-পা ছড়ে গিয়ে খুব ব্যথা হয়েছে, একটা হাতের কব্জি মচড়ে গিয়েছে। সে বাড়িতেই আছে।"

"তাকে দেখতে যাননি ?"

"না।"

"আপনি তাকে দেখতে গেলেন না, অথচ শেখর তাকে নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে দিল !"

"তাই তো শুনলাম আপনাদের মুখে।"

"তারপরও— ।"

"না, আমি নার্সিং হোমে যাইনি। কেন যাব ? জটার যদি অতবড় জখম হত, সে আমায় জানাতে পারত না লোক দিয়ে ? আমি তাকে হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম না ? না, বড় ডাক্তার দেখাতে পারতাম না ! ...রায়মশাই, একটা কথা বলি—মনে কিছু করবেন না। জটার এই নার্সিং হোমে যাওয়ার ব্যাপারটা প্ল্যান করে করা। সাজানো।"

কিকিরা আর তারাপদ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কিকিরা বললেন, "কেমন করে বুঝলেন ?"

"বুঝলাম। বুঝলাম, শেখর যখন এই ক'দিন আগে আবার আমায় বাড়িতে ফোন করে হঠাৎ হাজার পনেরো টাকা চাইল। বলল, জটার জন্যে দরকার। শেখর টাকা চেয়েছিল এ-কথা আপনাকে আমি বলেছি।"

মাথা নেড়ে কিকিরা বললেন, "বলেছেন। আমিও শেখরকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, টাকা আর সে পাবে না।"

মহিমচন্দ্র বললেন, "শেখর ভয় পাওয়ার ছেলে নয়।"

"এবার পাবে।"

"কেমন করে ?"

"ব্যবস্থা করেছি। আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন ! দেখতেই পাবেন।"

ঘড়িতে আটটা বাজতে চলেছে, চন্দন এল। সঙ্গে জটিলেশ্বর।

জটিলেশ্বরকে দেখে মহিমচন্দ্র চমকে গেলেন। "এ কী, তুই ?"

জটিলেশ্বর একটিও কথা বলল না। তার পরনে পাজামা, গায়ে শার্ট। বাঁ হাতের কব্জির কাছে একটা ব্যান্ডেজ। তাকে দেখে মনে হল না, সে মাথায় চোট নিয়ে নার্সিং হোমে শুয়ে ছিল এ-ক'দিন।

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "সব ব্যবস্থা ঠিক-ঠিক হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। মনোজদা নার্সিং হোমকে যা-তা বলেছে। ওদিকে আবার মনোজদার

বন্ধু লালবাজারে পুলিশের বড় অফিসার। লাহিড়ী সাহেব। ফোন তুলে নার্সিং হোমে ধমক মারতেই সব ঠাণ্ডা। নার্সিং হোমটা লোক লুকিয়ে রাখার জায়গা নয়। ওদের মালিকরা ঝামেলায় পড়ে গেছে। আমি জটিলেশ্বরকে নার্সিং হোম থেকে নিয়ে চলে এসেছি। অবশ্য খাতাপত্রে লেখাপড়া করে। জটিলেশ্বরও লিখে দিয়েছে, সে স্বেচ্ছায় নার্সিং হোম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার কোনো কমপ্লেন আর নেই।"

জটিলেশ্বর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল মুখমাথা নিচু করে।

কিকিরা জটিলেশ্বরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তোমায় আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক-ঠিক জবাব দেবে। কথা ঘোরাবে না, মিথ্যে কথা বলবে না!"

জটিলেশ্বর মুখ নিচু করেই দাঁড়িয়ে থাকল।

কিকিরা বললেন, "মেজোবাবু যেদিন মারা যান—সেদিন বিকেলের গোড়াতেই কারখানার ডেলিভ্যারি ভ্যান আর মেজোবাবুকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"সঙ্গে আর কে ছিল?"

"কেউ নয়।"

"কোথায় যাও?"

"আমাদের বড় দোকানে।"

"সেখানে কী হয়?"

"মেজোবাবু দোকানে যান। দোকানের লোক এসে গাড়ি থেকে কিছু জিনিস নামিয়ে নিয়ে যায়।"

"আরও জিনিস ছিল?"

"না বোধ হয়।"

"দোকানে কতক্ষণ ছিলেন মেজোবাবু?"

"বিশ-পঁচিশ মিনিট, বড়জোর আধঘণ্টা।"

"তারপর তোমরা কোথায় যাও?"

"ডেকার্স লেন-এ যেতে বলেন মেজোবাবু।"

"ডেকার্স লেন-এ কোথায়?"

"একটা বাড়িতে। পুরনো বাড়ি। পাশে ভাঙাচোরা গ্যারাজ।"

"কার কাছে?"

"আমি জানি না।"

"আগে কোনোদিন সেখানে যাওনি?"

"না স্যার।"

"সেখানে মেজোবাবু কতক্ষণ ছিলেন?"

"ওই আধঘণ্টা কি চল্লিশ মিনিট।"

"তারপর ফিরে এসে গাড়িতে বসলেন ?"

"হ্যাঁ, আমার পাশেই। আমাদের ভ্যানগাড়িতে সামনেই যা বাড়তি দু-একজন বসতে পারে। পেছনে বসার জায়গা নেই।"

"মেজোবাবু বসার পর—তোমরা চলে এলে ?"

"না। যখন চলে আসছি তখন একটা লোক এসে একপাতা ওষুধ দিল, গোলাপি-গোলাপি দেখতে। মেজোবাবুর হাতে দিল। সেইসঙ্গে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর ছোট মতন এক ইঞ্জেকশনের শিশি—ওই যেগুলো ভেঙে-ভেঙে ইঞ্জেকশন দেয়...। চন্দনবাবুকে আমি সব বলেছি স্যার।"

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

চন্দন একটু অপেক্ষা করতে বলল। তারপর পকেট থেকে নতুন একটা ডিসপোজাল সিরিঞ্জ, একটা ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল, আর একপাতা নতুন ওষুধ বের করল।

বড়-বড় ট্যাবলেট। আসবার সময় কিনে এনেছে। কিনে এনেছে, কারণ আগেই নার্সিং হোমে পুলিশের ভয়ে জটিলেশ্বর বলে ফেলেছিল ঘটনাগুলো।

চন্দন বলল, "এইরকম সিরিঞ্জ ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর—?"

"আমরা চলেই আসছি, লোকটা মেজোবাবুকে বলল, সে যতটুকু মেশাবার, মিশিয়ে দিয়েছে। যদি দরকার হয়, ব্যথা না কমে, আরও একটু করে মিশিয়ে নিতে।"

"জিনিসটা কী ?" তারাপদ বলল।

"আমি জানি না।"

কিকিরা বললেন, "তারপর ?"

"তারপর গাড়ি ছাড়লাম। মাঝপথে মেজোবাবু আমায় গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। গাড়ি দাঁড় করালাম। মেজোবাবু দেখলাম—ইঞ্জেকশনের শিশিটা ভেঙে ফেললেন। তার আগেই ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জটা বের করে নিয়েছেন। ওষুধ ভরলেন সিরিঞ্জে।"

"তারপর ?"

"ওষুধের পাতার পেছনদিকের পাতলা কাগজের মতন রাংতাটায় ছুঁচের মতন ফুটো করে ওষুধ দিতে লাগলেন। সবক'টা বড়িতেই। ওই নতুন পাতা থেকে দুটো বড়ি আগেও তিনি খেয়েছিলেন।"

কিকিরা চন্দনকে বললেন, "চাঁদু, ব্যাপারটা কী ?"

চন্দন তার হাতের ডিসপোজাল সিরিঞ্জ গুছিয়ে নিল, ওষুধ ভরে নিল

ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল থেকে। তারপর তার কিনে আনা ট্যাবলেটের পাতার পেছনদিককার পাতলা রাংতার ভেতর দিয়ে দু-তিনটে বড়িতে ওষুধ ছড়াল।

তারাপদ বলল, "হলটা কী ?"

চন্দন বলল, "এই সিরিঞ্জের ছুঁচের মুখ এত সরু যে—কারও বোঝার সাধ্য নেই, রাংতার ভেতর দিয়ে ওষুধ ঢোকানো হয়েছে। এই নিড্‌ল—মানে ছুঁচের গর্ত চোখেও দেখা অসম্ভব !"

কিকিরা জটিলেশ্বরকে বললেন, "তুমি নিজের চোখে এটা করতে দেখেছ ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"মেজোবাবু সেই সিরিঞ্জ আর ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল কী করলেন ?"

"নামার সময় গাড়িতে ফেলে রেখেই চলে গেলেন।"

"ট্যাবলেটের পাতাটা ?"

"মেজোবাবুর জামার পকেটেই থাকল।"

"তুমি সেই ভাঙা সিরিঞ্জ আর ভাঙা অ্যাম্পুল নিয়ে কী করলে ?"

"কী করব। গাড়িতে পড়ে থাকল।"

"পড়ে থাকল ! সত্যি কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"শেখরকে দাওনি ?"

"না, না। শেখরদাকে কেন দেব ! আমি কী অত বুঝেছি।"

"কবে বুঝলে ?"

"মেজোবাবু মারা যাওয়ার পর। আমার কেমন সন্দেহ হল। কারখানায় এসে দেখি, গাড়ির মধ্যে সেটা পড়ে আছে। আমি নিয়ে গিয়ে ছোটবাবুকে দিলাম।" বলে মহিমচন্দ্রের দিকে তাকাল। মহিমচন্দ্র চুপচাপ। "শ্রাদ্ধের দিন কাজের ভিড়ের মধ্যে শেখরদাকে দেখেছি। তখনো কিছু বলিনি। পরে নিয়মভঙ্গের দিন কথায়-কথায় বলেছিলাম শেখরদাকে।"

কিকিরা মহিমন্দ্রের দিকে তাকালেন।

মহিমচন্দ্র বললেন, "জটা ঠিকই বলছে।"

কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন। "চাঁদু, কী ব্যাপার ! আমার তো মাথায় ঢুকছে না। ট্যাবলেটের স্ট্রিপ ফুটো করে ইঞ্জেকশনের ওষুধ ঢালা ! এ তো জীবনে শুনিনি !"

চন্দন বলল, "আমিও শুনিনি। জানতাম না।"

"কিন্তু কী মেশানো হত ট্যাবলেটে ?'

চন্দন বলল, "কেমন করে বলব ! মনে হয়—মনে হয়—অ্যাপারান্টলি কোনো পেইন কিলার ড্রাগ। মরফিন, কোকেন কত কী হতে পারে। কিংবা হতে পারে কোনো নেশা—নেশার জিনিস !"

মহিমচন্দ্র হঠাৎ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন, "রায়মশাই, একটা কথাই

আপনাকে আমি বলিনি। বলতে লজ্জা করেছে। মেজোবাবু শেষের দিকে কোনোরকম নেশা করতেন। সন্দেহ হত আমার। অফিসে মাঝে-মাঝেই কেমন ঝিম মেরে থাকতেন, আর ওষুধ খেতেন। বলতে পারতাম না। সে সাধ্য আমার ছিল না। সত্যি বলতে কী, আমার এইরকম একটা কথা মনেও হত। মনে হত, কোনো নেশার বিষ বেশি খেয়ে ফেলে মেজোবাবু ওইভাবে হঠাৎ মারা গেলেন। আত্মহত্যা করাও বলতে পারেন। এই কথাটাই আপনাকে আমি কোনোদিন বলিনি। ...আমি আর যাই হই, মেজোবাবুকে ভয় পেতাম। খাতির করতাম। উনি মানুষ হিসেবে একদিকে যেমন ভাল ছিলেন—অন্যদিকে বদরাগী, ক্ষ্যাপাটে। অভিমানী। ...আপনাকে আমি সত্যি বলছি—ওই জিনিসগুলো আমি ফেলে দিয়েছি। তখন বুঝিনি, শেখর আমাকে ওই ব্যাপারটা নিয়ে প্যাঁচে ফেলতে পারে।"

কিকিরা শুনলেন। তারপর উঠে, ঘরে রাখা টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

বারকয়েক পরে সাড়া পাওয়া গেল।

"নিউ সেন্ট্রাল হোটেল? একবার শেখর গুহনিয়োগীকে ডেকে দেবেন? ভেরি আর্জেন্ট। নার্সিং হোম থেকে বলছি।"

ঘরে সবাই চুপ। মহিমচন্দ্র যেন চোখের পাতাও ফেলছিলেন না।

খানিকটা পরে সাড়া পাওয়া গেল।

"শেখরবাবু?"

শেখর সাড়া দিল ও-প্রান্তে।

"একটা কথা জানাবার ছিল। আমি কিকিরা। আমরা মহিমবাবুর বাড়ি থেকে কথা বলছি। জটিলেশ্বর এখন আমাদের সামনে। তার একটা বয়ান মহিমবাবু পুলিশের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে পারেন রেকর্ড রাখার জন্যে—যদি তিনি মনে করেন! ...তা মোদ্দা কথাটা হল, আপনি এর পর আর ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবেন না বোধ হয়। বরং যে টাকাগুলো নিয়েছেন... ও কি মশাই ফোন ছেড়ে দিচ্ছেন যে! শুনুন— শুনুন—।"

শেখর ওপাশে ফোন ছেড়ে দিল।

কিকিরা ফোন রেখে মহিমচন্দ্রকে বললেন, "স্যার, আপনি আপাতত নিশ্চিন্ত। শেখর আর আপনাকে জ্বালাবে না। তার তুরুপের তাস এখন আমাদের হাতে।" বলে কিকিরা হাসলেন।

সোনার ঘড়ির খোঁজে

সোনার ঘড়ির খোঁজে

কিকিরা বাড়ি ফিরে দেখলেন, তারাপদরা বসে আছে।

"কতক্ষণ ?"

"পনেরো-বিশ মিনিট। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ?"

"কাছেই।...কীরকম গরম পড়েছে দেখেছ ?"

"হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন ?"

"কোথায় হাওয়া! গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। ...বসো তোমরা, চোখে-মুখে একটু জলের ঝাপটা দিয়ে আসি।" কিকিরা চলে গেলেন।

এখন গরমকাল। মাঝ-বৈশাখ। কলকাতা শহর তেতেপুড়ে মরছে। সেই কবে চৈত্রমাসের শেষাশেষি একদিন কালবৈশাখী দেখা দিয়েছিল, তারপর থেকে টানা হপ্তা তিনেক না একটু মেঘ, না মেঘলা ; মাঝরাতেও যেন বাতাস তেমন ঠাণ্ডা হয় না। কাগজঅলারা বলছে, এখনো কয়েকটা দিন এইরকম গরম চলবে।

কিকিরা ফিরে এলেন। মনে হল, ভাল করে মুখ মোছেননি, ভিজে-ভিজে ভাব রয়েছে।

"আচ্ছা তারাবাবু, ফক্স, অক্স আর বক্স—এর মধ্যে মিলটা কোথায় ?" কিকিরা বললেন।

আচমকা এরকম একটা বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে তারাপদরা অবাক হয়ে গেল। চন্দন তারাপদর দিকে তাকাল, তারাপদ চন্দনের দিকে। দু'জনেই যেন বোকার মতন চুপ করে থাকল।

কিকিরা এবার নিজের জায়গাটিতে বসলেন।

বগলা জল এনে দিল কিকিরাকে। জল খেয়ে কিকিরা চায়ের কথা বলে দিলেন বগলাকে। বগলা চলে গেল।

তারাপদ ঠাট্টার গলায় বলল, "হঠাৎ আপনার মাথায় ফক্স, অক্স, বক্স এল কোথ্ থেকে ?"

"না, ভাবছিলাম !"

"ভাববার আর জিনিস পেলেন না ?"

চন্দন মজা করে বলল, "স্যার, ফক্স আর অক্সের একটা মিল আছে। দুটোরই চারটে করে পা ; একটা করে লেজ... !"

কিকিরা আড়চোখে চন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দুটো লেজওলা প্রাণী তুমি দেখেছ নাকি ?"

প্রথমটায় খেয়াল না হলেও পর মুহূর্তে কথাটা বুঝতে পেরে তারাপদ জোরে হেসে উঠল। সত্যিই তো, দুটো লেজওলা প্রাণী কে আর কবে দেখেছে ! অন্তত তারাপদরা আজ পর্যন্ত দেখেনি। তবে জগতে এত অজস্র হাজারে-হাজারে জীবজন্তু রয়েছে যে, যদি কারও দুটো লেজ থেকে থাকে, অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তারাপদ হাসতে-হাসতেই বলল, "ঠিক আছে স্যার, লেজের 'একটি'কে খসিয়ে দেওয়া গেল। এখন বলুন তো হঠাৎ ফক্স, অক্স, বক্স নিয়ে আপনার মাথা ঘামানো কেন ?"

চন্দন বলল, "ক্রস ওয়ার্ড ধরনের কিছু করছেন নাকি ?"

"না, আমি ওই জিনিসটা করি না। দু-একবার চেষ্টা করেছিলাম আগে, মাথা গুলিয়ে যায়।" বলে, নিজের মাথা দেখালেন। কিকিরার মাথার উসকো-খুসকো চুল যেন আরও পেকে গিয়েছে আজকাল।

"তা হলে ?"

"একটা সমস্যায় পড়া গিয়েছে। এক ভদ্রলোক কাল আমার কাছে এসেছিলেন ; আজও আসবেন। ফক্স, অক্স, বক্স তিনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।"

তারাপদ কিকিরাকে দেখল কয়েক পলক। তারপর চন্দনের দিকে তাকাল। কেমন যেন একটা রহস্যের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।

"কে ভদ্রলোক ?" তারাপদ বলল।

"কৃষ্ণকান্ত দত্তরায়। ...ক'টা বাজল এখন ?"

চন্দন ঘড়ি দেখল। "ছ'টা বাজতে চলল।"

"তবে তো ভদ্রলোকের আসার সময় হয়ে গেল। ছ'টা সোয়া ছ'টা টাইম দিয়েছি।"

চন্দনই আবার বলল, "আপনার চেনাজানা কেউ ?"

"না। আমার পুরনো বন্ধু অশ্বিনীবাবুর কাছ থেকে এসেছেন।"

"প্রয়োজন ?"

"সে এক লম্বা কাহিনী। ভদ্রলোককে আসতে দাও, শুনবে।"

তারাপদ বলল, "আপনার নতুন মক্কেল ?"

"এখনো নয়। আমি বলেছি, দাঁড়ান আগে ভেবে দেখি, তারপর কথা বলব। নো ফাইন্যাল টক—বুঝলে তারা, কাল শুধু হিয়ারিং দিয়েছি। আসতে

বলেছি আজ। তোমাদের সঙ্গে কথা না বলে মক্কেল নেওয়া কি উচিত? তোমরা আমার পার্টনার।" কিকিরা চোখ মটকে হাসলেন।

"বাঃ, আমরা যদি আজ না আসতাম!"

"সে আবার কী কথা গো! আজ শনিবার, তোমাদের আসার কথা। তা ছাড়া বগলার তৈরি গুজরাতি দহিবড়া খাবার নেমন্তন্ন আজ তোমাদের! আসবে না মানে? খাবার ব্যাপারে তোমরা ভুল করবে এমন তো দেখিনি।" কিকিরা হাসতে-হাসতে মজার গলায় বললেন।

দহিবড়ার নেমন্তন্ন না থাকলেও যে তারাপদরা আজ আসত, তা ঠিকই। নেহাত আটকে না পড়লে শনিবার তারা কিকিরার কাছে অবশ্যই আসে। যদি-বা চন্দন কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—হয়ত সে আসে না, তারাপদ ঠিকই আসে।

চন্দন বলল, "কৃষ্ণকান্ত দত্তরায় লোকটি সম্পর্কে না হয় আগেভাগে একটু বলে রাখলেন কিকিরা! কে তিনি, কোথায় থাকেন, কী করেন—?"

কিকিরা বললেন, "কৃষ্ণকান্ত ব্যবসায়ী মানুষ। বিল্ডিং কনট্রাকটার। হালে নিজেই দু-একটা ঘরবাড়ি তৈরি করে বিক্রিও করেছেন। তবে সেগুলো বাইরের দিকে। শহরে নয়। পয়সাঅলা মানুষ ঠিকই, কিন্তু বাইরের চালচলন সাদাসিধে।"

"বয়েস কত?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

"পঞ্চাশ-বাহান্ন। স্বাস্থ্য মজবুত বলা যায়। দুঃখের কথা হল, ওঁর বাঁ হাতটি স্বাভাবিক নয়। মানে, হাত আছে, হাতের রিস্ট থেকে তলার দিকটা—আঙুল পর্যন্ত—কী বলব—একটা মাংসের পিণ্ডর মতন। ভোঁতা, মোটা। আঙুলগুলো যেন জড়ানো। মনে হয়, হাত মুঠো করে আছেন। এটা তাঁর জন্মকাল থেকেই নয়। দুর্ঘটনায় পড়ে ওই অবস্থা হয়েছে। কিছু করার নেই। উনি বাঁ হাতে একটা সুতির সাদা দস্তানা পরে থাকেন।"

চন্দন মাথা নাড়ল। সে যেন বুঝতে পেরেছে। অ্যাক্সিডেন্টাল কেস।

তারাপদ বলল, "ভাগ্যের মার!"

"তা বলতে পারো। ওই খুঁতটুকু বাদ দিলে কৃষ্ণকান্তকে সুপুরুষ বলা যায়। লম্বা চেহারা, ধারালো নাক-মুখ, গায়ের রং শ্যামলা। মাথার চুল দু-চারটে পেকেছে। বেশ ভদ্র মানুষ। ধীরে-ধীরে কথা বলেন। আর এমনিতেও কাজের লোক। ব্যবসার কাজকর্ম দেখার জন্যে লোক আছে ঠিক, তবু নিজে সব দিকে নজর রাখেন।"

বগলা চা নিয়ে ঘরে এল।

চা নিতে-নিতে তারাপদ হেসে বলল, "বগলাদা, আমাদের দহিবড়া কি রাত্তিরে খাওয়া হবে?"

"একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে।"

"বাঃ ! ফাইন !"

বগলা চলে গেল।

চন্দন বলল, "কৃষ্ণকান্তবাবুর প্রব্‌লেমটা কী ?"

চায়ে চুমুক দিয়ে কিকিরা বললেন, "ওঁর ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী ? কত বড় ছেলে ? কতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না ?"

"ছেলে সাবালক। বছর একুশ-বাইশ বয়েস। দিন পাঁচেক হল নিরুদ্দেশ।"

তারাপদ বলল, "আশ্চর্য ! অতবড় ছেলে, হঠাৎ নিরুদ্দেশ ! বাড়িতে কিছু হয়েছিল নাকি ? রাগারাগি ? মা-বাবার ওপর অভিমান ?"

"না। কৃষ্ণকান্ত বলছেন, বাড়িতে কোনো গণ্ডগোলই হয়নি। আর ছেলেও তেমন নয় যে পালিয়ে গিয়ে বাড়ির লোককে জব্দ করবে ! ছেলে ভাল। বাড়ির আদুরে ছেলে। শরীর চর্চার দিকে ঝোঁক। খেলাধুলো করে। রোজ সকালে, বারোমাসই, মাইল দুই দৌড়য়। ওটা ওর অভ্যেস। দিন পাঁচেক আগে সে রোজকার মতন ভোরের দিকে দৌড়তে বেরিয়েছিল। আর বাড়ি ফিরে আসেনি।"

তারাপদ আর চন্দন যেন কিছু ভাবছিল। অজানা অচেনা একটি ছেলের কথাই। একটি অস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠছিল। ছেলেটি ভোরের আলোয় নিজের মনে দৌড়চ্ছে। কোনোদিকে হুঁশ নেই।

"কোথায় দৌড়চ্ছিল ?"

"লেকের পাশে।"

"ঢাকুরিয়া লেক ! বাড়ি কোথায় কৃষ্ণকান্তদের ?"

"পুরনো বাড়ি টালিগঞ্জ চারু অ্যাভিনিউ। নতুন বাড়ি লেক গার্ডেন্স। কৃষ্ণকান্তরা এখন লেক গার্ডেন্সেই থাকেন। গত আট দশ বছর। টালিগঞ্জের বাড়ি পৈতৃক। সেখানে বড় ভাই তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন।"

চন্দন বলল, "কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো ?"

"খোঁজখবর করে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। হাসপাতালে খোঁজ করা হয়েছে, এমনকি কাছাকাছি নার্সিংহোমেও। নো ট্রেস...।" চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে কিকিরা পকেট থেকে তাঁর সরু চুরুট বার করে ধরাতে যাচ্ছেন এমন সময় বাইরের দরজায় টোকা পড়ল।

কিকিরা বললেন, "বোধ হয় কৃষ্ণকান্ত।" বলতে-বলতে তিনি উঠলেন। "বসো, আসছি।"

সামান্য পরেই কিকিরা এক ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরে এলেন।

কৃষ্ণকান্তই। কিকিরার দেওয়া বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। তারাপদরা চিনে নিতে পারল। ভদ্রলোকের চোখে চশমা। রঙিন কাচ। খানিকটা ঘন রঙের। চোখ দেখা যায় না। কিকিরা চশমার কথাটি বলেননি। হয়ত ভুলে

গিয়েছেন। বা এমনও হতে পারে, সব সময় চোখে চশমা রাখেন না কৃষ্ণকান্ত।

তারাপদদের দেখে কৃষ্ণকান্ত যেন অস্বস্তি বোধ করলেন। বিরক্ত হয়েছেন কিনা বোঝা গেল না।

কিকিরা হাসি-হাসি মুখেই কৃষ্ণকান্তকে বললেন, "আমরা আপনার কথাই আলোচনা করছিলাম। এরা আমার দুই শাগরেদ, তারাপদ আর চন্দন। চন্দন পেশায় ডাক্তার। ব্রাইট বয়।" বলে তিনি তারাপদদের দিকে তাকালেন, "তারা, ইনিই কৃষ্ণকান্তবাবু।"

তারাপদরা হাত তুলে নমস্কার জানাল।

কৃষ্ণকান্ত শুধু ডান হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালেন। বাঁ হাত উড়নির তলায় আড়াল করা। এই গরমেও কৃষ্ণকান্ত একটা পাতলা উড়নি গলায় কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। উড়নিটা দেখতে ভাল। পাড়অলা।

তারাপদদের মনে হল, বাঁ হাতটা আড়াল করতেই কৃষ্ণকান্ত উড়নিটা ব্যবহার করেন। অন্তত বাইরের লোকজনের সামনে। ভদ্রলোকের পোশাকআশাক একেবারে সাদাসিধে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালি। অবশ্য ভাল ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি। ডান হাতে দুটি আংটি।

"বসুন," কিকিরা বললেন কৃষ্ণকান্তকে।

কৃষ্ণকান্ত বসলেন।

কিকিরা বললেন, "একটা কথা আপনাকে গোড়ায় বলে নিই। আমি মশাই গোয়েন্দা নই। অশ্বিনীবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন, ষণ্ডাদের সঙ্গে ফাইট করার এলেম আমার নেই। মানে, যাকে বলে ষণ্ডার ঘাড়ে গুণ্ডা—আমরা তা নই। রিভলবার বলুন আর বন্দুক বলুন—কোনোটাই আমি চালাতে পারি না। আমি নিতান্তই এক ম্যাজিশিয়ান। তাও সেকেলে ওল্ড ম্যাজিশিয়ান। এখন সে-পাটও গিয়েছে। আমার ভরসায় থাকলে আপনাকে পস্তাতে হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি আমি বলি, আপনার হয়ে কাজ করব, তবে যথাসাধ্য নিশ্চয় করব। আমার এই দুই চেলাকে সঙ্গে নিয়েই করব। আপনি কি তাতে রাজি হবেন?"

কৃষ্ণকান্ত ভাবলেন একটু। মাথা হেলালেন।

"বেশ! তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কী তারাপদ, চাঁদু—কী বলো তোমরা?" কিকিরা বললেন।

তারাপদরা আর কী বলবে!

কৃষ্ণকান্ত নিজেই বললেন এবার, "আজও কোনো খবর নেই। আমাদের যত জানাশোনা জায়গা ছিল, আত্মীয়স্বজন, সব জায়গাতেই খোঁজ করা হয়েছে। কলকাতার বাইরেও কেউ-কেউ থাকে—দূর সম্পর্কের, সেখানেও লোক পাঠিয়েছি। না,—" মাথা নাড়লেন কৃষ্ণকান্ত, "কোথাও বাবলুর কোনো

খবর নেই। সে কোথাও যায়নি।" কৃষ্ণকান্তকে বড় বিমর্ষ, হতাশ দেখাচ্ছিল। উদ্বিগ্ন, ভীত।

কিকিরা বললেন, "আপনি বড় ভেঙে পড়েছেন। ভাঙবারই কথা। কিন্তু অত হতাশ হলে তো চলবে না কৃষ্ণকান্তবাবু ; মনে একটু জোর আনুন।"

"কেমন করে জোর আনব বলুন ! আমাদের ওই একটিমাত্র ছেলে, আর একটি মেয়ে। সে তো এখনো ছেলেমানুষ, ষোলো সতেরো বছর বয়েস। মেয়েটা আজ ক'দিন ধরে শুধু কাঁদছে। বাবলুর মায়ের অবস্থা পাগলের মতন। আমি আর পারছি না রায়মশাই। কোথায় গেল আমার ছেলে ? কী হল তার ?"

কিকিরা শান্তভাবে বললেন, "পুলিশ কী বলছে ?"

"পুলিশের কথা আর বলবেন না। আজ সকালেই অনেক ধরে-করে এক বড় অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সব শুনে অফিসার বললেন, আজকাল মিসিং লোকজনের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। খোঁজখবর করতে সময় লাগে। তাও অর্ধেককে খুঁজে পাই না। কে যে কোথায় ছিটকে পড়ে, ধরতেই পারি না। তার ওপর কেউ যদি নিজে লুকিয়ে থাকতে চায়—তাকে খুঁজে বার করা একরকম অসম্ভব !"

কিকিরা হঠাৎ বললেন, "আপনার ছেলে বাবলু তো সেরকম নয়। মানে, সে নিজে থেকেই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে না।"

"না, একেবারেই নয়," কৃষ্ণকান্ত মাথা নাড়লেন, "বাবলুর পক্ষে অমন কাজ অসম্ভব !"

কিকিরা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "নতুন আর কিছু জানতে পেরেছেন ? মানে, আমি বলছি—বাবলুর টেবিলে ওই যে কাগজটা পেয়েছিলেন—পাজ্‌ল-এর মতন, যাতে ফক্স, অক্স আর বক্স লেখা ছিল ইংরিজি হরফে—তার পর আর কিছু নতুন জানতে পেরেছেন ?"

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "পেরেছি। আপনাকে সে-কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। কাল কথায়-কথায় ভুলে গিয়েছিলাম।

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন, "কী জানতে পেরেছেন ?"

"আমাদের বাড়িতে পুরনো একটা ঘড়ি ছিল। সেকেলে পকেট ঘড়ি। আমার বাবার কাছে দেখতাম। বাবা বড় একটা ব্যবহার করতেন না। আলমারিতে তোলা থাকত। ঘড়িটা সুইস মেড। সেকালের বিখ্যাত কোনো কোম্পানির। দেখতে অতি চমৎকার। তার চেয়েও বড় কথা হল, ঘড়িটা সোনার, একেবারে পাকা সোনা হয়ত নয়, কাঁটা দুটোও সোনার। এক-দুই নম্বরের বদলে রোমান সাইন ছিল, এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি... । আর সবচেয়ে মজা ছিল ঘড়িটা আলোয় আনলে ডায়ালের ভেতরে একরকম রং হত, ছায়ায় একরকম, আবার অন্ধকারে জ্বলজ্বল করত। ঘড়ির নিচে আর-এক ছোট্ট

গোলের মধ্যে কম্পাসের কাঁটাও ছিল। ঘড়িটা নিশ্চয় দামি। তার চেয়েও বেশি হল, দেখতে খুব সুন্দর। ঘড়ির ডালাটাও ছিল দেখার মতন। ডালার ওপর সুন্দর নকশা ছিল। এনগ্রেভিং। রাজা-রানীর মুখ। লতাপাতা।"

তারাপদরা মন দিয়ে শুনছিল কৃষ্ণকান্তর কথা। হঠাৎ বলল, "ঘড়িটা চলত ?"

"না। বাবার আমলেই বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও ঘড়ি সারাবার মিস্ত্রি কোথায় ?" কম্পাসের কাঁটাটা কিন্তু ঠিক ছিল।"

"ঘড়িটা খোয়া গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ। আলমারি, লকার, ওয়ার্ডরোব, দেরাজ—সব জায়গাতেই খোঁজা হয়েছে—ঘড়ি পাওয়া যায়নি।"

কিকিরা বললেন, "আপনাদের বাড়ি নিশ্চয় ছোটখাটো নয়; ঘর আসবাবপত্রও যথেষ্ট বলে মনে হয়। একটা পকেট ঘড়ি কোথাও না কোথাও পড়ে থাকতে তো পারে !"

"বললাম তো, সব জায়গাতেই খোঁজা হয়েছে তন্নতন্ন করে।...তা ছাড়া ঘড়িটা আমাদের ঘরে পুরনো আলমারির মধ্যে থাকত।"

"বাবলু বাড়ি থেকে উধাও, ঘড়িও উধাও—আপনি কি তাই বলতে চাইছেন ?"

কৃষ্ণকান্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। মাথা নাড়লেন। "তাই তো দেখছি !"

চন্দন চুপচাপ বসে কথাবার্তা শুনছিল কৃষ্ণকান্ত আর কিকিরার। তার কাছে ব্যাপারটা এখনো অস্পষ্ট। একটা কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে সকালে লেকের ধারে দৌড়তে গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছে। সাতসকালে এভাবে উধাও হওয়া অসম্ভব—যদি না সেই ছেলে নিজেই কোথাও পালিয়ে যায় ! লেকের আশেপাশে অজস্র লোক ভোরবেলায় বেড়ায়, শরীর চর্চা করে, দৌড়য়। অত লোকজনের চোখের সামনে থেকে, সদ্য ভোরে—কেউ তো বাবলু নামের জোয়ান ছেলেকে গুম করে নিয়ে যেতে পারে না। অসম্ভব ! তার ওপর আবার ভদ্রলোক কোথ্ থেকে এক পুরনো সোনার ঘড়ির কথা টেনে আনলেন। কী সম্পর্ক এই দুইয়ের ?

চন্দনের কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, বলল না।

চন্দন না বলুক, কিকিরাই বললেন কৃষ্ণকান্তকে, "বাবলুর সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক কী কৃষ্ণকান্তবাবু ? আপনার ছেলে ভাল, চোর ছ্যাঁচোড় নয়, বাজে বন্ধুবান্ধবও নেই। আপনি আমায় বলেছেন আগে।"

"বলেছি। এখনো বলছি। লেখাপড়ায় সে অ্যাভারেজ হয়ত, কিন্তু তার স্বভাবে কোনো দোষ নেই। খেলাধুলো করে হইহল্লা করে, একটা নাটকের দল আছে ওদের—তাতে খাটাখাটুনি ছাড়াও, একটু-আধটু অভিনয় করে। বাবা

হিসেবে ছেলের বেশি প্রশংসা করা মানায় না রায়মশাই। ছেলে সম্পর্কে আমার অন্য কোনো অভিযোগ নেই, শুধু একটাই ভাবনা ছিল ; এখন যেমন আছে—আছে, চলে যাচ্ছে। পাঁচ-সাত বছর পরে আমার ব্যবসার হাল ধরতে পারবে তো !"

"কেন, ওর বুঝি মন নেই আপনার ব্যবসাপত্রে ?"

"একেবারেই নয়। ছেলেটার সব ভাল, শুধু একটা জিনিস ভাল নয়, বড় খামখেয়ালি, জেদি। বেপরোয়া।"

তারাপদ বলল, "আপনি কি মনে করেন, আপনার ছেলে ঘড়িটা নিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ? ঘড়ি তো আপনাদের ঘরে আলমারির মধ্যে থাকত !"

"তাতে কী ! বাবলুর মা-র এমনিতেই ভুলো মন, তা ছাড়া মশাই, বাক্স আলমারি দেরাজের চাবি আগলে রাখার অভ্যেস বাড়ির মধ্যে আমাদের নেই। আমাদের একটি ছেলে একটি মেয়ে, কার জন্যে চাবির গোছা আগলাব ?"

"কাজকর্মের লোকজন ?"

"তারা আমাদের বাড়িতেই থাকে। পুরনো, বিশ্বস্ত লোক। ঠিকে কাজের লোক একজনই। বাসন-টাসন মাজে।"

কিকিরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বগলা চা নিয়ে এল কৃষ্ণকান্তর জন্য।

চা দিয়ে চলে গেল বগলা।

"নিন, একটু চা খান—" কিকিরা বললেন। "বাবলু যে ঘড়িটা নিয়েছিল এর কোনো প্রমাণ আছে ?"

"খুকু—আমার মেয়ে, দেখেছে।"

"নিতে দেখেছে ?"

"না, আগের দিন বাবলুর কাছে দেখেছে। দুই ভাইবোনে এ নিয়ে ঝগড়াও করেছে মজা করে।"

"আপনি বলছেন, বাবলু পরের দিন সকালে যখন লেকে দৌড়তে যায় তখন ওর কাছে ঘড়িটা ছিল ?"

"তাই তো মনে হয়," কৃষ্ণকান্ত অন্যমনস্কভাবে বললেন।

"অচল ঘড়ি, তাও পুরনো পকেট ঘড়ি নিয়ে দৌড়তে যাওয়া ?" চন্দন বলল হঠাৎ। এই প্রথম সে কথা বলল। তার বোধ হয় বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাটা। সন্দেহ হচ্ছিল।

কৃষ্ণকান্ত দেখলেন চন্দনকে, কোনো জবাব দিলেন না।

কিকিরা বললেন, "একটা কথা আমায় বলুন। মেনে নিলাম আপনার মেয়ে তার দাদার কাছে ঘড়িটা দেখেছে। কিন্তু বাবলু যে ঘড়িটা পকেটে পুরে দৌড়তে বেরিয়েছিল, তার প্রমাণ কী ? কেউ কি তাকে ঘড়ি পকেটে পুরতে দেখেছে ?"

কৃষ্ণকান্ত কেমন বিভ্রমের চোখে তাকিয়ে থাকলেন। মাথা নাড়লেন। "না, কেউ দেখেনি।"

"তবে ?"

"বাবলুর ঘরে তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে ঘড়ি রাখা বাক্সটা পাওয়া গেছে। ওটা অবশ্য ঘড়ির আসল বাক্স নয়। সে বাক্স কবে কোনকালেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটা গয়নার গোল মতন বাক্সে ঘড়িটাকে রেখে দিয়েছিলাম। বাবার স্মৃতি। দেখতেও তো ভাল।"

"তার ওপর সোনার ?'

"না, না, ওইটুকু সোনার লোভে ঘড়িটাকে যত্ন করে রেখে দেওয়ার দরকার আমাদের ছিল না। বাবার স্মৃতি হিসেবেই ছিল।"

তারাপদ বলল, "ড্রয়ারের মধ্যে ঘড়ির বাক্সটা রয়েছে, এটা আপনারা পরে খেয়াল করলেন ?"

"হ্যাঁ। প্রথমদিকে বাবলুর খোঁজখবর করতে বাইরেই ছোটাছুটি করেছি। ঘরের কথা খেয়ালই হয়নি। পরে ওর ঘরের এটা-সেটা হাতড়েছি। ভেবেছি, কী জানি—বাড়ি ছাড়ার আগে ও যদি কিছু লিখে গিয়ে থাকে ! এরকম করার কথা নয়। তবু কোথাও কিছু হদিস পাচ্ছি না বলেই ওর ঘর, টেবিল, জিনিসপত্র হাতড়ানো।"

"কী পেলেন ?"

"কী আর পেলাম ! টেবিলের ওপর একটা কাগজ পেলাম, তাতে লেখা ফক্স, অক্স আর বক্স !...আর কালই ওই ঘড়ির বাক্সটা চোখে পড়ল। কাগজপত্রের তলায় চাপা ছিল।"

"কী ধরনের কাগজ ?"

"এমনি কাগজ ! একটা স্পোর্ট্‌স ম্যাগাজিন, একটা ইংরিজি চটি কমিক্‌সের বই। দু-চারটে এলোমেলো কাগজ !" কৃষ্ণকান্ত চুপ করে গেলেন।

অল্পক্ষণ সবাই চুপচাপ। চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন কৃষ্ণকান্ত। অন্যমনস্কভাবেই সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন। লাইটার। এগিয়ে দিলেন কিকিরাদের।

চন্দন লক্ষ করল, সিগারেট বার করতে, লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হল না কৃষ্ণকান্তর। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে সবই। এইরকমই হয়। মানুষ তার অনেক শারীরিক খুঁত নিজের থেকেই মানিয়ে নেয়।

চন্দন কৌতূহল বোধ করে বলল, "আপনার ছেলে যে রোজকার মতন দৌড়তে বেরিয়েছিল—তাতে আপনাদের কোনো সন্দেহ নেই ?"

"না। ও অনেক ভোরে দৌড়তে বেরোয়। আমি তখন বিছানা ছেড়ে উঠি না। বেলায় উঠি। বাবলুর মা মাঝে-মাঝে উঠে পড়ে। আমাদের বাড়ির কাজের লোক সিধু—সিদ্ধেশ্বর ভোরে সদরটদর খুলে দেয়। সিধু বাবলুকে

সদর খুলে দিয়েছিল।”

“কিছু বলেছিল আপনার ছেলে সিধুকে ?”

“না। ট্রাকসুট জুতোটুতো পরে—যেমন রোজ দৌড়তে বেরোয়, বেরিয়ে গিয়েছিল বাবলু।”

কিকিরা বললেন, “আপনি তো আমায় কাল বলছিলেন, পাড়ার চেনাজানা লোক ওকে দৌড়তে দেখেছে লেকে।”

“হ্যাঁ। সকালের দিকে অনেকেই ঘোরাফেরা করে ওদিকে। আমাদের পাড়ার কয়েকজনও করে। তারা বাবলুকে দেখেছে।”

“ভুল দেখেনি তো ?”

“না, ভুল দেখবে কেন ? নীল-সাদা মেশানো ট্রাকসুট পরে বাবলু দৌড়য়। সেইভাবেই দেখেছে।”

“শেষ কে দেখেছে ?”

“তা বলতে পারব না।”

কিকিরা সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, “কৃষ্ণকান্তবাবু, ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত ! ভোরবেলায় লোকজনের সামনে থেকে একটা জোয়ান ছেলেকে কেউ তো চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না। অসম্ভব ! আর নেবেই বা কেন ?...আপনাদের সঙ্গে কারও শত্রুতা আছে ?”

“জ্ঞানত না।”

“কোনো জ্ঞাতি কুটুম... ?”

“মনে করতে পারি না।”

“বাবলুর বন্ধুবান্ধব, যাদের সঙ্গে ও পড়াশোনা করত, তাদের কারও সঙ্গে—”

“না না। ওর বন্ধুবান্ধবরাও ওকে আজ ক'দিন ধরে নানা জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাগজে আমি একটা ‘সন্ধান চাই’ বিজ্ঞাপনও ছাপিয়েছি। দু'দিন হল পর পর বেরিয়েছে।”

কিকিরা ভাবছিলেন। পরে বললেন, “আমরা আপনার ছেলেকে খোঁজ করার দায়িত্ব নিচ্ছি। পারব কিনা জানি না। সময় লাগবে।...তার আগে আমি একবার আপনাদের বাড়ি যেতে চাই। কাল সন্ধের আগেই যাব। আপত্তি নেই তো ?”

“কিসের আপত্তি, মশাই ! আপনারা কাল আসুন। আমি বাড়িতেই থাকব।”

২

পরের দিন চন্দনকে পাওয়া গেল না, কাজে আটকে গিয়েছে।

কিকিরা তারাপদকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন, লেক গার্ডেন্স যাবেন। তখনো ঝাপসা হয়নি চারপাশ। গ্রীষ্মের বিকেল কি সহজে ফুরোতে চায়! রোদ নেই, আলোও পুরোপুরি মুছে যায়নি।

ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে তারাপদ বলল, "স্যার, কাল মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। যা গরম! পাখাটাও আর বাড়ানো যাচ্ছে না। জল খেয়ে শুলাম আবার। ঘুম আর আসে না। কৃষ্ণকান্তবাবুর ছেলের কথা ভাবছিলাম। মাথায় কিছু ঢুকছিল না। অদ্ভুত ব্যাপার!"

কিকিরা বললেন, "আমার অবস্থাও তোমার মতন। ভেবেই যাচ্ছি, কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমার বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে। বাবলু সকালে দৌড়তে যাওয়ার সময় কেন একটা অচল ঘড়ি সঙ্গে নেবে?"

কিকিরা ট্যাক্সির জানলা দিয়ে রাস্তাঘাট, মানুষজন দেখতে-দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "নাও তো পারে!"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "বাবলুর বাবা তো বলছেন।"

"সেটা তাঁর অনুমান। কেউ কি দেখেছে?"

"না। উনি তা বললেন না।"

"তবে? এমন তো হতে পারে, আগের দিন বাবলু ঘড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল। তারপর হারিয়ে এসেছে।"

"হারিয়ে এসেছে! কী করে বুঝলেন?"

"বুঝিনি। কথার কথা বলছিলাম।...ধরো, এমন যদি হয় আগের দিন বাবলু ঘড়িটা নিয়ে তার বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে গিয়েছিল। আগের দিন বলছি এইজন্যে যে, বাবলুর বোন সেদিনই তার দাদার কাছে ঘড়িটা দেখেছিল। তার মানে এই নয় যে, বাবলুও আগেই আলমারি থেকে ঘড়িটা নেয়নি।"

"বন্ধুবান্ধবদের ঘড়িটা দেখাতে যাবে কেন?"

"খেয়াল! শখ! বাড়িতে একটা পুরনো দেখার মতন জিনিস রয়েছে, বন্ধুদের দেখাতে হবে! এই আর কী! ছেলেমানুষি বলতে পারো, বলতে পারো সাধ। এমন তো আমাদের হয় সকলেরই। আমিই তো কোনো পুরনো জিনিসপত্র কিনে আনলে তোমাদের দেখাই।"

তারাপদ কথাটা অস্বীকার করতে পারল না। বলল, "ঘড়িটা বরাবর তাদের বাড়িতে আছে। হঠাৎ সেদিন বাবলুর বন্ধুদের ঘড়ি দেখাবার শখ চাগাল কেন?"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন প্রথমটায়। তারপর বললেন, "এ-কথার জবাব

এখন আমি তোমাকে দিতে পারছি না, তারা। সবই অনুমান। হয়ত বাবলু সত্যি-সত্যিই ঘড়িটা নিয়ে তার বন্ধুদের দেখাতে যায়নি। হারিয়েও ফেলেনি।"

"তবে ?"

"জানি না। আমার ধারণা, ওই ঘড়ির কোনো রহস্য আছে। থাকতে পারে। আর ওই লেখাটাও আমি বাতিল করতে পারছি না। অক্স, ফক্স আর বক্স। বাবলুর টেবিলের ওপর যেটা পাওয়া গিয়েছে।"

তারাপদ কোনো জবাব দিল না।

আলো এবার আরও ময়লা হয়ে আসতে লাগল। আবছা অন্ধকার নেমে আসছে। আলো জ্বলে উঠেছিল রাস্তায়। আগেই। গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়। হরেক রকম শব্দ, হল্লা, গাড়ির হর্ন, বাস, মিনিবাসের গর্জন, ধোঁয়া। কিকিরাদের ট্যাক্সিটা এ-রাস্তা সে-রাস্তা দিয়ে ল্যান্সডাউন রোড ধরে নিয়ে এগুতে লাগল।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, "কৃষ্ণকান্তবাবুকে দেখে তোমার কেমন লাগল কাল ?"

তারাপদ অন্যমনস্ক ছিল। খেয়াল হল কিকিরার কথায়।

"কিছু বললেন ?"

"কেমন লাগল কৃষ্ণকান্তবাবুকে ?"

"ভালই। ভদ্রলোক খুবই আপসেট। ভয় পেয়ে গিয়েছেন। স্বাভাবিক। অত বড় ছেলে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেলে কে না ভয় পাবে! কার না মাথা খারাপ হবে!"

"মানুষটি কিছু লুকোচ্ছেন বলে মনে হল ?"

তারাপদ কিকিরার দিকে তাকাল। "ও-কথা কেন বলছেন ?"

"মনে এল, বলছি।"

"আমি ও-ভাবে ভেবে দেখিনি। একজন বাবা তাঁর ছেলেকে পাচ্ছেন না—মানে ছেলে হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছে—এই কথাটা আমাদের জানাতে এসেছেন। এর মধ্যে লুকোবার কী আছে ?"

"তা ঠিক। ...যাক যে, আগে তো ভদ্রলোকের বাড়ি চলো, তারপর দেখা যাবে।"

"আপনি স্যার দিন-দিন গোয়েন্দাই হয়ে যাচ্ছেন," তারাপদ একটু হেসে বলল, "সব ব্যাপারেই সন্দেহ!"

"না স্যার, আমি গোয়েন্দা নই। গোয়েন্দাদের তিনটে চোখ সামনে, একটা মাথার পেছনে। আমার মাত্র দুটো। ওনলি টু।"

"বাঃ! আর আমাদের চোখ—আমার আর চাঁদুর। এই চারটে আপনার সঙ্গে অ্যাড করুন।" তারাপদ মজার গলা করে বলল।

কিকিরা হেসে উঠলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "তা বটে ; আমার তবে ছ'টা চোখ। সিক্স আইজ !...কিন্তু কথাটা কী জানো তারাবাবু, আমাদের হল আনাড়ি-চোখ, ওদের হল নাড়ি-চোখ।"

"মানে, নাড়ি থেকে উঠে এসেছে বলছেন ?" ঠাট্টার গলাতেই বলল তারাপদ।

"না-ড়ি ! হ্যাঁ, তা বলতে পারো। ওদের পেশাদারি ব্যাপার ছাড়াও একটা বড় জিনিস আছে, তারাপদ। ইনট্যুইশান। ওটা ভেতরের ব্যাপার। কারও-কারও থাকে। সকলের থাকে না।"

"আপনার আছে স্যার। আপনি কিকিরা দ্য গ্রেট।" তারাপদ হাসতে লাগল।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। "না, কোথায় আর !"

কৃষ্ণকান্তর বাড়ি এসে পৌঁছতে আরও খানিকটা সময় লাগল। গাড়িঘোড়ার ভিড়, তার ওপর কিসের এক ব্যান্ড পার্টি চলেছে বাজনা বাজাতে-বাজাতে, সামনে-পেছনে মাথায় আলো নিয়ে একদল লোক। কিসের বাদ্য কে জানে।

সন্ধের মুখে কিকিরারা লেক গার্ডেন্সে পৌঁছে গেলেন।

জায়গাটা কিকিরার তেমন চেনা নয়, তারাপদরও নয়। কিকিরা আগে দু-চারবার এদিকে এলেও তখন যা দেখেছিলেন এখন একেবারে আলাদা। বাড়িতে-বাড়িতে ঠাসা। গিজগিজ করছে লোক। কত দোকান।

কৃষ্ণকান্ত আগেভাগে বুঝিয়ে না দিলে বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হত, অসুবিধেও হত। খুব একটা অসুবিধে কিকিরাদের হল না।

কৃষ্ণকান্ত অপেক্ষাই করছিলেন। বললেন, "আসুন।"

বাড়ি দোতলা। বাইরের দিকে গ্যারাজ। গেটের সামনে কৃষ্ণকান্ত। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

নিচের তলায় বাঁ পাশে বোধ হয় কৃষ্ণকান্তের নিজস্ব দফতর। ডানদিকে বসার ঘর। বাইরের লোকজন এলে বসে। ঘরটি মোটামুটি বড়। সাজানো-গোছানো। সোফাসেটি, বইয়ের আলমারি, বাহারি আলো, সুন্দর পরদা, দেওয়াল-র‍্যাকে শৌখিন জিনিসপত্র সাজানো। মস্ত এক ফুলদানি। খুবই চমৎকার দেখতে। কয়েকটা ছবি দেওয়ালে।

কিকিরা আর তারাপদ ঘরটা দেখছিলেন।

"বসুন !"

"হ্যাঁ, বসছি। বেশ বাড়ি করেছেন, মশাই !" কিকিরা বললেন।

"নিজে বিল্ডিং কনট্রাকটার। একটু দেখেশুনে করেছি," কৃষ্ণকান্ত বললেন বিনয় করে।

"কত দিন হল বাড়ির ?"

"বছর দশেক।"

"নতুনই। হালে রং করিয়েছেন নাকি?"

"এই তো করলাম। মাসখানেক হল। ভেতরের খুচরো কাজ কিছু বাকি আছে। তবে ইচ্ছে করে আটকে রেখেছি। আর এখন তো বাড়ি নিয়ে ভাবতেই পারি না। কাজকর্মও নিজে দেখতে পারছি না ব্যবসার।"

কিকিরা বসে পড়েছিলেন। তারাপদও।

"নতুন কোনো খবর পেলেন ছেলের?" কিকিরা বললেন।

"না," মাথা নাড়লেন কৃষ্ণকান্ত। "নতুন খবর কিছুই পাইনি। কাল রাত ন'টা নাগাদ একটা ফোন এসেছিল। বাবলুর এক বন্ধু করেছিল। আমার স্ত্রী প্রথমে ধরেছিলেন। পরে আমি কথা বললাম। বাবলুর বন্ধু বলল, ওদের এক কলেজের বন্ধু বাবলুর মতন একজনকে দুপুরবেলায় জিপিও-র সামনে দেখেছে।"

কিকিরা তাকিয়ে থাকলেন। তারাপদও কৃষ্ণকান্তকে দেখছিল।

কিকিরা বললেন, "কলেজের বন্ধু! বাবলুর মতন দেখতে! তাকে ধরতে পারল না?"

"না। শুনলাম, বাবলুর ও ক্লোজ ফ্রেন্ড নয়। চেনে। তবে বাবলুর কথাটা সে শুনেছে কমন ফ্রেন্ডদের কাছে! কাগজেও দেখেছে। আমরা বাবলুর ছবি দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।...তাও ছেলেটি ডাকার চেষ্টা করেছিল। যাকে ডেকেছিল সে শুনতে পায়নি হয়ত। চলন্ত মিনিবাসে লাফিয়ে উঠে চলে গেল।"

তারাপদ কী ভেবে বলল, "যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বাবলুর কথা অনেকেই জেনে গিয়েছে। হয়ত ওর কোনো ক্ষতি হয়নি।"

"দেখুন ভাই, আজকাল যা অবস্থা তাতে করে কার কখন কী ঘটে, এখানে বসে বোঝা মুশকিল। বাবলুর কোনো ক্ষতি হবে—আমিও ভাবতে পারি না। তার স্বভাব এত ভাল, সকলের সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক ছেলেটার। পরোপকারী, ভদ্র ছেলে! কোনো সাতে পাঁচে থাকে না। কে তার ক্ষতি করবে, কেনই বা করবে! না, সেদিক থেকে আমি তার ক্ষতি হওয়ার কথা এখনো ভাবিনি। তবে হ্যাঁ, কোনো অ্যাকসিডেন্ট যদি হয়—সেটা তো আমাদের হাতের মুঠোয় নয়। তা আজ পর্যন্ত থানা পুলিশ, হাসপাতাল—কেউ আমাদের জানায়নি যে বাবলুর মতন কোনো ছেলেকে—ইয়ে—মানে খারাপ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।"

কিকিরা নিজের মাথার চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে কিছু ভাবছিলেন। শান্তভাবে বললেন, "যে-ছেলেটি বাবলুর মতন একজনকে দেখেছে বলছে, সে ভুল দেখেনি তো?"

কৃষ্ণকান্ত যেন দ্বিধায় পড়লেন। "তা আমি কেমন করে বলব।"

"না, আমি বলছিলাম—অনেক সময় আমাদের চোখের ভুল হয়।"

"তা হয়।"

"যাক, এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে," কিকিরা বললেন তার পরই কথা পালটালেন, "কৃষ্ণকান্তবাবু, আমি একবার বাবলুর ঘরটা দেখব। তার বোন আর মায়ের সঙ্গে কথা বলব। বাড়ির কাজের লোকজনের সঙ্গেও। তার আগে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না।"

"বলুন ?"

"আপনাদের পুরনো পৈতৃক বাড়ি চারু অ্যাভিনিউতে বলেছিলেন। সেখানে আপনার দাদা থাকেন সপরিবারে। দাদার সঙ্গে আপনাদের—"

"মাপ করবেন। এ-ব্যাপারে দাদাকে না টানাই ভাল। আমার দাদা সরল মানুষ। ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। চাকরিবাকরি ভালই করতেন। রিটায়ার করছেন বছর দুই হল। দাদার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়। সিরিয়াসই হয়েছিল। ওই অ্যাটাকের পর দাদা খানিকটা আগে-আগেই চাকরি থেকে রিটায়ার করলেন।"

"আপনাদের সম্পর্ক তা হলে ভাল।"

"খুবই ভাল। চারু অ্যাভিনিউ এখান থেকে আর কতটা! ভেতর দিয়ে রাস্তা আছে। রিকশা করেই যাওয়া-আসা যায়। এ-বাড়ি ও-বাড়িতে সবসময়েই খোঁজখবর চলে।"

"বাবলুর কথা দাদা নিশ্চয় শুনেছেন ?"

"শুনবেন না, কী বলছেন! ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। বাবলুকে দাদা একসময় কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। তখন আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি।"

"এ তো সুখের কথা। ওঁর ছেলেমেয়ে ?"

"বাবলুর বড় একজন, বাবলুর সমবয়েসী একজন। বাবলুর ভাই আর বন্ধু। সে তো আজ ক'দিন বাইরে-বাইরে টো-টো করে বেড়াচ্ছে বাবলুর খোঁজখবর করতে।"

"কী নাম ?"

"আমরা কাবলু বলে ডাকি। ভাল নাম শরৎ। বাবলুর ভাল নাম রজত। ওই দুই ভাইয়ের নাম মিলিয়ে রাখা।"

বাড়ির ভেতর থেকে চা এল। চা আর মিষ্টি।

"নিন, একটু চা খান," কৃষ্ণকান্ত সৌজন্যবশে নিজেই চা এগিয়ে দিলেন কিকিরাকে।

চা খেতে-খেতে কিকিরা বললেন, "আপনার কাছ থেকে আমি কিছু-কিছু ঠিকানা নেব। বাবলুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের। সে যাদের সঙ্গে নাটক করত সেই দলের। আপনার দাদার সঙ্গেও একবার দেখা করতে চাই। আর আপনার

ভাইপো শরৎকে আমার দরকার। কথা বলব।"

"কাবলু—মানে শরৎকে আপনার বাড়িতেই পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"ভালই তো। দেবেন।"

চা-খাওয়া শেষ হলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন, বাবলুর ঘরটা একবার দেখি।"

"চলুন।"

দোতলায় বাবলুর ঘর। একেবারে একপাশে।

তারাপদ লক্ষ করলে কৃষ্ণকান্তের বাড়ির সবই তকতকে। প্রয়োজন বুঝে এবং রুচিমতন ঘরদোর করা হয়েছে। টাকা আছে বলে, লোক-দেখানো চটক বা বাহুল্য নেই। ভালই লাগে। নতুন করে রং হয়েছে বলে আরও ঝকঝকে দেখাচ্ছিল।

বাবলুর শোওয়ার ঘরেই তার পড়াশোনার ব্যবস্থা। খাট, আলমারি, টেবিল, বুকর্যাক ছাড়াও এক্সারসাইজের কয়েকটা খুচরো জিনিস রাখা আছে একপাশে। গোটা দুয়েক স্টিকার দেওয়ালে লটকানো। দু'জনেই খেলোয়াড়। সুনীল গাওস্কর আর মারাদোনা। বাবলু ক্রিকেট, ফুটবল দুইয়েরই অনুরাগী বোধ হয়। আলনার তলায় জুতোর বাক্স, গামবুট।

কিকিরা ঘরের চারপাশ দেখতে-দেখতে বললেন, "এই টেবিলের ওপর আপনি ওই কাগজের টুকরোটা পেয়েছেন ? ওই যাতে ফক্স, অক্স আর বক্স লেখা ছিল ?"

"হ্যাঁ। টেবিলের ওপর একটা কাগজে ওগুলো লেখা ছিল। রঙিন লেখা। ফেল্ট পেনে বোধ হয়।"

"কীভাবে ছিল ?"

"টেবিলের মাঝখানে। ওর পকেট ক্যালকুলেটার চাপা দেওয়া।"

"ও যেন কী পড়ে ?"

"কমার্স। অ্যাকাউটেন্সি..."

"আপনি কি বলতে পারেন, কাগজে ফক্স, অক্স, বক্স লেখার কী মানে ?"

"না," মাথা নাড়লেন কৃষ্ণকান্ত।

"এ-রকম অদ্ভুত নামে কাউকে কি আপনারা ডাকতেন ঠাট্টা করে ?"

"মানে ?"

"মা-নে ! মানে যেমন ধরুন, আমরা ঠাট্টা করে খুব মোটাসোটা কাউকে 'পিপে' বলি, খায় দায় চরে বেড়ায় কাউকে বলি 'ষাঁড়'...এইরকম আর কী !"

"না, আমি জানি না। আমার তো মনে পড়ছে না।"

কিকিরা কথা বলতে-বলতে ঘরের এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ডানপাশে এক দরজা, খানিকটা সরুমতন। খোলাই ছিল। দরজা দিয়ে বাইরের ছোট

ব্যালকনি চোখে পড়ছিল। বাড়ির পিছন দিক ওপাশটা।

কিকিরা ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। ফিরেও এলেন সামান্য পরে।

"পেছনে এখনো ভারা বাঁধা আছে দেখছি!"

"হ্যাঁ, দু-চারটে বাঁশ বাঁধা হয়েছিল আবার। রং কমবেশি করে ফেলেছিল জায়গাটায়। ড্যাম্পের ছাপের মতন দাগ দেখাচ্ছিল। রং মিস্ত্রিদের কাণ্ড। নতুন করে মিলিয়ে দিতে হয়েছে।"

"ও!...আপনার মেয়েকে একবার ডাকবেন?"

"ডাকছি। কাছেই আছে।" কৃষ্ণকান্ত বাইরে গেলেন মেয়েকে ডেকে আনতে।

তারাপদ বলল, "বাড়ির পেছনে কী দেখলেন, কিকিরা?"

"পেছনেও বাড়ি। তবে এ-বাড়ির কম্পাউন্ড ওয়ালের গায়ে ও-বাড়ির ড্রাইভওয়ে আর গ্যারাজ। রং মিস্ত্রিদের ভারার বাঁশ আর পাশের বাড়ির গ্যারাজের ছাদের মধ্যে তফাতটা বেশি নয়।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না। পাশের বাড়ির গ্যারাজের মাথায় চড়ে এ-বাড়ির ছারার বাঁশ বেয়ে না হয় চোর আসতে পারে। কিন্তু এটা তো চুরির কেস নয় স্যার!"

"তাই ভাবছি।...দাও তো একটা সিগারেট দাও।"

সিগারেট ধরানো শেষ হয়নি কিকিরার, কৃষ্ণকান্ত একটি মেয়েকে সঙ্গে করে ঘরে এলেন। "আমার মেয়ে খুকু।"

কিকিরা দেখলেন মেয়েটিকে। গোলগাল গড়ন, ফরসা রং গায়ের, বছর ষোলো-সতেরো বয়েস। পরনে সালোয়ার কামিজ। মোটা বিনুনি ঝুলছে পিঠে। মেয়েটিকে দেখেই বোঝা গেল, খানিকটা আগেও সে কাঁদছিল। হয়ত দাদার কথা মনে হচ্ছিল বলেই।

কিকিরা সহজভাবে বললেন, "তোমার নাম খুকু! বাঃ। ভাল নাম কী তোমার?"

ক' মুহূর্ত চুপ করে খুকু বলল, "রমলা।"

"তুমি এখন কী পড়ছ?"

"হায়ার সেকেন্ডারি দেব।"

"ভেরি গুড। ...আচ্ছা, আমি তোমায় ক'টা কথা জিজ্ঞেস করব। একটু ভেবেচিন্তে জবাব দেবে। কেমন?"

খুকু মাথা নাড়ল।

"তোমার দাদার কাছে তুমি ঘড়িটা কবে দেখেছিলে?"

"আগের দিন। দাদাকে যেদিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—তার আগের দিন।"

"কোথায় দেখেছিলে ? ড্রয়ারে ?"

"না, দাদার হাতে। দাদা ওটা দেখছিল।"

"সেটা কখন ? সকালে, না বিকেলে ? সন্ধেবেলায় ?"

"বিকেলে।"

"ও ! তোমার দাদা তখন বাড়িতেই ছিল ?"

"বেরিয়ে যাওয়ার আগে। বিকেলে দাদা বেরিয়ে যায়। খেলাধুলো করে, আড্ডা মারে।"

"দাদার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল ঘড়ি নিয়ে ?"

"হ্যাঁ। এমনি ঝগড়া।"

"কেন ?"

"সোনার ঘড়িটা বার করে খেলা করছিল বলে। বারণ করেছিলাম।"

"ঠিকই তো করেছিলে ! দাদা তোমার কথা শোনেনি ?"

"না। উলটে আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, চুপ কর, নিজের চরকায় তেল দে। যা, তোর গানের ক্লাসে যা, পাকামি করতে হবে না।"

কিকিরা মুচকি হাসলেন, "দাদারা ওইরকমই হয়।...তা সেদিনের পরে আর তুমি দাদার কাছে ঘড়ি দেখোনি ?"

"দাদার সঙ্গে আর আমার কথাই হয়নি। আমার খুব রাগ হয়েছিল।"

"তা তো হবেই।...আচ্ছা, একটা কথা মনে করে বলো তো ! ঘড়িটা তুমি দেখেছ বাবলু নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন।...তার আগে আর তার কাছে দেখোনি ?"

"কই ! না !"

"তোমার দাদা ঘড়ি নিয়ে আর কিছু বলেনি তোমায় ?"

"না।" বলেই মাথা নাড়ল খুকু। "একবার শুধু বলেছিল, মা-বাবাকে লাগাবি না। লাগালে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

কিকিরা হাসলেন। তারাপদও মুচকি হাসল।

সামান্য পরে কিকিরা বললেন, "আচ্ছা খুকু, তুমি কি বলতে পারো—বাবলু একটা কাগজে কেন অক্স, ফক্স আর বক্স লিখে টেবিলের ওপর রেখেছিল ?"

খুকু মাথা নাড়ল। সে জানে না।

কিকিরা আর দাঁড় করিয়ে রাখলেন না খুকুকে। যেতে বললেন।

কৃষ্ণকান্ত নিজেই বললেন, "আপনি কি খুকুর মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন ? আজ তাঁর শরীর একেবারেই ভাল নেই। প্রেশার খুব বেড়ে গিয়েছে। শুয়ে আছেন।"

"থাক, তাঁকে আর কষ্ট দেব না। চলুন, আমরা নিচে যাই। আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলব। কী নাম যেন ওর, যে সকালে সদর খুলে দিয়েছিল বাবলুকে ?"

"সিধু। সিদ্ধেশ্বর। আমাদের বাড়িতেই থাকে। সাত-আট বছর হয়ে গেল।"

"চলুন, নিচেই যাই।"

নিচে নেমে এসে আর বসার ঘরে ঢুকলেন না কিকিরা। বাড়ির সদরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তারাপদ সদর দেখছিল। আলাদা কোনো ব্যবস্থা নয়, প্রায় সব বাড়িতেই যেমন দেখা যায়, কোলাপসিবল গেট, ভারি দরজা। দরজার ভেতর দিকে ওপরে-নিচে ছিটকিনি, মাঝ-মধ্যিখানে লক। আগে সদর খুলতে হয়, তারপর কোলাপসিবল গেট। গেটের পর কয়েক ফুট প্যাসেজ, তারপর রাস্তা। গাড়ি রাখার গ্যারাজ একপাশে। রাস্তা ঘেঁষেই।

সিদ্ধেশ্বরকে ডাকা হল।

লোকটি সামনে আসতেই কিকিরা বুঝতে পারলেন, নিরীহ ধরনের মানুষ সিদ্ধেশ্বর। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস হয়ত। রোগাটে গড়ন। মুখে কালচে দাগ। দাড়ি প্রায় নেই, সামান্য গোঁফ চোখে পড়ে। চোখ দুটি বড়-বড়।

"তোমার নাম সিদ্ধেশ্বর ?" কিকিরা বললেন।

"হ্যাঁ বাবু। সিদ্ধেশ্বর দাস।"

"তুমি সেদিন দাদাবাবুকে দরজা খুলে দিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রোজই আমি সদর খুলি। বন্ধও করি রাতের বেলায়। আমার কাছেই চাবি থাকে।

"সকালে ক'টা নাগদ দরজা খুলে দিলে ?"

"সময় বলতে পারব না। রোজ যেমন খুলি। ভোরবেলায়।"

"দাদাবাবু কী পরে বেরিয়ে গেলেন ?"

"রোজই যা পরে যায়, সেই জামা।"

"হাতে কিছু ছিল ?"

"না। দেখিনি।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "রাস্তায় তখন লোক ছিল ?"

"আজ্ঞে দু-একজন ছিল বইকি ! এই পাড়ার অনেকেই ভোরে বেড়াতে যান।"

"যারা ছিল—দু-একজন—তাদের তুমি চেনো ?"

"চিনি। এগারো নম্বর বাড়ির বাবু ছিলেন। পালবাবু ছিলেন ?"

কিকিরা বললেন, "নতুন কাউকে দেখোনি ?"

"ন-তু-ন !" সিদ্ধেশ্বর যেন ভাবছিল, চেষ্টা করছিল মনে করার। মাথা নেড়ে না বলতে গিয়েও হঠাৎ তার কিছু মনে পড়ে গেল। বলল, "আমি লোহার ফটক খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাদা বেরিয়ে গেল। খানিকটা তফাতে এক বাবু হাঁটছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটা কুকুর ছিল। বাঘের মতন

কুকুর।”

কৃষ্ণকান্ত বললেন, “রায়মশাই, এই পাড়ার অনেক বাড়িতেই কুকুর আছে। সকালে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরুনোর লোকও আছে।”

সিদ্ধেশ্বর মাথা নাড়ল। “না বাবু, এই কুকুরটা যেন বাঘ। আগে আমার চোখে পড়েনি।”

“কুকুরের মালিক ভদ্রলোককে তুমি দেখেছ ? চিনতে পারলে ?”

“তফাত থেকে দেখেছি। চিনতে পারিনি।”

“আন্দাজ বয়েস ?”

“ছোকরা নয়। খাটো প্যান্ট আর মোটা গেঞ্জি পরা। এক হাতে লাঠি। অন্য হাতে কুকুরটার শিকলি।”

“ভদ্রলোককে তুমি চিনতে পারোনি বলছ। কুকুরটাও তুমি আগে কোনোদিন দেখোনি ?”

“আজ্ঞে !”

কিকিরা কৃষ্ণকান্তের দিকে তাকালেন। “আপনাদের পাড়ায় নতুন কেউ এসেছে ?”

“আসতে পারে। আসে মাঝে-মাঝে। তা ছাড়া নতুন ফ্ল্যাট হচ্ছে, বাড়িও দু-একটা হচ্ছে ওপাশে...”

তারাপদ কিকিরাকে বলল, “এ আর কঠিন কী ! খোঁজ নিলেই কুকুর আর ভদ্রলোকের খবর বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু...”

কিকিরা তারাপদকে কথা শেষ করতে দিলেন না। “চলো, যাওয়া যাক।”

কৃষ্ণকান্ত বললেন, “আমার গাড়ি আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।”

কিকিরা আপত্তি করলেন না।

৩

দু-তিনটে দিন কেটে গেল।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ খানিকটা ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। গুমোট দিন। বিকেলে মেঘলা হল। তারপর দমকা ঝড় উঠল। বৃষ্টিও হল একপশলা। আধ ঘণ্টার মতন বৃষ্টি, তবে জোরেই নেমেছিল। সারাদিন গুমোটের পর এই বৃষ্টি যেন অনেক আরাম এনে দিল শহুরে মানুষজনকে।

তারাপদ আর চন্দন বৃষ্টি থামার পরই কিকিরার কাছে হাজির।

কিকিরা তাঁর বসার ঘরে—যেটা জাদুঘরের চেয়ে রহস্যময়—বাতি জ্বালিয়ে বসে-বসে একটা চটি মতন বই বা ওই ধরনের কিছু দেখছিলেন।

চন্দনই কথা বলল প্রথমে, “আর খানিকক্ষণ হলে পারত ; কী বলুন, স্যার ! যা অবস্থা যাচ্ছিল। মরে যাচ্ছিলাম। ...কলকাতার ক্লাইমেট নাকি পালটে যাচ্ছে,

বুঝলেন। সেদিন কাগজে একটা লেখা দেখছিলাম, তাতে লিখেছে—এই শহরে শীত কমছে, গরম বাড়ছে। প্রতি দশ বছরের হিসেবে কমপক্ষে দেড় থেকে দু' ডিগ্রি।"

তারাপদ মজা করে বলল, "লোক বাড়ছে, ঘরবাড়ি বাড়ছে, ট্রামবাস গাড়ি বাড়ছে—গরম তো বাড়বেই।"

চন্দন বসতে-বসতে কিকিরাকে বলল, "কী পড়ছেন ?"

কিকিরা বললেন, "ক্যাটালগ।"

"ক্যাটালগ ? কিসের ক্যাটালগ ?"

"ঘড়ির।"

চন্দনের বিশ্বাস হল না। কিকিরা নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। বলল, "হঠাৎ ঘড়ির ক্যাটালগ কেন ?"

কিকিরা হাতের বইটা কোলের ওপর রাখলেন। বললেন, "চোরবাজারের সুরবাবুর কাছে পাওয়া গেল। ইউ নো সুরবাবু ?"

"না স্যার, চোরবাজারই চিনি না তো সুরবাবু! চোরবাজারে আপনার কত যে বন্ধু ?"

"চোরে-চোরে হাফ্-ব্রাদার। আমি কখনো-কখনো চোরবাজারে মার্কেটিং করতে গেলে দুই ভাইয়ে মিলে চা-টা খাই, গল্পগুজব হয়। সুররা ভেরি ওল্ড কনসার্ন। ওরা পুরনো শখের জিনিস বিক্রি করে। বনেদি বড়লোক—ওয়ান্স আ আপঅন এ টাইমে রাজাগজা ছিল—এখন শরিকি-ভাঙা-বাড়ির বংশধর, টানাটানির মধ্যে থাকে—দু-চারশো টাকায় ভাল-ভাল জিনিস বেচে দেয়। কোনো-কোনোটা আবার হাতফেরতা হয়ে আসে। সেকালের কাচের জিনিস, ঝাড় থেকে সেজবাতি, আসলি বেলজিয়াম মিরার, বিউটিফুল ফুলদানি, ছোট-ছোট কার্পেট, রুপোর গড়গড়া, ছবির ইংলিশ ফ্রেম—কতরকম জিনিস। চলো একদিন, দেখাব।"

তারাপদ অবাক হয়ে বলল, "সে-না হয় বুঝলাম। কিন্তু ঘড়ির ক্যাটালগ ?"

"ওই তো! ওটা তো তোমরা বুঝবে না।" কিকিরা পকেট হাতড়ে চুরুট বার করতে-করতে বললেন, "সুরদের কাছে দু-চারটে পুরনো মডেলের ঘড়িও আছে। আগে আরও ছিল, এখন নেই। দু-একটা মাত্র। পুরনো শৌখিন জিনিস কেনার লোক এখন কমে গিয়েছে তারাবাবু। লোকে আর পয়সা খরচ করে ওসব কিনতে চায় না।"

"ভালই করে।...তা আপনি—"

"আমি সুরকে বললাম, একটা সোনার পকেট ঘড়ির কথা শুনেছি। তার মধ্যে কম্পাস আছে। সে এই ধরনের ঘড়ির কথা আগে শুনেছে কিনা ? বা, কোথাও যদি দেখে থাকে ?"

তারাপদ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। চন্দনের দিকে তাকাল।

চন্দনও এবার আন্দাজ করতে পেরেছে।

চন্দন হঠাৎ বলল, "কিকিরা, কাগজে মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দেখি—অমুক ঘড়ি তমুক ঘড়ির অত নম্বর মডেল যদি কারুর কাছে থাকে তবে যেন..."

"হ্যাঁ, কাগজে বিজ্ঞাপন থাকে। এখনো থাকে।...সেটা আলাদা। তা সুর বলল, ওরা বেশিরভাগই আগে যা বিক্রি করেছে সেগুলো বড় ঘড়ি। হয় ওয়াল ক্লক, না হয় টেব্‌ল ক্লক—মানে ছোট দেরাজ, কিংবা ভারি টেবিলের ওপর রাখার মতন ঘড়ি। রিস্ট ওয়াজও এক-আধটা বিক্রি করেছে অবশ্য, তবে সেগুলো সোনাটোনার নয়।"

তারাপদ বলল, "বুঝেছি। আপনি বাবলুর ঘড়িটার ব্যাপারে জানতে গিয়েছিলেন।"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। চুরুট ধরালেন। "তোমার মাথা এতক্ষণে প্লে করেছে।"

চন্দন হেসে ফেলল। "তারার মাথা লেটে প্লে করে।'

তারা গায়ে মাখল না কথা। বলল, "আপনার ক্যাটালগ প্লে করল?"

"না। এটা পুরনো ঠিকই। অনেক খুঁজেপেতে হাতড়ে বার করল সুর। কাগজগুলো একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে। অনেক পুরনো ঘড়ির নাম দেখলাম। ডেসক্রিপশানও রয়েছে। কিন্তু সোনার ঘড়ি যা রয়েছে সবই ফোরটিন ক্যারেট। কোথাও দেখলাম না, সোনার কাঁটা আর কম্পাসের কথা আছে।"

চন্দন বলল, "স্যার, এই ক্যাটালগ কিসের কাজে লাগে?"

"পুরনো ওয়াচ ডিলার্সদের কাজে লাগত একসময়। এখন লাগে বলে শুনিনি।"

"তা এর জন্য ক্যাটালগ ছাপানো?" চন্দন বলল।

মাথা হেলিয়ে কিকিরা বললেন, "হ্যাঁ। ব্যাপারটা কী জানো? আগেকার দিনে যারা পুরনো শৌখিন জিনিস বিক্রি করত, তাদের একটা সার্কেল ছিল। কার কাছে কী আছে জানাবার জন্যে ক্যাটালগ ছেপে নিজেদের মধ্যে বিলি করত। সারা দেশ জুড়ে এই ব্যবসা চলত। দিল্লির ডিলার জানতে পারত কলকাতায় কার কাছে কোন জিনিসটা পাওয়া যাবে, কলকাতার ডিলার জানতে পারত জয়পুরের ডিলারের কাছে কী পাওয়া যাবে। তারপর কাস্টমার জুটলে লেনদেন হত। এখন আর এ-সব বড় পাবে না। ব্যবসাই উঠে গেল, তা ক্যাটালগ!"

তারাপদ জায়গা ছেড়ে উঠে এসে হাত বাড়াল। "দিন তো একবার, চেহারাটা দেখি।"

কিকিরা ক্যাটালগের চটি বইটা দিলেন।

তারাপদ বইটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল।

ন্দন বলল, "নতুন কোনো খবর পেলেন ?"
"খবর তো তোমাদের দেওয়ার কথা।"
চন্দন বলল, "আমি একেবারেই সময় পাইনি, স্যার। ক'টা দিন আমার ঘাড়ে ...পড়েছে। আমার এক মামাতো ভাই এসেছিল। তাকে নিয়ে খানিকটা ...ছিলাম। তারপর আমাকে কলকাতার অন্য হাসপাতালে ট্রান্সফার করে ...দিয়েছিল। রাইটার্সে ধরনা মারলাম গতকাল।...তবে হ্যাঁ, তারা আমায় ...বলে—আপনি বলেছেন, লেকের আশেপাশে আমার কোনো বন্ধু আছে ...খোঁজ করতে। সেটা করেছি। লেক গার্ডেন্সেই আমার এক পুরনো বন্ধু ...। সে এখন চোখের ডাক্তারি করছে। আই স্পেশালিস্ট। বিদ্যুৎ ...। তার ঠিকানা নিয়ে ফোন করেছিলাম।"
"কিছু বলেছ ?"
"না। এমনি একদিন যাব বলেছি।"
"কালই যাও।"
চন্দন বলল, "একলা ?"
"হ্যাঁ ; একলাই যাবে।"
"গিয়ে কী করব ?"
"কৃষ্ণকান্ত দত্তরায় মশাই আর তাঁর ফ্যামিলি সম্পর্কে খোঁজখবর করবে।"
"আপনি কি দত্তরায় সম্পর্কে... ?"
"না, তা নয়। তবু অন্যদের কাছ থেকে খোঁজখবর করা ভাল। আমরা যা শুনেছি সবই একতরফা, কৃষ্ণকান্ত যা বলেছেন। তাঁর বলার বাইরেও তো কিছু থাকতে পারে।"
"আর কিছু ?"
"হ্যাঁ। বাবলু সম্পর্কেও জানবে, যতটা পারা যায়।" কিকিরা একটু থেমে আবার বললেন, "আরও একটা কাজ তোমার থাকল। বাবলু যেদিন হারিয়ে যায় সেদিন ভোরবেলায় সে যখন দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন পাড়ার কে-কে তাকে দেখেছে ? কোথায় দেখেছে ? কী অবস্থায় দেখেছে ? মানে, সে একাই ছিল, না, তার সঙ্গেও কেউ দৌড়চ্ছিল ? সে দাঁড়িয়ে পড়ে কারও সঙ্গে কথা বলছিল কিনা ! আশেপাশে রাস্তায় লোকজন ছিল কিনা ! মানে, যা-যা সম্ভব সবই জানার চেষ্টা করবে।"
চন্দন মাথা নাড়ল। বুঝতে পেরেছে। বলল, "আপনি যে রকম ফিরিস্তি দিচ্ছেন—একদিনে কি এত কাজ করা যাবে !"
"একদিনে হবে কেন ? দু-তিনদিন যদি লাগে—তোমাকে ঘুরে-ফিরে এই কাজটা করতে হবে। ইট্‌ ইজ মোস্ট ইমপর্টেন্ট।"
"এত সময় পাব কেমন করে স্যার ?...ভদ্রলোক আপনাকে পাড়ার লোকের কথা বলেননি ?"

"বলেছেন দু-চারজনের কথা। আমি ওঁকে বলেছিলাম—আপনি আমাদের নামগুলো দিন,যারা বাবলুকে সেদিন সকালে দেখেছে। তা ছাড়া ওর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওর থিয়েটারের দলের নাম-ঠিকানা দিন।"

"দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, কাল বাবলুর জেঠতুতো ভাই কাবলু এসেছিল। সে একটা লিস্টি দিয়ে গিয়েছে।" বলতে-বলতে কিকিরা তাঁর ছোট টেবিলটা দেখালেন। "ওখানে ড্রয়ারের মধ্যে কাগজটা আছে। নিয়ে যেয়ো।"

বগলা চা নিয়ে এল।

চা এগিয়ে দিয়ে চলে গেল বগলা। জানলা দিয়ে মাঝে-মাঝে দু-এক দমক ভিজে বাতাস আসছিল। পাখা চলছে।

চা খেতে-খেতে তারাপদ হঠাৎ বলল, "কিকিরা স্যার, আপনার এই ক্যাটালগের যা বহর ! যেমন ছাপা, তেমনই কাগজ। একেবারে রদ্দি।'

"ওগুলো ওইকমই হয়," কিকিরা বললেন, "বাজারে বিলি করার জন্যে নয়, নিজেদের জন্যে..."

"প্রাইভেট ইউজ।"

"হ্যাঁ।"

"এই ক্যাটালগের শেষের দিকে একটা রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ আছে দেখেছেন ? খুব অস্পষ্ট। ভাল করে কালি লাগিয়ে ছাপ মারা হয়নি।"

"দেখেছি।"

"এর মানে কী স্যার ? রাবার স্ট্যাম্পের ছাপে ইংরেজিতে লেখা BOXY & Co, বক্সিটা কী ?" তারাপদ বলল, "ধর্মতলা স্ট্রিটের ঠিকানা।"

কিকিরা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "মানে বক্সি কোম্পানি।"

"বক্সি কোম্পানি। বাঙালি ! তা হলে এরকম অদ্ভুত বানান BOXY কেন ?"

কিকিরা মুচকি হাসলেন। "সেকালের সাহেবি কেতা। তখনকার দিনে কেউ-কেউ এরকম করত, সাদামাটা নামধামকে একটু ইংলিশ কায়দায় সাজাত। কেন, তুমি বোনার্জি শোনোনি ? ব্যানার্জি হত বোনার্জি, পাল হত পল্। দাঁ হত ডন্, পালিত হত পলিট।"

তারাপদ কপালে হাত দিয়ে বলল, "সাংঘাতিক। বক্সি হল BOXY ! ভাবা যায় না।'

"তারাবাবু, একে বলে রেওয়াজ। সেকালের কোনো-কোনো ব্যবসাদার এরকম করত, কোম্পানির কদর বাড়াবার জন্যে। বক্সি কোম্পানি ছিল পুরনো ওয়াচ ডিলার।"

"তাই নাকি ? কে বলল ?"

"সুরবাবু। সুরবাবুর বাবার আমলে ধর্মতলা স্ট্রিটে বক্সি কোম্পানির দোকান

ছিল।”

“আচ্ছা।”

“আচ্ছা নয়। ধর্মতলা স্ট্রিট তখন আজকের দিনের ধর্মতলা নয়। তখন ওটা সাহেব-মেমসাহেবদের মার্কেটিং করার জায়গা। বড়-বড় নামকরা দোকান ছিল। বুঝলে।”

“বুঝলাম। অবশ্য স্যার, আমার তো মনে হয় না, আপনি সেই ওল্ড ধর্মতলা দেখেছেন ?” ঠাট্টা করেই বলল তারাপদ।

“আমি কোথ্ থেকে দেখব হে ! শ'বছর আগের কথা। তা ছাড়া আমি বাপু বাইরের লোক। আমার বাপ-ঠাকুর্দাও দেখেননি।

“গপ্প শুনেছেন !”

“তা শুনেছি।...যাক সে-কথা। ওই BOXY থেকে একটা ধোঁকা লাগছে।”

“মানে ?”

“বাবলুর ফক্স, অক্স, বক্স-এর বক্সের সঙ্গে এই BOXY-র কোনো সম্পর্ক আছে কিনা কে জানে !”

তারাপদ চমকে উঠল। চন্দনও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বললেন, “ক্যাটালগটা সুরবাবুদের নয়। সুরবাবুদের ব্যবসা পৈতৃক হলেও তাঁরা ওয়াচ ডিলার নন। ক্যাটালগটা বক্সি কোম্পানির কাছ থেকে তাঁদের হাতে এসেছিল। বোধ হয় সুরবাবুর বাবার আমলে। দোকানে পড়ে ছিল ধুলোর মধ্যে।”

“বক্সি কোম্পানি এখন নেই ?”

“না। কোনকালে উঠে গিয়েছে।”

“তা হলে ?”

“বক্সিদের মেজো ছেলে, এন্টালি বাজারের দিকে থাকেন। সুরবাবুর চেনাজানা। ভদ্রলোকের বয়েস ষাট-বাষট্টি। এখন ওঁদের ব্যবসা ইলেকট্রিকাল গুড্স-এর।”

“আপনি স্যার সব খবরই নিয়ে ফেলেছেন !”

“সুরবাবুর সঙ্গে গপ্প করতে-করতে নিয়ে ফেললাম। আসলে ওই রাবার স্ট্যাম্পের ছাপে BOXY না দেখলে হয়ত অত খোঁজ নিতাম না। কী জানি, ওটা আমারও চোখে লেগে গেল। খোঁজ নিলাম।”

চন্দন সিগারেট বার করল। মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছি। দু-চার টান ধোঁয়া দরকার। বলল, “আপনি কীভাবে এগুতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না, স্যার। আমাদের কাজ বাবলুর খোঁজ করা, ঘড়ি আর ফক্স, বক্স নিয়ে আমরা কী করব ?”

কিকিরা বললেন, “ওই ঘড়ির সঙ্গে বাবলুর নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্পর্ক আছে।

আমার তাই মনে হয়।"

তারাপদ বলল, "কিন্তু কিকিরা, ঘড়ি নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে গিয়ে সময় নষ্ট করলে যদি বাবলুর কিছু হয়ে যায়! অবশ্য তার যে কিছু হয়নি এতদিনে—তাই বা আমরা জানছি কেমন করে?"

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, "ভগবান করুন, ছেলেটার কিছু না হয়। তবে তারা, তেমন কিছু খারাপ হলে এতদিনে জানা যেত।"

"স্যার, এটা কলকাতা শহর। এখানে সব কিছু জানার উপায় থাকে না।"

চন্দন বলল, "বাবলুকে খুঁজে বার করাই আমাদের আগে দরকার।"

কিকিরা কোনো জবাব দিলেন না।

খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল।

তারাপদর খেয়াল হল হঠাৎ। বলল, "কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়নি আর?"

"হয়েছে। গত পরশু এসেছিলেন। কাল ওঁকে ফোন করেছিলাম বাড়িতে।"

"নতুন কিছু জানতে পারলেন?"

"ওই ভদ্রলোক—কুকুর নিয়ে সেদিন সকালে যিনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কথা শুনলাম।"

"কে তিনি?"

"রাজেন সিন্‌হা। নিউ কামার। সবেই ওই পাড়ায় এসেছেন। কৃষ্ণকান্তবাবুদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন ভদ্রলোক। পাড়ার লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বিশেষ একটা হয়নি। বাড়িতে একাই থাকেন। কাজের একটা লোক আছে পুরনো।"

"কী করেন?"

"তা কাজকর্ম করেন বইকি! কলকাতার একটা মাঝারি হোটেলের ম্যানেজার। আধা-আধি মালিকও হতে পারেন।"

"এখানকারই লোক?"

"বলতে পারছি না।"

"সিন্‌হার সঙ্গে বাবলুর কেসের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"এমনিতে তো মনে হয়, না। তবে কৃষ্ণকান্তবাবু বললেন তিনি পাড়ার লোক—যারা সেদিন থেকে লেকে বেড়াতে বেরিয়েছিল ভোরবেলায়—তাদের মধ্যে দু-একজন সিন্‌হার সঙ্গে বাবলুকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছে।"

চন্দন বলল, "কোথায় দেখেছে?"

"রোয়িং ক্লাবের দিকে।"

কী ভেবে চন্দন বলল, "সাসপেক্ট করার মতন কারণ নেই, তবু খোঁজ করতে হবে।"

কিকিরা মুচকি হাসলেন।

৪

বাবলুদের নাটকের দলের দুটি ছেলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিল তারাপদ।

প্রথম ছেলেটিকে তার দোকানেই পেয়ে গেল।

গড়িয়াহাটের কাছকাছি ছোট্ট একটা দোকান ছেলেটির। বইপত্র বিক্রি করে। হাত কয়েকের ঘর। বুক স্টলের মতনই দেখতে। মোটামুটি সাজানো। বাংলা বই-ই বেশি, কিছু ম্যাগাজিনও রয়েছে।

দোকানে ভিড় ছিল না। দু-একটা খদ্দের।

তারাপদকে খদ্দের ভেবে কিছু বলতে যাচ্ছিল ছেলেটি, তারাপদ মাথা নাড়ল। বলল, "আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে এসেছি, ভাই। প্রাইভেট।"

"আমার সঙ্গে প্রাইভেট কথা! কোথ্ থেকে আসছেন?" ছেলেটি অবাক হয়ে বলল। তারপরই কী ভেবে বলল আবার, "আমাদের গ্রুপের কেউ পাঠিয়েছে? কল্ শো বুকিং?"

"না। আমি কৃষ্ণকান্তবাবুর কাছ থেকে আসছি।"

"মেসোমশাই! বাবলুর বাবা?"

"হ্যাঁ।"

কী যেন ভাবল ছেলেটি। তারাপদকে দেখল খুঁটিয়ে। "একটু ওয়েট করুন।"

খদ্দের দু'জন বিদায় হলে ছেলেটি তারাপদকে বলল, "বসুন। বাইরে টুলে বসবেন? ভেতরেও আসতে পারেন।"

ছোট কাউন্টারের ওপাশে বসার জায়গা নামমাত্র। তারাপদ বাইরে একটা টুলের ওপরই বসল। "বাইরেই বসি। আমার নাম তারাপদ।"

"আমার নাম পবন। পবন গোস্বামী।"

"জানি। নাম জেনেই তো এসেছি।"

"বলুন, কী বলবেন?"

"আমরা বাবলুর খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছি।"

পবন তাকিয়ে থাকল। "পুলিশের লোক! লালবাজার থেকে আসছেন।"

"না," তারাপদ মাথা নাড়ল। হাসল। "লালবাজার নয়, পুলিশও নয়।"

পবন অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখল তারাপদকে। "তা হলে?"

"প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশান।"

"প্রাইভেট ডিকেটটিভ ?"

তারাপদ মজার মুখ করে হাসল। "না, তাও ঠিক নয়। আমাদের একজন মাথাঅলা আছেন। বস্ বলতে পারেন। তিনি প্রাইভেটলি কিছু কাজ করেন। আমরা তাঁর লোক।"

"কী নাম বসের ?"

"কিকিরা।"

"কিকিরা—কি-কি-রা ! অদ্ভুত নাম। বাঙালি, না, জাপানি ?"

তারাপদ হেসে ফেলল। "বাঙালি। পুরো নাম কিঙ্কর কিশোর রায়। ছোট করে কিকিরা।"

পবন এবার মজা পেয়ে গিয়েছিল যেন। বলল, "দারুণ নাম, দাদা।"

"ভাই, আমি কয়েকটা কথা জানতে এসেছি। যদি আমায় বিশ্বাস করে বলেন, বলবেন। আর যদি অবিশ্বাস করেন, বলবেন না ; আমি ফিরে যাব।"

"আরে না না, অবিশ্বাস করব কেন ! আমি কখনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখিনি তো, তাই অবাক হচ্ছিলাম। বাবলু আমাদের ছোট ভাইয়ের মতন। আমরা সবাই তাকে ভালবাসি। জানেন, আমরা ঘটনাটা জানার পর থেকে নিজেরাই তার কত খোঁজ করছি। মেসোমশাইয়ের কাছেও গিয়েছিলাম আমরা।...অদ্ভুত ব্যাপার, দাদা। একটা ছেলে বেমালুম উধাও হয়ে গেল ! কেন হল ? কেন তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না !"

"সেটাই তো কথা। আমরা..."

"চা খাবেন ?'

"খেতে পারি।"

পবন দোকানের বাইরে এসে গলা চড়িয়ে কাকে যেন হাঁক মারল। চায়ের কথা বলল চেঁচিয়ে। ফিরে এসে আবার দোকানে ঢুকল।

"আমাদের ভয় হয়, বাবলুকে কেউ খুনটুন করল কিনা !"

"খু-ন ? খুন করবে কেন ?"

"জানি না। কলকাতায় রোজই দু-চারটে খুনখারাবি হয়। কাগজে দেখি।"

"মিছেমিছি খুন করবে ! কারণ নেই, তবু !"

"কী জানি !"

"যাক গে, সে পরের কথা।...আচ্ছা, আপনি কবে বাবলুকে শেষ দেখেছেন ?"

"কেন, আগের দিনই দেখেছি ; ও বেপাত্তা হওয়ার আগের দিন। সন্ধের দিকে এই দোকানে এসেছিল। সাতটা নাগাদ ও চলে গেল। বলল, ধীরাজদার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে যাবে।"

"ধীরাজদা—"

"আমাদের গ্রুপের সেক্রেটারি। কাঁকুলিয়ায় থাকেন।"

তারাপদর কাছে যে চার-পাঁচজনের নামের লিস্ট আছে—বাবলুদের গ্রুপের ছেলেছোকরা, বন্ধু বাবলুর—তার মধ্যে ধীরাজের নাম আছে। নামটা তারাপদর মনে পড়ল।

পবন বলল, "দাদা, এই একই কথা আমি মেসোমশাইকে বলেছি। পুলিশের একজন খোঁজে এসেছিলেন—তাঁকেও বলেছি। একই কথা কতবার বলব।"

তারাপদর নিজেরই যেন খারাপ লাগছে বলতে, তবু সে নাচার—এমন গলা করে বলল, "না ভাই, ব্যাপার তা নয় ; আমাদের সব জানা নেই তাই জিজ্ঞেস করছি। ডোন্ট মাইন্ড।...তা ইয়ে, বাবলু এখানে অনেকক্ষণ ছিল ?"

"ঘণ্টাখানেকের বেশিই হবে। আড্ডা দিল।"

"ও এখানে আড্ডা মারতে আসে ? তাই না ?"

"আসে। বন্ধুরা অনেকেই আসে।"

"আচ্ছা, সেদিন ওকে কেমন দেখাচ্ছিল ? মানে অন্যদিনের তুলনায়।"

"বরাবর যেমন দেখায়।"

"এমন কোনো কথা বলেছিল যাতে মনে হয় ওর...মানে আমি বলতে চাইছি, বাবলুর মুখে আপনি কোনো নতুন কথা শুনেছিলেন ?"

"মনে পড়ছে না। নতুন কী বলবে ?"

"বাবলু আপনাকে কিছু দেখিয়েছিল ? বা বলেছিল ?"

"কী দেখাবে ?"

"কিছুই দেখায়নি ? পুরনো একটা ঘড়ি ? পকেট ঘড়ি ?"

পবন হঠাৎ মনে করতে পারল। বলল, "না, ঘড়িটড়ি দেখায়নি। তবে আগের দিন কথায়-কথায় বলছিল, ওদের কাছে বাড়িতে একটা সোনার ঘড়ি আছে। দারুণ দেখতে। ঘড়ির ওপর যে ঢাকনাটা আছে, সেটার ওপর কাজ করা। তাতে মুখের ছবি আছে। মুখগুলো তাসের রাজা-রানীর মুখের মতন দেখতে। চারপাশে গোল-করা লতাপাতার নকশা।"

চা এল। ছোট-ছোট কাপ। দুধ কম। গুঁড়ো ভাসছে চায়ের। ছেলেটা চা দিয়ে চলে গেল।

তারাপদ যেন সাধারণভাবেই কথা বলছে, বেশি আগ্রহ দেখাল না, চঞ্চলতাও নয়, বলল, "আগের দিন মানে ? আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার আগের দিন ?"

পবন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।' এমন সময় এক মহিলা এলেন। কী একটা বইয়ের খোঁজ করলেন। পবনের কাছে ছিল না। তিনি চলে গেলেন।

তারাপদ বলল, "তা হঠাৎ সেদিন ঘড়ির কথা উঠল কেন ?"

পবন বলল, "সে এক মজা হয়েছিল ! সেদিন আমাদের গ্রুপের ক্লাবে সন্ধের সময় আড্ডা হচ্ছিল। আমি গিয়ে হাজির। খবরের কাগজের ওপর মুড়ি-বাদাম

ছড়িয়ে মুড়ি খাওয়া চলছে। ভাঁড়ের চা। মুড়ি যে শেষ, হঠাৎ কে যে কাগজটার দিকে তাকিয়ে বলল, আরে দ্যাখ, একটা ঘড়ির জন্যে কেমন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে !"

"বিজ্ঞাপন ?"

"হ্যাঁ। ইংরিজি খবরের কাগজ, তাতে একপাশে রুল দিয়ে ঘেরা একটা বড় মতন বিজ্ঞাপন। এক ভদ্রলোক পুরনো এক ঘড়ির খোঁজ করছেন। লিখেছেন, ঘড়িটার জন্যে ভাল দাম দেওয়া হবে।"

"কার বিজ্ঞাপন ? ঠিকানা ?"

"তা জানি না। আমি বিজ্ঞাপনটা দেখিনি। ওরা কেউ-কেউ দেখল। মজা করল। তখন বাবলু বলল, তাদের বাড়িতে একটা দারুণ পুরনো সোনার ঘড়ি আছে। পকেট ঘড়ি। তার ঠাকুরদার।"

চা খেতে-খেতে তারাপদ বলল, "ঘড়িটা কেমন দেখতে, তাও বলল !"

"হ্যাঁ। নয়ত আমরা জানব কেমন করে ?"

"তা তো বটেই !...আচ্ছা ভাই, সেই খবরের কাগজটা কি বাবলু নিয়ে নিল ?"

পবন সামান্য ভেবে বলল, "তা বলতে পারব না। আমি বেশিক্ষণ ছিলাম না। ওরা ছিল। ধীরাজদা, সুব্রত, বঙ্কিম...।"

তারাপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, বাবলু তো ভাল ছেলে। স্বভাব-টভাব—"

"কী বলছেন আপনি ! বাবলু ভীষণ ভাল ছেলে ! ওর স্বভাব দারুণ।"

"আপনার আর কিছু মনে পড়ছে ?"

পবন মাথা নাড়তে-নাড়তে হঠাৎ কী মনে পড়ায় বলল, "ও যেদিন আমার দোকানে এল, সেদিন কথায়-কথায় একটা জায়গার নাম বলল। জিজ্ঞেস করল, আমি জানি কিনা ! আমি না বললাম।"

"কী নাম ? কলকাতার মধ্যে ?"

"কলকাতা—। না, কলকাতার মধ্যে বোধ হয় নয়। বাইরে হবে, মফস্বল। তবে কলকাতাতেই কত জায়গা। কে তার খোঁজ রাখে !...কী যেন বলল নামটা ? 'জ' দিয়ে হবে ! নাকি, 'ব' দিয়ে ? উঁহু, মনে পড়ছে না।"

"একটু চেষ্টা করুন ভাই।"

"মনেই পড়ছে না।"

"ঠিক আছে, আমি পরে আসব, যদি আপনার মনে পড়ে ! আজ আর বসব না, আমায় এক জায়গায় যেতে হবে। তার আগে একবার আপনাদের ধীরাজদাদের সঙ্গে দেখা করে যাই। পাব তো তাঁকে এ সময় ?"

"ধীরাজদাকে আজ পাবেন না। ধীরাজদা কলকাতায় নেই, খড়্গপুর গিয়েছে, বাড়িতে। মায়ের অসুখ। পরশু নাগাদ পাবেন।"

"আজ উঠি," তারাপদ উঠে পড়ল। সে এখন গোলপার্কের কাছে **একটা** জায়গায় যাবে, চন্দনের সেখানে অপেক্ষা করার কথা।

দোকান থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে তারাপদ বলল, "আপনার কী মনে হয় ? বাবলুকে কেউ জোর করে তুলে নিয়ে যেতে পারে রাস্তা থেকে ?"

পবন মাথা নাড়ল। "একলা কেউ পারবে না, সাধারণ মানুষ হলে। হিন্দি ছবির পাক্কা গুণ্ডা বদমাশ হলে পারতে পারে।" পবন একটু হাসল। বলল, "বাবলু দারুণ দৌড়তে পারে, গায়ে জোর আছে, তা ছাড়া ও কিছুদিন ক্যারাটেও শিখেছিল। ওকে চট করে কাবু করা মুশকিল।"

তারাপদ তার ঘড়ি দেখল। আর দেরি করা যায় না।

চন্দন ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করছিল।

তারাপদ এসে বলল, "কীরে ! তোর খবর কী ? কিছু জানতে পারলি ?"

চন্দন বলল, "বন্ধুর সঙ্গে সেই বিকেল থেকে লেগে থাকলাম। দেখাও করলাম দু-তিনজনের সঙ্গে। সবাই বলল, বাবলুকে তারা লেকে দেখেছে। চোখে পড়েছে। কেউ আগে দেখেছে, কেউ পরে। মোট কথা, বাবলু যে সেদিন জগিং করছিল, সেটা ঠিকই।"

"আর ওই ভদ্রলোকের খোঁজ নিতে পেরেছিস ?...রাজেন সিন্‌হা ?"

"চল্‌, বলছি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে।"

"চায়ের দোকানে বসবি ?"

"না, বাড়ি ফিরব। কোয়ার্টারে। চল, ট্যাক্সি নিই।"

কাছাকাছি ট্যাক্সি পেয়ে গেল চন্দন।

ধুলোর ঘূর্ণি উঠল হঠাৎ। ট্যাক্সিতে উঠে জানলার কাচ বন্ধ করল চন্দন। রুমালে চোখ-মুখ মুছতে-মুছতে বলল, "বিকেলের আগে এসেছি, আর এখন ক'টা বাজল ?"

"সাতটা বেজে গিয়েছে।"

ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছিল। গড়িয়াহাট হয়েই সোজা যাবে। পার্ক সার্কাস ময়দান হয়ে সি আই টি রোড, তারপর মৌলালি ধরবে।

"তোর বন্ধুকে বাড়িতে পেলি ?" তারাপদ বলল।

"হ্যাঁ। বলা ছিল আগেই। বিদ্যুৎ পাঁচটা থেকে চেম্বার করে যোধপুর পার্কে। আজ ওর দেরি হল। ছ'টায় বসবে।"

ধুলোর ঘূর্ণি কেটে গিয়েছে। জানলার কাচ নামিয়ে দিতে দিতে চন্দন বলল, "বাবলুকে সেদিন সকালে লেকের কাছে যাঁরা দেখেছেন—তাঁদের একজন হলেন নিরাপদ চ্যাটার্জি। সত্তরের মতন বয়েস। রিটায়ার্ড প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি রোজই মর্নিং ওয়াক করেন। অন্য ভদ্রলোক হলেন সজল দত্ত। এঁরও বয়েস হয়েছে। খবরের কাগজের অফিসে পঁয়ত্রিশ বছর প্রেস

ম্যানেজারি করেছেন। তিন নম্বর ভদ্রলোকের নাম মধুময় সরকার। বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু হাই ব্লাড সুগার। ডাক্তার রোজ সকালে হাঁটতে বলেছে, জোরে-জোরে! এই তিনজনের সঙ্গেই আমার দেখা করিয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ। দু'জনকে বাড়িতেই পেয়ে গিয়েছিলাম। মধুময়কে পেলাম রাস্তায়। অফিস থেকে ফিরছেন।"

"কোনো ক্লু— ?"

"কিস্যু না। নাথিং। বাবলুকে এঁরা দেখেছেন, এই পর্যন্ত।"

"রাজেন সিন্‌হা ?"

"দেখা হয়নি। তবে ইনফরমেশান পেলাম কিছু।"

"কী ?"

"সিন্‌হা সাহেব নাকি একসময় আন্দামানে ছিলেন। জাহাজেও কাজ করেছেন। পরে ভদ্রলোক মাদ্রাজে চলে আসেন। সেখান থেকে কলকাতায়।"

"কোথাকার লোক ?"

"বলেন, এইদিককার। চব্বিশ পরগনার।"

"হোটেল ম্যানেজারি— ?"

"আন্দামান থেকেই। মাদ্রাজে বছরখানেক। তারপর কলকাতা।"

"এখন যে হোটেলের ম্যানেজারি করেন, সেটার তিনি শুধুই ম্যানেজার ? না, মালিকও ?"

"হাফ্ মালিক হতে পারেন। কিংবা পার্টনার ?"

"আর কিছু ?"

"পাড়ায় নতুন এসেছেন। ফ্যামিলি বলে কিছু নেই। কাজের লোক একজন, আর ওই কুকুর। কুকুরটার জাত বোঝা যায় না। বাঘের মতন লম্বা-চওড়া। তবে ভীষণ ট্রেন্‌ড। মনিবের হুকুম মতন চলে।"

"রাস্তায় দু-চারটেকে কামড়ে দিলেই হুকুম মেনে চলা বেরিয়ে যাবে।"

"মুখ গার্ড করা থাকে। কামড়াবার চান্স নেই।"

তারাপদ বুঝতে পারল, চাঁদুর বিকেলটাই বৃথা গিয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাবলুকে সেদিন সকালে লেকে দেখা গিয়েছে এটা কোনো নতুন খবর নয়। আর সিন্‌হা সাহেবের ব্যাপারেও মামুলি খবর যা পাওয়া গিয়েছে—তাতেও কাজের কাজ হয়নি কিছু।

"দে, একটা সিগারেট দে।" চন্দন সিগারেট চাইল।

ট্যাক্সি পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে পৌঁছে গেল।

সিগারেট ধরিয়ে হতাশ গলায় চন্দন বলল, "তুই কিছু জানতে পারলি ?"

"পারলাম। তবে—"

"বল, শুনি।"

তারাপদ পবনের সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত বলতে লাগল।

চন্দন মন দিয়ে শুনল। শেষে কী ভেবে বলল, "তারা, ঘড়িটা একটা বড় ফ্যাক্টার মনে হচ্ছে। না কিরে?"

"বুঝতে পারছি না! ঘড়ি নিয়ে একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে। তবে বাবলু তো সেদিন ঘড়িটা পবনকে দেখায়নি। হয়ত সঙ্গে ছিল না।"

"সন্ধেবেলায় ছিল না। পরের দিন সকালে দৌড়তে যাওয়ার সময়ই বা পকেট ঘড়ি সঙ্গে থাকবে কেন?"

তারাপদ পাঁচ কথা ভাবতে-ভাবতে বলল, "আমার কিছু মাথায় ঢুকছে না।"

"হবে না। বুঝলি! বাবলু-কেস সল্‌ভ করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা—তাই বা কে জানে!"

৫

বক্‌সি কোম্পানির মেজোবাবু ননী বক্‌সি—মানে ননীলাল বক্‌সিকে পেতে অসুবিধে হল না। এন্টালি বাজারের কাছাকাছি তাঁর বাড়ি।

ননী বক্‌সির চেহারা, সাজপোশাকের মধ্যে পুরনো কলকাতার বনেদিয়ানার একটা ছাপ যেন আছে। ভদ্রলোকের বয়েস পঁয়ষট্টির কাছাকাছি হবে। স্বাস্থ্য এখন ততটা মজবুত নয়, তবু বোঝা যায় একসময় স্বাস্থ্যবানই ছিলেন। গায়ের রং ফরসা। প্রায়-গোল মুখ। মাথার মাঝখানে সিঁথি। সব চুলই সাদা। পরনে ভাল লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, গেঞ্জির বুকের কাছে বোতাম। ভদ্রলোক পান-জরদার ভক্ত।

কিকিরা খবর দিয়ে গিয়েছিলেন।

নিচের বৈঠকখানা ঘরে কিকিরাদের বসিয়ে ননী বক্‌সি বললেন, "বসুন, সুর আমায় লোক পাঠিয়েছিল। চিঠি দিয়ে।"

কিকিরার সঙ্গে তারাপদ ছিল।

কিকিরা বললেন, "ভেবেছিলাম, দোকানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। শুনলাম, আপনি দোকানে যাচ্ছেন না।"

"শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বয়েস হয়েছে। প্রেশারের গোলমাল। মাঝে-মাঝেই যাই; ইচ্ছে না হলে যাই না। ছেলেরাই কারবার দেখে। আমি ওপর-ওপর।"

কিকিরা একটু হেসে বললেন, "ওপর-ওপরটাই কী কম বক্‌সিমশাই। মাথা না থাকলে শুধু ধড় কি কাজ করে!"

ননী বক্‌সি হাসলেন। তারপর বললেন, "বলুন, আমি কী করতে পারি?"

অল্প অপেক্ষা করে কিকিরা বললেন, "সুরবাবু কি চিঠিতে আমার পরিচয় আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। জানিয়েছে খানিকটা।"

"আমি আপনার কাছে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।"

"বলুন?"

"আপনার বাবার আমলে যে ঘড়ির দোকান ছিল সেই দোকানে আপনি আসা-যাওয়া করতেন?"

"করতাম বইকি! আমাদের ঘড়ির দোকান হয়েছিল উনিশ শো এক সালে। নাইনটিন হানড্রেড ওয়ান। আমাদের দোকানের বেশ নাম ছিল তখন বড়-বড় কোম্পানির ঘড়ি রাখতাম। রেয়ার ঘড়িও। রিপেয়ারিং হত।"

"আপনারা তো কোম্পানির নাম রেখেছিলেন Boxy & Co?"

"হ্যাঁ।"

"Boxy লিখতেন কেন?

"বাবা লিখতেন। তখনকার দিনে এরকম চল। বাবা বরাবরই নিজের নামের উপাধি ইংরিজিতে BOXY লিখতেন। আমাদের স্কুলের খাতায় BAKSHI লেখা হত।"

"আপনি ঠিক কোন বয়েস থেকে দোকানে যেতেন?"

"আমার জন্ম নাইনটিন থারটিতে। আমার দাদা ছিল আমার চেয়ে তিন বছরের বড়। আমি মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়তাম। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই মাঝে-মাঝে দোকানে যেতাম। এমনি বেড়াতে। মানে যুদ্ধের সময়। কলকাতায় যখন জাপানি বোমা পড়ল, আমরা ক'জন আমাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে ছিলাম। বাবা কলকাতায় থাকতেন।"

"আপনাদের দেশের বাড়ি কোথায়?"

"বর্ধমানের এক গ্রামে। জিরেনপুর।"

তারপর কানে লাগল কথাটা। বাবলু না 'জ' দিয়ে একটা জায়গার কথা বলেছিল পবনকে। 'জ' বা 'ব' হতে পারে বলেছিল। অবশ্য সঠিকভাবে নয়। সে কিকিরার দিকে তাকাল। কিকিরা তারাপদর মুখে শুনেছেন সবই।

কিকিরা একটুও চঞ্চল হলেন না।

ননী বক্‌সি নিজেই বললেন, "যুদ্ধটুদ্ধ থামল। একদিন আমিও স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ঢুকলাম। কিন্তু কলেজটা শেষ করতে পারলাম না। বাবা মারা গেলেন। দাদা হঠাৎ ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। আগে থাকতেন বিন্ধ্যাচলের দিকে। পরে কাশী। শেষে কাটোয়ার দিকে আশ্রম করেছিলেন। সেখানেই দেহরক্ষা করেন।" ননী বক্‌সি একটু থামলেন। নিজেই আবার বললেন, "আমাদের ফ্যামিলিতে একটা অভিশাপ নেমে এল। বাবা যাওয়ার পর-পরই। বাবা গেলেন, মা চলে গেলেন, দাদা সংসার ছাড়ল, দিবু—আমার ছোট ভাই গয়ায় তর্পণ করতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে ডুবে গেল।"

কিকিরা শুনলেন কথাগুলো। কী আর বলবেন! সহানুভূতি জানাতেও

কেমন যেন লাগে !

সামান্য সময় চুপচাপ থাকার পর কিকিরা বললেন, "আমি একটা ঘড়ির খোঁজ করছি। পুরনো ঘড়ি। আপনি কি বলতে পারেন ?"

"বাবার ঘড়ির ব্যবসা আমি নিজে বড় একটা দেখতাম না। সে-বয়েসেও হয়নি। পরে তো দোকানই উঠে গেল। তবু বলুন, কোন ঘড়ির খোঁজ করছেন ?"

"সোনার ঘড়ি। সুইস মেড। পকেট ঘড়ি।"

ননী বক্‌সি রীতিমতন অবাক ! তাকিয়ে থাকলেন। "সোনার পকেট ঘড়ি ! ক্যানটন ?"

"ক্যানটন ?"

"ঘড়ির নাম ক্যানটন। ক্যানটন গোল্ড। এ ঘড়ির কথা আপনারা কোথ্ থেকে জানলেন ? শ'খানেক বছর আগেকার মডেল। বাবার মুখে শুনেছি।"

কিকিরা আর তারাপদ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কিকিরা বললেন, "বক্‌সিদা, আপনি নিজে এই ঘড়ি দেখেছেন ?"

"আলবাত দেখেছি। অমন জিনিস দেখা যায় না। রেয়ার ঘড়ি। সারা পৃথিবীতে মাত্র পাঁচটা ক্যানটন গোল্ড পাওয়া গিয়েছিল। ওই ঘড়ি নিয়ে গল্প আছে।"

"কী গল্প ?"

"কোনো কোটি-কোটিপতি এক ইটালিয়ান অর্ডার দিয়ে ক্যানটন গোল্ড তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু ঘড়ি নেওয়ার আগেই মারা যান। পরে যে চারজন বিদেশি ধনী ওই ঘড়ি কিনেছিলেন তার একজন জাহাজডুবি হয়ে মারা যান, একজন পাহাড় থেকে খাদে পড়ে গিয়ে মারা যান। বাকি দু'জনের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করেন নিজের মাথায় পিস্তল চালিয়ে, অন্যজনের প্রাণ যায় বুনো জন্তুর হাতে পড়ে।"

"এ তো গল্প !"

"তা হতে পারে। হয়ত দু-একজন সত্যি-সত্যি মারা গিয়েছিল, বাকিগুলো বানানো গল্প। তবে এটা ঠিক, ক্যানটন গোল্ড রেয়ার ঘড়ি। ভেরি রেয়ার।"

কিকিরা বললেন, "ওই ঘড়ি নিজের চোখে আপনি দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"একটু বলবেন কেমন দেখতে ?"

ননী বক্‌সি চোখ বন্ধ করে যেন মনে করতে লাগলেন ঘড়ির কথা।

বাড়ির ভেতর থেকে চা, মিষ্টি এল।

"নিন, একটু চা খান—" ননী বক্‌সি বললেন, "ঘড়িটার কাঁটা সোনার। দাগগুলো রোমান নম্বর। ডায়াল প্লেট ব্রাইট অ্যান্ড কালারফুল। আলাদা কম্পাস আছে। সেকেন্ডের কাঁটা ছিল না। বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছিল।"

"আপনি দেখেননি ?"

"না। ঘড়ির ওপর কভার ছিল। ডালা। সব পকেট ঘড়িতেই থাকত তখন। ডালাটা দেখতে সুন্দর। অতি চমৎকার। চারপাশে এনগ্রেভিং। ডিজাইন। মাঝখানে দুটো মাথা। ডালা—কভারের পেছনদিকে কোম্পানির নাম। আরও কী-কী খোদাই করা ছিল। মনে পড়ছে না। ...তবে হ্যাঁ। পেছনদিকে বাবাও আমাদের কোম্পানির নাম স্যাকরাকে দিয়ে খোদাই করিয়ে নিয়েছিলেন।"

"BOXY & CO?"

"হ্যাঁ।"

"ঘড়িটা আপনারা পেলেন কেমন করে, কিছু জানেন ?"

"ভাল জানি না। বাবার মুখে শুনেছি একজন সেলার—মানে জাহাজি সাহেব—ঘড়িটা বেচে দিয়ে যায় দোকানে।"

"বলেন কী ! অমন সোনার ঘড়ি—"

"আরে মশাই, জাহাজ থেকে অমন চুরিচামারি করা জিনিস সেলাররা নেশার ঘোরে কতই বিক্রি করে দিয়ে যেত।"

"কত দামে কিনেছিলেন আপনারা বাবা ? জানেন ?"

"না। তবে সাহেব-বেটা হয়ত ওটাকে ক্যারেট গোল্ড ভেবেছিল, তাই বেশি দাম হাঁকতে পারেনি। তবু তখনকার দিনেই হাজার কয়েক টাকা তো নিয়েছিল নিশ্চয়।"

চা খাওয়ার ফাঁকেই কিকিরা বললেন, "আপনার বাবা কি ক্যানটন ঘড়ির কথা জানতেন ?"

"বাবা অনেক রেয়ার ঘড়ির খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর ব্যবসাও ছিল রেয়ার ঘড়ি বিক্রি করা। তবে, ওই ঘড়িটার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজখবর পরে নিয়েছেন বলেই আমার মনে হয়।"

"ঘড়িটার শেষপর্যন্ত কী হল ? বিক্রি হয়ে গেল ?" তারাপদ হঠাৎ বলল।

ননী বক্সি মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, তা আর হল কোথায় ! আমরা যখন কলকাতায় বোমা পড়ার সময় দেশের বাড়িতে পালিয়ে যাই, তখন বাবা কয়েকটা রেয়ার ঘড়ি আমাদের সঙ্গে সরিয়ে ফেলেন। ভেবেছিলেন, বোমাটোমা পড়ে কলকাতার কী হবে কেউ তো জানে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কয়েকটা সরিয়ে ফেলেন। ঘড়িটা আমাদের কাছেই ছিল দেশের বাড়িতে। শেষে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে একদিন চুরি হয়ে গেল।"

"দেশের বাড়ি থেকে ?"

"হ্যাঁ। চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত তখন গাঁ-গ্রামে। রোজই এটাসেটা যায় এর-ওর বাড়ি থেকে। আমাদেরও গেল।"

কিকিরা চা-খাওয়া শেষ করে বললেন, "ও-রকম একটা রেয়ার ঘড়ি চলে

গেল, আপনারা খোঁজখবর করেননি ?"

"বাবা নিশ্চয় করেছিলেন। লাভ হয়নি।" ননী বক্‌সি পান-জরদা মুখে দিলেন। পানের ডিবে এগিয়ে দিলেন কিকিরার দিকে। "তা মশাই, আপনারা হঠাৎ এই ঘড়ির খোঁজখবর করতে এসেছেন কেন—তা তো বললেন না !"

কিকিরা পানের ভক্ত নন। তবু একটা পান নিলেন। বললেন, "কেন এলাম শুনতে চাইলে আপনাকে অনেক কথা বলতে হয়।"

"বলুন, শুনি। আপত্তি আছে ?"

"না, না।"

কিকিরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণকান্তর কথা বললেন। বাবলুর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় পুরো বিবরণ জানালেন।

ননী বক্‌সি অবাক হয়ে কিকিরার কথা শুনছিলেন। দু-একবার জিজ্ঞেসও করলেন এ-কথা সে-কথা।

কিকিরার কথা শেষ হল। তিনজনেই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে ননী বক্‌সি বললেন, "ঘড়িটার ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওটা আমাদেরই ঘড়ি। ওরকম দ্বিতীয় ঘড়ি অন্য কারও কাছে ছিল বলে আমি জানি না, মশাই।...তবু, আমি একজনের খবর দেব, আপনি একবার সেখানে খোঁজ করে দেখুন।" বলে পান চিবোতে-চিবোতে জড়ানো জিভে ননী বক্‌সি বললেন, "আমি এক জুয়েলারকে দেখেছি। বাবার কাছে আসতেন। বাবা যখন অসুস্থ, বাইরে বেরোতে পারেন না, তখনো তিনি বাবাকে দেখতে আসতেন। এঁরা সে-সময় বড় জুয়েলার ছিলেন। অবাঙালি, ফতেচাঁদ জুরাভাই। কলকাতার বনেদি বাড়ির অনেকের সঙ্গে কারবার ছিল। ভদ্রলোক বাবার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিলেন। বাবাকে 'দাদাজি' বলতেন। বাংলা বলতে পারতেন পরিষ্কার। ফতেচাঁদবাবুর কাছেও দামি ঘড়ি থাকত। খবর রাখতেন।...ওঁর দোকান ছিল লালবাজারের কাছে। বাড়ি ভবানীপুরে। উনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা জানি না। যদি বেঁচে থাকেন, একেবারেই বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। আশির ওপর তো হবেই। উনি বেঁচে থাকলে আপনারা হয়ত কিছু জানতে পারেন।"

কিকিরা মন দিয়ে বক্‌সিবাবুর কথা শুনছিলেন। "ভবানীপুরে কোথায় বাড়ি ?"

"রাস্তার নাম জানি না। জগুবাবুর বাজারের আশেপাশে থাকতেন।...দোকানেই খোঁজ করে দেখুন না ! সেটা সহজ হবে।"

"দোকান আছে তো ?"

মাথা নাড়তে-নাড়তে ননী বক্‌সি বললেন, "তা বলতে পারব না। পুরনো জুয়েলাররা অনেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে শুনি।"

তারাপদ উসখুস করছিল। তার মনে হচ্ছিল, এবার উঠে পড়া ভাল। নতুন

করে আর কিছু জানার নেই।

কিকিরা উঠি-উঠি ভাব করে বললেন, "আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করলাম। কী করব বলুন, একটা জোয়ান ছেলে বাড়ি থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ। মা-বাবার মনের অবস্থা বুঝতেই পারেন!"

"পারি বইকি, ভায়া। কলকাতা শহরটাও তো আজকাল ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কিকিরা উঠে পড়লেন। তারপর আচমকা বললেন, "ঘড়িটার দাম এখন কত হতে পারে, বক্সিদা? ওই রেয়ার সোনার ঘড়িটার?"

ননী বক্সি তাকিয়ে থাকলেন কয়েক পলক। পরে বললেন, "বলতে পারব না। আমার কোনো আইডিয়া নেই। শখের জিনিস কিনে টাকা নষ্ট করবে, এমন লোক এখন কোথায়?"

"সোনা... ?"

"ওতে আর কতটুকু সোনা আছে! বিদেশি হলেও পাকা সোনা হবে বলে মনে হয় না। আমাদের হিসেবে ভরি তিনেক হতে পারে। কিন্তু মশাই জুয়েলগুলো কস্টলি।"

"আচ্ছা, চলি...! পরে একদিন আসব গল্পগুজব করতে। আপনি ভাল থাকুন।" কিকিরা নমস্কার করে বেরিয়ে আসছিলেন, ননী বক্সীর কথায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ননী বক্সি বললেন, "ছেলেটির খোঁজ পেলে আমায় জানাবেন। একটা ফোন করলেও হবে। আমাদের ফোন নম্বর..." বলে উনি বাড়ির ফোন নম্বর জানালেন।

বাইরে এসে কিকিরা তাঁর চুরুট ধরালেন। মুখে কথা নেই। হাঁটতে লাগলেন। সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন।

তারাপদও পাশে-পাশে হাঁটছিল কিকিরার। অনেকক্ষণ পরে বলল, "স্যার, এ তো বড় ঝামেলায় পড়া গেল! ঘড়ি চুলোয় যাক। বাবলুর একটা খবর যদি পেতাম!"

কিকিরা বললেন, "পেলে তো ভালই হত। কিন্তু ঘড়ি বাদ দিয়ে বাবলুকে কি পাওয়া যাবে! যাবে না।"

"আমি বুঝতে পারছি না, ওই ঘড়ি নিয়ে বাবলু কী করবে?" ধরে নিলাম, ঘড়িটা বেচে দিলে পাঁচ-দশ হাজার টাকা সে পেতে পারে। কিন্তু বাবলু বেচবে কেন? আর পাঁচ-সাত হাজার টাকা ওর বাবার কাছে কিছুই নয়।...যদি বাবলুর টাকার দরকারই হত, মা-বাবার কাছেই পেতে পারত।"

কিকিরা ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "পাঁচ-সাত কি দশ হাজারের ব্যাপার নয়, তারাবাবু।" মাথা নাড়লেন কিকিরা। তারপরই কী মনে

করে বললেন, "আমি কৃষ্ণকান্তবাবুকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি ঘড়ির কথা। তিনি একই কথা বলেন, তাঁর বাবার ঘড়ি। অচল। স্মৃতি হিসেবে বাড়িতে পড়ে ছিল। ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। বাবলুর জেঠামশাই—বাবলুর বাবার সঙ্গেও চারু অ্যাভিনিউর বাড়িতে আমি দেখা করেছি। তিনিও ঘড়ি নিয়ে গরজ দেখালেন না। ওঁরও সেই একই কথা, বাবার ঘড়ি, কৃষ্ণ রেখে দিয়েছিল স্মৃতি হিসেবে।"

"তবে?"

"আমার মনে হয়, বাবলুর বাবা-জেঠা—ঘড়িটার ভেতরের কথা জানেন না। হয় জানেন না, না হয় জানতে চান না। প্রথমটাই হয়ত ঠিক।"

"বাবা-জেঠা জানেন না, বাবলু জানতে পারল! এটা কেমন করে হয়?"

"বলতে পারব না। কোনোরকমে জেনেছে।"

"আপনি সেটা ভাবতে পারেন। কিন্তু কেমন করে জেনেছে, কার কাছ থেকে জেনেছে, ধরবেন কেমন করে!"

অন্যমনস্কভাবে কিকিরা বললেন, "দেখি।...ভাল কথা, টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে আমি একটা ফক্স পেয়েছি।"

তারাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে বলল, 'ফক্স?"

"ফক্স অ্যান্ড মল্লিক।"

"অদ্ভুত! কিসের কোম্পানি?"

"জানি না। লেখা নেই। ডালহাউসির দিকে অফিস। স্ট্র্যান্ড রোড।"

তারাপদর কেমন হাসি পেয়ে গেল। বলল, "স্যার, আপনি BOXY থেকে বক্স পেলেন। আবার ফক্সও পেলেন দেখছি।" ফক্স যখন পেয়ে গেলেন, একটা অক্সও পেয়ে যেতে পারেন।"

কিকিরা হাসলেন না। বললেন, "হাসবার কিছু নেই, তারাবাবু; এরকম তুমি অনেক পাবে। আগে সাহেবসুবোর ব্যবসা ছিল, পরে দিশিবাবুরা ব্যবসা কিনে নিয়েছে। কিন্তু ওই যাকে গুড উইল বলে, পুরনো কোম্পানির গুড উইলটা কাজে লাগায়। আমার মনে হয় এটাও তাই।...কাজে লাগুক না লাগুক কাল-পরশু একবার ফক্স অ্যান্ড মল্লিকের খোঁজ করতে হবে।"

তারাপদ চুপ করেই থাকল।

৬

কৃষ্ণকান্ত দুপুরে তাঁর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অফিসে ছিলেন। এটিই তাঁর আদি অফিস, বাড়িতে যে-অফিস আছে সেটি অনেকটা ব্যক্তিগত।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের নানা অফিসের ভিড়ে কৃষ্ণকান্তর অফিসকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার উপায় নেই। তেতলা পুরনো এক বাড়ির দোতলায় অন্য

দু-তিনটি অফিসঘরের একপাশে কৃষ্ণকান্তর দু' কামরার অফিস।

কিকিরা এসেছিলেন দেখা করতে।

কাঠের পার্টিশান করা ঘরের মধ্যে কৃষ্ণকান্তর মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছিল। ঘরে তাঁরা মাত্র দু'জন। পাশের ঘর থেকে সাড়া-শব্দ আসছিল। অফিসের কাজকর্ম চলছে।

কৃষ্ণকান্তকে যেন আরও শুকনো, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। চিন্তায়-চিন্তায় চোখের তলা কালচে হয়ে গিয়েছে, দৃষ্টি হতাশ, অন্যমনস্ক। গায়ের জামাটাও আধ-ময়লা, কোঁচকানো। কোনো ব্যাপারেই গা নেই, উৎসাহ নেই মানুষটির। অফিসেও এসেছেন যেন আসতে হয় বলে, বা নিজেকে খানিকক্ষণ ভুলিয়ে রাখার জন্য।

সামান্য কথাবার্তার পর কিকিরা বললেন, "পুলিশ থেকে আর কোনো খবর পেলেন না?"

মাথা নাড়লেন কৃষ্ণকান্ত। "না। ওরা মশাই এখন আমাকেই চার্জ করছে। বলছে, ছেলের সম্পর্কে আপনি কারেক্ট ইনফরমেশন দেননি। ছেলের খোঁজখবরও ভাল করে রাখতেন বলে মনে হয় না। আপনার ছেলে খুব ভাল ছিল কে বলল আপনাকে! আজকাল এইসব ছোকরা ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে কেমন দহরম মহরম করে—জানেন আপনি?"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী!"

"কী আর বলব, রায়মশাই। আমার ছেলেকে আমি চিনলুম না, ওরা চিনে ফেলল! পুলিশের কথা থেকে মনে হল, ওরা মনে করছে—বাবলু নিজেই গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ওদের কথায়, যে-কোনো অ্যাডাল্ট যদি নিজে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চায় এই কলকাতা শহরে, তবে পুলিশের সাধ্য কী—তাকে খুঁজে বার করা!"

"বলল?"

"হ্যাঁ। ...আমি বললাম, তা হলে আপনারা ক্রিমিন্যালদের খোঁজ করেন কেমন করে? ওরা বলল, ক্রিমিন্যালদের কথা আলাদা। তাদের ঠিকুজি আমাদের কাছে থাকে। খোঁজ রাখি। আপনার ছেলে কি ক্রিমিন্যাল! ...এ-সব শুনে আমি আর কী বলব বলুন! চুপ করে গেলুম।"

কিকিরা একটু সময় চুপ করে থাকলেন। অন্যমনস্কভাবে অফিসঘরের চারপাশে তাকালেন। মামুলি অফিস। টেবিল, দু' তিনটি চেয়ার, ফোন, ক্যালেন্ডার, দুটো বাড়ির ছবি, লোহার আলমারির মাথায় একরাশ কাগজ, গোল করে পাকানো, বোধ হয় ঘরবাড়ির প্ল্যান।

কিকিরা বললেন, "আমি দু-একটা কথা জানতে এসেছি।"

"বলুন। আর নতুন কী জানাব, রায়বাবু!"

"আপনি বক্‌সি কোম্পানির নাম শুনেছেন? বক্‌সি বানানটাই ইংরিজিতে

BOXY বলে লেখা !"

"বক্সি কোম্পানি ! বক্সি তো অনেক আছে। ...আমি ব্যবসায়ী মানুষ, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়—তার মধ্যে বক্সিও আছে। এক বক্সি আমার কনস্ট্রাকশানের কাজে লোহার ছড় সাপ্লাই করে। কে. বক্সি কোম্পানি। আরেকজন আমার কাছেই কাজ করে। সুপারভাইজ করে।"

"আমি BOXY —বি ও এক্স ওয়াই দিয়ে BOXY বলছি।"

"না।"

"আপনাদের বাড়িতে যে সোনার ঘড়িটা ছিল, তার ওপরকার ডালার তলায় যে বক্সি কোম্পানির নাম খোদাই করা ছিল... ! সেই বক্সি। দেখেননি ?"

কৃষ্ণকান্ত অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক পলক। পরে বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি। কেন বলুন তো ?"

"বক্সি বানানটা খেয়াল আছে ?"

"আছে। আপনি যা বলছেন—সেইরকমই। BOXY। তবে ওটা যে আমাদের বক্সি—"

"কোম্পানির নামের তলায় ঠিকানা ছিল ধর্মতলা স্ট্রিটের ?"

"ছিল। তবে শুধু ধর্মতলা ছিল। ক্যালকাটা। একেবারে খুদে-খুদে হরফে।"

"ওই কোম্পানির কাউকে আপনি চিনতেন ?"

"না।"

"ননী বক্সি ?"

"না।"

"কোনোদিন সেই দোকানের খোঁজও করেননি ?"

"না, মশাই ! কী জন্যে খোঁজ করব !"

কিকিরা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। আজ বড় গুমোট, সকাল থেকেই। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে জল হয়ে যাচ্ছে। মুখ মুছতে-মুছতে কিকিরা বললেন, "আচ্ছা কৃষ্ণকান্তবাবু, আপনার কি একবারও ইচ্ছে হয়নি, আপনার বাবার স্মৃতি হিসেবে যে-ঘড়িটা তুলে রেখে দিয়েছিলেন, সেটা একবার সারাবার চেষ্টা করা ! হাজার হোক ঘড়িটা তো সুন্দর। দামি।"

মাথা নেড়ে কৃষ্ণকান্ত বললেন, "না মশাই, মনে হয়নি। কী হবে সারিয়ে ? কেই বা সারতে পারবে ! লাভের মধ্যে যা আছে তাও থাকবে না। সারাবার হলে বাবাই সারাতেন। ...আপনি বার বার আমায় ঘড়ির কথা বলছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সোনার ঘড়ি হলেও বাবার স্মৃতি হিসেবেই আমরা ওটা রেখে দিয়েছিলাম। অন্য কিছু মনে হয়নি।"

কিকিরা জল খেতে চাইলেন।

জল আনতে বললেন কৃষ্ণকান্ত বেয়ারাকে ডেকে।

"ঘড়ির কথা আমি বারবার তুলছি কেন জানেন— ?" কিকিরা বললেন, "আমার বিশ্বাস ওই ঘড়ির জন্যেই বাবলুর কিছু হয়েছে। বাবলুর বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ আর ঘড়িটা হঠাৎ খোয়া যাওয়া—একই সঙ্গে—এই দুটোর মধ্যে বড় সম্পর্ক রয়েছে। ...যাক গে, আপনি কি জানেন আপনার বাবা কবে ঘড়িটা কিনেছিলেন ?"

"না, মনে নেই।"

"বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন আগে ?"

"কেমন করে বলব ! আমার তখন কতটুকু বয়েস। বড়জোর দু' তিন বছর। দাদা আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। দাদাও বলতে পারবে না।"

জল এল।

কিকিরা জল খেলেন। কৃষ্ণকান্ত সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার এগিয়ে দিলেন কিকিরাকে।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কিকিরা বললেন, "ওই ঘড়ির যারা মালিক ছিল—বক্‌সি কোম্পানি, তাদের নাম জোগাড় করতে আমায় কষ্ট করতে হয়েছে। ভাগ্য ভাল, পেয়ে গেলাম। বক্‌সিদের দোকান কবেই উঠে গিয়েছে। মালিকের মেজো ছেলে ননী বক্‌সি এখনো আছেন। বয়েস হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। কথা হল। শুনলাম, ঘড়িটা একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ সাল নাগাদ ওঁদের গ্রামের বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল। ওঁরা তখন কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। ইভ্যাকুয়ি হিসেবে।" বলে কিকিরা পুরো ঘটনাটাই বললেন কৃষ্ণকান্তকে।

কৃষ্ণকান্ত শুনলেন। মনে হল না, তিনি এ-সব কথা আগে শুনেছেন। শেষে বললেন, "আমার বাবাকে নিশ্চয় আপনারা চোর ঠাওরাবেন না !"

কিকিরা জিব কেটে বললেন, "ছি, ছি, এ আপনি কী বলছেন ! ...চোরাই জিনিস কবে কার হাত-ফেরতা হয়ে একসময় যদি আপনার বাবার হাতে এসে থাকে, তিনি কিনেছিলেন। এতে দোষ কোথায় !"

"বাবা বেঁচে থাকলে এ-ব্যাপারে যা বলার বলতে পারতেন। আমি কিছু জানি না, কী বলব !"

"যাক গে, বাদ দিন ও-কথা। আচ্ছা মশাই, আপনি তো ঘরবাড়ি কনস্ট্রাকশানের কাজ করেন। আমায় একটা কথা বলুন। ফক্স অ্যান্ড মল্লিক বলে একটা কোম্পানি আছে। আমি আজ সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই আপনার কাছে আসছি। ওখানে গিয়ে খোঁজখবর করে শুনলাম, ওরা কলকাতার পুরনো ঘরবাড়ি ভাঙার পর ভাঙা বাড়ির দরজা, জানলা, টালি, মার্বেল, কাচ, বাথরুমের ফিটিংস..."

"হ্যাঁ।" কিকিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই কৃষ্ণকান্ত বললেন, "জানি। ওরা—যাকে আমরা সাহেববাড়ি বলি, সেই সব বাড়ি ভাঙার পর

দরকারি যা কিছু কিনে নেয়। কলকাতার আশেপাশেও এমন বাড়ি আছে। আবার পুরনো বনেদি বাড়ি ভাঙার পরও নানা জিনিস কেনে। আসবাব, আয়না, ঝাড়—অনেক কিছু।"

"নিলামে কেনে ?"

"সবসময় নয়। সরাসরিও কিনতে পারে। ওরা খোঁজ রাখে। এটাই ওদের কারবার। ওদের এজেন্টও থাকে। সত্যি বলতে কী, পুরনো ভাঙা বাড়ির কাঠকুটোর বাজার দর বেশ চড়া। কেন হবে না বলুন ! এখন ওসব কাঠ আপনি পাবেন কোথায় ! কোথায় পাবেন ইটালিয়ান মার্বেল, জয়পুরি টালি।"

কৃষ্ণকান্ত নিজে এবার একটা সিগারেট ধরালেন। কথা বলতে-বলতে হয়ত আনকার মতন একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন। নিজেই আবার বললেন, "আমার এক ক্লায়েন্ট তাঁর বাড়ির অর্ধেক জিনিসপত্র এইভাবে কিনেছিলেন। একটা বাথটব পেয়েছিলেন ফুট পাঁচেক লম্বা, অ্যানামাল, যাকে বলে পালাই-করা—সেই জিনিস। ড্যামেজ সামান্যই। কী দেখতে !"

"আপনিও বাড়ির কাজে এ-সব কেনেন ?"

"না, আমি কিনি না। ক্লায়েন্ট যদি কিনে আনেন, আমরা কাজে লাগাবার মতন করে নিই। অন্তত কাঠটা দরজা-জানলার কাজে লাগাই। টালিও নিই বেছেবুছে।"

"ও ! ...আপনি ওই ফক্স মল্লিকদের কাউকে চেনেন ?"

"না। ওদের নাম জানি। পুরনো কোম্পানি। আগে বোধ হয় ওদের নাম ছিল ফক্স অ্যান্ড কলিন্স। পরে নাম পালটেছে।"

"বাবলুর সঙ্গে মল্লিকবাড়ির কারও ভাবসাব ছিল ?"

কৃষ্ণকান্ত যেন কথাটা শুনতেই পাননি। বোকার মতন তাকিয়ে থাকলেন। পরে বললেন, "বাবলুর সঙ্গে ভাবসাব ! তা কেমন করে হবে ! আমি নিজেই যাদের চিনি না, বাবলু তাদের কেমন করে চিনবে ?"

কিকিরা হেসে বললেন, "তা কেন হবে না ! আপনি না চিনতে পারেন, তা বলে বাবলু চিনবে না ! তার বন্ধুবান্ধব, চেনাজানা ছেলে, কলেজের ছেলেদের আপনি কি সবাইকে চেনেন !"

কৃষ্ণকান্ত চুপ করে থাকলেন। কথাটা ঠিকই। বাবলুর সঙ্গীসাথীদের ক'জনকেই বা তিনি চেনেন ! চুপ করে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বললেন, "ওরা থাকে কোথায় ? বাড়ি কোথায় মল্লিকদের ?"

"মুদিয়ালি।"

"তাই নাকি ! ..তবে তো আমাদের বাড়ি থেকে দূরে নয় !"

"না। আমার ওদিকে আসা-যাওয়া নেই। কমই চিনি। টালিগঞ্জ রেল ব্রিজ অবশ্য চিনি।"

"ও-বাড়ির কোনো ছেলে কি বাবলুর বন্ধু ?"

"সেটা এখনই বলতে পারছি না। তবে, বাবলু যেদিন যে-সময় থেকে ঘরছাড়া, ঠিক সেদিন সেই সময় ওই লেকের কাছে বড় রাস্তায় একটা গাড়ি একটি ছেলেকে ধাক্কা মেরে পালায়। ছেলেটি মল্লিকদের পাশের বাড়ির। বেচারি জখম হয়েছে। হাত ভেঙেছে, পায়ে চোট। তার চেয়েও বড় কথা, ছিটকে পড়ে গিয়ে মুখে এমন লেগেছে যে, গালের চোয়ালের হাড় ফেটে গিয়েছে। বেচারি নার্সিংহোমে পড়ে আছে আজ ক'দিন। কপাল ভাল, মাথাটা বেঁচে গিয়েছে।"

কৃষ্ণকান্ত কেমন হতবাক ! "আপনাকে এ-সব কথা কে বলল ?"

"আমি তো আপনাকে আগেই বললাম, এখানে আসার আগে আমি মল্লিকদের অফিসে গিয়েছিলাম। আলাপ করে কথাবার্তা বলতে-বলতে ঘটনাটার কথা শুনলাম।"

"আপনি বাবলুর কথা বলেছেন ?"

"বলেছি। ওঁরা কাগজেও দেখেছেন নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনটা। কিন্তু এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে ভাবেননি। তা ছাড়া ওঁদের কেউ বাবলুকে চেনেন না। দেখেছেন বলেও মনে করতে পারলেন না।"

কৃষ্ণকান্ত সিগারেটের টুকরোটা নিভিয়ে দিয়ে মাথায় হাত দিলেন। অল্পসময় চুপচাপ। পরে বললেন, "ছেলেটি এখন কেমন আছে ?"

"আগের চেয়ে ভাল।" বলে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। "এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা—তা এখনই বলতে পারছি না কৃষ্ণকান্তবাবু ! থাকলে আমি বলব, বাবলুকে কেউ বা কারা তুলে নিয়ে গিয়েছে। ...দেখি, খোঁজ নিই। আচ্ছা চলি !"

৭

সন্ধেবেলায় কিকিরার ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল।

কিকিরা যেমন সারা দুপুর স্ট্র্যান্ড রোডের ফক্স অ্যান্ড মল্লিকদের অফিস ঘুরে কৃষ্ণকান্তর কাছে গিয়েছিলেন, তারাপদও তার অফিস থেকে মাঝ দুপুরে বেরিয়ে লালবাজারের কাছে ফতেচাঁদ জুয়েলারের খোঁজ করেছে। কোনো লাভ হয়নি তারাপদর ; ফতেচাঁদের দোকান আর নেই, অনেক আগেই উঠে গিয়েছে। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শুধু এইমাত্র জানা গেল যে, বাবুজি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলেরা কারবার গুটিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছেন।

তারাপদ বলল, "স্যার, ফতেচাঁদের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দিন।"

কিকিরা যে খুব কিছু আশা করেছিলেন ফতেচাঁদদের কাছ থেকে, তা নয়। তবু দু' এক কথা যদি জানা যেত, খারাপ হত না। আসলে এই ধরনের কাজই হল, কোথাও কোনো গন্ধ পেলে শুঁকে বেড়ানো। কিকিরা ঠাট্টা করে বলেন,

দ্যাখো হে তারা আর স্যান্ডেল উড—সেই যে কথা আছে— যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই— পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন.... ।

কথাবার্তার মধ্যে একসময় কিকিরা বললেন, "এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবলুকে সেদিন কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিড্‌ন্যাপ.... !"

চন্দন বলল, "কীভাবে ?"

তারাপদ বলল, "কিকিরা, বাবলুর বন্ধু পবন যা বলেছিল তাতে মনে হয়, ওকে ঝপ করে তুলে নিয়ে যাওয়া সহজ কর্ম নয়। বাবলুর স্বাস্থ্য ভাল, স্পোর্টসম্যান, ক্যারাটের প্যাঁচ-পয়জার জানে একটু-আধটু.."

কিকিরা বললেন, "সবই ঠিক। তবু ধরো কেউ যদি আচমকা তাকে ধরে অজ্ঞানটজ্ঞান করে..."

কিকিরার কথা শেষ হতে দিল না চন্দন, বলল, "শুনুন স্যার, অত সহজে কাউকে অজ্ঞান করা যায় না। ওই যে আমরা গল্পের বইয়ে পড়ি, রাস্তাঘাটে ভিড়ের মধ্যে কেউ রুমালে ক্লোরোফর্ম ঢেলে একজনের মুখের কাছে চেপে ধরতেই সে সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গেল, তা কিন্তু হয় না বাস্তবে। এর অনেক অসুবিধে আছে। ... তবে হ্যাঁ, দু-তিনজনে মিলে একটা লোকের হাত, পা, মাথা চেপে ধরেছে, তাকে নড়তে দিচ্ছে না, অন্য-একজন তার মুখের কাছে ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল জোরসে চেপে ধরল, তবে লোকটা অজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন এ-ভাবে ক্লোরোফর্ম অ্যাপ্লাই করা ভীষণ রিস্কি। এতে মানুষ মারাও যেতে পারে। এভরি চান্স।"

কিকিরা শুনলেন, বললেন, "চাঁদু, তুমি ডাক্তার ; তোমার কথা মানলাম। কিন্তু ধরো দু-চারজনের একটা গ্যাঙ— বাবলুকে বাগে পেয়ে কাছাকাছি একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে হাত-মুখ চেপে ধরে অজ্ঞান করার চেষ্টা করে —তবে ?"

"করতে পারে," চন্দন বলল।

"আর সেই গাড়ি পালাবার সময় রাস্তার মধ্যে কাউকে ধাক্কা মেরে পালায় ?"

"পালাতে পারে। ... আপনি কি ওই মল্লিকদের প্রতিবেশী ছেলেটির কথা বলছেন ?"

"ভাবছি। দুটো ঘটনাই ঘটেছে একই দিনে, মোটামুটি একই সময়ে, আর কাছাকাছি জায়গায়।"

তারাপদ কান চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "বাবলু আর জখম-হওয়া ছেলেটির মধ্যে জানাশোনা ছিল বলে তো আপনি কোনো প্রমাণ পাননি।"

"না," মাথা নাড়লেন কিকিরা, "এখনো পাইনি। হয়ত জানাশোনা ছিলও না। তাতে কিন্তু এ-কথা প্রমাণ হয় না যে, ছেলেটি কিছু দেখেনি ? ধরো সে কিছু দেখেছে ? বা তার নজরে পড়েছে ?"

"আপনি কি বলতে চান, রাস্তা থেকে একটা ছেলের কিছু নজরে পড়েছিল বলে গাড়িটা তাকে চাপা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল ?"

"না, তা হয়ত নয়। পালাতে গিয়েও ধাক্কা মারতে পারে। ছেলেটির সঙ্গে দেখা না করলে আমরা তা জানতে পারছি না।"

চন্দন বলল, "ওদের বাড়ির লোক আমাদের দেখা করতে দেবে ছেলেটির সঙ্গে ? তার ওপর সে এখন নার্সিং হোমে।"

"দেবে। মল্লিকদের বড় ভাই মানুষটি ভাল। আমি তাঁর কাছে কিছুই লুকোইনি। কেমন করে তাঁদের কোম্পানির নাম পেলাম, কেনই বা ফক্স নিয়ে মাথা ঘামালাম, সবই বলেছি। বাবলুর কথা বলেছি। তার মা, বাবা, বোনের কথা। বলেছি, ওঁরা দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনায় প্রায় মরে আছেন। কোনো ভাবে, যে কোনো লোকের কাছ থেকে একটু সাহায্য পেলে যদি আমাদের সামান্য উপকার হয়—" কিকিরা কথা শেষ না করে হাই তুললেন। তাঁকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। নিজেই আবার বললেন, "ভদ্রলোককে আমার খুবই সিমপ্যাথেটিক মনে হল। হাজার হোক, তিনিও তো ছেলের বাবা।"

"ওঁর কোনো ছেলে কি পাশের বাড়ির জখম-হওয়া ছেলেটির বন্ধু ?"

"ছোট ছেলের বন্ধু।"

"চলুন, তবে দেখা করতে যাই," চন্দন বলল।

"ভাবছি, কাল যাব। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে।... তুমি আমি যাব নার্সিং হোমে, আর তারাপদ যাবে বাবলুদের ড্রামা ক্লাবের সেক্রেটারি ধীরাজের কাছে।"

"ধীরাজ খড়্গপুর থেকে ফিরলে তো ?" তারাপদ বলল।

"এখনো ফেরেনি ? কতদিন গিয়ে বসে থাকবে খড়্গপুরে ?"

"দেখি। মা-র অসুখ শুনে বাড়ি গিয়েছে। ফিরেছে কিনা কে জানে! খোঁজ করব।"

সামান্য সময় চুপচাপ। পাখার শব্দ, নিচে থেকে ভেসে আসা টুকরো-টাকরা অস্পষ্ট কথা, বড় রাস্তায় গাড়ির হর্ন কানে আসছিল।

চন্দন হঠাৎ বলল, "আচ্ছা কিকিরা, আপনি ঘড়ির ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ভেবেছেন কিছু ?"

"না," মাথা নাড়লেন কিকিরা, "দু-একবার ভাববার চেষ্টা করেছি। পারিনি। মাথার মধ্যে ঘড়িটাই টিকটিক করছে।"

"ওটা অচল ঘড়ি। টিকটিক করবে না," চন্দন ঠাট্টা করেই বলল।

কিকিরা আবার হাই তুললেন। "ভেরি মাচ টায়ার্ড হে! এই বয়েসে রোদে এত ঘোরাঘুরি পোষায়! ...কী বলছিলে! ঘড়ির কথা! না, ঘড়ি বাদ দিলে বাবলুর হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না। ঘড়ি মাস্ট।"

"বেশ, ঘড়ি মাস্ট। কিন্তু আপনি বলুন, একটা অচল ঘড়ি, হোক না সোনার, তবু সেটা এমন কী লক্ষ টাকা দাম যে, তার জন্যে..."

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না চাঁদু। সোনার ঘড়ি বলেই তার দাম

আজকের বাজারেও লক্ষ টাকা নয়। হতে পারে না। রেয়ার ঘড়ি হলেও অত দাম হবে বলে আমার মনে হয় না। আমি আমার জুয়েলার বন্ধু দত্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে সোনার যে হিসেব দিল তাতে মনে হয়, অল গোল্ড হলেও, ওই ঘড়িতে আড়াই-তিন ভরির বেশি সোনা থাকার কথা নয়। হাজার পনেরো টাকা হতে পারে বড়জোর এখনকার বাজার দরে। তবে সোনার সঙ্গে পান না মিশিয়ে এ-কাজ করা যায় না। বিদেশি ব্যাপার, তাও অনেক পুরনো। ওরা কীভাবে করেছিল, কে বলতে পারে!"

তারাপদ বলল, "সবই হল কিকিরা, শুধু একজনের কাছে এখনো যাওয়া হয়নি।"

"কে? সিন্‌হাসাহেব! হোটেল ম্যানেজার?"

"হ্যাঁ। ওই ভদ্রলোক আর বাবলু সেদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন। ওঁর কাছে যাওয়া উচিত একবার।"

"যাব। ...আগে, মল্লিকদের পাড়ার ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে নিই একবার।"

তারাপদ আর কিছু বলল না।

৮

মল্লিকদের পাশের বাড়ির ছেলেটির নাম বিষ্ণু। বছর কুড়ি একুশ বয়েস। বাবলুর সমবয়েসিই হবে। ছেলেটিকে দেখতে বেশ। ছিপছিপে গড়ন। মাথার চুল কোঁকড়ানো। সামান্য কটা রঙের চোখের মণি। গায়ের রংটি ধবধবে ফরসা।

নার্সিং হোমের এক সরু মতন কেবিনে সে শুয়ে ছিল। ডান চোয়ালে থুতনির দিকে জখম হয়েছিল তার; মাথার দিক থেকে পাক মেরে মুখ-চোয়াল জড়িয়ে ব্যান্ডেজ। ডান হাতের হাড় ভেঙেছে। প্লাস্টার করা। পায়ের দিকেও অল্পস্বল্প জখম।

বিষ্ণু এখন অনেকটাই ভাল। দু'-চারদিনের মধ্যে নার্সিং হোম থেকে ছেড়ে দেবে। বাড়ি চলে যাবে বিষ্ণু। তবে তার চিকিৎসা এখনো চলবে। মাসখানেকের কম তো নয়ই।

বিষ্ণুর বাড়ির লোকজনরা চলে গেলেন। একটু তাড়াতাড়িই আজ। বিষ্ণুর বাবাই তাদের সরিয়ে দিলেন। তারপর কিকিরা আর চন্দনকে ছেলের কেবিনে ডেকে আনলেন। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন মল্লিকমশাই বিষ্ণুর বাবাকে বলে। ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে আসার পরও কিকিরারা কিছুক্ষণ থাকতে পারবেন, অসুবিধে হবে না।

ছেলেকে বলে রেখেছিলেন ভদ্রলোক আগেই, শুধু পরিচয় করিয়ে দিলেন

কিকিরার সঙ্গে।

কিকিরা কিছু ফুল এনেছিলেন হাতে করে। রাখলেন। নরম মুখ করে দেখলেন বিষ্ণুকে। চন্দন যেন খুঁটিয়ে দেখে নিল ছেলেটিকে। আন্দাজ করে নিল কী ধরনের চোট-জখম হতে পারে বিষ্ণুর।

কিকিরা বিষ্ণুর বাবাকে বসতে বললেন।

"আপনারা?"

"বসব। আপনি চেয়ারটায় বসুন। আমি টুলটা টেনে নিচ্ছি। চন্দন বিছানাতেই বসতে পারবে।"

বিষ্ণুর বাবা নিজেই ছেলের বিছানায় বসলেন। "আপনারা বসুন। আমি এখানেই বসলাম।"

কিকিরারা বসলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "ওর কথা বলতে কষ্ট হয়। আগে তো মুখ নাড়তেই পারছিল না। এখন পারছে। যা জিজ্ঞেস করার অল্প কথায় করবেন। আপনাদের সব কথা বলতে হবে না, আমি আপনাদের কথা মল্লিকদের মুখে শুনে ওকে বলে রেখেছি। শুধু আপনাদের যা জানার, জেনে নিন।"

কিকিরা বললেন, "ভালই করেছেন। আমরা সামান্য ক'টা কথা জেনেই চলে যাব।"

বিষ্ণু তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা বিষ্ণুকে বললেন, "সেদিন তুমি কী দেখেছিলে একটু বলতে পারবে?"

বিষ্ণু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "বলছি।" কথা বলতে তার কষ্টই হচ্ছিল। ভাল করে মুখ নাড়তে পারছে না। তবু থেমে-থেমে, মাঝে-মাঝে ব্যথার দরুন কষ্টের মুখ করে যা বলল তাতে বোঝা গেল, সেদিন সকালে সে রোজকার মতন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছিল। সে ফুটবল প্লেয়ার। সকালে ঘণ্টাখানেক ছোটাছুটি, প্র্যাকটিস করে। সে যখন প্রায় স্টেডিয়ামের কাছাকাছি পৌঁছেছে, তখন দেখে একটি ছেলেকে দু-তিনজনে মিলে ঠেলতে-ঠেলতে এনে একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

"কী গাড়ি?"

"মারুতি ভ্যান।"

"রং?"

"কালচে মতন। নেভি ব্লু হবে।"

"নম্বর?"

"জানি না। দেখার কথা মনে হয়নি।"

"যাকে ঠেলতে-ঠেলতে আনছিল তার পোশাকআশাক?"

"ট্র্যাকসুট পরা।"

"হঠাৎ ঠেলতে-ঠেলতে এনে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ?"

"না, না,— মানে, আগে তো আমি নজর করিনি। খেয়ালও করিনি। আমার মনে হল, ট্র্যাকসুট-পরা ছেলেটির পাশে-পাশে, পেছনে ওরাও জগিং করছিল। আচমকা তারা ওকে ঘিরে ফেলে, তারপর ঠেলে নিয়ে কাছের গাড়িতে তুলে দেয়।"

"তুমি একেবারে ঠিক যা দেখেছ তাই বলছ ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ছেলেটি যখন ছুটছিল তখন পাশ থেকে বা পেছন থেকে অন্য দু'জনের কেউ তাকে ল্যাং মেরেছিল, বা পুশ করেছিল। ছেলেটি হোঁচট খাওয়ার মতন মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছিল, তখন তাকে ওরা ধরে ফেলে। তারপর গাড়ির দিকে..."

"বুঝেছি।... তুমি ছেলেটিকে চেনো ?"

"না। তবে তাকে আমি মাঝে-মাঝে ওদিকে দৌড়তে দেখেছি।"

"তোমাকে ওই গাড়িঅলারা ধাক্কা মারল কেন ?"

"জানি না। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের দেখছিলাম। ... শেষে এক-দু'বার চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ওরা গাড়ির মুখ ঘুরিয়েই রেখেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে পালাল। যে গাড়ি চালাচ্ছিল, সে হয় আনাড়ি, না হয় তাড়াতাড়ির মধ্যে পালাতে গিয়ে আমায় ধাক্কা মেরেছে।"

"তারপর ?"

"আমি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়লাম। ... আর আমার কিছু মনে নেই।"

বেশ কষ্ট করেই কথাগুলো বলছিল বিষ্ণু। কথাও স্পষ্ট নয়। জড়িয়ে যাচ্ছে।

বিষ্ণুর বাবা তাকালেন। যেন বলতে চাইলেন, আর নয়— এবার শেষ করুন।

কিকিরা মাথা নাড়লেন। হ্যাঁ, তাঁরা উঠে পড়বেন এবার। চন্দনের দিকে তাকালেন কিকিরা।

চন্দন কী ভেবে বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করল, "ঘটনাটা যখন ঘটে আশেপাশে লোক ছিল না ?"

"অত ভোরে ওখানে লোক কমই থাকে। তফাতে ছিল নিশ্চয় দু-একজন। নজর করেনি। করলেও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। হঠাৎ চোখে পড়লে মনে হবে, ছেলেটি হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে দৌড়তে- দৌড়তে— তাকে অন্যরা তুলে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছে কোথাও।"

"গাড়িটার জানলা... ?"

"বন্ধ ছিল।"

"কাছাকাছি কোনো ভদ্রলোক কি কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ?"

"লক্ষ করিনি।"

"গাড়িটা কোন্ দিকে গেল ?"

"সোজা বেরিয়ে গেল। যেটুকু চোখে পড়েছিল মনে হল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের দিকে।"

কিকিরা উঠে পড়লেন। বললেন, "ঠিক আছে ভাই। তোমার সঙ্গে কথা বলে উপকার হল। ... নাও, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। আমরা চলি।" তারপর ভদ্রলোককে বললেন, "আপনাকে আর কী বলে ধন্যবাদ জানাব ! যথাসাধ্য সাহায্য করলেন আমাদের।"

বিষ্ণুর বাবা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "না না, এ আর এমন কিসের উপকার ! ওই হারানো ছেলেটির খোঁজ পেলে একবার জানাবেন।"

"চলি।" ভদ্রলোক কিকিরাদের সঙ্গে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলেন। "আপনারা এগোন, আমি একটু পরে আসছি। নমস্কার।"

কিকিরারা কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ি ধরলেন। ছোট্ট নার্সিং হোম। দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই আলো চলে গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়তে হল চন্দনদের। লোডশেডিং নাকি ?

না, লোডশেডিং নয় ; আবার আলো এসে গেল। ভেতরে কোনো গণ্ডগোল হয়ত !

রাস্তায় এসে কিকিরা বললেন, "চাঁদু, আমার এইরকমই সন্দেহ হচ্ছিল, কিড্ন্যাপিং। কিন্তু কেন ? হোয়াই ?"

"ঘড়ির জন্যে। আর কী হতে পারে ?"

"মানতেই হবে। তবে কথা হল, ঘড়িটা যদি বাবলুর কাছে থাকে— তবেই তাকে কিড্ন্যাপ করার মানে হয়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সাত সকালে বাবলু কেন একটা অচল পকেট ঘড়ি সঙ্গে নিয়ে বেরুবে ! ব্যাপারটা কি আগে থেকে ঠিক করা ছিল। প্রিঅ্যারেঞ্জড ? যদি তাই হয়, বাবলু কাকে ঘড়িটা দিতে বেরিয়েছিল। কেন ? সেই লোকটা কোথায় গেল ? প্রিঅ্যারেঞ্জড না হলে যারা বাবলুকে তুলে নিয়ে গেল— তারাই বা জানল কেমন করে বাবলুর কাছে ঘড়ি আছে ?"

চন্দন বলল, "লোকটাই হয়ত বলেছে।"

কিকিরা চুপ। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে-হাঁটতে একটা সিগারেট চাইলেন চন্দনের কাছে। ধরালেন। "ক'টা বাজে ?"

"সাড়ে সাত।"

"একবার বাবলুদের বাড়ি যাবে নাকি ? মাত্র সাড়ে সাত— !"

"কী করবেন গিয়ে ?"

"করার বিশেষ কিছু নেই, শুধু বিষ্ণুর খবরটা ডিটেলে কৃষ্ণকান্তকে জানাতে পারি।"

"ওটা তেমন জরুরি নয়, স্যার। কাল ফোন করেও জানাতে পারেন

অফিসে।"

"তা হলে বাড়ি ফিরতে হয়।"

"তাই চলুন।"

কিকিরা বলতে যাচ্ছিলেন, তাই চলো ; হঠাৎ কী মাথায় এল, বললেন, "চাঁদু, একবার সেই ডগ্ অ্যান্ড দি ম্যান— সিনহার বাড়িতে গেলে কেমন হয় ! আমরা তো কাছাকাছিই রয়েছি।"

চন্দন অবাক ! বলল, "এখন যাবেন ? বাড়িতে পাবেন তাঁকে ! হোটেলের ম্যানেজার মানুষ, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন ?"

"চেষ্টা করা যেতে পারে। এমনিতে ভেবেছিলাম, তাঁর হোটেলেই যাব। ভাবছি, কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি একবার চেষ্টা করতে দোষ কোথায় ?"

চন্দনের তেমন গা ছিল না। বলল, "বিষ্ণু যা বলল, তাতে কুকুরঅলা ভদ্রলোককে সে সেদিন ওই সময়ে কাছাকাছি দেখেনি।"

"তাই তো বলল ! ... তবু চলো, একবার আলাপ করে দেখা যাক। নাও একটা গাড়ি ধরো।"

রাজেন সিন্‌হাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল।

টিভি দেখছিলেন। নিজেই বাইরে এসে কোলাপসিব্‌ল্ গেটের ফাঁক দিয়ে দেখলেন কিকিরাদের।

"কী চাই ?"

"আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে ? আপনারা— ?"

"আমরা বেপাড়ার লোক। আপনি চিনবেন না। দুটো কথা বলতে এসেছি।"

"কী ব্যাপারে ?"

"কৃষ্ণকান্তবাবুর ছেলে বাবলুর ব্যাপারে।"

রাজেন সিন্‌হা যেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। "আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন ? আসুন !"

"আপনার কুকুর ? কুকুরে আমার ভীষণ ভয়, স্যার।"

"কুকুর পেছনের দিকে বাঁধা আছে। ভয় নেই।"

নিজের হাতে গেটের ভেতর দিকের তালা খুলে দিলেন সিন্‌হা। "আসুন।"

চার-ছ' পা এগিয়ে ডান্‌দিকে বসার ঘর সিন্‌হাসাহেবের। সাজানো-গোছানো। তবে পুরোপুরি সাজানো নয় বলেই মনে হল। নতুন এসেছেন।

টিভি বন্ধ করে দিলেন ভদ্রলোক। "বসুন।"

কিকিরারা বসলেন। নিজের এবং চন্দনের পরিচয় দিলেন। হাসি-তামাশা করলেন না।

রাজেন সিন্‌হার বয়েস বছর বাহান্ন-চুয়ান্ন। মাথায় বিশেষ লম্বা নয়। সামান্য মেদবহুল চেহারা। হাত-পা খাটো ধরনের, শক্ত। মাথার টাকটি চোখে পড়ার মতন। পরনে পাজামা, গায়ে খাটো পাঞ্জাবি, ফতুয়া বললেও চলে। গোল মুখ। চোখ উজ্জ্বল। থুতনির তলায় কাঁচাপাকা দাড়ি।

"বলুন ?"

"আপনার কুকুর হঠাৎ এসে পড়বে না তো ?"

"না। ঘুমিয়ে আছে। বাঁধাও আছে।"

কিকিরা বিনয় করে বললেন, "আমরা বাবলুর **খোঁজখবর করে** বেড়াচ্ছি। মানে কৃষ্ণকান্তবাবুর কথামতন..."

"আপনারা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ?"

"না স্যার, আমাদের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরির কোনো **সম্পর্ক** নেই। বলতে পারেন, আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো পার্টি।"

"ও ! তা দরকারটা বলুন ?"

"বলছি। এক গ্লাস জল পাব ?"

"জল ! নিশ্চয়। পাহাড়ি— পাহাড়ি।"

ডাক শুনে পাহাড়ি এল। বেঁটেখাটো তাগড়া মাঝবয়েসি নেপালি কাজের লোক। রাজেন সিন্‌হা ইশারায় জল দিতে বললেন। ঠাণ্ডা জল। পাহাড়ি চলে গেল।

কিকিরা বললেন, "আপনি এ-পাড়ায় নতুন মিস্টার সিনহা !"

"হ্যাঁ, নতুন। সবেই এসেছি।"

"বাবলুকে আপনি দেখেছেন ?"

"দেখেছি। আগে ওর নাম জানতাম না। পরে শুনলাম।"

"বাবলুকে কি আপনি সেদিনই প্রথম দেখলেন ?"

"কবে ?"

"যেদিন থেকে ওকে আর পাওয়া যাচ্ছে না ?"

"না, তার দিন দুই আগে প্রথম দেখেছি। ... কথা হয়নি।"

"কথা হয়নি ! শুনলাম যেদিন—"

"যেদিন থেকে ছেলেটিকে পাওয়া যাচ্ছে না সেইদিনই সকালে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। ও দৌড়তে বেরিয়েছিল, আমি আমার টোটো— আই মিন কুকুরকে নিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম। রেল লাইন পেরিয়ে খানিকটা এগোতেই লেকের কাছে ওর সঙ্গে আলাপ। ছেলেটি আমাকে টোটোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। তারপর যে যার মতন চলে যাই। ... কেন, মিস্টার দত্তরায়কে তো আমি সে-কথা বলেছি। উনি কয়েকদিন আগে আমার কাছে

এসেছিলেন।”

পাহাড়ি ঘরে এল। গোল বাহারি ট্রে করে প্লেটের ওপর কাচের গ্লাস বসিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস এনেছে দু'জনের জন্য। নামিয়ে রাখল।

কিকিরা বললেন, “আরে, এ-সব আবার কেন! প্লেইন জল হলেই চলত।”

“এটাও জল! নিন।”

কিকিরা আর চন্দন গ্লাস তুলে নিল।

দু-চার চুমুক কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে কিকিরা বললেন, “আপনি সেদিন পরে আর বাবলুকে দেখেননি?”

“খেয়াল করতে পারছি না। কেন?”

“আমরা শুনলাম, তার খানিকটা পরে বাবলুকে কিড্‌ন্যাপ করা হয়েছে। এমনভাবে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছে যাতে চট করে বোঝা না যায় একটা গ্যাং তাকে কিড্‌ন্যাপ করছে।” কিকিরা খানিকটা আগে শোনা বিষ্ণুর কথাগুলো বুঝিয়ে বললেন সিন্‌হাকে।

চন্দন একটাও কথা বলছিল না। রাজেন সিনহাকে দেখছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তা, আচার-আচরণের মধ্যে সাজানো-গোছানো ভাব আছে। গলার স্বর খানিকটা গম্ভীর, অথচ রুক্ষ নয়। হোটেল ম্যানেজার বলেই হয়ত কেতাদুরস্ত আচরণ।

সিন্‌হা মন দিয়ে কিকিরার কথাগুলো শুনছিলেন। ভাববার চেষ্টাও করছিলেন।

“আপনি গাড়িটাড়ি কিছু দেখেননি?” কিকিরা বললেন।

“গাড়ি! ... দেখুন, কলকাতার রাস্তায় গাড়ি দেখা যায় না এমন হয় না, সে ভোরেই হোক কি মাঝ রাতে! এক-আধটা গাড়ি নিশ্চয় দেখা যাবে। তবে আমি নজর করে গাড়িটাড়ি দেখিনি। যদি দেখতাম, দু-তিনটে লোক মিলে ছেলেটিকে ঠেলতে-ঠেলতে কোনো গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বাধা দিতাম।”

“আপনি?”

“হ্যাঁ,” সিন্‌হা একটু হাসলেন, “আমার গায়ে খানিকটা জোর এখনো আছে। তবে তার দরকার হত না। টোটোকে ছেড়ে দিতাম।”

“টোটো!”

“ভীষণ ট্রেইন্ড ডগ্। অ্যান্ড ফেরোসাস। ওকে আমি এমনভাবে ট্রেইন্ করেছি যে, যদি ইশারা করেও বলি, ওই লোকটার টুঁটি চেপে ধরো গে যাও— টোটো সত্যি-সত্যি চোখের পলকে দৌড়ে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরবে।”

চন্দন বলল, “ওটা কোন জাতের কুকুর? অ্যালশেসিয়ান?”

মাথা নাড়লেন সিন্‌হা, “না, অ্যালশেসিয়ান, টেরিয়ার, বুল ডগ, ম্যাসটিফ, গ্রেট ডেন— এ-সব নামীদামি কুকুরের কোনোটাই নয়। বুনো কুকুর, ওয়াইল্ড ডগ্। ওকে আমি চার-ছ' মাস বয়েস থেকে নিজের কাছে রেখেছি। এখন

টোটোর বয়েস পাঁচ বছর। একটু বুড়ো হয়ে গিয়েছে। দেখবেন টোটোকে ?"

কিকিরা যেন আঁতকে উঠলেন, "না স্যার, দেখে দরকার নেই। কুকুরকে আমি ভীষণ ভয় পাই। কেষ্টর জীব, শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ঘুমোতে দিন।"

সিন্‌হা হেসে ফেললেন। "ওর ঘুম বড় পিকিউলিয়ার। এমনিতে যখন ঘুমোয় কুম্ভকর্ণ ; কিন্তু চোর-ছ্যাঁচোড় এলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছুটে যায়। একটা আন্ডার কারেন্ট কিছু আছে। ...তবে আপনাদের ভয়ের কারণ নেই। টোটো তার নিজের জায়গায় বাঁধা আছে। ঘুম ভাঙলেও আসতে পারবে না। তা ছাড়া অকারণ চেঁচানো অভ্যেসটা ওর নেই।"

কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া শেষ।

কিকিরা এবার উঠে পড়বেন বলে মনে হল। বললেন, "আপনাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি সিন্‌হাসাহেব, আমরা সাধ্যমতন চেষ্টা করেও বাবলুর কোনো খোঁজ করতে পারলাম না। ওকে কিড্‌ন্যাপ করা হয়েছে, কিন্তু কারা করল, কোথায় নিয়ে গিয়ে ধরে রেখেছে, ছেলেটা কী অবস্থায় আছে— কিছুই বুঝতে পারছি না। আর যদি খুনটুন করে ফেলে— !"

"অসম্ভব কী ! তবে অতটা ভাববার আগে হাল ছেড়ে দেবেন না। আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম। ছেলেটিকে যেটুকু দেখেছি, কথা বলেছি, আমার বেশ লেগেছিল, ব্রাইট ইয়াং বয়।"

কিকিরা উঠে পড়লেন। দেখাদেখি চন্দনও।

সিন্‌হাও উঠে দাঁড়ালেন। কোলাপসিবল গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তালা খুলে দেবেন ফটকের।

কিকিরা বললেন, "আপনার হোটেলটা তা হলে..."

"সার্কাস রেঞ্জ।"

"ওদিকে গেলে যাব একদিন।" কিকিরা হালকা ভাবেই বললেন।

"আসবেন। মিড ডে বা ওইরকম সময়ে। সন্ধের পর আমি থাকি না। ... ভাল কথা, আমার টোটোর একটা অদ্ভুত গুণের কথা আপনাদের বলা হয়নি। এমনিতেই কুকুরদের গন্ধের নাক ভাল, কোনো-কোনো জাতের কুকুররা আবার ওই ব্যাপারটায় পয়লা নম্বর। যেমন পুলিশদের কুকুর। আমার টোটো— একেবারে বুনো বলেই হোক বা ওর কোনো স্পেশ্যাল কোয়ালিটির জন্যেই হোক— গন্ধের ব্যাপারে এক্সসেপশনাল। মনে হবে, ওর কোনো সিক্সথ সেন্স আছে। আনবিলিভেব্‌ল ! ওই যে সেদিন ছেলেটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় ও তার ট্র্যাকসুটের গায়ের গন্ধ শুঁকেছে, সেটা কিন্তু ভুলে যাবে না। নেভার। অন্তত এত তাড়াতাড়ি নয়। যদি এমন কিছু হয় মিস্টার রায়, টোটোকে কাজে লাগাবার দরকার হয়— আমায় বলবেন। আমি আমার সাধ্যমতন সাহায্য করব।"

কিকিরা শুনলেন। মাথা নাড়লেন। "ধন্যবাদ স্যার।"

"আচ্ছা, নমস্কার।"

বাড়ির বাইরে এসে কিকিরা ঘাড় ঘুরিয়ে চন্দনকে দেখলেন। চন্দন চুপচাপ।

হাঁটতে-হাঁটতে কিকিরা বললেন, "সিন্‌হাসাহেবকে কেমন মনে হল, চাঁদু?"

অন্যমনস্ক ছিল চন্দন। রাত হয়ে যাচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। কোথাও একটু মেঘ নেই। হাওয়াও না থাকার মতন। একটু বৃষ্টি বাদলা আবার না হলে বাঁচা যাবে না! এবারের গরমটা যেন একনাগাড়ে জ্বালাচ্ছে।

"কী গো চাঁদুবাবু! কথার জবাব দিলে না?"

"কিছু বললেন?"

"কেমন লাগল সিন্‌হাসাহেবকে।"

"ভালই লাগল। ওঁকে সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখছি না।"

'হুঁ! ... ইয়ে, কুকুররা কখন ঘুমোয়?"

"মানে!" চন্দন অবাক!

"আমি বলছি, কুকুররা কি খাস সাহেবদের মধ্যে সন্ধেয় সন্ধেয়- ডিনার সেরে নেয়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে! আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ! আটটা বাজবার আগেই খেয়েদেয়ে ঘুম! নো সাড়াশব্দ! ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় নাকি!"

"এ আপনি কী বলছেন?"

"বাড়িতে কি কুকুরটা ছিল?"

"তার মানে?"

"ধরো যদি না থাকে!"

"না-থেকে যাবে কোথায়?"

"তা বলতে পারব না। ... তবে হ্যাঁ, পাড়ার লোক যদি দেখে থাকে— সিন্‌হাসাহেব রোজ সকালে কুকুর নিয়ে মর্নিং ওয়াক্ করতে বেরুচ্ছেন— তবে কুকুর নিশ্চয় ও-বাড়িতে আছে। থাকে। অন্তত সকালে। ... সন্ধের পর—" কথাটা আর শেষ করলেন না কিকিরা।

চন্দন বুঝতে পারল না, কিকিরা কী বলতে চাইছেন।

৯

ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার মতন করে ধীরাজকে পাকড়াও করে নিয়ে এল তারাপদ কিকিরার কাছে। এনে বলল, "এই নিন স্যার, বাবলুদের গ্রুপের ধীরাজদাকে নিয়ে এসেছি।"

কিকিরার ফ্ল্যাটের চেহারা দেখে হয়ত অতটা নয়, কিন্তু বসার ঘর দেখে রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিল ধীরাজ। এরকম বিচিত্র ঘর বোধ হয় আগে সে

দেখেনি। যতরকম অদ্ভুত আর পুরনো জিনিস সব কি এখানে ? তারাপদর কথা শুনে সে ভেবেছিল, বেশ সাজানো-গোছানো কোনো অ্যামেচার ডিটেকটিভের সঙ্গে সে দেখা করতে যাচ্ছে। খানিকটা কৌতূহলও হয়েছিল। এখন সে বুঝতে পারছে, যার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে সেই ভদ্রলোক গোয়েন্দার 'গ'-ও নয়। এই কি গোয়েন্দার চেহারা ! রোগা, ঢ্যাঙা, আধ-বুড়ো, গর্তে-ডোবানো চোখ, লম্বা-লম্বা উসকোখুসকো চুল—এই মানুষ কখনোই গোয়েন্দা, পেশাদারি বা শখের—কোনো জাতেরই গোয়েন্দা হতে পারেন না ! ধীরাজের মেজাজই বিগড়ে গেল।

কিকিরা ধীরাজকে বসতে বললেন। আজকের দিনটা মন্দের ভাল। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। দুপুরেও মেঘলা-মেঘলা ছিল। গরম কমেছে সামান্য।

কিকিরা ধীরাজের চোখমুখ দেখে আন্দাজ করতে পারছিলেন, বেচারি বেশ হতাশ হয়েছে। তা তিনি আর কী করবেন ! তিনি তো তারাপদকে বলেননি, ধীরাজকে ধরে আনো—দড়ি বেঁধে।

তারাপদ বলল, "স্যার, ধীরাজবাবুর গত পরশু খড়্গপুর থেকে ফিরেছেন। কাল আমি আমার পাড়ার লাইব্রেরিতে সারা সন্ধে কাগজ ঘেঁটে কটিয়েছি। আর ওঁর কাছে গিয়েছিলাম কাঁকুলিয়ায়। অনেক বলে কয়ে ধরে এনেছি।"

ধীরাজের বয়েস চল্লিশের তলায়। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। দেখতে সাধারণ, তবে বাহারি করে দাড়ি রেখেছে।

কিকিরা আলাপি ঢঙে বললেন, "কী বলব ভাই আপনাকে— ! আপনি, না তুমি ? বয়েস তো বেশি নয়।"

"তুমিই বলুন। আমি বুঝতে পারিনি—"

"পারবে কেমন করে ! আমরা তো ওই ক্লাসের নয়। মানে গোয়েন্দা ক্লাসের। আমরা হলাম, কী বলব—কী বলা যায়—ফেউ ক্লাসের। আমি ভাই একসময় ম্যাজিক নিয়ে মাতামাতি করেছি। এখন ওল্ড। বাতিল। আর তারাপদ আর চন্দন হল আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড ব্রাদার।"

ধীরাজ বলল, তারাপদর কাছে সে শুনেছে পরিচয়গুলো।

কিকিরা আর হাসি-তামাশা করলেন না। বললেন, "কৃষ্ণকান্তবাবু, আমাদের একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। বাবলুকে খুঁজে বার করার।"

"তাও শুনেছি। গতকাল পবনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আর আজ উনি তো আমার বাড়িতেই গিয়েছিলেন"

"ভাল কথা। আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল ! তোমার মায়ের অসুখ—কেমন আছেন তিনি ?"

"এখন ভালই আছেন।"

"কী হয়েছিল ?"

"বুকে ব্যথা। প্রথমটায় ওখানকার ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়েছিল। পরে বোঝা গেল, আলসারের কেস। মা বড় অত্যাচার করে।"

কিকিরা হাসলেন। "মায়েরা ওইরকমই।...তা মা যখন ভাল আছেন, তোমারও মন ভাল থাকা দরকার। নয় কী !এবার একটু কাজের কথা বলি !"

"বলুন ?"

"তুমি বাবলুর পুরনো বন্ধু ?"

"হ্যাঁ, বন্ধু কেন, দাদার মতন বলতে পারেন।"

"ওকে ভাল করেই চেনো ? কেমন ছেলে ?"

"খারাপ কিছু দেখিনি। লাইভলি, মজাদার, ভাল স্বভাব..."

তারাপদ বলল, "বাবলুর সম্পর্কে যাকেই জিজ্ঞেস করছি, সবাই তার প্রশংসা করছে। ও নিশ্চয় ভাল ছেলে, স্যার। তবু বেচারি—"

কিকিরা তারাপদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ধীরাজকে বললেন, "আচ্ছা, ওই যে শুনলাম, একটা খবরের কাগজে কী বেরিয়েছিল—!"

তারাপদ বলল, "স্যার, দ্যাটস কারেক্ট। ...আমি দু'দিন লাইব্রেরিতে রাখা খবরের কাগজের ফাইল হাতড়েছি। কালই ইংরিজি কাগজে বিজ্ঞাপনটা দেখতে পেলাম। ধীরাজবাবুকে বলেছি সে-কথা।"

কিকিরা মাথা নাড়লেন। মানে, ঠিক আছে। ইশারায় তারাপদকে বললেন, বগলাকে একটু চা-টায়ের কথা বলে আসতে।

তারাপদ উঠে গেল।

কিকিরা বললেন, "আমাদের মধ্যে লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই। ...এবার আমায় একটু বলো তো, বাবলু যেদিন থেকে নিরুদ্দেশ—তার কি ক'দিন আগে খবরের কাগজের ব্যাপারটা ঘটে ?"

ধীরাজ বলল, "ও নিরুদ্দেশ হওয়ার দু' দিন আগে। মানে আগের আগের দিন।"

"ঠিক কী হয়েছিল ?"

"কী আর হবে, আমরা প্রায়ই যেমন আড্ডা মারি, আমাদের ক্লাবে আড্ডা মারছিলাম সন্ধেবেলায়। পুরনো খবর কাগজ ছড়িয়ে তার ওপর মুড়ি-বাদাম, কাঁচা পিঁয়াজ ছড়িয়ে খাচ্ছিলাম সকলে। ভাঁড়ের চা ছিল। গল্প হচ্ছিল। আমাদের নাটক নিয়েই। গ্রুপের টাকাপয়সা নেই, হাজার কয়েক টাকা দেনা। দু-পাঁচটা কল শো অ্যারেঞ্জ করতে পারলে খানিকটা মেকআপ হয়। এইসব গল্প।"

তারাপদ ফিরে এল। চোখমুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে এসে নিজের জায়গায় বসল।

কিকিরা বললেন, "মুড়ি খেতে-খেতে কাগজের বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়ল ?"

“খাওয়া তখন শেষ। মুড়ি প্রায় সাফ। কাগজটা ঝেড়েঝুড়ে আমরা দলা পাকিয়ে ফেলেই দিতাম। হঠাৎ কার যেন নজরে পড়ল— ।”

“বিজ্ঞাপনটা ?”

“হ্যাঁ। খুব বড় নয়, আবার ছোটও নয়। কত হবে—, ইঞ্চি চারেক মতন লম্বা। চারপাশে রুল দেওয়া।”

“তোমরা সবাই পড়লে ?”

“না। কে একজন পড়ল। দু-একজন দেখল। বাবলুও দেখল।”

“তারপর ?”

“আমরা একটু মজার কথাবার্তা বললাম। কাগজটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালাম না।”

“বাবলু কি কাগজটা নিল ?”

“ঠিক মনে নেই। হতে পারে সে কাগজের পাতা ছিঁড়ে পকেটে রেখেছিল। ...তবে ও বলল, ওদের বাড়িতে ওর ঠাকুরদার একটা পকেট ঘড়ি পড়ে আছে। সোনার ঘড়ি।”

তারাপদ কিকিরাকে বলল, “পবনও একই কথা বলেছে, স্যার। ঘড়িটার একটা মোটামুটি ডেসক্রিপশানও বাবলু দিয়েছিল।”

ধীরাজ মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ।”

“তুমি নিজে কাগজের ওই বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলে ?”

“এমনি দেখেছি। ভাল করে দেখিনি। আমার মাথায় ওসব ঢোকে না। আর মন দিয়ে দেখে করবই বা কী ! আমার কাছে তো ঘড়ি নেই।”

“তবু, কী লেখা ছিল ?”

ধীরাজ মনে করে দু-একটা কথা বলা সঙ্গে-সঙ্গেই তারাপদ পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করে এগিয়ে দিল। বলল, “স্যার, আমি কাগজ ঘেঁটে-ঘেঁটে এই বিজ্ঞাপন বার করেছি। এটা সেই ঘড়ির বিজ্ঞাপন। আলগা কাগজে পুরো বিজ্ঞাপনটাই টুকে নিয়েছি।” কাগজটা দিয়ে আবার বলল, “ধীরাজবাবুকে আমি দেখিয়েছি এটা। উনি বললেন, হ্যাঁ, এটাই সেদিন পড়েছিলেন।”

কিকিরা হাতে-টোকা বিজ্ঞাপনের নকলটা পড়তে লাগলেন।

বগলা চা নিয়ে এল। চায়ের সঙ্গে পাকা পেঁপের টুকরো আর নোনতা বিস্কিট।

তারাপদ ধীরাজকে চা নিতে বলল।

হাতের কাগজটা পড়তে-পড়তে একবার আড়চোখে কিকিরা ধীরাজের দিকে তাকালেন। হালকা গলায় বললেন, “আগে পেঁপেটা খাও, ভাল জাতের পেঁপে, পেঁপে খেলে লিভার ভাল হয়। খাও !”

ধীরাজের প্রথমদিকে যে ইতস্তত ভাব ছিল, সেটা কেটে গিয়েছে অনেকটা।

এখন সে অত আড়ষ্ট নয়।

কাগজ দেখা হয়ে গেলে কিকিরা বললেন, "তাই দেখছি—, বাবলুদের ঘড়িরই ডেসক্রিপশান। তবে একেবারে পুরো ডিটেলে নয়। ঘড়ির নামও বলে দিয়েছে, ক্যানটন। ক্যানটন গোল্ড। পকেট ওয়াচ।...এটা কোন কাগজে বেরিয়েছিল ? কত তারিখে ?"

তারাপদ দলল, "নিচে লেখা আছে। টুকে নিয়েছি।"

দেখলেন কিকিরা। "এই বিজ্ঞাপন তো এপ্রিলে বেরিয়েছে। বাইশে এপ্রিল। আর এখন মে মাসের আট-ন' তারিখ।"

তারাপদ বলল, "বিজ্ঞাপনটা আগে বার তিনেক রিপিট হয়েছে। এটাই লাস্ট।"

"বাবলু কবে থেকে যেন ঘরছাড়া ?"

ধীরাজই কথা বলল, "আমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পরের দিন। তার পরের দিনই সন্ধেবেলায় আমি খড়্গপুরে চলে যাই। সেটা ছিল আটাশে এপ্রিল। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না সাতাশে এপ্রিল থেকে।"

কিকিরা চায়ে চুমুক দিতে-দিতে হাতের কাগজটা দেখছিলেন। ভাবছিলেন। বাইশে এপ্রিলের পুরনো কাগজের পাতায় মুড়ি বাদাম ছড়িয়ে রেখে বাবলুরা পরে একদিন মুড়ি খেয়েছে। হতেই পারে ! শেষে বললেন, "তলার ঠিকানাটা, যেখানে কনট্যাক্ট করতে বলেছে সেটা তো দেখছি সাবেকি ঠিকানা : লাজোস, LAJOS। লাজস্‌ও হতে পারে। বিলেতিগুলোর এইরকম নামও হয় নাকি, তারা। যাক গে, রাস্তাটা হল পার্ক স্ট্রিট। ফোন নম্বরও দেওয়া আছে।"

তারাপদ বলল, "ওখানে গিয়ে খোঁজ করতে অসুবিধে কোথায় ?"

"কিছুই নয়। কালই যাওয়া যেতে পারে।"

ধীরাজ কোনো কথা বলছিল না। চা খাচ্ছিল।

অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কিকিরা পকেট হাতড়ে চুরুট বার করলেন। মাথার চুলে আঙুল চালালেন বার কয়েক। চুরুট ধরালেন। শেষে ধীরাজকে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ?"

ধীরাজ তাকিয়ে থাকল।

কিকিরা বললেন, "ব্যাপারটা এখন এই দাঁড়াচ্ছে যে, সেদিন তোমাদের আড্ডাখানা থেকে ফেরার পর—মানে মুড়ি-বাদাম খাবার দিনের কথা বলছি—বাবলু পুরনো খবরের কাগজ থেকে লাজোস-এর বিজ্ঞাপনের পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। সেটা তবে পঁচিশে এপ্রিল পড়ছে ! তাই না ?"

ধীরাজ হিসেব করে বলল, "তাই। ছাব্বিশ তারিখেও ও আমার কাছে এসেছিল। সাতাশ তারিখ সকালের পর ওকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ছাব্বিশ তারিখে তবে ও পবনের দোকানে গিয়েছিল, সেখান থেকে

আপনার কাছে যায়।" তারাপদ বলল।

"হ্যাঁ।"

"পবনকে কিন্তু ঘড়ি দেখায়নি। হয়ত সঙ্গে ছিল না। আপনাকেও কি দেখিয়েছিল ?"

"না।"

কিকিরা বললেন, "এখন আমার মনে হচ্ছে, বাবলু বাড়িতে গিয়ে আলমারি খুলে ঘড়িটা বার করেছে। করে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। দেখেছে একই ঘড়ি। তারপর—" কিকিরা চুপ।

অপেক্ষা করে তারাপদ বলল, "তারপর কী ?"

"সেটাই তো ধরতে পারছি না। ও কি লাজোস-এর ঠিকানায় গিয়েছিল দেখা করতে ? না, ফোন করেছিল ?"

তারাপদ বলল, "স্যার, বাবলুর বোন খুকুর কথামতন, আগের দিনই ঘড়িটা তার কাছে দেখা গিয়েছে। মানে ছাব্বিশ তারিখে।"

কিকিরা ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন ধীরাজের দিকে তাকিয়ে। বললেন, "না, ঘড়ি নিয়ে বাবলু বাইরে যায়নি। তোমার কাছে নয়। তা হলে দেখাত তোমায়। আমার ধারণা, ও ছাব্বিশ তারিখে হয় লঞ্জেসচুষ—মানে লাজোসের কাছে যায়, বা তাদের অফিসে ফোন করে।...কিন্তু কেন করবে ?"

"টাকার জন্যে নিশ্চয় নয়। আবার শুধু-শুধু ওদের জানাবার জন্যেও ফোন করবে না। ঘড়িটা তাদের কাছে আছে জানিয়ে ফোন করার একটা মানে থাকবে তো !"

"কী জানি ! ছেলেমানুষের কাণ্ড !" বলে কিকিরা ধীরাজের দিকে তাকালেন। "আচ্ছা ভাই, একটা রহস্য উদ্ধার করে দিতে পারো ? বাবলু বেপাত্তা হওয়ার পর তার টেবিলে একটা কাগজে বড় বড় করে ইংরিজিতে FOX OX BOX লিখে রেখেছিল। এর কোনো মানে বলতে পারো ?"

ধীরাজ অবাক চোখেই তাকিয়ে থাকল। দাড়ি চুলকে নিল অন্যমনস্কভাবে। আকাশ-পাতাল খুঁজল যেন ! তারপর বলল, "না। আমি তো জানি না।"

"তা হলে কী আর কথা যাবে ! যাক গে, কাল আমরা ওই লাইমজুস, লঞ্জেচুষ—মানে লাজোস-এর কাছে যাচ্ছি।" কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন, উঠে দাঁড়িয়ে পিঠ কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা ভাঙার জন্যে বার কয়েক শরীর হেলালেন, বেঁকালেন, হাত ওঠালেন, নামালেন। শেষে বললেন, "তারাপদ, তিনটে জিনিস খেয়াল করো।"

"কী ?"

"এক নম্বর হল, বাবলু যেদিন খবরের কাগজে লাজোস-এর বিজ্ঞাপনটা দেখেছে, সম্ভবত সেদিন রাত্রে বা তার পরের দিন বাড়িতে আলমারি খুলে

ঘড়িটা বার করেছিল। করে মিলিয়ে নিতে গিয়েছিল বিজ্ঞাপনের ডেসক্রিপশানের সঙ্গে। খুকু বাবলুর কাছে ঘড়িটা দেখেছিল ছাব্বিশে এপ্রিল। তাই তো!"

"হ্যাঁ।"

"দু' নম্বর হল, ঘড়িটা নিয়ে সে পবন বা ধীরাজের কাছে যায়নি। মানে ঘড়ি পকেটে নিয়ে সে পথে বেরোয়নি। যদি ঘড়ি তার কাছে থাকত—ধীরাজকে দেখাত। তাই না?"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"তিন নম্বর হল, আমার যতদূর মনে হয়—ব্যাপারটা যাচাই করতে সে বাড়ি থেকে লাজোসে ফোন করেছিল। নিজে নিশ্চয় যায়নি। গেলে পবন ধীরাজদের বলত।"

"বলুন!"

"হতে পারে বাবলু বিকেল বা সন্ধেবেলায় লাজোসে ফোন করেছিল। বাড়ি থেকেই। সেটা হয়ত জানা যাবে না। কেননা, বাড়ির ছেলেমেয়ে কোথায় কাকে কখন ফোন করছে, বাড়ি থেকে কে আর তার দিকে নজর রাখে!...তবে একটা কথা পরিষ্কার, বাবলু আগের দিন ঘড়ি নিয়ে পথে বেরোয়নি। পরের দিন সকালে যদি সে ঘড়ি নিয়ে বেরিয়ে থাকে, তবে মাঝখানে কিছু একটা ঘটেছিল। কী ঘটেছিল, কাল আমরা হয়ত জানতে পারব। আজকের মতন এখানেই ইতি।" কিকিরা চুরুটে টান মারলেন। চুরুট নিভে গিয়েছে।

১০

পরের দিন লাজোস খুঁজতে গিয়ে কিকিরারা অবাক! পার্ক স্ট্রিটের ওপরে ঠিক নয়, বড় রাস্তা থেকে এক গলি ধরতে হবে। গলির মুখে, কর্নার প্লটে এক ঝকঝকে, তকতকে দোকান। আশেপাশে ভাল-ভাল দোকানেরও অভাব নেই। কোনোটা ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন; কোনোটা টিভির; কোনোটা বা টাইপ মেশিনের। সাজসজ্জার দোকানও আছে। দু-একটা চমৎকার রেস্টুরেন্ট। নিচে দোকানপত্র, ওপরে অফিস, ফ্ল্যাট।

চন্দন আর তারাপদ সঙ্গে ছিল কিকিরার। তারাপদ অফিস পালিয়েছে।

বাইরে থেকে দেখেই বোঝা যায় লাজোস একটা দোকানের নাম। ছিমছাম দোকান। বাইরে কাচের আড়াল। দোকানটা দেখেই চন্দন বলল, "স্যার, এখানে তো ডাক্তারি জিনিসপত্র বিক্রি হয়। মেডিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স।"

কিকিরা বললেন, "তাই দেখছি। চলো, ভেতরে তো যাই!"

তারাপদ বলল, "আমি বাইরে আছি। বেশি ভিড় করে দরকার নেই।"

কিকিরা আর চন্দন কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

দোকান খুব বড় নয়। তবে পরিপাটি। মাইক্রোস্কোপ, ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র থেকে আরও পাঁচটা ডাক্তারি যন্ত্রপাতি বিক্রি হয়।

ভিড়টিড় নেই। কর্মচারী জনা চারেক। দু' জন অবাঙালি।

চন্দন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

ম্যানেজার বসেন আলাদা। তাঁর ঘর একপাশে। ভেতরের দিকে।

ম্যানেজার অবাঙালি। পাঞ্জাবি।

চন্দনই কথা শুরু করল।

ম্যানেজার শুনলেন খানিকটা। তারপর যা বললেন তার মর্মার্থ হল, এই দোকান বা কোম্পানিটা হল এক হাঙ্গেরিয়ান সাহেবের নামে। তিনি এ-দেশে থাকেন না। 'লাজোস'-এর ব্যবসা আছে বিদেশেও। ভারতে চার জায়গায়। দিল্লি, বম্বে, কলকাতা আর বাঙ্গালোরে। তাঁর কোম্পানির এটা অফিস। অফিস অ্যান্ড এজেন্সি।

বিজ্ঞাপনের কথা তুললেন কিকিরা।

ম্যানেজার ইংরিজিতেই বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের এখানকার ঠিকানাতেই ওটা ছাপতে দেওয়া হয়েছিল। সেভাবেই অ্যাডভাইস করা হয়েছিল আমাদের। সাহেবের একজন লোক এখানে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি এখন এখানে নেই। বাঙ্গালোর গিয়েছেন। উনি এখানে ফিরে আসতেও পারেন, নাও পারেন। ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে আমাদের থ্রু দিয়ে করতে হবে। আমাদের ফ্যাক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।"

ম্যানেজারের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক অনেকদিনই কলকাতায় আছেন। ইংরিজি-হিন্দি, মাঝে-মাঝে বাংলাও বলছিলেন ভাঙা-ভাঙা ভাবে।

কিকিরা বললেন, "বাইরে জানাতে হবে?"

"আমরা ওঁকে জানিয়ে দেব। ওভারসিজ লিঙ্ক আমাদের আছে বিজনেস পারপাজে।"

কিকিরা বেশ বিনয় করে বললেন, "আপনি যদি আমাদের আরও একটু সাহায্য করেন, স্যার। আপনাদের সাহেবের ইন্টারেস্টেই বলছি।"

"কীরকম হেল্প?

"ঘড়িটা সম্পর্কে আরও একটু ডিটেল জানতে পারলে? নিউজ পেপারে যা আছে, সেটা বড় শর্ট। মোর ডিটেল—"

ম্যানেজার ভদ্রলোক কী ভাবলেন যেন। তারপর নিজের অফিস টেবিলের নিচের ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র হাতড়ে একটা খাম বার করলেন। বড় খাম। খামের মধ্যে থেকে একটা কাগজ বার করে এগিয়ে দিলেন কিকিরাকে।

কাগজটা নিলেন কিকিরা। ইংরিজিতে টাইপ করা কাগজ। ডুপ্লিকেট।

ম্যানেজার বললেন, "টেক্ ইট। দ্যাট্ উইল সার্ভ ইওর পারপাজ।"

কিকিরা আর চন্দন উঠে দাঁড়াল। "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"নেভার মাইন্ড ! ...বাই দ্য ওয়ে— বি ভেরি কেয়ারফুল !" বলে ভদ্রলোক সাবধান করে দিলেন। বললেন, "অনেক টাকার ব্যাপার মিস্টার, কাগজটা নষ্ট করবেন না, পড়লে বুঝতে পারবেন।"

"কত টাকা ?"

"এ লট্ অব মানি। লাখ-সওয়া লাখ।"

ভেতরে-ভেতরে যেন চমকে উঠলেন কিকিরারা। লাখ-সওয়া লাখ !

চলে আসার সময় কিকিরা বললেন, "আপনাদের দোকান কখন বন্ধ হয় ?"

"সেভেন ও ক্লক। সাত বাজে ক্লোজ হয়। মাগর, আট সাড়ে আট পর্যন্ত দুগার থাকে। আউট স্টেশন কল, অর্ডার করস্পনডেন্স, ফোন্ রিসিভ...। উসকো বাদ টোটালি ক্লোজ্ড !"

"দুগার কে ?"

"হীরা দুগার। আমার অ্যাসিসটেন্ট।"

ধন্যবাদ জানিয়ে কিকিরারা ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাকালেন আশেপাশে। কর্মচারীরা কাজকর্ম করছিল। আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন হীরা দুগারকে।

রাস্তায় নেমে তারাপদকে দেখতে পেলেন না। গেল কোথায় ?

দু-চার পা এগিয়ে খুঁজছিলেন তারাপদকে।

তারাপদ খানিকটা তফাতে গাড়িবারান্দার তলায় আড়ালে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছিল একটা দোকানের সামনে। খাওয়া শেষ করে পয়সা মেটাল। সিগারেট ধরাল।

কিকিরারা তাকে দেখতে না পেলেও সে ওঁদের দেখতে পেয়েছিল। হাত নাড়তে যাবে ; হঠাৎ চোখে পড়ল, কিকিরারা দোকান থেকে রাস্তায় নামার পর-পরই একজন দোকান থেকে বেরিয়ে এসে কিকিরাদের নজর করতে লাগল। কেমন যেন লাগল লোকটাকে ! তারাপদ স্পষ্ট বুঝল না, কিন্তু তার খারাপ লাগল। সন্দেহ হল।

কী মনে করে তারাপদ আরও একটু আড়ালে সরে গেল। কিন্তু নজর রাখল লোকটার ওপর। প্যান্ট-শার্ট পরা তাগড়া চেহারা। কিকিরাদের লক্ষ করছে।

সামান্য পরেই লোকটা দোকানের পাশের গলি ধরে চলে গেল।

তারাপদ তাড়াতাড়ি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে ইশারা করল কিকিরাদের।

কিকিরারা এগিয়ে আসার আগেই তারাপদ এগিয়ে গেল। কাছাকাছি আসতেই তারাপদ বলল, "স্যার, আপনারা ওই ওপারের ফুটপাথে রেস্টুরেন্টে ঢুকে যান। আমি আসছি। একটা লোককে ফলো করে আসছি আমি।" বলতে-বলতে তারাপদ গলির দিকে এগিয়ে গেল।

গলি ধরে সামান্য এগিয়ে তারাপদর মনে হল, কে বলবে এই গলি পার্ক

স্ট্রিটের গায়ে-গায়ে। অনেক নিরিবিলি। বাড়িগুলো বড়-বড় হলেও একেবারে নতুন নয়। পাঁচমেশালি লোকের ফ্ল্যাট বাড়িগুলোয়। খানিকটা এগিয়ে ছোট্ট তেকোনা ফাঁকা নেড়া মাঠ। পার্ক। তারই পেছন দিকে পুরনো এক হতশ্রী চেহারার বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া ভাঙাচোরা শেডের গ্যারাজ। বাড়িটার ফটকের মাথায় মরচে-ধরা ভাঙা লোহার ক'টা অক্ষর। পড়াও যায় না। এক্স্ সেলার্স হোম গোছের কিছু হবে।

তারাপদ দেখছিল। বাড়িটার জানলাগুলো খড়খড়ির। রং আর চেনা যায় না! দোতলা বাড়ি। বাইরের দিকে বারান্দা বলে কিছু নেই। দেওয়ালের ফাটাফুটি জায়গা দিয়ে জল পড়ে-পড়ে শ্যাওলা ধরেছে, গাছের সরু ডাল, পাতা।

তারাপদ দেখছিল। চোখে পড়ল হঠাৎ সেই লোকটা ফিরে আসছে আবার বাড়িটার দিকে।

নিজেকে আড়াল করার উপায় ছিল না। তারাপদ ফিরে আসতে লাগল। লোকটা এবার তার পেছনে।

বড় রাস্তায় এসে লোকটা দাঁড়াল। তাকাল চারপাশ। তারপর দোকানে ঢুকে গেল।

তারাপদ রাস্তা পেরিয়ে কিকিরাদের খোঁজে রেস্টুরেন্টের দিকে পা বাড়াল।

কিকিরারা তখনো চা পাননি। মিনারেল ওয়াটারের বোতল, গ্লাস টেবিলে পড়ে আছে।

তারাপদ এসে বলল, "কিকিরা, আপনারা ওই দোকান থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা লোকও বেরিয়ে এল। আপনাদের দেখছিল। তারপর গলির মধ্যে চলে গেল। লোকটাকে দেখে আমার সন্দেহ হল। তাকে ফলো করলাম।" তারাপদ যা যা দেখেছে, বলল কিকিরাদের।

কিকিরা হাতের কাগজটা আগেই পড়েছেন। চন্দনও। তবু কাগজটা হাতে দিল কিকিরার। বললেন, "লোকটা নিশ্চয় হীরা দুগার।"

চন্দন বলল, "বুঝলেন কেমন করে?"

"মন বলছে।"

"মন বললেই কি সত্যি হয়?"

"কখনো-কখনো হয়। ... আমি বলছি। বাবলু সেদিন— তার নিরুদ্দেশ হওয়ার আগের দিন সন্ধেবেলায় নিশ্চয় লাজোসে ফোন করেছিল। যে-সময় ফোন করেছিল তখন দুগার আর দরোয়ান ছাড়া কারও থাকার কথা নয়। দরোয়ান দোকানের বাইরে বা ভেতরেও থাকতে পারে। তাতে কিছু আসে যায় না!"

"দুগার দোকানে ছিল, আপনি জানলেন কেমন করে?"

"কেন, ম্যানেজার সাহেবই তো বললেন যে, দুগারই একলা আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকে।"

চন্দন মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ম্যানেজার তাই বলেছেন বটে! তবু বলল, "যদি অন্য কেউ থেকে থাকে!"

"সেটা পরে চেক করে নেব। ম্যানেজার সাহেব নিশ্চয় জানেন।"

তারাপদ বলল, "লোকটার ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগল না, স্যার। কেমন যেন চোর-চোর ভাব। ...আমার মনে হচ্ছে, ওই পুরনো বাড়িটা সন্দেহজনক। কে বলতে পারে বাবলুকে ওখানে আটকে রাখা হয়নি! ...পুলিশকে বললে হয় না?"

কিকিরা মাথার চুলে আঙুল চালাতে-চালাতে ভাবলেন যেন। শেষে বললেন, "পুলিশ পরে। আগে সিন্‌হা। সিন্‌হা না বলেছিলেন, তাঁর কুকুরের গন্ধের নাক আন্‌বিলিভেবল। দেখা যাক, ভদ্রলোকের কুকুর এখন কী করে? উনি তো বড় মুখ করে বলেছিলেন, কোনো সাহায্যের দরকার হলে উনি অবশ্যই করবেন। সেটা সত্যি না মিথ্যে, পরখ করতে হবে। ...চাঁদু, সিন্‌হার হোটেলে যাওয়া যাক। এখন উনি নিশ্চয় থাকবেন।"

১১

এই সময়টায় সচরাচর যেমন হয়। হঠাৎ-হঠাৎ বিকেলে ধুলোর ঝড় ওঠে, আকাশ কালচে দেখায়, এক-আধ পশলা হালকা বৃষ্টিও হয়ত হয়ে যায়— অনেকটা সেইভাবে শেষ বিকেলে ধুলোর ঝড়টড় উঠেছিল, একপশলা রাস্তা ভেজানো বৃষ্টিও হয়ে গেল। তারপর যেমন-কে-তেমন, আকাশ পরিষ্কার, বাতাসেও ঠান্ডা ভাব নেই।

সন্ধের আগেই রাজেন সিন্‌হা আর কিকিরা বেরিয়ে পড়েছিলেন লেক গার্ডেন্স থেকে।

সিন্‌হাসাহেবের গাড়ি আছে হোটেলের। তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসে, আবার পৌঁছেও দেয়। নিজের ব্যক্তিগত দরকার কিংবা অন্য কাজকর্মে তিনি হোটেলের গাড়িই ব্যবহার করেন। কিকিরাদের কাছে খবরটা শোনার পর তিনি সঙ্গে-সঙ্গে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ি যাবেন। তাঁর কুকুর টোটোকে নিয়ে ফিরে আসবেন জায়গা মতন।

তাঁর পরামর্শ মতন তারাপদ আর চন্দন সন্দেহজনক বাড়ি আর পুরনো গ্যারাজের আশেপাশে থেকে গেল। তারা নজর রাখবে বাড়িটার দিকে। বলা যায় না, দুগার বা তার লোকজন যদি বিপদ বুঝে বাবলুকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে— তবে তারাপদরা দেখতে পাবে! অবশ্য, আসল কথাটা হল, বাবলুকে ওই বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে কি না সেটা জানা? আর তার

সঙ্গে দুগারের সম্পর্ক আছে কি না ! কিকিরার অনুমান আর সন্দেহ সত্যি হতেও পারে, নাও পারে ।

টোটোর মুখে স্ট্র্যাপের গার্ড পরিয়ে, তার গলায় বাঁধা চামড়ার মোটা বকলস পরিয়ে চেইন-কর্ডটা হাতে নিয়ে সিন্‌হাসাহেব গাড়িতে উঠলেন ।

"আপনি সামনে বসুন, কুকুরে আপনার বড় ভয়", সিন্‌হা বললেন গাড়িতে উঠতে-উঠতে ।

কিকিরা সামনের দিকে বসলেন । সিন্‌হা কুকুর-সমেত পেছনের সিটে ।

তখন আর ধুলোর ঝড়, আচমকা হালকা বৃষ্টির চিহ্ন নেই । আলো সরে গিয়েছে । ঘোলাটে, আবছা ভাব । প্রায় সন্ধে ।

গাড়ি ছাড়তেই সিন্‌হা হঠাৎ বললেন, "একটা কাজ করুন তো ! মিস্টার দত্তরায়ের বাড়ির সামনে গাড়িটা দাঁড় করাই । ও বাড়ির লোক আপনাকে দেখেছে । চেনে । আপনি ওই বাড়ি থেকে ছেলেটির একটি শার্ট-প্যান্ট চেয়ে আনুন ।"

"বাবলুর জামা প্যান্ট ?"

"হ্যাঁ । আফটার অল, টোটো মাত্র একদিনই মিনিট আট-দশ বাবলুর সামনে ছিল । যদি তার গন্ধের নাক ভুল করে । করার কথা নয়, তবু আরও শিওর হওয়া ভাল । বেটার, আপনি একটা ইউজ্‌ড জামা-প্যান্ট নিয়ে আসুন ছেলেটির । টোটোকে শুঁকিয়ে নেব ।

কৃষ্ণকান্তর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল ।

কিকিরা বললেন, "কৃষ্ণকান্তবাবুকে হয়ত এখন বাড়িতে পাব না । তিনি ফিরেছেন বলে মনে হয় না । জামা-প্যান্ট যা হোক একটা আমি আনছি । কিন্তু এখন কাউকে কিছু বলব না ।"

"কোনো দরকার নেই ।"

কিকিরা নেমে গেলেন গাড়ি থেকে ।

সামান্য পরে ফিরে এলেন । খুকুর কাছ থেকে তার দাদার একটা জামা নিয়ে এসেছেন । উনি বসলেন গাড়িতে । জামাটা সিন্‌হাকে এগিয়ে দিলেন ।

তেকোনা নেড়া ছোট পার্কের একপাশে গাড়িটা দাঁড়াল ।

ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গিয়েছে । গলির মধ্যে আলো কম । বরং অন্ধকারই বেশি । জায়গাটা অদ্ভুত ! সাড়াশব্দ কম । লোক চলাচলও তেমন নয় । মাঝেসাঝে একটা গাড়ি চলে যায়, সাইকেল, স্কুটার । গ্যারাজটা পুরনো, ভাঙাচোরা চেহারা, তার গায়ে মস্ত এক নিমগাছ, গাছের প্রায় গায়-গায় সেই পুরনো বাড়ি । এক্স সেলার্‌স হোমই হয়ত । বাড়িটার চেহারা, এই ঝাপসা অন্ধকারেও জরাজীর্ণ মনে হল । কেউ যে ও-বাড়িতে থাকে— তাও মনে হয় না । তবু ছিটেফোঁটা আলো চোখে পড়ছিল ।

তারাপদ আর চন্দন এসে হাজির ।

তারাপদ বলল, "দোকানের লোকটা এখনো আসেনি ।"

রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন কিকিরা । সিন্‌হা তখনো নামেননি । তিনি সারাটা পথই প্রায় টোটোর নাকের সামনে বাবলুর পুরনো জামাটা ধরে ছিলেন ।

চন্দন বলল, "স্যার, বাড়িটার ফটক দিয়ে না গিয়ে আমরা বরং গ্যারাজের পেছন দিয়ে দিয়ে যেতে পারি ।"

"কেন ?"

"ওদিকে বাড়ির পাঁচিল ভাঙাচোরা । আমি দেখে এসেছি ।"

সিন্‌হা নেমে পড়লেন টোটোকে নিয়ে । বললেন, "ভাল সাজেশান । গোলমাল না করে ঢুকে পড়াই ভাল ।"

গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে সিন্‌হা তাঁর কুকুর নিয়ে এগিয়ে চললেন । জামাটা আর হাতে নেই । এক সাইকেলঅলা আসছিল । বিরাট কুকুর দেখে ভয়ে তফাতে সরে পালিয়ে গেল ।

গ্যারাজ চুপচাপ । এখন বন্ধ । সামনের দিকে বোধ হয় দরোয়ান গোছের কেউ থাকে । সে নিজের মনে উনুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না শুরু করেছে । চারটে লোক আর বাঘের মতন এক কুকুর দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ।

কিকিরা কী মনে করে তার দিকে এগিয়ে গেলেন । কথা বললেন তার সঙ্গে ।

"তুম্‌ দরোয়ানজি ?"

"জি ।"

"উয়ো মোকান ?"

"মালুম নেহি ।" দরোয়ানের ভয় আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, সে ধরেই নিয়েছে— এই লোকগুলো নিশ্চয়ই পুলিশের লোক, নয়ত কুকুর নিয়ে এমন সময় আসে !

কিকিরা ধমক দিলেন । "ঝুটা মত্‌ বোলো ! ঠিক সে বাতাও ।"

এর পর লোকটা যা বলল, তাতে বোঝা গেল, বাড়িটা প্রায় পরিত্যক্ত । দু-চারজন যারা থাকে, তারা হয় আজেবাজে লোক, না হয় মাতাল । বাড়িটায় গুন্ডা-বদমাশের আসা যাওয়া আছে । জুয়াখেলা চলে । হল্লাও হয় কখনো-কখনো । একটা খুনও হয়েছিল বছর দুয়েক আগে ।

সিন্‌হা বললেন, "আমরা ও-বাড়িতে যাব ।"

দরোয়ান বলল, "ইয়ে কারখানাকো ভিতর সে চলে যাইয়ে, সাব ।"

কারখানার ভেতর দিয়ে ভাঙা পাঁচিল টপকে বাড়িটার মধ্যে যাওয়া যায় ।

সিন্‌হা এগিয়ে গেলেন ।

ভাঙাচোরা দু-একটা গাড়ি, একটা মিনিবাসের খাঁচা, দু-একটা সারাই গাড়ি,

লোহার জঞ্জাল, আরও কত আবর্জনা পেরিয়ে ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক-ফোঁকর পাওয়া গেল।

কিকিরারা ঢুকে পড়লেন বাড়িটার ভেতর।

সামান্য খোলা জায়গা, আগাছায় ভরতি। দুটো গাছ। বাড়িটা ভূতের মতন দাঁড়িয়ে। টিমটিমে আলো দু-চার জায়গায়। ভাঙা টিউবওয়েল। বড় একটা পাথরের পাশে একটা কল।

সাড়াশব্দ বিশেষ নেই।

সিন্‌হাসাহেব টোটোকে এগিয়ে দিলেন।

টোটোই টেনে নিয়ে চলল। কাঠের ভাঙা সিঁড়ি। শুঁটকি মাছের মতন এক গন্ধ। ধুলো, ময়লা। ছেঁড়া কাগজ। একটা মাতালের চিল্লানি।

দোতলার শেষদিকের ঘরের কাছে এসে টোটো ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দরজা তালাবন্ধ।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে সিন্‌হা ডাকলেন, "বাবলু! বাবলু!"

ভেতর থেকে সাড়া এল।

"একটু দাঁড়াও, আমরা আসছি।" বলে কিকিরাদের দিকে তাকালেন। "তালাটা ভাঙতে হবে।" টোটো অনবরত দরজার গায়ে আঁচড়াচ্ছে, ধাক্কা মারছে, মুখে চামড়ার স্ট্র্যাপের গার্ড পরানো, তবু আওয়াজ করছিল চাপা।

কিকিরা ভাবলেন, পকেট হাতড়ালেন। বাড়িতে তাঁর কাছে কতরকমের চাবি আছে। হ্যান্ড কাপ খোলারও চাবি পাওয়া যাবে এখনো। ম্যাজিশিয়াসন্ 'কী'। কিন্তু এখন পকেটে কিছুই নেই। তাঁর চাবির রিংয়ের সঙ্গে দাঁত খোঁটার একটা ছোট আঁকশি অবশ্য আছে। মেটাল টুথ পিক। ছোটখাট একটা স্ক্রু ড্রাইভার পেলে হত। অন্তত একটু শক্ত তারের টুকরো।

"সবাই মিলে ধাক্কা মেরে দরজাটা ভাঙব?" তারাপদ বলল।

"না না," কিকিরা বারণ করলেন। "শব্দ হবে। যারা এখানে দু-চারজন আছে, ধাক্কাধাক্কি শুনে এসে পড়বে। দাঁড়াও দেখি, কী করা যায়।" বলে কিকিরা দেশলাই বা লাইটার জ্বালাতে বললেন। "একটা টর্চ থাকলে ভাল হত। তারা, দেখো তো আশেপাশে যদি তারের টুকরো কিংবা সরু মতন কিছু কুড়িয়ে পাও। ...নিন, সিন্‌হাসাহেব, ওকে একটু সরান, আর লাইটারটা চন্দনের হাতে দিন।"

"আপনি তালা খুলবেন?"

"চেষ্টা করে দেখি। আপনার টোটোর নাক আছে মানতেই হবে। আমি ম্যাজিশিয়ান, ওল্ড অ্যান্ড রিটায়ার্ড, তবু আমার হাত আছে, ম্যাজিশিয়ান্‌স হ্যান্ড্... !" কিকিরা রসিকতা করে বললেন।

চন্দন লাইটারটা জ্বেলে ধরে থাকল তালার সামনে। এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে ধরে থাকা যায় না, আঙুলে তাত লাগে। নিভিয়ে ফেলতে

হয়। আবার জ্বালতে হয় সামান্য পরে।

কিকিরা চেষ্টা করেই যাচ্ছিলেন। তার পাওয়া গেল না কোথাও, একটা পুরনো পেরেক পাওয়া গেল। দাঁত খোঁচানো আঁকশি আর পেরেক দিয়ে চেষ্টা করতে-করতে শেষপর্যন্ত তালাটা খুলে গেল। কিকিরা বললেন, "জয় মা তারা।"

দরজায় ধাক্কা মারতেই পাল্লা দুটো দু' পাশে যেন ছিটকে গেল। কিকিরারা ঢুকে পড়লেন ঘরে।

অন্ধকার ঘর। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। খোলা জানলা দিয়ে যেটুকু আলোর আভা আসছে ঘরের বাইরে থেকে, তাতেও কিছু দেখা যায় না।

"বাবলু ?"

বাবলু বুঝি আশাই করেনি এভাবে আচমকা তাকে কেউ বাঁচাতে আসবে! বিহ্বল হয়ে থাকল। মুখে কথা আসে না।

"বাতিটা জ্বেলে দিন। ...আজ বাতি জ্বালতেও লোক আসেনি।" বাবলু শেষমেশ বলল।

লাইটারের আলোয় আধভাঙা সুইচ খুঁজে বাতিটা জ্বেলে দিল চন্দন। বাতি জ্বালার পর বাবলুকে চোখে পড়ল।

হাসপাতালের লোহার খাটের মতন একটা খাট একপাশে, তার ওপর মামুলি শতরঞ্জি, চাদরটাদর নেই। খাটের পায়ার সঙ্গে বাবলুর একটা পা নাইলনের দড়ি দিয়ে বাঁধা। এমনভাবে চালাকি করে বাঁধা যে, গিঁটটা খোলা যাবে না সহজে। জলের একটা জাগ্ মাটিতে নামানো। ঘরের এককোণে একটা এঁটো থালা, টিফিন কেরিয়ার।

বাবলুর পরনে বেখাপ্পা ময়লা পাজামা, গায়ে হাফহাতা বুশ শার্ট, সেটাও ময়লা। ওর চোখমুখ অসম্ভব শুকনো, নোংরা দেখাচ্ছিল। গালে দাড়ি গজিয়েছে ক'দিনে। রুক্ষ চুল মাথায়।

বাবলু সিন্‌হাকে চিনতে পারল। অন্য কাউকে সে চেনে না। অবাক হয়ে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এত লোক তার ঘরে আসতে পেরেছে! টোটোকে সামলানো যাচ্ছে না। সিন্‌হা ধমক দিলেন।

সিন্‌হাই কথা বললেন, "বাবলু, এঁরা তোমার বাবার পাঠানো লোক। তাঁর হয়ে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন ক'দিন। কী হয়েছিল তোমার ?"

বাবলু জল খেতে চাইল। জাগে আর জল নেই। কোনো রকমে গলা ভেজানো গেল।

বাবলু বলল, "অন্যদিন সন্ধেবেলায় একটা লোক এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যায়। জল দেয়, খাবার। আজ আসেনি।"

"খেতে দেয় না ?"

"দেয়। দু' বেলাই দেয়। চা-পাউরুটিও দিয়ে যায়। আজ বিকেলে এসে চা দিয়ে গেল। আর এই..." বলে নাইলন দড়ির বাঁধন দেখাল।

ছোট ঘর। একটিমাত্র জানলা। লোহার শিক দেওয়া জানলা। শিকগুলো মোটা। বাইরের দিকে ভাঙা খড়খড়ি।

তারাপদ সরে গিয়ে ঘরের লাগোয়া বারান্দার দিকে গেল। সরু একটু বারান্দা। লোহার তারের জালি দিয়ে ঘেরা। ছোট্ট একটু কলঘর। বালতিতে জল নেই। ফুরিয়ে গিয়েছে।

কিকিরা বাবলুর বাঁধন খুলে দিতে লাগলেন। দিতে-দিতে মনে মনে হাসলেন। ভাল ম্যাজিশিয়ানরা বিশরকমের নট— মানে গিঁট দেওয়া আর খোলা জানে। এ তো নেহাতই ছেলেখেলা তাঁর কাছে!

সিন্‌হা কিকিরাকে বললেন, "এখানে আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, জায়গা ভাল নয়; চলুন আমরা চলে যাই। ফিরে গিয়ে যা শোনার শোনা যাবে।"

কিকিরা রাজি।

বাইরে এসে সিঁড়ি নামার মুখেই দেখা গেল দু-তিনটে লোক। তার মধ্যে হীরা দুগারও রয়েছে। লোক দুটো পাকা গুন্ডা গোছের। বোঝাই যায়, দুগার কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। হয়ত সরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে বাবলুকে।

সিঁড়ির মুখে এত লোক আর কুকুর দেখে দুগাররা হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর তারা আচমকা পিছু হটে পালাবার চেষ্টা করল।

দুগার পালাতে পারল না। সিন্‌হা টোটোকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। চোখের পলকে সে দুগারের গায়ে গিয়ে ঝাঁপ মারল। অন্যজন গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি দিয়ে। একজন পালিয়ে গেল।

আচমকা হট্টগোল শুনে দু-চারজন— যারা ওই বাড়িটায় মাথা গুঁজে থাকে, তারা বেরিয়ে পড়েছিল।

দুগার আর এক-পাও নড়তে পারছিল না। টোটো তার বুকের সামনে দু' পা তুলে দাঁড়িয়ে। অন্য দুটো পা দুগারের কাঁধে।

কিকিরা বললেন, "সিন্‌হাসাহেব, এই সেই দুগার। হীরা দুগার। ...বাবলু, এই লোকটা তোমাকে ধরে এনেছিল না?"

বাবলু মাথা নাড়ল। বলল, "না। ও গাড়িতে ছিল। গাড়ি চালিয়েছে ও। অন্য দুটো গুন্ডা আমাকে আচমকা ধরে ফেলে গাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয়'। তারপর একজন আমায় ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে।"

দুগার কিছু বলবার চেষ্টাও করল না। কুকুরটার বিশাল মুখ যেন দুগারের নাক ছুঁয়ে আছে।

"এই লোকটা তোমাকে এখানে এনে আটকে রেখেছিল না?" কিকিরা বললেন।

"হ্যাঁ," বাবলু বলল। "ও আমাকে প্রথমে অন্য এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে

আটকে রেখেছিল। তারপর এখানে এনেছে।"

"এরা তোমায় মারধোর করত ?"

"করেছে বার কয়েক।"

সিন্‌হা বললেন, "ঠিক আছে। এর ব্যবস্থা হবে। জায়গাটা ভাল নয়। গুন্ডার দল এসে বোমা ছোড়াছুড়ি করতে পারে। এখন বাড়ি চলো।" বলে টোটোকে ডাকলেন।

টোটো তার শিকার যেন ছাড়তেই চায় না। শেষে ছেড়ে দিল।

দুগার আর পালাবার চেষ্টা করল না।

১২

কৃষ্ণকান্ত যেন ভাবতেই পারেননি এইভাবে ছেলেকে তিনি ফেরত পাবেন।

বাড়ির মধ্যে হট্টগোল পড়েগেল। চুপচাপ বিমর্ষ বাড়ি জেগে উঠল আবার।

কৃষ্ণকান্তর বসার ঘরে ওঁরা সকলেই বসে : কিকিরা, তারাপদ, চন্দন এমনকি সিন্‌হাসাহেবও। কৃষ্ণকান্ত বসে আছেন। আবেগে, কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল জমে আছে। জল, মিষ্টি খাওয়া শেষ। চা-সিগারেট খেতে-খেতে কিকিরা সময় জানতে চাইলেন। সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বললেন, "বাবলু আসছে ; আর-একটু বসুন দয়া করে। রাত হলেও ভাববেন না ; আমার গাড়ি গিয়ে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে। মিস্টার সিন্‌হার তো কোনো তাড়াই নেই, কাছেই বাড়ি।"

সিন্‌হাসাহেব বাবলুদের নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ঘুরেই এসেছেন। রেখে এসেছেন টোটোকে।

বাবলু এল। তাড়াতাড়িতে স্নানও সেরে এসেছ। তবু তাকে বেশ অবসন্ন দেখাচ্ছিল।

কিকিরা ডাকলেন বাবলুকে। বললেন, "এসো। বসো ওখানে।...ক'দিন ধরে ভোগালে খুব ! কী হয়েছিল বলো তো, বাবা।"

বাবলু বসল না। কেমন যেন কুণ্ঠিত। তারপর ঘটনাগুলো বলতে লাগল।

প্রথম দিকের ঘটনা সবই মিলে গেল। নিজেদের ক্লাবে বসে চা-মুড়ি খাওয়া, খবরের কাগজের পাতায় একটা বিজ্ঞাপন দেখা—সবই ঠিক। এটাও ঠিক যে, বাবলু বিজ্ঞাপনের পাতার টুকরোটুকু ছিড়ে নিয়ে এসেছিল। কারণ সে দেখতে চাইছিল, তাদের বাড়িতে ঠাকুরদার যে পকেট ঘড়িটা পড়ে আছে—সেই ঘড়ি আর এই কাগজের লেখা ঘড়িটা একই কিনা !

পরের দিন সে আলমারি থেকে ঠাকুরদার ঘড়িটা বার করে নেয়।

"দেখলে একই ঘড়ি ?" কিকিরা বললেন।

"হ্যাঁ। কিন্তু কাগজে যা বেরিয়েছিল তাতে পুরোটা—ডিটেল ছিল না অত। মোটামুটি ছিল। বোঝা যায় একই ঘড়ি।"

"তবু পুরোপুরি শিওর হওয়া যায় না!"

"খটকা থাকে।"

"তোমাদের ক্লাবে আড্ডাখানায় চা-মুড়ি খেতে-খেতে হঠাৎ বিজ্ঞাপনটা তোমাদের চোখে পড়ায় তুমি বন্ধুদের বলেছিলে—এরকম একটা ঘড়ি তোমাদের বাড়িতে আছে ?"

"বলেছিলাম। ওরা তেমন কেউ কান দেয়নি।"

"পরের দিন ঘড়িটা বার করলে। দেখলে। কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে। খুকু সেদিনই দেখল তোমার কাছে ঘড়িটা। সেদিনই আবার তুমি পবনের কাছে গিয়েছিলে বিকেলের দিকে, ধীরাজের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। তখন আর ঘড়ির কথা বলোনি ?"

"না।"

তারাপদ কিছু জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল। করল না। চন্দনও চুপ। সিন্‌হাসাহেব আরও একটা সিগারেট ধরালেন।

"তারপর ?"

"সেদিন সন্ধের দিকে বাড়ি ফিরে এসে আমি একটা ফোন করি। কাগজে ফোন নম্বর ছিল। নিচে, পাশের অফিস ঘর থেকে ফোন করেছিলাম। ভেবেছিলাম, কাউকে পাব না। পেয়ে গেলাম। একটা লোক ফোন ধরল।"

কিকিরা তাকালেন তারাপদদের দিকে। এই পর্যন্ত তিনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন।

বাবলু নিজেই পরের ঘটনাগুলো বলে চলল। ফোনে যাকে পেল, সে স্পষ্ট বাংলা বললেও তার কথায় একটু অন্যরকম টান ছিল। লোকটার কথাবার্তা বলার ভঙ্গি থেকে বাবলুর কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। মনে হল, লোকটা ধূর্ত; ভালও নয়।

"কী বলল সে ?" কিকিরা জিজ্ঞেস করলেন।

"বলল, জিনিসটা আগে দেখা দরকার। আরও দু-একজন যোগাযোগ করেছিল, পরে দেখা গেছে, তাদের কথা ঠিক নয়। কাজেই আগে জিনিসটা দেখতে হবে। অযথা কথাবার্তা বলার জন্যে ওই ঠিকানায় দেখা করে লাভ নেই।"

"তোমার নাম-ঠিকানা জানতে চেয়েছিল ?"

"হ্যাঁ। আমি আমাদের ঠিকানা দিলাম না, শুধু বললাম লেক গার্ডেন্সে থাকি। নাম বলেছিলাম। ...ও তখন বলল, ঘড়িটা আগে একবার দেখা দরকার। তাতে অসুবিধে হবে না ওর পক্ষে, ও নিজেও কাছাকাছি থাকে।

একসময়ে জিনিসটা দেখতে পারে।” বলে বাবলু একটু যেন ইতস্তত করল, দেখল বাবাকে। পরে নিচু গলায় বলল, “আমার একটু ভুল হয়ে গেল। আমি লোকটাকে দেখতে চাইছিলাম। ভাবছিলাম, ওকে বাজিয়ে দেখতে হবে, ধরব ওকে।”

“বুঝেছি! তুমি ওকে দেখা করতে বললে সকালবেলায়, লেকের কাছে?”

“বললাম, আমি রোজ সকালে লেকে দৌড়তে যাই। আমার গায়ে নীল-সাদা ট্র্যাকসুট থাকে। কাল সকাল সওয়া ছ'টা নাগাদ আমি স্টেডিয়ামের দিকে দৌড়ব। ঘড়ি আমার কাছে থাকবে সে যদি চায়, দেখতে পারে। তবে ঘড়ি যদি মিলে যায়—বাকি কাজটা আমার বাবা ঠিকানামতন জায়গায় গিয়ে করবেন। ও রাজি হয়ে গেল। ভাবল, সত্যি-সত্যি ঘড়িটা আমার কাছে পাবে।...আমি বুঝতে পারিনি, লোকটা আমার চেয়েও বেশি চালাক। সে আমাকে ওইভাবে তুলে নিয়ে যাবে, গুণ্ডা এনে! ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছিল!”

“ছেলেমানুষের মতন কাজ করেছিলে, হঠকারিতা!”

বাবলু মুখ নিচু করে থাকল। বলল, “কী করে বুঝব, আমার পাড়ায় এসে ও আমাকে ওভাবে তুলে নিয়ে যাবে! আমি ভাবতেই পারিনি! আমার মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়। চিট্। বদমায়েশ। হয়ত লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। ওকে ধরব।”

“তোমার সঙ্গে সিন্‌হাসাহেবের দেখা হয়েছিল সকালে খানিকটা আগে; তাঁকেও তো একবার বলে রাখলে পারতে যে, তুমি...”

“না, আমি বলিনি।”

“ওভার কন্‌ফিডেন্ট ছিল আর কী!” সিন্‌হাসাহেব বললেন।

কিকিরা বললেন, “যাক গে, ঘড়িটা কোথায়?”

বাবলু মাথা চুলকে বলল, “আমার ঘরেই আছে। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া আমার ছোট গামবুটের মধ্যে।”

কৃষ্ণকান্ত অবাক হয়ে বললেন, “সে কী রে! আমরা এত খুঁজলাম। গামবুটের মধ্যে ঘড়ি রাখবি, ভাবতেই পারিনি!...ওখানে কেন রেখেছিলি?”

“খুকুর ভয়ে। ও আমার ঘরে সব জিনিস হাতড়ায়। ওর হাতে পড়লে তোমাদের দিয়ে দেবে। গামবুটের মধ্যে ঘড়ি! ওর মাথায় অত বুদ্ধি হবে না যে, জুতো হাতড়াবে।”

কৃষ্ণকান্ত আর কী বলবেন! কিকিরা হাসলেন।

“যারা তোমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল,” কিকিরা বললেন, “তার মধ্যে ওই লোকটার নাম হীরা দুগার। জানো তুমি?”

“পরে জেনেছি। আগে জানতাম না।...ফোনে ও আমায় ওর নাম বলেনি, বলেছিল, নাম জেনে কী হবে, ও অফিস-এজেন্ট, আমায় খুঁজে নেবে আমার ট্র্যাকসুট দেখে।”

"তোমায় ওরা সোজা ওই বাড়িটায় নিয়ে যায় !"

"না। প্রথমে তিনদিন অন্য জায়গায় রেখেছিল। তারপর ওই বাড়িটায় নিয়ে যায়।" বলে বাবলু নিজেই বলল, "আমায় ওরা ভয় দেখাত। বলত, খুন করে ফেলবে। চড়চাপড়, ঘুষি মারত। ওরা চাইত, আমি একটা কাগজে লিখে দি—বাবা যেন ঘড়িটা নিয়ে হীরার কথামতন জায়গায় তার সঙ্গে দেখা করে। আমি লিখে দিতাম না।...তবে ওরা যেমন আমায় নজরে-নজরে রাখত সব সময়, স্নান খাওয়াও করতে দিত।"

বাবলু চুপ করে গেল।

কৃষ্ণকান্ত বললেন, "একটা সোনার অচল ঘড়ির জন্যে এত ! কী এর দাম ! দশ-পনেরো হাজার। ব্যাঙ্ক লুঠ নয়, লাখ দু' লাখ টাকার গয়না চুরি নয়—মাত্র দশ-বারো হাজার টাকার জন্যে ছেলেটাকে কিড্ন্যাপ করল ! মানুষ যে আজকাল কী হয়ে গিয়েছে !"

কিকিরা মাথা নাড়লেন ধীরে-ধীরে, চন্দনের দিকে তাকালেন। তারপর পকেটে হাত ডুবিয়ে একটা কাগজ বার করলেন। কৃষ্ণকান্তর দিকে তাকালেন এবার। বললেন, "না কৃষ্ণকান্তবাবু, দশ-পনেরো হাজারের ব্যাপার নয়। টাকার দিক থেকে লাখ সওয়া লাখও হতে পারত। তবে টাকাটাও এখানে বড় কথা নয়। অন্য ভ্যালু আছে ঘড়িটার। এই কাগজটা—টাইপ করা কাগজটা—আজ 'লাজোস' কোম্পানির ম্যানেজারসাহেব আমায় দিয়েছেন। এতে ঘড়িটার কথা মোটামুটি লেখা আছে। দেখবেন ?"

"আপনিই বলুন।"

কিকিরা কাগজের লেখাটা দেখে-দেখে বলতে লাগলেন :

"ঘড়িটার মালিক ছিলেন আদতে এক ইটালিয়ান ধনী। ভদ্রলোক পরে হাঙ্গেরিতে চলে যান। ১৯১৪ সালে ভদ্রলোক বুদাপেস্ট শহর থেকে নিখোঁজ হন। কেউ তাঁকে খুন করে। পরে এক জাহাজের বরফঘরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। জাহাজটা ভারতের দিকে আসছিল। ভদ্রলোকের নাম ফিলিপ্পো। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। স্ত্রী হাঙ্গেরিয়ান। স্ত্রী এবং মেয়ে মিলে 'লাজোস' কোম্পানি চালাতে থাকেন। মেয়ের ছেলে—মানে নাতির নাম লাজোস এজরি। এই পরিবার একসময়, হাঙ্গেরির জু—বা ইহুদিদের মধ্যে গোপনে অনেক কাজ করত। সাঁইত্রিশ সালের আগেই অনেক ইহুদিকে এরা বিদেশে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছিল। পরে, হিটলারের সময় গোটা পরিবারকে হাঙ্গেরি থেকে তাড়িয়ে, আরও হাজার হাজার ইহুদির সঙ্গে লেবার ক্যাম্পে রেখে, অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়। মাত্র একজন পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল। তিনিই এখন লাজোস কোম্পানির মালিক। এঁর নাম মোল্নার। লাজোসদের পারিবারিক সংগ্রহে অনেক কিছুই একে-একে জোগাড় করা হয়েছে খুঁজে পেতে। আঁদিপুরুষের ঘড়িটার খবর পেয়ে এখন

তাঁরা সেটি ফেরত পেতে চান।”

সিন্‌হার যেন বিশ্বাস হল না। বললেন, “আশ্চর্য ব্যাপার, মিস্টার রায়। ঘড়িটা কলকাতায় আছে এ-খবর ওরা পাবে কেমন করে?”

“কলকাতাতেই আছে তা হয়ত পায়নি। তবে এদেশের কোনো বড় শহরে রেয়ার ওয়াচ ডিলারদের কাছে আছে, জানতে পেরেছিল। সব বড় শহরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে—এ-কথা ম্যানেজার সাহেব আমাদের বলেছেন। আরও বলেছেন, দিল্লির এক রেয়ার কালেকশান্‌স ডিলারের কাছ থেকে বোধ হয় ওঁরা শুনেছেন ঘড়িটা কলকাতায় থাকতে পারে।” কিকিরা বললেন।

সকলেই চুপ করে থাকল।

রাত হয়ে যাচ্ছে। কিকিরা ওঠার জন্য প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। কী মনে করে বাবলুকে বললেন, “তোমার ওই ফক্স, অক্স, বক্স লেখার মানে কী, বাবা?”

বাবলু বলল, “কাগজটায় লেখা নেই?”

কিকিরা হাসলেন। “আছে। বলব? এই কাগজ দেখে বলছি। বলি। ঘড়ি যদি আসল হয় তবে তার পেছনে একেবারে খুদে-খুদে অক্ষরে একটা মনোগ্রাম খোদাই করা আছে। গায়ে-গায়ে জড়ানো। তাতে এফ. ও. বি লেখা। মানে সেই মৃত বৃদ্ধের পুরো নামের আদ্যাক্ষর ফিলিপ্‌পো ও.বি। তুমি সেটা সাঁটে ফক্স, অক্স, বক্স করেছ?”

বাবলু মাথা দুলিয়ে বলল, “মাথায় এল, করে ফেললাম।” অত ভাবিনি। ফক্স, অক্স, বক্স মিলে যাচ্ছিল—তাই!”

রাত হয়ে যাচ্ছিল। কিকিরা এবার উঠে দাঁড়ালেন।

“এবার আমাদের যেতে হয়, কৃষ্ণকান্তবাবু! চলুন সিন্‌হাসাহেব! আপনাকে স্যার ধন্যবাদ। আপনার টোটো সত্যিই ওয়ান্ডারফুল!”

তারাপদরাও উঠে দাঁড়াল।

চন্দন সিন্‌হাসাহেবকে বলল, “ওই দুগারের কী হবে?”

সিন্‌হা বললেন, “আজকের মতন তো তাকে আমার হোটেলের দরোয়ানদের জিম্মায় দিয়ে এসেছি। কাল দুগারের অফিস আর থানা-পুলিশ করতে হবে।”

ওঁরা বাইরে এলেন। কৃষ্ণকান্ত গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বাইরে। কিকিরাদের বাড়ি পৌঁছে দেবে গাড়ি।

“চলি মশাই, নমস্কার।”

“নমস্কার। আপনাদের কী বলে ধন্যবাদ দেব, জানি না।” কৃষ্ণকান্ত বললেন, কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই তাঁর। “আমি আপনার সঙ্গে কালই দেখা করব।”

সিন্‌হা মজা করে বললেন, “উপায় নেই, দেখা করতেই হবে।”

কিকিরা, তারাপদরা গাড়িতে উঠে পড়লেন।